সাইয়েদ কুতুব শহীদ

# তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

২১তম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

AL-QURAN ACADEMY LONDON

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

# তাফসীর
# ফী যিলালিল কোরআন

২১তম খন্ড

সূরা আল মূলক
থেকে
সূরা আল মোরসালাত

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

# তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

*(২১তম খন্ড সূরা আল মুলক থেকে সূরা আল মোরসালাত)*

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫
বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬
**বিক্রয় কেন্দ্র :** ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭
প্রথম সংস্করণ
১৯৯৫
১১ম সংস্করণ
রবিউস সানি ১৪৩২ মার্চ ২০১১ চৈত্র ১৪১৭
কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকামাত্র

Bengali Translation of Tafseer

**'Fi Zilalil Quran'**

**Author**

Syed Qutb Shaheed

**Translator of Quranic text into Bengali**
**&**
**Editor of Bengali rendition**
Hafiz Munir Uddin Ahmed

**21th Volume**

(Sura Al Mulk to Sura Al Morsalat)

**Published by**
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy London
124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK
Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955
**Bangladesh Centre**
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
**Sales Centre:** 507/1 (362) Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
38/3 Computer Market Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997
**1st Edition**
1995
**11th Edition**
Rabius Sani 1432 March 2011
**Price** Tk. 200 .00
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN 984-8490-06-5

# বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমান যমীন, চাঁদ সুরুজ, মহাদেশ মহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তাঁর নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?

কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়
এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আলামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

# এই খন্ডে যা আছে

# প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্‌সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে ঊর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

**খাদিজা আখতার রেজায়ী**

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

# সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' ( সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না–এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে–কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। ( সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহ্র কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' ( সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের ( আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না–না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

**হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ**
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

# সূরা আল মুলক

আয়াত ৩০ রুকু ২

**মক্কায় অবতীর্ণ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ ⑴ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ ⑵ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ⑶ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ⑷ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ⑸

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. (কতো) মহান সেই পুণ্যময় সত্তা, যাঁর হাতে (রয়েছে আসমান যমীনের যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব, (এ সৃষ্টি জগতের) সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান, ২. যিনি জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে এর দ্বারা তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন, কর্মক্ষেত্রে কে (এখানে) তোমাদের মধ্যে বেশী ভালো। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অসীম ক্ষমাশীল, ৩. তিনিই সাত (মযবুত) আসমান বানিয়েছেন, পর্যায়ক্রমে একটার ওপর আরেকটা (স্থাপন করেছেন); অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার এ (নিপুণ) সৃষ্টির কোথাও কোনো খুঁত তুমি দেখতে পাবে না; আবার (তাকিয়ে) দেখো তো, কোথাও কি তুমি কোনো রকম ফাটল দেখতে পাও? ৪. অতপর (তোমার) দৃষ্টি ফেরাও (নভোমন্ডলের প্রতি), দেখো, আরেকবারও তোমার দৃষ্টি ফেরাও (দেখবে, তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। ৫. নিকটবর্তী আকাশটিকে (তুমি দেখো, তাকে কিভাবে) প্রদীপমালা দিয়ে আমি সাজিয়ে রেখেছি, (উর্ধ্বলোকের দিকে গমনকারী) শয়তানদের তাড়িয়ে বেড়ানোর জন্যে এ (প্রদীপগুলো)-কে আমি (ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে) সংস্থাপন করে রেখেছি, (চূড়ান্ত বিচারের দিন) এদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডলীর ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থাও আমি (যথাযথভাবে) প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝٦ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۝٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝٨ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝٩ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝١٠ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝١١ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝١٢ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝١٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝١٤

৬. (এতো সব নিদর্শন সত্ত্বেও) যারা তাদের স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠোরতম) শাস্তি; জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্টতম স্থান! ৭. এর মধ্যে যখন তাদের ছুঁড়ে ফেলা হবে তখন (নিক্ষিপ্ত হবার আগেই) তারা শুনতে পাবে, তা ক্ষিপ্ত হয়ে বিকট গর্জন করছে, ৮. (মনে হবে) তা যেন প্রচন্ড ক্রোধের কারণে ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; যখনই একদল (নতুন পাপী)-কে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, (এ জায়গার কথা বলার জন্যে) তোমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী কি আসেনি? ৯. তারা বলবে, হাঁ, আমাদের কাছে (আল্লাহর) সাবধানকারী (নবী রসূল) এসেছিলো, কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকারই করেছি, আমরা তাদের বলেছি, (এ দিন সংক্রান্ত) কোনো কিছুই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেননি; বরং তোমরা নিজেরাই চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছো। ১০. তারা বলবে, কতো ভালো হতো (যদি সেদিন) আমরা (নবী রসূলদের কথা) শুনতাম এবং (তা) অনুধাবন করতাম, (তাহলে আজ) আমরা জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের মধ্যে গণ্য হতাম না। ১১. অতপর তারা নিজেরাই নিজেদের (যাবতীয়) অপরাধ স্বীকার করে নেবে, ধিক্কার জাহান্নামের অধিবাসীদের ওপর! ১২. (অপর দিকে) সেসব (সৌভাগ্যবান) মানুষ, যারা নিজেরা (চোখে) না দেখেও তাদের সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করেছে, নিসন্দেহে তাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ১৩. তোমরা তোমাদের কথাবার্তাগুলো লুকিয়ে রাখো কিংবা (তা) প্রকাশ করো (আল্লাহর কাছে এর উভয়টাই সমান); কারণ তিনি মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল। ১৪. তিনি কী (সৃষ্টি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে) জানবেন না, যিনি (এর সবকিছু) বানিয়েছেন, (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ

وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا

هِىَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ

فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ

نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ

اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍۢ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ

يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا

## রুকু ২

১৫. তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন, তোমরা (যখন যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর থেকে (উদ্গাত) রেযেক তোমরা উপভোগ করো; (মনে রেখো,) একদিন (তোমাদের সবাইকে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ১৬. তোমরা কি নিজেদের নিরাপদ ভাবছো (মহাশক্তিধর) আকাশের মালিক আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের সহ ভূমন্ডলকে গেড়ে দেবেন না? (এমনি অবস্থা যখন দেখা দেবে) তখন তা (ভীষণভাবে) কম্পমান হবে, ১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিত, আকাশের (অধিপতি) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর (প্রস্তর নিক্ষেপকারী) এক প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করবেন না? (এমন দিন আসবে এবং) তোমরা সেদিন অবশ্যই জানতে পারবে, কেমন (ভয়াবহ হতে পারে) আমার সাবধানবাণী (উপেক্ষা করা)! ১৮. তাদের আগেও যারা (আমার সাবধানবাণী) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দেখো, কেমন (ছিলো তাদের প্রতি) আমার আচরণ! ১৯. এ সব লোকেরা কি তাদের মাথার ওপর (দিয়ে উড়ে যাওয়া) পাখীগুলোকে দেখে না? (কিভাবে এরা) নিজেদের পাখা মেলে রাখে, (আবার) এক সময় (তা) গুটিয়েও নেয়। (তখন) পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালাই এদের (মহাশূন্যে) স্থির করে রাখেন (হাঁ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই); তিনি (তাঁর সৃষ্টির ছোটো বড়ো) সব কিছুই দেখেন। ২০. বলো তো, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার কাছে (এমন) একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী আছে, (যা দিয়ে) তারা অসীম দয়ালু আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবে? (আসলে) এ অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা (হামেশাই) বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকে, ২১. যদি তিনি তোমাদের জীবিকা (-র উপকরণ) সরবরাহ বন্ধ করে

الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن
يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا
مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ
اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ
اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾

দেন, তাহলে (এখানে) এমন (দ্বিতীয়) আর কে আছে যে তোমাদের (পুনরায়) রেযেক সরবরাহ করতে পারবে? এরা তো বরং (মনে হয় আল্লাহ তায়ালার) বিদ্রোহ এবং গোঁড়ামিতেই (অবিচল হয়ে) রয়েছে। ২২. যে ব্যক্তি যমীনের (ওপর দিয়ে) উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে– সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে হেদায়াতপ্রাপ্ত, না যে (ব্যক্তি যমীনে স্বাভাবিকভাবে) সঠিক পথ ধরে চলে সে (বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত)? ২৩. (হে নবী,) তুমি (এদের) বলে দাও (হাঁ), তিনিই তোমাদের পয়দা করেছেন, তিনি তোমাদের (শোনার ও দেখার জন্যে) কান এবং চোখ দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন (চিন্তা করার মতো) একটি অন্তর; কিন্তু তোমরা খুব কমই (এসব দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো। ২৪. (এদের আরো) বলো, তিনিই এ ভূখন্ডে তোমাদের (সর্বত্র) ছড়িয়ে রেখেছেন, আবার (একদিন চারদিক থেকে) তাঁরই সম্মুখে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে। ২৫. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে (বলো) কবে এটা (সংঘটিত) হবে? ২৬. তুমি এদের বলো, (এ) তথ্য তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, আমি তো একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র! ২৭. যখন (সত্যি সত্যিই) এ (প্রতিশ্রুতি)-টি তারা (সংঘটিত হতে) দেখবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে) অস্বীকার করেছিলো, তখন তাদের সবার মুখমন্ডল বিকৃত হয়ে যাবে এবং (তাদের তখন) বলা হবে, এ হচ্ছে সেই (মহাধ্বংস), যাকে তোমরা চ্যালেঞ্জ করতে! ২৮. তুমি বলো, তোমরা কি এ কথা ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে এবং আমার সংগী সাথীদের ধ্বংস করে দেন, কিংবা (ধ্বংস না করে) তিনি যদি আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করেন (সবই হবে তাঁর ইচ্ছাধীন), কিন্তু (আল্লাহ তায়ালাকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের (কেয়ামতের দিন) এ ভয়াবহ আযাব থেকে কে বাঁচাবে?

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاۤءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

২৯. তুমি এদের বলো (হাঁ, সেদিন বাঁচাতে পারেন একমাত্র) দয়াময় আল্লাহ তায়ালাই, তাঁর ওপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁর ওপরই নির্ভর করেছি (হাঁ), অচিরেই তোমরা জানতে পারবে (আমাদের মধ্যে) কে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে নিমজ্জিত ছিলো? ৩০. (হে নবী,) তুমি (এদের) জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের (যমীনের বুকে অবস্থিত) পানি যদি কখনো উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদের জন্যে এ (পানির) প্রবাহধারা পুনরায় বের করে আনবে?

## সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য পারাটির সব কয়টি সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ। ঠিক এর বিপরীত, পূর্ববর্তী ২৮ নং পারার সব কয়টি সূরাই ছিলো মদীনায় অবতীর্ণ। মক্কী হোক বা মাদানী হোক, প্রত্যেক সূরারই থাকে স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বিশিষ্ট স্বাদ। এই পারার কোনো কোনো সূরার প্রথমাংশ পবিত্র কোরআনের সূচনাকালীন ওহীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সূরা আল মোদ্দাসসের ও সূরা আল মোযযাম্মেলের প্রথমাংশ। আবার এই পারায় এমন কিছু সূরাও রয়েছে যা সম্ভবত নবুয়ত লাভের প্রায় তিন বছর পর নাযিল হয়েছে, যেমন সূরা আল ক্বালাম, আবার কোনোটা নাযিল হয়েছে নবুয়ত লাভের প্রায় দশ বছর পর যেমন সূরা আল জ্বিন।

বর্ণিত আছে, বনু সকীফ গোত্রের নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রসূল (স.) যখন তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে সূরা জ্বিন নাযিল হয়। সূরা জ্বিনের ঘটনার বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর কাছে একদল জ্বিনকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন রসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি কোরআন পড়ছিলেন। জ্বিনেরা তাঁর কোরআন পাঠ শুনতে লাগলো। তায়েফের এই সফর সংঘটিত হয়েছিলো খাদিজা (রা.) ও আবু তালেবের ইন্তেকালের পর হিজরতের এক বছর বা দু'বছর আগে। অবশ্য অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা জ্বিন নবুওতের প্রথম দিকেই নাযিল হয়েছিলো। এই শেষোক্ত রেওয়ায়াতটিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

পবিত্র কোরআনের মক্কায় নাযিল হওয়া অংশ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, ওহী ও আখেরাত সংক্রান্ত আকীদা এবং এই আকীদা থেকে বিশ্বজগত ও তার স্রষ্টার সাথে বিশ্বজগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, তা। সেই সাথে স্রষ্টার পরিচয়ও এই সূরাগুলোতে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে, স্রষ্টার সম্পর্কে মানব হৃদয়ে এক জীবন্ত চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেই চেতনা অত্যন্ত কার্যকর, সঠিক দিক-নির্দেশক এবং আপন মনিবের অনুগত বান্দার যেরূপ অনুভূতি ও মানসিকতা থাকা উচিত, সেরূপ মানসিকতারই উদ্দীপক, বান্দার মধ্যে আপন প্রভুর উপযুক্ত আদব ও ভক্তির উদ্গাতা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনাবলীর

মূল্যায়ন ও মান নির্ণয়ে একজন মুসলমানের যে দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়, তারই উজ্জীবক। পূর্ববর্তী মক্কী সূরাগুলোতে আমরা এই বক্তব্যের নমুনা দেখেছি। বর্তমান পারায় আমরা তার আরো নমুনা দেখতে পাবো।

পক্ষান্তরে মাদানী সূরা ও আয়াতগুলো প্রধানত উপরোক্ত আকীদা এবং ধারণা ও মূল্যমানকে বাস্তব জীবনে কার্যকর রূপদান সম্পর্কে সোচ্চার থাকে। সেই সাথে মানুষের মনকে জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও শরীয়তী বিধান বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এ ব্যাপারে মানুষকে মানসিক ও বাহ্যিক উভয়ভাবে প্রস্তুত করে। পূর্বোক্ত মাদানী সূরাগুলোতে যেমন আমরা এর নযীর দেখেছি, চলতি পারার সূরাগুলোতেও তেমনি দেখতে পাবো।

'সূরা তাবারাকা' বা 'সূরা আল মুল্‌ক' এ পারার প্রথম সূরা। সৃষ্টিজগত ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা এ সূরায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ধারণাটা এতো ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী যে, তা সংকীর্ণ ও সীমিত পার্থিব পরিমন্ডলকে অতিক্রম করে মহাকাশের বিভিন্ন জগত, আখেরাতের জীবন, পার্থিব জগতের মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টি তথা জ্বিন, পাখি, আখেরাতের জাহান্নাম ও তার রক্ষীরা এবং অদৃশ্য জগতের এমন আরো বহু জিনিস পর্যন্ত বিস্তৃত, যার সাথে মানুষের মন ও আবেগ জড়িত, তাই এর আলোচ্য বিষয় শুধু দৃশ্যমান পার্থিব জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু তা মানুষের চোখের সামনে, বাস্তব জীবনে ও আপন সত্তার মধ্যে বিরাজমান এমন বহু জিনিস সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে, যাকে সচরাচর উপেক্ষা করে চলতেই সে অভ্যস্ত।

এই সূরা মানুষের মনমানসে পুঞ্জীভূত যাবতীয় স্থবির ও পশ্চাদমুখী জাহেলী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারাকে নাড়া দিয়ে ঝেড়ে ফেলে, চেতনার স্থানে স্থানে সংযোগের জানালা খুলে দেয়। সেখান থেকে জড়তার ধুলাবালি মুছে ফেলে এবং বিবেক, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টিকে স্বাধীন করে দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির মুক্ত দিগন্তে, আপন সত্তার গভীরতম প্রকোষ্ঠে, মহাশূণ্যের দূর নিলীমায়, মহা সমুদ্রের অথৈ জলরাশিতে এবং অদৃশ্য জগতের সকল গোপন ঘাঁটিতে বিচরণ ও পর্যবেক্ষণে উদ্দীপিত করে। এই বিচরণের মধ্য দিয়ে সে সর্বত্র আল্লাহর হাতকেই দেখতে পায় সৃজনশীল, অনুভব করে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও নৈপুণ্যে পরিচালিত সৃষ্টিজগতের তৎপরতা, তারপর এই বিশাল সৃষ্টি জগতকে স্বীয় উপলব্ধির ঊর্ধে বিবেচনা করে তার পর্যবেক্ষণ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে তার মন-মগয। সে বুঝতে পারে যে, এ মহাবিশ্বের পরিধি তার কল্পনার চেয়েও বিশালতর। ফলে সে পৃথিবীর প্রশস্ততাকে অতিক্রম করে চলে যায় আকাশে, দৃশ্যমান জগত থেকে তা গিয়ে উপনীত হয় প্রকৃত জগতে, স্থবিরতা থেকে সচলতায় অদৃষ্ট, জীবন ও জগতে জীবসুলভ এক চঞ্চলতায়।

জীবন ও মৃত্যু একটি সুপরিচিত ও বারংবার সংঘটিত ব্যাপার। কিন্তু এই সূরা মানুষের চিন্তাধারাকে জীবন ও মৃত্যুর অপর পারে সঞ্চালিত করে। আল্লাহর নির্ধারিত অদৃষ্ট, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার প্রজ্ঞা ও কৌশল নিয়ে ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। সূরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'যিনি জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল। তিনি মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।'

আকাশ হচ্ছে অজ্ঞ মানুষের চোখের সামনে বিরাজিত স্থির নিশ্চল এক সৃষ্টি। এ সৃষ্টির পশ্চাতে তার সৃজনকারী হাতকে সে দেখতে পায় না। এতে কি পূর্ণতা ও চমৎকারিত্ব বিদ্যমান তাও তার চোখে পড়ে না। কিন্তু আলোচ্য সূরা তার চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তিকে এর অপরূপ

সৌন্দর্য ও পূর্ণতা এবং তার পশ্চাতে যে তৎপরতা ও অভিলাষ নিহিত রয়েছে তা নিয়ে ভাবতে শিখায় এবং তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই উপরোক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতের বক্তব্য হলো,

'যিনি সাতটি আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। আচ্ছা, দৃষ্টি ফেরাও তো। কোনো অসম্পূর্ণতা দেখতে পাও কি? পুনরায় দৃষ্টি ফেরাও। তোমার দৃষ্টি তোমার কাছেই ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। আর আমি নিম্নতম আকাশকে কতকগুলো প্রদীপ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং শয়তানগুলোকে মেরে তাড়ানোর জন্যে এগুলোকে হাতিয়ার বানিয়েছি।'

জাহেলিয়াতের দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনই হচ্ছে জীব-জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু আলোচ্য সূরা আরেকটি জগত উদঘাটিত করেছে। নতুন করে সৃজিত সেই জগতটি শয়তানদের ও কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। সে জগত চঞ্চলতা, চমক ও প্রতীক্ষায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর জাহান্নাম খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা .... জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডবাসীর ওপর অভিশাপ।'

জাহেলিয়াতমুখী মন-মগয জীবন যাপনের এই প্রকাশ্য পরিমন্ডলের বাইরের আর কিছুর অস্তিত্ব মানে না। অদৃশ্য জগত ও তার অন্তর্নিহিত সত্যগুলো নিয়ে চিন্তাও করে না। তার সমস্ত চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র পার্থিব জীবনকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত এবং দৃশ্যমান পৃথিবীর বদ্ধ খাঁচায় সে আবদ্ধ। তাই এ সূরা মানুষের মনকে ও দৃষ্টিকে অদৃশ্য জগত, আকাশ ও সেই সীমাহীন ক্ষমতার প্রতি নিবদ্ধ করে, যা চোখের অগোচরে থাকলেও যা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা ও যেখানে ইচ্ছা তা করতে সক্ষম। যে ইহকালীন জগত নিয়ে তারা ডুবে আছে এবং যার প্রতি তারা পরম আস্থাশীল রয়েছে, সেই ইহকালীন জগতের প্রতি তাদের আস্থা নাড়িয়ে দেয়। সূরার একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'যারা তাদের অদৃশ্য প্রভুকে ভয় পায়, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। .... যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি যে তোমাদেরকে মাটির নিচেও পুঁতে ফেলতে পারেন, সে ব্যাপারে কি তোমরা নিশ্চিন্ত? ....'

পাখি এমন এক সৃষ্টি যাকে মানুষ প্রতিনিয়তই দেখতে পায়, অথচ তার অলৌকিকত্ব নিয়ে তেমন চিন্তাভাবনা করে না। কিন্তু এই সূরা মানুষের চোখকে পাখির দিকে তাকাতে এবং তার মনকে পাখি নিয়ে ভাবতে শেখায়। আল্লাহর যে সীমাহীন ক্ষমতা এই বিচিত্র সৃষ্টিকে সৃজন ও তার পরিকল্পনা করেছে, সে সম্পর্কে তাকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

'তারা কি পাখিদের দিকে তাকায় না, কিভাবে তারা মানুষের মাথার ওপর পাখা মেলে ও গুটিয়ে নেয়? দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদেরকে তো আর কেউ থামাতে পারে না। তিনি সকল জিনিসের দর্শক।'

মানুষ যখন নিজ বাসস্থানে আল্লাহর ক্ষমতা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে অবস্থান করে, সেই সময়ে এই সূরা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে এক মানসিক উদাসীনতা থেকে মুক্ত করে দেয়। অবশ্য সে চিন্তাভাবনা করলে বুঝতো, যে তার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী এবং চারপাশ থেকে গোটা প্রকৃতি ইতিপূর্বেই তাকে আল্লাহর পরাক্রম ও প্রতাপ সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছে, অথচ এটাকে সে হিসাবেই ধরেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমাদের কাছে কি এমন কোনো বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে, যারা রহমানের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে! আসল কথা হলো, অমান্যকারীরা প্রতারণার শিকার।'

মানুষ যে জীবিকা উপার্জন করে, তা তার ধারণায় উপায় উপকরণের নাগালের কাছাকাছি এবং সহজেই তা উপার্জন করা সম্ভব। আর এই উপায়-উকরণ হচ্ছে তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। কিন্তু আলোচ্য সূরা তাদের দৃষ্টিতে অনেক দূরে আকাশের ওপরে পর্যন্ত প্রসারিত করে। তাদের ধারণা অনুসারে তাদের সুপরিচিত উপায়-উপকরণের ঊর্ধে টেনে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি আয়াতের বক্তব্য দেখুন!

'যে তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করে থাকে, তার জীবিকা যদি আল্লাহ তায়ালা বন্ধ করে দেন, তাহলে কি হবে ভেবে দেখতো। আসলে তারা আল্লাহদ্রোহিতা ও সত্য পরিত্যাগের ওপর জেদ ধরে রয়েছে।'

মানুষ যখন তার বিভ্রান্তিতে অনড় হয়ে বসে থাকে আর ভাবে যে, আমি সঠিক পথে আছি, তখন এই সূরা তার কাছে তার প্রকৃত অবস্থা এবং প্রকৃত সত্য পথচারীদের অবস্থা ও গুণাগুণ বর্ণনা করে এক চলন্ত, জীবন্ত ও উদ্বুদ্ধকারী ভংগীতে।

'ভেবে দেখ তো, যে লোক উল্টোদিকে মুখ করে বলছে, সে সঠিক সত্য পথপ্রাপ্ত, না যে লোক মাথা উঁচু করে সোজাসুজি একটি সমতল সড়কের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তার সত্তায় যেসব যোগ্যতা, ক্ষমতা ও প্রতিভা দিয়েছেন, তাকে সাধারণত সে কাজে লাগায় না। তার স্নায়ূ ও পঞ্চইন্দ্রিয় যা অনুভব করে তাকে অতিক্রম করে এই ইহজগতের ঊর্ধের কোনো কিছুতে সে ভ্রুক্ষেপ করে না। এ জন্যে আলোচ্য সূরা তাকে দেয়া আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এই নেয়ামতগুলোকে দৃশ্যমান বর্তমানের বহির্ভূত অজানা ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করে দেয় এবং এই সূচনা থেকে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছার দিক নির্দেশনা দেয়!

'তুমি বলো! তিনিই সেই মহান আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের চোখ, কান ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। বলো, তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তার কাছেই ফিরে যাবে।'

কাফেররা পরকালীন জীবনে পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামতকে অস্বীকার করে থাকে এবং তার নির্দিষ্ট সময়কাল জানতে চায়। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য সূরা তার সামনে কেয়ামতকে একটা অবধারিত আকস্মিক ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে এবং সে ঘটনা যখন ঘটবে তখন তা তাদের জন্যে অবশ্যই বিব্রতকর হবে।

'তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলতো এই ঘটনা কবে ঘটবে? বলো, প্রকৃত জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে আর আমি তো শুধু খোলাখুলি সতর্ককারী। পরে তারা যখন এই জিনিসকে অর্থাৎ কেয়ামতকে একান্ত কাছে উপস্থিত দেখবে, তখন এই অস্বীকারকারীদের মুখ বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এই হচ্ছে সেই বিষয়, যার জন্যে তোমরা তাগাদা দিচ্ছিলে।'

কাফেররা ভাবতো যে, রসূল (স.) ও তার সংগীরা মারা গেলে খুবই ভালো হতো এবং তারা হেদায়াতের এই বিরক্তিকর আওয়ায শোনার হাত থেকে রেহাই পেতো। যে আওয়ায প্রতিনিয়ত তাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সতর্ক করে এবং তাদের আয়েশী ঘুম ভেংগে দেয়,

তার হাত থেকে নিস্তার পেতো। কিন্তু আলোচ্য সূরা তাদেরকে বলে যে, মোমেন জনগোষ্ঠীর মরা বা বাঁচাতে কিছু এসে যায় না। রসূল (স.)-কে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর যে আযাব তাদের জন্যে অবধারিত হয়ে আছে, তা থেকে তাদের রেহাই নেই। কাজেই সেই ভয়াবহ দিন ঘনিয়ে আসার আগে তাদের নিজ নিজ অবস্থা ও করণীয় বিবেচনা করা উত্তম।

'তুমি বলো! আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের ওপর দয়া করেন, তাহলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কাফেরদেকে কে রক্ষা করবে? তুমি বলো, তিনি দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নন। আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তারই ওপর নির্ভরশীল আছি। প্রকৃত গোমরাহ কে, তা তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।'

সর্বশেষে এই সূরা আরবদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংগ পানি যে কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে এ আশংকা ব্যক্ত করে সাবধান করেছে। সে বলছে যে, আল্লাহ তায়ালাই এই পানি সরবরাহ করেন। অথচ তাকেই তারা অগ্রাহ্য করছে,

'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের পানি যদি উধাও হয়ে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান পানি এনে দেবে?'

এ সব বক্তব্য বিবেচনা করলে মনে হয় সূরাটি আগাগোড়াই একটি আন্দোলন, অনুভূতিতে একটি শিহরণ এবং চিন্তায় ও চেতনায় একটি অভ্যুত্থান, আর গোটা সূরার মূল ও প্রধান বক্তব্য হলো তার সূচনা বাক্য,

'পরম কল্যাণময় তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সাম্রাজ্য এবং তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান।'

আর এই সাম্রাজ্য ও তাতে সর্বশক্তিমান হওয়ার তত্ত্ব থেকেই এই সূরায় নিবেদিত সকল দৃশ্য এবং সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তৎপরতার উৎপত্তি।

**তাফসীর**

বস্তুত জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি এবং তা দিয়ে কে অধিক সৎ কর্মশীল তা পরীক্ষা করা, আকাশসমূহের সৃষ্টি, আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সজ্জিত করা ও সেগুলো দিয়ে শয়তানকে বিতাড়িত করা, জাহান্নামকে তার নির্দিষ্ট আকৃতি, গুণাগুণ ও রক্ষক সহকারে প্রস্তুত করা, গোপন ও প্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, পৃথিবীকে মানুষের জন্যে বশীভূত করা, অতীতকালের অবিশ্বাসীদের ওপর আকস্মিক বিপদাপদ অবতরণ করা, আকাশে পাখিদের টিকে থাকার ব্যবস্থা করা, আধিপত্য ও পরাক্রম, যাকে যতো ইচ্ছা রেযেক দান করা, মানুষকে সৃষ্টি করা ও তাকে চোখ কান ও হৃদয় দান করা, পৃথিবীতে ও কেয়ামতের দিন সৃজন ও পুনরুজ্জীবন, আখেরাতের জ্ঞান, কাফেরদের আযাব এবং জীবন রক্ষাকারী পানি সরবরাহ করা ও যখন ইচ্ছা তা উধাও করে দেয়া এ সবই আল্লাহর সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌমত্বের আধিপত্য থেকে উৎসারিত। তাই সূরার সকল তত্ত্ব ও বক্তব্য এবং এর সকল দৃশ্য ও শিক্ষা সূরার সেই সূচনা বাণী ও তার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য থেকে উৎসারিত,

**যাবতীয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর**

'পরম কল্যাণময় তিনি, যার হাতে সমগ্র বিশ্বের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।'

সূরার সকল তত্ত্ব, তথ্য ও শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে ও বিরতিহীনভাবে বিবৃত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সূরার সেই সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যবহ সূচনাবাণীর ব্যাখ্যা বিবৃত হয়েছে। এ জন্যে এ সূরাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা কঠিন। সূরাটির বক্তব্যগুলোকে একইভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন,

'পরম কল্যাণময় সেই মহান সত্তা, যার হাতে বিশ্বের কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও সাম্রাজ্য এবং তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।'

সূরার শুরুতে এই গুণ বর্ণনা আল্লাহর বরকত ও কল্যাণকে বহুগুণে বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান করে, আর তার পাশাপাশি রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের উল্লেখ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এই রাজ্য ও বরকতময় এবং এই বরকত শুধু আল্লাহর সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং গোটা সৃষ্টিতে বিস্তৃত। এই সত্যের সপক্ষে প্রত্যেক সৃষ্টির মাঝে ঐকতান রয়েছে। এই ঐকতান কোরআন থেকে শুরু হয়ে গোটা সৃষ্টিজগত জুড়ে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

'বরকতময় ও কল্যাণময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব।'

সুতরাং তিনি গোটা বিশ্ব সাম্রাজ্যের অধিপতি, তার ওপর পরাক্রান্ত, তার ওপর সঠিক ক্ষমতার অধিকারী। এটি এমন একটি সত্য যে, এটি যখন কারো বিবেকে অবস্থান করে তখন তার দিক ও পরিণতি নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে একমাত্র এই রাজ্যের একক অধিপতির কাছে প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর সেই একক ও সার্বভৌম অধিপতির দাসত্ব ও আনুগত্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার প্রেরণা যোগায়।

'তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।'

সুতরাং তাঁকে কোনো কিছুই অক্ষম ও উপায়হীন করে দেয় না। তাঁর উর্ধে কেউ উঠতে পারে না, তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারে না বা সীমাবদ্ধও করতে পারে না। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যা চান তাই করেন। তিনি যা চান তা করতে সক্ষম, নিজের কাজের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব সর্বোচ্চ ও সর্বজয়ী। তাঁর ইচ্ছার সাথে কোনো শর্ত ও বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়নি। তাই এমন একটি সত্য, যা মানুষের বিবেকে অবস্থান গ্রহণ করলে আল্লাহর ইচ্ছা ও কাজ সম্পর্কে তার ধারণাকে সর্বপ্রকারের শর্ত ও বাধা থেকে মুক্ত করে। যার জ্ঞান বুদ্ধি ও অনুভূতি পরিচিত বলয়ে কেন্দ্রীভূত, তার দিক থেকে আগত সকল বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত করে। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমতা মানুষের মনে আগত যাবতীয় ধারণা-কল্পনার উর্ধে। আর মানুষের জন্মগত সীমাবদ্ধতার কারণে তার ধ্যান-ধারণায় যে সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা আরোপিত হয়, তা তাকে তার প্রিয় বস্তুর বন্দী বানিয়ে দেয়। চলমান মুহূর্ত ও সীমিত বাস্তবতার বাইরে প্রত্যাশিত রদবদলের মূল্যায়নে তাকে নিজের প্রিয় বস্তুর দাসানুদাস বানিয়ে ছাড়ে। আলোচ্য সূরার এই তত্ত্ব ও তথ্য তার অনুভূতিকে এই বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমতায় সকল অসাধ্য সাধন সম্ভব বলে বিশ্বাস করে এবং নির্বিশেষে সকল জিনিসকে আল্লাহর ক্ষমতার কাছে সমর্পণ করে দেয়। এভাবে সে চলমান সময় ও নির্দিষ্ট সীমিত বাস্তবতার গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করে।

'যিনি জীবন ও মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল.. ।'

বিশ্ব সাম্রাজ্যের ওপর তার যে সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিরাজমান, সব কিছুর ওপর যে তার সীমাহীন অধিকার ও ক্ষমতা এবং তার ইচ্ছা যে বাধা-বন্ধনহীন, তার প্রমাণ এই যে, তিনি জীবন ও মৃত্যুর স্রষ্টা। মৃত্যু দ্বারা জীবনের পূর্ববর্তী নির্জীব অবস্থা ও তার পরবর্তী মৃত্যু দুটোকেই বুঝায়। আর জীবন বলতে ইহকালের জীবন ও পরকালের জীবন উভয়টাকেই বুঝায়। আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এর সবটাই আল্লাহর সৃষ্টি। এ আয়াত মানুষের চিন্তা ও কল্পনায় এই তথ্য সংগ্রহ করে দিচ্ছে এবং তার পাশাপাশি জাগ্রত চেতনার সৃষ্টি করছে। এই জাগৃতির পশ্চাতে রয়েছে ইচ্ছা ও পরীক্ষা।

বস্তুত ব্যাপারটা বিনা চেষ্টায় কিছু অর্জন এবং বিনা উদ্দেশ্যে কোনো আয়োজন নয়। এ হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর জানা ও অন্যদের অজানা তথ্য প্রকাশ করা, মানুষ পৃথিবীতে কি আচরণ করে এবং তারা কি প্রতিদান পায় সে সম্পর্কে।

'যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্মশীল।'

মন মগযে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ সদা সতর্ক থাকে, সচেতন ও ছোট বড় যাবতীয় গুনাহ সম্পর্কে সাবধান হয় এবং মনের গোপন ইচ্ছা ও প্রকাশ্য কাজ কর্ম সম্পর্কে হুশিয়ার হয়। এটা তার ভেতরে কোনো শৈথিল্য উদাসীনতা যেমন থাকতে দেয় না, তেমনি তাকে নিশ্চিত মনে বসেও থাকতে দেয় না। এ জন্যেই বলা হয়েছে,

'তিনি মহাপরাক্রান্ত, ক্ষমাশীল।'

যে ব্যক্তির মন আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং আল্লাহর সম্মানে সচেতন, তার হৃদয়ে এ আয়াতংশ নিশ্চিন্ততা এনে দেয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা পরাক্রান্ত ও বিজয়ী। সেই সাথে তিনি ক্ষমাশীল এবং দয়াশীলও। মন যখন সচেতনভাবে একথা বুঝবে যে, সে এই জগতে কেবল পরীক্ষা দিতেই এসেছে, তখন সে সতর্কও সংযত হবে। তখন সে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া আশা করতে পারে এবং নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে।

ইসলাম মানুষের মনে যে সত্য ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দূরে তাড়িয়ে দেন না, ব্যক্তির আযাব হোক তাও তিনি চাননা বরং শুধু এটুকু চান যে, তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে অন্তত সে সজাগ ও সচেষ্ট হোক এবং তার বাস্তবতার পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত হোক এবং আল্লাহ তায়ালা যে উদ্দেশ্যে তাকে রূহ দিয়ে অন্যান্য সৃষ্টির ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছেন তা সে বাস্তবায়িত করুক। এটুকু লক্ষ্য অর্জিত হলে আর তেমন সমস্যা থাকে না। কারণ এর পরে অঢেল অনুগ্রহ, অনুকম্পা, বিপুল মহানুভবতা এবং প্রচুর ক্ষমার ব্যবস্থা রয়েছে।

অতপর এই সত্যকে যে সমগ্র বিশ্ব জগতের সাথে সম্পৃক্ত করে সেই সাথে আখেরাতের প্রতিদানকেও তার সাথে সম্পৃক্ত করে। জীবন ও মৃত্যু দ্বারা পরীক্ষিত হবার পরই সে এ কাজ করে।

### বিস্ময়কর এ সাত আসমান

'যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশকে স্তরে স্তরে ...'

এই আয়াতসমূহের বক্তব্য হুবহু প্রথম আয়াতেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং সার্বভৌমত্ব, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও রাজত্বেরই বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় আয়াতে পরীক্ষার জন্যে ও প্রতিদানের জন্যে জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি সম্পর্কে যে বক্তব্য রয়েছে, এ আয়াতগুলো তার প্রতিও সমর্থন ব্যক্ত করে।

এ আয়াতে যে সাত স্তর আকাশসমূহের কথা বলা হয়েছে, তা কি জিনিস নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। আকাশ বা মহাশূন্য সংক্রান্ত মতবাদসমূহের ওপর নির্ভর করে এ সম্পর্কে কিছু বলা চলে না। কারণ এসব মতবাদ সবসময় পরিবর্তনশীল ও সংশোধন সাপেক্ষ। তাছাড়া মহাশূন্য সংক্রান্ত তথ্যান্বেষণের উপায়-উপকরণও নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। তাই এসব সংশোধনযোগ্য ও রদবদলযোগ্য তথ্যের সাথে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাকে সংশ্লিষ্ট করা যায় না। আমাদের শুধু এতটুকু জানাই যথেষ্ট হবে যে, সাতটি আকাশ আছে এবং সেগুলো স্তরে স্তরে সাজানো অর্থাৎ পরস্পর থেকে দূরত্বে অবস্থিত স্তরে বা তালায় তালায় সজ্জিত।

কোরআন মানুষের দৃষ্টিকে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে আকৃষ্ট করে। আকাশের দিকে বিশেষভাবে এবং যাবতীয় সৃষ্টির দিকে সাধারণভাবে। আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময় সে এই সৃষ্টির শৈল্পিক পূর্ণতা ও চমৎকারিত্ব সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। সৃষ্টির এই পূর্ণতা ও চমৎকারিত্ব চক্ষুকে করে বিস্ময়ে বিস্ফারিত অভিভূত ও হতভম্ব।

'দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না।'

বস্তুত তাতে আসলেই কোনো খুঁত নেই, ত্রুটি নেই, নেই কোনো অসম্পূর্ণতা।

'আচ্ছা, পুনরায় দৃষ্টি দাও তো! কোনো ত্রুটি কি দেখতে পাচ্ছো?' অর্থাৎ এর কোথায়ও কোনো কাটা, ফাটা, ছেঁড়া, কিংবা বৈকল্য তোমার নযরে পড়ছে কি? দৃষ্টি ফেরাও তো দ্বিতীয়বার।

হয়তো তোমরা প্রথম বারের দৃষ্টিতে কোনো কিছু বাদ পড়ে গেছে, যা তুমি দেখোনি।' কাজেই আবার তাকাও।

'তোমার দৃষ্টি তোমার কাছেই শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে ফিরে আসবে।'

এখানে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে গিয়ে যে বর্ণনাভংগী অবলম্বন করা হয়েছে, তার ভেতরে আকাশ ও সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি গুরুত্বের সাথে অনুসন্ধিৎসা সহকারে দৃষ্টি দেয়ার অনুপ্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। এই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানমূলক ও চিন্তা গবেষণাধর্মী দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণে উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে কোরআনের লক্ষ্য। এই অপরূপ সুন্দর সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর প্রকৃতির দিকে তাকালে মানুষের সরল ও স্থূল দৃষ্টি সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরিণত হয়। চক্ষু এই প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কোনোক্রমেই তৃপ্ত হয় না, বরং যতো দেখে, ততোই আরো দেখতে চায়। হৃদয় এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিক্ষা ও আভাস ইংগিত যতোই পায়, ততোই তার আরো পাওয়ার বাসনা জাগে। বিশ্ব প্রকৃতির সুশৃংখল পরিচালনা ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা নিয়ে হৃদয় যতোই চিন্তা গবেষণা করে, তৃপ্তি পায় না বরং আরো চিন্তা গবেষণায় মগ্ন হতে চায়। আর যে ব্যক্তি এই জগতের অধিবাসী হয়ে আল্লাহর এই বিচিত্র ও অপরূপ সৃষ্টির মেলাকে নিরন্তর নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে, তারও পর্যবেক্ষণে কোনোক্রমেই তৃপ্তি আসতে চায় না। কারণ এটা এমন এক জগত, যা কখনো প্রাচীন হয় না, চোখ, মন ও বিবেক বুদ্ধির জন্যে এ জগত প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সাজে সজ্জিত হয়।

**প্রকৃতির এ এক মহা বিস্ময়**

যে ব্যক্তি এই বিশ্বজগত এবং তার নিয়ম-নীতি ও স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে ন্যূনতম তথ্যও জানে–যেমনটি আধুনিক বিজ্ঞান কিছু কিছু তথ্য উদঘাটন করেছে, সে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হতবাক না হয়ে পারে না। তবে প্রকৃতির বিস্ময় ও চমকের জন্যে বিজ্ঞানের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। মানুষের ওপর আল্লাহর এ এক অতুলনীয় অনুগ্রহ যে, বিশ্ব প্রকৃতির আর একটি সাধারণ দৃষ্টি বুলানো এবং সামান্যতম মনোযোগ দেয়া মাত্রই তার সাথে পরিপূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করতে পারে এই ক্ষমতা তাকে তিনি দিয়েছেন। তাই মানুষের মন এই অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি বিশ্ব নিখিলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত শিক্ষাকে সংগে সংগেই লুফে নেয় ও তাকে আত্মস্থ করে। এই শিক্ষাকে সে সরাসরিভাবেই গ্রহণ করে, যখন সে তার পরিচয় লাভ করে। অতপর সে এসব শিক্ষার ব্যাপারে পরিপূর্ণ একাত্মতা ব্যক্ত করে, জীবের সাথে জীবের যে রূপ ঐকতান হওয়া উচিত এটি ঠিক সেরূপ ঐকতান। এই বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে কোনো তথ্য অবগত হওয়া এবং কোনো চিন্তা-ভাবনা করার আগেই তার মধ্যে এই ঐকতান গড়ে ওঠে।

**সৃষ্টি দেখে তার স্রষ্টাকে জানো**

এ জন্যেই কোরআন মানুষকে এই বিশ্ব প্রকৃতি ও তার বিস্ময়কর উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ কোরআন সর্বকালের সমগ্র মানব জাতিকেই সম্বোধন করে। সে কথা বলে অরণ্যবাসীর সাথে, মরুচারীর সাথে, নগরবাসী ও সমুদ্র অভিযাত্রীর সাথে। সে কথা বলে

সেই নিরক্ষর মানুষের সাথেও- যে একটি অক্ষরও কখনো লেখেনি বা পড়েনি। একইভাবে সে সম্বোধন করে মহাশূন্য বিজ্ঞানী, প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিককে, আর পবিত্র কোরআন থেকে এরা সবাই প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্টতর সংযোগ স্থাপনের উপকরণ এবং প্রকৃতি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করার প্রেরণা লাভ করে।

বিশ্বজগতের সৃষ্টিতে পূর্ণতা যেমন কাম্য, তেমনি কাম্য সৌন্দর্যও। বরঞ্চ এই দুটো আসলে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ মাত্র। কেননা পূর্ণতা যখন শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন তা সৌন্দর্যে পরিণত হয়। এ কারণেই কোরআন মানুষের দৃষ্টিকে আকাশের পূর্ণতার দিকে আকৃষ্ট করার পর তার সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি সর্বনিম্ন আকাশকে সাজিয়ে রেখেছি বহুসংখ্যক প্রদীপ দ্বারা।'

এই সর্বনিম্ন আকাশটা কি? সম্ভবত এটিই পৃথিবী ও পৃথিবীর অধিবাসীর নিকটতম এবং কোরআনের শ্রোতাদের কাছাকাছি। আর এখানে যে প্রদীপমালার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো সম্ভবত খালি চোখে আকাশের দিকে তাকালেই যে গ্রহ নক্ষত্র-পুঞ্জকে দেখা যায় সেগুলো। শ্রোতাদেরকে আকাশের দিকে তাকাতে বলার সাথে এই ব্যাখ্যাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা সে যুগের শ্রোতাদের কাছে তাদের খালি চোখ ছাড়া এবং আকাশে ঝিকমিক করা যে জ্যোতিষ্কগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় সেই জ্যোতিষ্কগুলো ছাড়া পর্যবেক্ষণের আর কোনো সরঞ্জাম ছিলো না।

আকাশে নক্ষত্রমন্ডলীর দৃশ্য যে হৃদয়ে দাগ কাটার মত সৌন্দর্যমন্ডিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে সৌন্দর্য বিচিত্র। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার রংও পাল্টে যায়। সকালে বিকালে ও উদয়াস্তে বিচিত্র বর্ণে তার আত্মপ্রকাশ। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে, জ্যোৎস্নাত রাতে, নির্মল আকাশে এবং কুয়াশাচ্ছন্ন ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তার রকমারি শোভা। সত্যি বলতে গেলে প্রতি ঘন্টায়, আকাশের প্রতি কোণ থেকে এবং প্রত্যেক মানমন্দির থেকে তার ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। এর প্রতিটি দৃশ্যই মনোরম। প্রতিটি দৃশ্যই অন্তরে দাগ কাটে।

ওই সে যে আকাশের এক প্রান্তে একটি নক্ষত্রকে একাকী উঁকিঝুঁকি মারতে দেখা যাচ্ছে, মনে হয় ওটা নক্ষত্র তো নয়, যেন একটা চোখ। মায়াভরা চাহনি নিয়ে তা যেন ডাকছে মিটমিট করে। আবার ওধারে দেখা যাচ্ছে দুটো নক্ষত্র, ভিড় থেকে মুক্ত হয়ে তারা যেন গোপন আলাপচারিতায় লিপ্ত। আর এখানে ওখানে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু ছোট বড় নক্ষত্রপুঞ্জ। আকাশের বিশাল আলোর মেলায় ওগুলো যেন এক একটা উজ্জ্বল সমাবেশ। মেলায় ওরা যেন এ রাতের সহচর। একবার মিলিত হয় আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চাঁদ ও তার পরিক্রমার পথও বিচিত্র ধরনের। মাসের শুরুতে এক রাতে তার জন্ম ও উদয়, তারপর ক্রমে তার বৃদ্ধি, আবার ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্তি, অবশেষে এক রাতে বিলীন হয়ে যাওয়া। বিশাল মহাশূন্যকেই দেখুন না! যতোদূর চোখ যায় তার কোনো কুলকিনারা নেই। বিচিত্র সৌরজগতের এই অপরূপ সৌন্দর্যকে উপভোগ করার ক্ষমতাই শুধু মানুষের আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্যকে বর্ণনা ও ব্যক্ত করার ভাষা তার নেই।

### আকাশ ও বিশ্বের অপরূপ সৌন্দর্য

কোরআন মহাকাশ ও গোটা বিশ্বের এই অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কেননা সৃষ্টির সৌন্দর্যোপলব্ধি হচ্ছে স্রষ্টার সৌন্দর্যোপলব্ধির নিকটতম ও অব্যর্থ উপায়। এই উপলব্ধি মানুষকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে। কেননা স্রষ্টার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা মাত্রই সে উৎকর্ষের সেই উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে, যেখান থেকে সে মুক্ত স্বাধীন, মনোরম ও

পার্থিব জীবনের ক্লেদমুক্ত এক জগতে প্রবেশ করে চিরস্থায়ী জীবন যাপনের প্রস্তুতি নিতে পারে। আর মানব মনের সবচেয়ে সুখময় মুহূর্তটি আসে তখনি, যখন সে বিশ্বজগতে বিরাজিত আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য সুষমাকে উপভোগ ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কেননা ওটাই সেই দুর্লভ ও বিরল মুহূর্ত, যখন তার ভেতরে স্বয়ং আল্লাহর সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও প্রস্তুতি জন্মে।

এখানে পবিত্র কোরআনের অকাট্য উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে প্রদীপমালা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সর্বনিম্ন আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন, সে সব প্রদীপমালার তথা নক্ষত্রমালার আরো একটা দায়িত্ব আছে। সেটি হচ্ছে,

'ওগুলোকে আমি শয়তানদের বিতাড়নের হাতিয়ার বানিয়েছি।'

আমি এই তাফসীর গ্রন্থে একটি নীতি অবলম্বন করে এসেছি যে, আল্লাহ তায়ালা যেসব অদৃশ্য বিষয়ের আংশিক তথ্য আমাদের কাছে ব্যক্ত করে থাকেন, তার অতিরিক্ত কিছুই বলার আমি চেষ্টা করবো না এবং কোরআন তার সুস্পষ্ট বক্তব্যে যতোটুকু বলে, আমরা ঠিক ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকবো, তার চেয়ে একবিন্দুও সামনে এগুবো না। কেননা কোরআনের বক্তব্য বিষয় প্রমাণিত করতে আসলে সেটুকুই যথেষ্ট। অতিরিক্ত কিছুর কোনো প্রয়োজন নেই।

যেমন ধরুন, শয়তান নামে আল্লাহর একশ্রেণীর সৃষ্টি যে আছে সে কথা আমরা বিশ্বাস করি। কোরআনে শয়তানের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আমার এই তাফসীরেও ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে কিছু বিবরণ দিয়েছি। আমরা তার চেয়ে বেশী কোনো তথ্য দেবো না। আমরা এ কথায়ও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা এই নক্ষত্রমন্ডলী দ্বারা আকাশকে সুশোভিত করা ছাড়াও শয়তানকে তাড়ানোর কাজও সম্পন্ন করে থাকেন। অন্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে যে, উল্কাপিন্ডের আকারে নক্ষত্রগুলোর অংশ বিশেষ দ্বারা এই কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

'প্রত্যেক দুর্বৃত্ত শয়তানের কবল থেকে রক্ষার জন্যে। তবে যে কেউ পশ্চদ্ধাবন করবে, একটি জ্বলন্ত উল্কা তার পিছু নেবে।'

**তারকাপুঞ্জের কাজ**

বাকী রইলো কিভাবে ও কেমন আকৃতি নিয়ে এই নক্ষত্র শয়তানকে তাড়া করে–সে কথা, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কিছুই জানাননি। আর এটা জানবার জন্যে আমাদের কাছে অন্য কোনো উৎসও নেই। সুতরাং আমাদের শুধু এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং এর বাস্তবতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমাদের কাছ থেকে আল্লাহর কাম্যও এটাই। আল্লাহ তায়ালা যদি বুঝতেন যে, আরো সঠিক তথ্য জানায় উপকারিতা আছে, তাহলে তিনি তা অবশ্যই আমাদের জানাতেন। আল্লাহ তায়ালা যা জানানো ভালো মনে করেননি, তা আমাদের জানতে চেষ্টা করার কি দরকার? বস্তুত শয়তানকে বিতাড়নের আদেশটিও তিনি দিয়েছেন এ ধরনের নিষ্প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যে।

এরপর শয়তানদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা আর কি কি শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন তার বিবরণ দিচ্ছেন,

'আমি তাদের জন্যে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি'।

অতএব এই শয়তানদের জন্যে পৃথিবীতে নক্ষত্র ছুঁড়ে মেরে বিতাড়ন এবং আখেরাতে আগুনে দগ্ধ হওয়ার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা শয়তানদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে যে শাস্তি নির্ধারিত রেখেছেন, তার উল্লেখের প্রাসংগিকতা কি, এ প্রশ্ন এখানে স্বভাবতই ওঠে। এর প্রাসংগিকতা প্রথমত এই যে, আকাশেই প্রদীপমালার উল্লেখ প্রসংগে শয়তানের উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পরবর্তীতে যে কাফেরদের উল্লেখ রয়েছে, সে প্রসংগেও শয়তানের উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান ও কাফেরদের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ তা সুবিদিত। আকাশের প্রদীপমালার উল্লেখ প্রসংগে সেগুলোকে শয়তান বিতাড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। আর শয়তানদের জন্যে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির উল্লেখ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা শয়তানের অনুসরণের কারণে কাফেরদের জন্যে নির্ধারিত করেছেন জাহান্নামের আযাব,

'যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে জাহান্নামের আযাব নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত জাহান্নাম বড়ই নিকৃষ্ট ঠিকানা।'

**জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তির বর্ণনা**

অতপর এই জাহান্নামের একটি দৃশ্য অংকন করা হয়েছে এই বলে,

'যখন অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে গাধার ডাক শুনবে, জাহান্নাম তখন উদ্বেলিত হবে এবং ক্রোধে যেন ফেটে পড়ার উপক্রম হবে।'

বস্তুত জাহান্নামকে এখানে একটা জীবন্ত সৃষ্টিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। সে যেন নিজের প্রচন্ড ক্রোধ দমন করছে। ফলে তার ভেতর থেকে গাধার ডাকের মত আওয়াযের সৃষ্টি হচ্ছে। দমিত আক্রোশে সে যেন ফেটে পড়তে চাইবে। কাফেরদের ওপর তার ক্রোধ ও আক্রোশ চরম পর্যায়ে উপনীত হবে।

এখানে দোযখের অবস্থা বাহ্যত রূপকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু আসলে তা রূপক নয় বরং বাস্তব। কেননা আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিই এই অর্থে প্রাণী যে, তার নিজস্ব এক ধরনের আত্মা আছে এবং প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে থাকে। মানুষকে তার স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করতে দেখে প্রত্যেক সৃষ্টি দুঃখিত, স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ হয়। কেননা স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টি মাত্রেরই সহজাত বিরাগ বিদ্বেষ ও ক্রোধ জন্মে। তার স্বভাব অন্য এক সৃষ্টির কুফরী আচরণকে ও অবাধ্যতাকে ঘৃনা সুপ্ত রয়েছে। বস্তুত কোরআনে এ সত্যটি একাধিক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার গুণগানের প্রবণতা আর তার অবাধ্যদের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা সুপ্ত রয়েছে। কোরআনের দ্ব্যর্থহীন উক্তি হচ্ছে,

'সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সব কিছু আল্লাহর গুণগান করো । আল্লাহর গুণগান করে না এমন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তবে তোমরা তাদের গুণগান বুঝতে পারে না।'

আরো বলা হয়েছে,

'হে পর্বতমালা এবং হে পাখিরা, দাউদের সাথে সাথে তোমরাও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করো।'

এ সব উক্তি এতো অকাট্য এতো সুস্পষ্ট যে, এর ভেতরে অন্য কোনোরকম ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ নেই। আরো বলা হয়েছে,

'অতপর আল্লাহ তায়ালা আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, তখনও তা ছিলো ধুঁয়ার আকারে।'

তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন,

'তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক চলে এসো।'

আকাশ ও পৃথিবী জবাব দিলো, 'আমরা স্বেচ্ছায় এলাম।'

এখানে এরূপ ব্যাখ্যা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে যে, এটা আসলে রূপক অর্থে আল্লাহর আদেশের সামনে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য বুঝাচ্ছে। কিন্তু আসলে এই ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। বরঞ্চ প্রত্যক্ষ অর্থ থেকে এটা আরো বেশী দূরবর্তী।

আলোচ্য আয়াতে দোযখের একটি প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন অপর এক জায়গায় আল্লাহর সাথে শরীক করার কাজটির প্রতি প্রকৃতির তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা এমন একটা উদ্ভট বিষয় নিয়ে এসেছো যে, তার প্রভাবে আকাশ বিদীর্ণ, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড এবং পাহাড় পর্বতসমূহ বিধবস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। কারণ লোকেরা দয়াময় আল্লাহর পুত্র আছে বলে দাবী করেছে। অথচ দয়াময় আল্লাহর পক্ষে এটা আদৌ সমীচীন নয় যে, কাউকে পুত্র বানিয়ে নেন।'

পবিত্র কোরআনের এ সব অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন উক্তি যে সত্যের সন্ধান দিচ্ছে, সে সত্যটি এই যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী এবং তার প্রশংসা ও গুণগানে নিয়োজিত। মানুষ যখন তার স্রষ্টাকে অস্বীকার করে তার অবাধ্য হয়, তখন সমগ্র সৃষ্টিজগত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহদ্রোহী মানুষ গোটা সৃষ্টিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সৃষ্টিজগত তার ওপর ক্রোধে ও আক্রোশে ফেটে পড়তে চায়। ঠিক যেমন কোনো সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে কেউ অপদস্থ ও ভর্ৎসনা করলে জনতা সেই ভর্ৎসনাকারীর ওপর ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। দোযখের অবস্থাও তদ্রূপ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে অবস্থা এই যে, 'দোযখ উদ্বেলিত হবে এবং ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে।'

**জাহান্নামের প্রহরীর জিজ্ঞাসা**

আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের ওপর দোযখের এই সর্বব্যাপী ক্ষোভ ও অসন্তোষ দোযখের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকেও প্রভাবিত করবে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখনই একটি দলকে তার ভেতরে নিক্ষেপ করা হবে, তখনই তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী (রসূল) আসেনি?'

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ অবস্থায় এই প্রশ্ন নিছক তাচ্ছিল্য ও অবমাননার উদ্দেশ্যেই করা হবে। কেননা দোযখের প্রহরীরাও তাদের ওপর দোযখের মতোই ক্ষিপ্ত ও রাগান্বিত হবে এবং তারা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কাজে তৎপর হবে। কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধীর অবমাননা ও লাঞ্ছনার জন্যে যখন এ ধরনের কথা বলা হয়, তখন এর চেয়ে হৃদয়বিদারক কটু কথা ও কষ্টদায়ক কথা আর কিছুই হতে পারে না।

এর জবাবে স্বভাবতই চরম হতাশা, অনুশোচনা ও আপন নির্বুদ্ধিতা ও উদাসীনতার স্বীকৃতি প্রতিফলিত হবে এবং দুনিয়ার জীবনে নিজেদের হঠকারিতা অস্বীকৃতি ও নবীদের গোমরাহীতে লিপ্ত থাকার অপবাদ দানের স্মৃতিচারণ করা হবে। তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলাম আর বলেছিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা তো কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা নিশ্চয়ই মারাত্মক গোমরাহীতে লিপ্ত আছো। তারা আরো বলবে,

'আমরা যদি শুনতাম এবং বুঝতাম তাহলে আজ দোযখের অধিবাসী হতাম না।'

বস্তুত যে ব্যক্তি শ্রবণ করে অথবা হৃদয়ংগম করে, সে নিজেকে এমন ভয়ংকর পরিণতির সম্মুখীন করে না, সেসব হঠকারী লোকের মত অস্বীকার করে না, অস্বীকৃতির কোনো যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও এমন ধৃষ্টতার সাথে এতো তাড়াহুড়া করে রসূলদেরকে গোমরাহ ঠাওরায় না এবং অস্বীকার করার পর পরম সত্যবাদী রসূলদের ওপর এরূপ পাল্টা দোষারোপ করে না যে, 'আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, তোমরা নিছক গোমরাহীতেই লিপ্ত রয়েছো।'

'বস্তুত তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে কাজেই এ সব দোযখবাসীর ওপর অভিসম্পাত!'

'সুহক' শব্দের শাব্দিক অর্থ দূরত্ব, তাওহীদের প্রতি ঈমান না আনা এবং কেয়ামত সত্যই ঘটবে বলে বিশ্বাস না করার অপরাধ স্বীকার করার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অভিসম্পাত উচ্চারিত হবে। আল্লাহর অভিসম্পাতের অর্থই হলো এই মর্মে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা যে, তারা তার রহমত থেকে বঞ্চিত, তাদের ক্ষমা লাভের কোনো অবকাশ নেই এবং আযাব থেকে পরিত্রাণ নেই। তারা চিরদিনের জন্যে দোযখবাসী। এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অধিবাস ও বাসস্থান আর কি হতে পারে? এমন বিক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত ও উদ্বেলিত দোযখের আযাব অত্যন্ত ভয়াবহ আযাব। এ আযাব দেয়া আল্লাহর যুলুম নয়। তিনি কাউকে যুলুম করেন না। আমরা মনে করি যে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে ঈমানের সত্যতা ও তার যৌক্তিকতায় বিশ্বাস স্থাপনের প্রবণতা সংরক্ষিত করার পরও যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তার বিবেকে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই। সে ব্যক্তির ভেতরে এমন গুণপনারও আর অস্তিত্ব নেই- যা তাকে গোটা সৃষ্টির ভেতরে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবে। সুতরাং তার পরিণতি হলো তাকে দোযখে রাখা হবে এবং সেখান থেকে তার উদ্ধার পাওয়া বা পালাবার কোনো অবকাশ থাকবে না।

### আল্লাহ তায়ালার সাথে বিদ্রোহের চরম পরিণতি

যে মানবাত্মা পৃথিবীতে আল্লাহকে অমান্য করে, সে পার্থিব জীবনে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হতে থাকে, অবশেষে তা চরমভাবে বিকৃত, ধিকৃত, ঘৃণীত ও দোযখের উপযুক্ত রূপ ধারণ করে। বিশ্বজগতের কোনো জিনিসই তার মত বিকৃত ও নিকৃষ্ট হয় না। কেননা প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু মোমেন। প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে। এসব আল্লাহদ্রোহী, বিকৃত অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠ মানবাত্মা ছাড়া বিশ্বজগতের সকল বস্তু আল্লাহর অনুগত ও ফরমাবরদার। ফলে এই পাপিষ্ঠ মানবাত্মাগুলো বিশ্ব প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ধিকৃত ও বিকৃত হয়ে নিকৃষ্টতম স্তরে পৌঁছে যায়। আর তাদের পারলৌকিক পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, তারা সে ভয়ংকর ক্ষিপ্ত রুদ্রমুর্তিধারী জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড দোযখে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সকল মান-মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

পবিত্র কোরআনের রীতি এই যে, কেয়ামাতের দৃশ্য বর্ণনাকালে দুই পরস্পর বিরোধী পরিণামকে পাশাপাশি রেখে দেখিয়ে দেয়। এক পাশে মোমেনের আর এক পাশে কাফেরের পরিণামের বর্ণনা দেয়। এভাবে সে সূরা 'মুলক-এর দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করে!

'যাতে তোমরা কে অধিকতর সৎকর্মশীল তার পরীক্ষা হয়।'

পরীক্ষার কথা উল্লেখের পর এখন আল্লাহ তায়ালা কর্মফলের বিবরণ দিচ্ছেন,

'নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।'

আয়াতে উল্লেখিত 'গায়ব' শব্দটিতে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রথমত, বান্দাদের চোখের আড়ালে থাকা মনিবকে যারা ভয় করে। দ্বিতীয়ত, যে বান্দারা একে অপরের দৃষ্টির আড়ালে থাকা অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে।

### আল্লাহ তায়ালার বিপুল জ্ঞান ভান্ডার

এই দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান, মর্যাদাপূর্ণ ও পবিত্র অবস্থা। আয়াতের শেষাংশে যে মহান প্রতিদানের তথা ক্ষমা, গুণাহ থেকে অব্যাহতি ও বিরাট পুরস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে, উক্ত উভয় প্রকারের ভীতিই মানুষকে তার উপযুক্ত করে তোলে। অর্থাৎ আল্লাহকে না দেখেও ভয় করা এবং লোকেরা না দেখুক, না জানুক এমন অবস্থায়ও আল্লাহকে ভয় করা।

বস্তুত গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে হৃদয়ের যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকা, কেউ না দেখা ও না জানা সত্ত্বেও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ রাখা হচ্ছে মানব মনে চেতনা ও অনুভূতি অটুট থাকার মানদন্ড এবং বিবেকের সজীবতার গ্যারান্টি। হাফেজ আবু বকর আল বাযযায স্বীয় মোসনাদে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আনাস বর্ণনা করেন, সাহাবীরা রসূল (স.)-কে বললেন, আমরা যখন আপনার কাছে থাকি, তখন এক অবস্থায় থাকি এবং আপনার কাছ থেকে দূরে গেলেই আমাদের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যায়। রসূল (স.) বললেন,

'আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক কেমন থাকে? তারা বললেন, আল্লাহ তায়ালা তো গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আমাদের প্রতিপালক। রসূল (স.) বললেন, তাহলে তোমাদের সে অবস্থার পরিবর্তন মোনাফেকী নয়।'

বস্তুত, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সংযোগই হলো মূল কথা। এটা যতোক্ষণ কারো মনে অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততক্ষণ সে যথার্থ আল্লাহভক্ত মোমেন থাকবে।

এ আয়াতটি তার পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে পরবর্তী আয়াতের সংযোগ ঘটাচ্ছে। যেহেতু মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবই আল্লাহ জানেন, তিনি মানুষের মন ও আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অবস্থান স্থল সম্পর্কে অবগত আছেন, তাই তিনি তাদেরকে এ আয়াতে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন,

'তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বলো বা প্রকাশ্যে বলো, তিনি মানুষের মনের কথা জানেন। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি জানবেন না এও কি সম্ভব! তিনি তো অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।'

অর্থাৎ গোপন করো বা প্রকাশ করো, আল্লাহর জ্ঞানের কাছে তা সমানভাবে পরিজ্ঞাত। এমনকি গোপন ও প্রকাশ্য কথার চেয়েও যা গোপনীয়, যা এখনো কথায় পরিণতই হয়নি বরং হৃদয়ে চিন্তা ও কল্পনার আকারে লুকিয়ে আছে, তাও জানেন।

'নিশ্চয়ই তিনি মনের অবস্থাও জানেন, তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।'

যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি নিজের সৃষ্টিকে জানবেন না? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ। ফলে তার জ্ঞান সূক্ষ্মতম ও গুপ্ততম জিনিস পর্যন্তও পৌঁছে।

মানুষ যখন নিজের কোনো তৎপরতাকে বা মনের কোনো চিন্তাভাবনাকে আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চেষ্টা করে, তখন সে বড়ই হাস্যকর চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। কেননা যে মনের মধ্যে সে নিজের চিন্তাভাবনাকে লুকায় সে মনটা তো আল্লাহরই সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা তার এই সৃষ্টির গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা সবই জানেন। আর যে চিন্তাভাবনা, ধ্যান ধারণা বা উদ্দেশ্যকে সে লুকায় তাও আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি এটাও জানেন, কোথায় তা থাকে তাও জানেন। তাহলে মানুষ কি লুকাবে এবং কোথায় লুকাবে?

কোরআন এই সত্যটিকেই মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল করতে চায়। কেননা এ সত্য যার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তার সব জিনিসের ব্যাপারেই সঠিক বুঝ অর্জিত হয়। তার জাগৃতি, চেতনা ও আল্লাহভীতি সবই যথাযথভাবে অর্জিত হয়। এগুলো যথাযথভাবে অর্জিত হওয়ার কারণে পৃথিবীতে সত্যিকার মোমেন হিসাবে তার দায়িত্ব পালনও তার পক্ষে সম্ভবপর হয়। আকিদা ও ন্যায়নীতি এবং নিয়ত ও আমলে সে আল্লাহর একক আনুগত্য অবলম্বন করে। আর এটা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন তার এই বিশ্বাস জন্মে যে, তার মন এবং মনে যা কিছু লুকানো থাকে সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর কাছে তার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত। কেননা তিনি সূক্ষ্মতম জ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। এ বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার পরই মোমেন তার গুপ্ত উদ্দেশ্য এবং প্রকাশ্য কাজ ও শব্দ থেকে সংযত ও সাবধান হয়। কেননা সে জানে, তার আচরণ ও লেনদেন যা কিছু হচ্ছে, গোপন ও প্রকাশ্য সব তিনি হৃদয়ের ভেতরে কি আছে তা অবশ্যই জানে।

## বসবাসযোগ্য গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী

এ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা মানুষের নিজ সত্তা নিয়ে আলোচনা করলেন। অতপর যে পৃথিবীকে তিনি মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, যে পৃথিবীকে মানুষের অনুগত করেছেন এবং যে পৃথিবীর উদরে মানুষের যাবতীয় জীবনোপকরণ নিহিত রেখেছেন, তার সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তিনি বলেন,

'তিনি সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বশীভূত ও বিনীত করেছেন। অতএব তোমরা তার সকল প্রান্তে চলাফেরা করো এবং তার জীবিকা আহরণ করো। তোমাদেরকে তার কাছেই সমবেত হতে হবে।'

মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাস করে আসছে। অনায়াসে ও অবাধে তার ওপর জীবন যাপন ও চলাফেরা করছে। তার পানি, মাটি, বাতাস, খনিজ দ্রব্য, রকমারি শক্তি ও জীবিকা উপভোগ করছে। এই গতানুগতিক জীবন ধারায় মানুষ আল্লাহর এই অনুগ্রহের কথা বেমালুম ভুলে যায় যে, তিনিই পৃথিবীকে এমন বিনীত, অনুগত ও বাসযোগ্য করে দিয়েছেন। কোরআন এ অভাবনীয় নেয়ামতটির কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে তার ভেতরে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং তা এমন ভাষায় করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক প্রজন্ম এই অনুগত পৃথিবী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে।

আর কোরআনে কথিত অনুগত পৃথিবী বলতে কোরআনের তৎকালীন শ্রোতারা বুঝতো এই ভূমন্ডল যে, যার ওপর পায়ে হেঁটে, জন্তু জানোয়ারের পিঠে সওয়ার হয়ে, সমুদ্র বিহারী নৌকা ও জাহাজে আরোহণ করে যদৃচ্ছা চলাচল ও যাতায়াত করা যায়। যার ওপর কৃষিকার্য করা, ফসলের বীজ বোনা ও ফসল কাটা যায়। আর বৃক্ষলতা ও ফসল উৎপাদনের যোগ্য পানি, মাটি ও বাতাসে সমৃদ্ধ জীবন যাপন করা যায়। পৃথিবী সংক্রান্ত এই সংক্ষিপ্ত ধ্যান-ধারণার যে বিশদ ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে থাকে তা কোরআনের বক্তব্যেরই যুক্তিসংগত সম্প্রসারিত রূপ।

পবিত্র কোরআনে পৃথিবীকে 'যালূল' (অনুগত বা বশীভূত) শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। আনুগত্য বা বশীভূত হওয়া বা পোষ মানার এই গুণটি সাধারণত জন্তু জানোয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই গুণটি স্বয়ং পৃথিবীর ওপরও প্রযোজ্য। আমরা যে পৃথিবীকে দেখি, একই জায়গায় স্থির ও নিস্তব্ধ হয়ে আছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আসলে তা একটা চলমান, শুধু চলমান নয় সবেগে ধাবমান এক জন্তু। আবার একই সাথে সে বিনয়াবনত এবং অনুগতও। সে তার আরোহীকে পিঠ থেকে নাড়া দিয়ে ফেলে দেয়না বা পোষমানা জন্তুর মত অস্থির করে তোলে না। আরোহীরা পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করতে থাকে। এই জন্তুটি শুধু অনুগতই নয় বরং দুধেলও। তার পেট থেকে আমরা যাবতীয় খাদ্য সম্ভার লাভ করে থাকি।

এই যানবাহনটি, যার ওপর দিয়ে আমরা ভ্রমণ করি, নিজের চার পাশেই ঘন্টায় এক হাজার মাইল বেগে ঘুরছে। তাছাড়া সূর্যের চারপাশেও সে প্রায় ৬৫ হাজার মাইল বেগে চক্কর দিচ্ছে। তারপর পৃথিবী, সূর্য ও গোটা সৌরজগত একত্রে ২০ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে। এতসব ঘোরাঘুরি ও ছুটোছুটির ভেতরে মানুষ তার পিঠের ওপর নিরাপদে, নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে বসে আছে। কোথাও ছিটকে পড়ছে না, তার হাড়গোড় মাথা মগয কিছুই ভাংছে না।

## পৃথিবীর গতির প্রভাব

পৃথিবীতে যে তিনটে গতির কথা উল্লেখ করলাম, তার গভীর উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা রয়েছে। মানুষের জীবনে এর দুটো গতির প্রভাব আমরা জানতে পেরেছি। শুধু মানুষের জীবনে নয় বরং

ভূপৃষ্ঠে যতো প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে তাদের জীবনেও এ গতিদ্বয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। পৃথিবীর নিজের চারপাশে যে গতি (আহ্নিক গতি) তার প্রভাবে রাত ও দিন হয়। পৃথিবীতে যদি শুধু রাতই চিরস্থায়ী হতো, তাহলে গোটা জীব জগত বরফে জমে যেত। আর যদি শুধু দিনই চিরস্থায়ী হতো তাহলে উত্তাপে গোটা জীবজগত জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। আর সূর্যের চারপাশে তার যে আবর্তন, (বার্ষিক গতি) তার প্রভাবে ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। শুধু একটা ঋতুই যদি চিরস্থায়ী হতো তাহলে আল্লাহর ঈপ্সিত বর্তমানরূপে জীবজগত টিকে থাকতে পারতো না। তৃতীয় যে আবর্তনটার উল্লেখ করেছি, (অর্থাৎ সমগ্র সৌরজগতের একত্রে আবর্তন) তার অজানা রহস্য এখনো উদঘাটিত হয়নি। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মহাজাগতিক ভারসাম্য রক্ষার সাথে সে গতিটার একটা সংযোগ এবং মহাজাগতিক এই সমন্বয় বিধানে তারও একটা ভূমিকা অবশ্য আছে।

এই সব কয়টি গতিতে একই সাথে আবর্তনরত, এই একান্ত অনুগত জন্তুটি বা যানবাহনটি আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে একই অবস্থায় স্থির থাকে। কেবল ০২৩.৫ ডিগ্রী পরিমাণ হেলানো থাকে। কেননা এই হেলানো অবস্থায় পৃথিবীর সূর্যের কক্ষপথে পরিভ্রমণ থেকেই ঋতু বৈচিত্রের উদ্ভব হয়ে থাকে। পরিভ্রমণকালে যদি এই অবস্থান কিছুমাত্র বিক্ষত হতো, তাহলে ঋতু বৈচিত্রের উৎপত্তিও বাধাগ্রস্ত হতো এবং শুধু উদ্ভিদ জীবনই নয়, ভূপৃষ্ঠের গোটা জীব ও জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তো।

আল্লাহ তায়ালা যে পৃথিবীকে মানুষের অনুগত ও মানানসই করে রেখেছেন তার একটা অর্থ এই যে, তিনি তার ভেতরে মধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করেছেন। যা পৃথিবীর আবর্তনকালে তার অধিবাসীদেরকে তার সাথে চিমটে ধরে রাখে। তাছাড়া তাকে একটা বায়ুমন্ডলীয় চাপের আওতায় রেখেছেন, যাতে তার ওপর দিয়ে সহজে চলাচল করা যায়। বায়ুমন্ডলীয় চাপটা যদি বর্তমানে যেমন আছে তার চেয়ে বেশী ভারী হতো, তাহলে সেই বায়ুমন্ডলীয় চাপ যে পরিমাণে ভারী হতো ঠিক সেই পরিমাণ মানুষের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন কষ্টকর হতো অথবা একেবারেই অসাধ্য হতো। মানুষ হয় ধ্বংস হয়ে যেত, নতুবা অচল ও পংগু হয়ে যেত। আর যদি বায়ুমন্ডলীয় চাপ এখনকার চেয়ে হালকা হতো, তাহলে মানুষের পদচারণা হতো এলোমেলো ও এবড়োথেবড়ো, তার চার পাশের বায়ুমন্ডলের ওপর তার নিজ দেহের চাপ বেশী হওয়ায় তার দেহের কোটর বিশিষ্ট অংগসমূহ ফেটে যেত, যেমন উপযুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মহাশূণ্যের উচ্চতর স্তরসমূহে উন্নয়নকারীদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা যে পৃথিবীকে অনুগত করে দিয়েছেন, তার একটা দিক এও যে, তিনি পৃথিবীর উপরিভাগকে প্রসারিত করে দিয়েছেন এবং ভূপৃষ্ঠের মাটিকে নরম বানিয়ে দিয়েছেন। যদি তা কঠিন প্রান্তরের আকারে থাকতো যেমন বিজ্ঞান বলে থাকে যে, পৃথিবীর উপরিভাগ ঠান্ডায় জমে গেলে তা পাথরে পরিণত হতো তাহলে এর ওপর দিয়ে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়তো এবং উদ্ভিদ জন্মানোও অসাধ্য হয়ে পড়তো। কিন্তু বাতাস ও বৃষ্টি ইত্যাকার পরিবেশগত উপাদানগুলো এসব পাথরকে চূর্ণ করে দেয়। সেই পাথরচূর্ণ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা জীবন ধারণের উপযোগী এই উর্বর মাটি তৈরী করেন আর এই উর্বর মাটি থেকেই সৃষ্টি করেন পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় জীবিকা ও উদ্ভিদ।

**মানব জীবনের জরুরী উপাদানসমূহ**

আল্লাহ তায়ালা এভাবেও পৃথিবীকে মানুষের অনুগত ও বশীভূত করে দিয়েছেন যে, তার চারপাশের বিরাজমান বায়ুমন্ডলকে জীবনের জন্যে অপরিহার্য উপাদানসমূহ দিয়ে পূর্ণ করে

দিয়েছেন। আর এই উপাদানগুলোকে এমন নিখুঁত ও সুক্ষ্ম আনুপাতিক হারে স্থাপন করেছেন যে, তাতে বিন্দুমাত্রও কম বেশী হলে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারতো না। এতে শতকরা ১৯ ভাগ অক্সিজেন, ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন আর অবশিষ্ট অংশ কার্বনডাই অক্সাইড ও অন্যান্য উপাদান রয়েছে ৩ ভাগ অনুপাতে। এ অনুপাত পৃথিবীতে জীবন সংরক্ষণের জন্যে অপরিহার্য। এ না হলে জীবন এখানে টিকে থাকতে পারবে না।

উল্লেখিত অপরিহার্য উপাদানগুলো ছাড়াও আরো হাজারো রকমের মানানসই উপাদান দিয়ে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে মানব জীবনের উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। এসব উপাদান জীবন রক্ষার জন্যে অত্যন্ত জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীর আকৃতি, সূর্য ও চাঁদের আকৃতি, চাঁদ ও সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব, সূর্যের তাপমাত্রা, পৃথিবীর উপরিভাগের ব্যাস, পৃথিবীর গতিবেগ, পৃথিবীর অক্ষরেখার হেলানো ভাব, পৃথিবীতে জল ও স্থলের আনুপাতিক তারতম্য এবং পৃথিবীর চারপাশের বায়ুমন্ডলের ঘনত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল অনুকূল উপাদানের একত্র সমাবেশই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছে। এগুলোই পৃথিবীতে জীবিকা উৎপাদনে এবং প্রাণীকূলের ও বিশেষত মানুষের জীবন ধারণে সহায়ক হয়েছে।

পবিত্র কোরআন এসব সত্যকে তুলে ধরছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক প্রজন্ম এগুলোকে সাধ্যমত ও নিজ নিজ জ্ঞান মোতাবেক হৃদয়ংগম করে। এতে সে সমগ্র বিশ্ব জাহানের সম্রাট আল্লাহর শক্তি ও প্রতাপ অনুভব করবে কেননা তার এবং চারপাশের সকল জিনিসের ওপর মহান আল্লাহরই আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বিরাজিত। তিনিই পৃথিবীকে মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন এবং তিনিই মানুষ ও পৃথিবীর সংরক্ষক। তিনি যদি এক মুহূর্তও এ কাজে উদাসীনতা দেখান তবে সমগ্র বিশ্বজগত বিশৃংখলার শিকার হবে এবং বিশ্বজগতে যতো বস্তু ও প্রাণী আছে, সকলকে নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার বিবেক যখন এই অকাট্য সত্যকে গ্রহণ করে নেয়, তখন পরম দাতা ও দয়ালু স্রষ্টা তাকে পৃথিবীর প্রান্তরে চলাফেরা করা ও তার ফলানো জীবিকা খাওয়ার অনুমতি দেন।

'পৃথিবীর সকল প্রান্তরে চলাফেরা করো এবং তার রেযেক খাও।'

মূল আয়াতে যে, 'মানকেব' শব্দটি রয়েছে তার অর্থ হলো উচ্চ প্রান্ত সমূহ বা কিনারসমূহ। এটা সংগতভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি উচ্চ প্রান্তর বা কিনারসমূহে চলাফেরা ও খাদ্য আহরণের অনুমতি যখন দিয়েছেন, তখন নিম্ন সমতল ভূমি এবং উপত্যকা অঞ্চলেও এ অনুমতি অবশ্যই দিয়েছেন। আর যে জীবিকা পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় তার সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর মালিকানাভুক্ত। তাই 'তার জীবিকা' কথাটা স্রেফ 'জীবিকা' বললে যা বুঝা যায় তা তার চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা এ দ্বারা কোনো মানুষের হাতে বিদ্যমান সেই অর্থ সম্পদকে বুঝায় না-যা দ্বারা সে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করতে পারে। বরঞ্চ এ দ্বারা বুঝানো হয় আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে জীবিকার যতো উপায়-উপকরণ গচ্ছিত রেখেছেন তার সব কিছু। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে এমন সব উপাদান থেকে তৈরী করেছেন। সেসব উপাদানকে এমন আনুপাতিক হারে বন্টন করেছেন যে তা দ্বারা এখানকার যাবতীয় উদ্ভিদ এবং মানুষসহ সকল প্রাণীর জন্ম ও বিকাশ লাভ সম্ভব হয়েছে। অতপর প্রাণী ও উদ্ভিদকে আল্লাহই এসব উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। এই ব্যাপক অর্থের আলোকে জীবিকার প্রকৃত তাৎপর্য কি সে সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করছি।

## রেযকে এলাহীর তাৎপর্য কি?

প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী মাহমুদ সালেহ তার গ্রন্থ 'আধুনিক বিজ্ঞান ঈমানের দিকে আহবান জানায়' নামক গ্রন্থের ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় বলেন,

'বিজ্ঞানীদের কাছে এটা সুবিদিত ব্যাপার যে, প্রত্যেকটা উদ্ভিদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে কার্বন অক্সাইডের সেই ন্যূনতম মাত্রার ওপর যা বায়ুমন্ডলেই বিদ্যমান এবং যা উদ্ভিদ নিজেই শুষে নিয়ে থাকে বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আলোর সংযুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আমরা সংক্ষেপে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। উদ্ভিদ পাতা হচ্ছে ফুসফুস এবং তা কার্বনঅক্সাইডের ন্যায় শক্ত জিনিসকে সূর্যের কিরণের সাহায্যে বিভক্ত করে কার্বন ও অক্সিজেনে পরিণত করতে সক্ষম।

অন্য কথায় বলা যায়, এই পাতা অক্সিজেনকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং হাইড্রোজেন মিশ্রিত কার্বনকে সংরক্ষণ করে। এই হাইড্রোজেন হচ্ছে উদ্ভিদ কর্তৃক নিজের শেকড়ের সাহায্যে সংগৃহীত পানি। এই পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্রকৃতি এ বিস্ময়কর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই সকল উপাদান থেকে চিনি, উদ্ভিদের প্রধান উপাদান সেলিলোজা ও আরো কয়েক রকমের রাসায়নিক উপাদান প্রস্তুত করে। অতপর এই সমস্ত উপাদানের কিয়দংশ ফল ও ফুলের আকার ধারণ করে। আর বাদবাকী অংশকে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং আরো খানিকটা উৎপন্ন উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়, যা পরবর্তীতে ভূপৃষ্ঠের সকল প্রাণীর জন্যে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ করে। একই সময় উদ্ভিদ তার শোষিত অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই অক্সিজেন না হলে কোনো প্রাণী ৫ মিনিটের বেশী বাঁচে না।'

এভাবে আমরা জানতে পারি যে, যাবতীয় উদ্ভিদ, গাছপালা, ঘাস, শেওলার প্রতিটা অংশ এবং কৃষি ক্ষেতের পানির সাথে সংযুক্ত যে কোনো উদ্ভিদের জন্ম কার্বন এবং বিশেষভাবে পানির ওপর নির্ভরশীল। প্রাণী কার্বন অক্সাইড-২ ত্যাগ করে। আর উদ্ভিদ ত্যাগ করে অক্সিজেন। এই আদান প্রদান চালু না থাকলে উদ্ভিদ ও প্রাণী সকল অক্সিজেন অথবা প্রায় সকল কার্বন অক্সাইড-২ খেয়ে ফেলতো। এভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে হয় উদ্ভিদ পচে যেত, নচেৎ মানুষ মারা যেত। আর একটার মৃত্যুর সাথে অপরটিও তার সাথে মিলিত হতো। সাম্প্রতিক কালে এ তথ্যও আবিস্কৃত হয়েছে যে, বেশীরভাগ প্রাণীর জীবনের জন্যেও স্বল্পমাত্রায় কার্বন অক্সাইড-২ প্রয়োজনীয়। আবার এও জানা গেছে যে, উদ্ভিদও সামান্য কিছু অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে।

হাইড্রোজেনও একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ না করলেও হাইড্রোজেন ছাড়া পানির অস্তিত্ব অসম্ভব। আর প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের জন্যে যে অনুপাতে পানির প্রয়োজন তার মাত্রা বিস্ময়করভাবে বিপুল। এক কথায় বলা যায়, পানির কোনো বিকল্প নেই এবং পানি ছাড়া জীবন একদম অচল। পৃথিবীর জীবিকা উৎপাদনে নাইট্রোজেনের অবদানও কম নয়। একই বিজ্ঞানী তার গ্রন্থের ২৬-২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

কোনো না কোনোভাবে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি ছাড়া খাদ্য জাতীয় উদ্ভিদের উৎপাদন ও বিকাশ অসম্ভব। কৃষি জমিতে নাইট্রোজেন প্রবেশের দুটো উপায় আছে। একটা হলো, এক ধরনের রোগ জীবাণুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ। এসব জীবাণু সবজী ও তরিতরকারীর গাছের বীজে পাওয়া যায়। এসব সবজী ও তরকারী হলো লবংগ, বুট, মোটর ইত্যাদি। এ সব জীবাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাকে মিশ্র নাইট্রোজেনে পরিণত করে। যাকে উদ্ভিদ চুষে নিতে পারে আর উদ্ভিদ মারা গেলে এই মিশ্র নাইট্রোজেনের কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠে থেকে যায়।

মাটিতে নাইট্রোজেন প্রবেশের অপর মাধ্যমটি হলো মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকানো। প্রবল জোরে মেঘের গর্জন হলে ও বিদ্যুৎ চমকালে নাইট্রোজেন ও স্বল্প মাত্রায় অক্সিজেন মিশ্রিত হয়। বৃষ্টি এটাকে মিশ্র নাইট্রোজেনের আকারে পৃথিবীতে নামায়।(অর্থাৎ উদ্ভিদ যাতে তাকে চুষে নিতে পারে। কেননা উদ্ভিদ নির্ভেজাল নাইট্রোজেনকে বায়ুমন্ডল থেকে চুষে নিতে অক্ষম। সেখানে নির্ভেজাল নাইট্রোজেনের মাত্রা শতকরা ৮৭ ভাগ সে কথা আগেই বলেছি।)

এ ছাড়া ভূগর্ভে তরল ও কঠিন খনিজ পদার্থের আকারে অনেক গুপ্ত জীবিকা রয়েছে। এসব কিছু দ্বারা পৃথিবী ও তার সংশ্লিষ্ট অবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সম্পন্ন হতে পারে। আমরা এর দীর্ঘ বিশ্লেষণে যাবো না। তবে উল্লেখিত বিবরণসমূহের আলোকে বিষয় বা জীবিকার তাৎপর্য এর প্রচলিত অর্থের চেয়ে ব্যাপকতর। পৃথিবী পুনর্নির্মাণে এবং গোটা বিশ্বের সংহতকরণে এর উপায়-উপকরণ অত্যন্ত গভীর ও কার্যকর। আর আল্লাহ তায়ালা যখন 'খাও' বলে এই জীবিকা আহরণের অনুমতি দেন তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি এই জীবিকা মানুষের আয়ত্তাধীন ও সহজলভ্য করে দিয়েছেন এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া ও তা খাওয়ার ক্ষমতাও তাকে দিয়েছেন। তাই তিনি বলেন,

'পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে বিচরণ ও পরিভ্রমণ করো এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকা আহার করো।'

কিন্তু এই জীবিকা আহরণের সময় নির্ধারিত ও সীমিত। সে সময় নির্ধারিত হয় আল্লাহরই জ্ঞান পরিকল্পনা ও কর্তৃত্বাধীনে। এই নির্ধারিত মেয়াদটি আবার জীবন মৃত্যু এবং অন্য যে যে জিনিসে পার্থিব জীবনে আল্লাহ তায়ালা মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তার দ্বারা পরীক্ষা পরিপূর্ণ। এই পরীক্ষার মেয়াদ শেষ হলেই আসবে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর তারই কাছে পুনরুজ্জীবন।'

বস্তুত সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র মালিকানা ও কর্তৃত্ব যখন তারই হাতে, তিনিই যখন সৃষ্টিজগতের আশ্রয়স্থল এবং তিনিই যখন সর্বশক্তিমান তখন তিনি ব্যতীত আর কার কাছেই বা মানুষের পুনরুজ্জীবন হবে?

আর এখন যখন মানুষ পরম শক্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে এই নিরুপদ্রব বিশ্বে জীবন যাপন করছে আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে এই প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিতে কাল কাটাচ্ছে, তখন সহসা আল্লাহ তার পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে দিচ্ছেন এবং আন্দোলিত ও আলোড়িত করছেন চার পাশের পরিবেশ ও বায়ুমন্ডলকে। এমনভাবে উদ্বেলিত করছেন যে, একটা আগুনের শিখা যেন এসে তার মুখ ও বুকে আঘাত করছে। মানুষের স্নায়ুতে এই ভূকম্পন ঘটাচ্ছেন এবং তাদের কল্পনার জগতে আগুনের শিখা বইয়ে দিচ্ছেন যাতে তারা স্বস্তি ও স্থিতিজনিত উদাসীনতা থেকে নিবৃত্ত হয়। তার দৃষ্টি আকাশ ও অদৃশ্য জগতের দিকে প্রসারিত করে এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কাছে নিজেদের মনকে নিবেদিত করে।

### কোন দুরাচার আল্লাহকে ভয় করবে না?

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা কি আকাশের অধিপতির পক্ষ থেকে এমন কর্মকান্ডের আশংকা বোধ করো না যে, তিনি তোমাদেরকে মাটির অভ্যন্তরে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন এবং পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে অবনমিত হয়ে যেতে পারে। তোমরা কি এ আশংকাও বোধ করো না

যে আকাশের অধিপতি তোমাদের দিকে একটা অগ্নিশিখা পাঠিয়ে দিতে পারেন? তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন (সাংঘাতিক) হয়। পূর্ববর্তী লোকেরাও আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। তখন আমার শাস্তিটা কেমন ছিলো?'

অর্থাৎ পরম অনুগত জন্তু সদৃশ যে পৃথিবীটার ওপর মানুষ জীবন যাপন করছে এবং তাকে দোহন করে তা থেকে আল্লাহর নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবিকা আহরণ করছে, সেই নিরীহ গোবেচারা পৃথিবী যে সময়ে সময়ে কি সাংঘাতিক রকমের অনমনীয় ও অবাধ্য হয়ে ওঠে তা সে যথাসময়েই জানতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা যখনই নির্দেশ দেন সামান্য একটু হেলে দুলে উঠতে অমনি তার পিঠের সব কিছু এলোমেলো অথবা বিধ্বস্ত হয়ে যায় অথবা আন্দোলিত ও তছনছ হয়ে যায়। কোনো ফন্দি বা শক্তি খাটিয়ে তাকে রক্ষা করা যায় না।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় এ ধরনের প্রলয়ংকরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন এই গোবেচারা পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি সাংঘাতিক হিংস্র প্রাণীর চরিত্র লুকিয়ে ছিলো তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ হিংস্র প্রাণীটাকে আল্লাহ তায়ালা লাগাম দিয়ে সামাল দিয়ে রাখেন বলে তা সীমিত পর্যায়ের উচ্ছৃংখলতা দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডব্যাপী ভূমিকম্পের হিংস্রতা ভূপৃষ্ঠে মানবজাতির নির্মিত হাজার হাজার বছরের সভ্যতা সংস্কৃতি ও সুরম্য প্রাসাদকে ধূলিস্মাৎ করে দেয়। যখন অবাধ্য পৃথিবীর কোনো আগ্নেয়গিরির পেট থেকে কোনো মুখ ফুটে বের হয় তখন তা পৃথিবীর একটা অংশকে আস্ত গ্রাস করে ফেলতে পারে। মানুষ এই ধ্বংসলীলার সামনে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় হয়ে পড়ে।

ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ও ভূমিধসের ধ্বংসলীলায় মানুষ ভয়ে ত্রাসে খাঁচার আবদ্ধ ইঁদুরের মতো পড়ে থাকে। অথচ একটু আগেই হয়তো তারা পরম শান্তিতে ও মহা উল্লাসে খেলায় মত্ত ছিলো। এক সর্বশক্তিমান সত্তার হাতে যে তাদের সর্বময় কর্তৃত্বের লাগাম ধরা রয়েছে সে সম্পর্কে ছিলো একেবারেই উদাসীন।

মানুষ এভাবেই অনেক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটনকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগাদি প্রত্যক্ষ করে থাকে। সে সব বিনাশী অভিযানের সামনে তারা তাদের সমস্ত জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি ও তৎপরতা সত্ত্বেও নিরুপায় ও অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। যতোক্ষণ আল্লাহর হস্তক্ষেপে সেই দুর্যোগ প্রশমিত না হয় ততক্ষণে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে তা তার সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলা অবাধে চালিয়ে যেতে থাকে। মানুষ তার সামনে নিতান্তই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, দুর্বল জীব প্রতীয়মান হয়।

পৃথিবীর নিরুপদ্রব শান্তি ও নিরাপত্তা মানুষকে প্রতারিত করে, তাকে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার কথা ভুলিয়ে দেয়। সে জন্যেই কোরআন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর ইচ্ছায় যে কোনো মুহূর্তে তাদের এই সুখ স্বপ্ন ভেংগে যেতে পারে। যে কোন সময় তাদের ঘাড়ে নেমে আসতে পারে এসব সর্বনাশা দুর্যোগ। তাদের পায়ের নিচের শান্ত পৃথিবী হঠাৎ দুলে উঠতে পারে। সংহারীরূপ ধারণ করে ফুঁসে উঠতে ও মানুষকে খড়-কুটোর মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। চারপাশের মৃদুমন্দ বাতাস সহসা প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। কোনো শক্তিই তা রোধ করতে পারে না। মানুষ তার সামনে হয়ে পড়ে অসহায়। কোরআন সেই সম্ভাব্য অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে সাবধান করে। তার স্নায়ুতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে তাকে হুশিয়ারী দেয়,

'শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে আমার হুশিয়ারী কেমন।'

কোরআন এই সাথে অতীত ইতিহাস থেকে ইসলামী দাওয়াতকে অস্বীকারকারীদের শোচনীয় পরিণামের দৃষ্টান্ত পেশ করে এই বলে,

**আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাব**

'তাদের পূর্ববর্তীরা প্রত্যাখ্যান করেছিলো, সে জন্যে আমার শাস্তিটা কেমন হয়েছিলো?'

আয়াতে যে 'নাকীর' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হলো প্রত্যাখ্যান ও তার পরিণতি। যারা অতীতে আল্লাহর দাওয়াতকে অস্বীকার করেছিলো আল্লাহ তায়ালা তাদের অস্বীকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করছেন এই জিজ্ঞাসার মাধ্যম যে 'আমার শাস্তি কেমন ছিলো?' অথচ আল্লাহ নিজেই জানেন তা কেমন ছিলো। সে সময়কার ধ্বংস চিহ্নগুলো এখনো বহাল রয়েছে। সে গুলো মক্কার কাফেরদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সে ধ্বংসলীলা কেমন ভয়াবহ ছিলো।

যে শান্তি ও নিরাপত্তা মানুষকে আল্লাহর কথা, তার সীমাহীন শক্তি ও পরিকল্পনার কথা ভুলিয়ে দেয়- সেই শান্তির প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এ আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহর রহমত তার প্রহরা ও তদারকীর ওপর নির্ভর করে মোমেনরা যে প্রশান্তি লাভ করে তার প্রতি নয়। এই দুটো প্রশান্তি এক রকমের নয়। কেননা মোমেন আল্লাহর ওপর নির্ভর করে শান্তি পায়। তার করুণা ও অনুগ্রহের প্রত্যাশী থাকে। কিন্তু তা তাকে উদাসীন করে দেয়না। দুনিয়ার প্রাচুর্য তাকে মত্ত করে রাখে না। বরং তাকে সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রত্যাশী, তার ব্যাপারে লজ্জাশীল, তার ক্রোধ সম্পর্কে সতর্ক, তার অজানা পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন এবং তার প্রতি সদা অনুগত ও সদা প্রশান্ত রাখে।

ইমাম আহমদ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলকে আমি কখনো দাঁত বের করে হাঁসতে দেখিনি। তিনি কেবল মুচকি হাঁসতেন আর যখনই তিনি কোনো মেঘ বা বাতাস দেখতেন তখন তার মুখে ভয়ার্ত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতো। তিনি বললেন, হে রসুল, মেঘ দেখলে বৃষ্টির আশায় লোকেরা আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনার মুখে অসন্তোষের চিত্র দেখতে পাই। রসুল (স.) বললেন, হে আয়েশা, ওই মেঘ থেকে বৃষ্টির বদলে আযাব আসবে কিনা সেই আশংকায় আমাকে পেয়ে বসে। একটি জাতি এই বাতাস থেকেই আযাব ভোগ করেছিলো। আর একটি জাতি বলেছিলো যে, ঐ তো মেঘ আসবে, আমাদের বৃষ্টি দেবে। কিন্তু পরে তারা তা থেকে আযাবে ভুগেছিলো। আল্লাহর প্রতি মোমেনের সর্বক্ষণ এই চেতনা ও অনুভূতি জাগরূক থাকা চাই। কুরআন যে ইতিহাস বর্ণনা করেছে তাও এই চেতনা জাগরূক করার উদ্দেশ্যেই করেছে। তবে আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীলতার জন্যে যে প্রশান্তি জন্মে তা সে চেতনার পরিপন্থী নয়।

**একজন মোমেনের কর্তব্য**

এরপর মোমেনের কর্তব্য হলো যাবতীয় বাহ্যিক কারণের মূল কারণ যে আল্লাহ তায়ালা তা বিশ্বাস করা। প্রত্যেক বিষয়কে সর্বতোভাবে সর্বশক্তিমান বিশ্ব অধিপতির নিরংকুশ কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত মনে করতে হবে। কি ভুমিকম্প, কি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, কি ঝড় ঝঞ্ঝা, কি ভূমিধস কিংবা আগুনের হলকা যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগই আসুক না কেন তার ব্যাপারে মানুষের কিছুই করার থাকে না। এ সব ব্যাপারে আল্লাহর হাতেই নিরংকুশ ক্ষমতা নিবদ্ধ। এ সব ঘটনা সম্পর্কে মানুষ যা কিছুই বলে তা দ্বারা কেবল তা কেন ও কিভাবে ঘটলো তার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু সে ঘটনা ঘটা বা না ঘটার ব্যাপারে তার কোনোই হাত থাকে না এবং তা থেকে আত্মরক্ষারও কোনো কার্যকর শক্তি তাদের নেই।

পৃথিবীতে মানব জাতি যতো সুরম্য ইমারত নির্মাণ করুক না কেন, পৃথিবীর একটিমাত্র ঝাঁকুনি কিংবা একটামাত্র ঝড় তাকে তাসের ঘরের মতো নিশ্চিন্ন করে দেয়। সুতরাং এসব

ব্যাপারে একমাত্র এই বিশ্বনিখিলের সৃষ্টিকর্তার দিকে মুখ ফেরানোই মানুষের কর্তব্য। কেননা তিনিই এ সবের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অপরাজেয় শক্তির কিছু নির্দশন দেখতে পাওয়া যায়। সে শক্তির চাবিকাঠি একমাত্র তার হাতেই নিবদ্ধ। এসব দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে মানুষের আত্মনিবেদন করা উচিত একমাত্র বিশ্বজগতের সার্বভৌম অধিপতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে।

**মানবীয় জ্ঞান ও আল্লাহর কুদরত**

আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু শক্তি ও জ্ঞান মানুষকে বরাদ্দ করেছেন মানুষ ততটুকুই শক্তি ও জ্ঞানের মালিক। কিন্তু গোটা সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণ এর স্রষ্টার হাতেই নিবদ্ধ। এর নেয়ামক বিধিমালা তারই সৃষ্টি এবং এর ভেতরে নিহিত যাবতীয় শক্তি তারই সরবরাহ করা। এই সকল শক্তি আল্লাহরই প্রাকৃতিক বিধানের বলে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে চলে। এ শক্তি থেকে আল্লাহর বরাদ্দ করা অংশই মানুষ পেয়ে থাকে এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানেরও কেবল বরাদ্দকৃত অংশই তার হস্তগত হয়ে থাকে। আর যেসব ঘটনা সংঘটিত হয় অথবা মানুষ তার সামনে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারে না, সে সম্পর্কে তাকে সেসব ঘটার স্রষ্টা নিয়ন্তা ও সংগঠক আল্লাহর কাছেই যা কিছু বলার থাকে বলতে হবে। সেগুলোর মোকাবেলা করার জন্যে সাহায্য চাইতে হবে এবং যতোদুর তার সাধ্যে কুলায় মোকাবেলা করে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

এ সত্যকে যখন মানুষ ভুলে যায় এবং সৃষ্টিজগতের কিছু শক্তিকে পদানত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, তখন সে একটা বিকৃত ও ভ্রষ্ট মানুষে পরিণত হয়। সেই নির্ভুল জ্ঞানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় যা আত্মাকে উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করায় এবং সে সৃষ্টির জীবনী শক্তি থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে মাটির কাছে ঘনিষ্ঠ হয়। অথচ সত্য জ্ঞানের অধিকারী মোমেন আল্লাহর অনুগত গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে একাত্ম হয়ে এক নয়নাভিরাম সমাবেশে মহান স্রষ্টার সামনে রুকু সেজদায় লিপ্ত হয়। এটা যে কি অমূল্য নেয়ামত তা শুধু সেই ব্যক্তিই জানে যে এর স্বাদ পেয়েছে এবং এর স্বাদ আল্লাহ যার বরাতে রেখেছেন।

কিন্তু এ স্বাদ ও সৌভাগ্য মানুষের অর্জিত হোক বা না হোক প্রকৃতির ত্রাসসঞ্চারী শক্তিগুলো তাকে অসহায়ত্ব ও অক্ষমতার শেষ প্রান্তে না নিয়ে এবং আত্মা সম্পর্কে বাধ্য না করে ছাড়ে না। সে টুকটাক কিছু আবিস্কার ও উদ্ভাবন করে এবং বেশ খনিকটা শক্তিও অর্জন করে। কিন্তু এসত্ত্বেও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মোকাবেলায় সে অক্ষম মানুষের চেয়ে বেশী কোনো মর্যাদা রাখেনা। হয়তো বা সময় সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্যোগগুলো যথারীতি ঘটতেই থাকে, মানুষ তার আত্মরক্ষা করতে পারেনা। সে বড়জোর দুর্যোগের আগাম সংবাদ জানিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তাও সব সময় নয়। কিন্তু কখনো তার পক্ষে দুর্যোগকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কখনো কখনো তো দুর্যোগ তাকে হত্যা করেই ছাড়ে। তার দেয়াল ও ভবন ধসিয়ে দিয়ে তার নিচে তাকে পিষে মারে। সমুদ্র ঝড় তুফান তাকে ডুবিয়ে মারে আর বড় বড় জাহাজকে এমনভাবে প্রবল বাতাসের মধ্যে উল্টে দেয় কোনো শিশু যেমন তার খেলনাকে উলট পালট করে। ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির তো ব্যাপারই আলাদা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তা যেমন ছিলো তেমনই রয়েছে। মানুষ তার নাগালই পায়নি।

কাজেই মানুষ এই প্রাকৃতিক জগতে একাই দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম কিংবা সে এর নিয়ন্তা এ কথা যে বলে সে অন্ধ ছাড়া কিছুই নয়। তার এ উক্তি জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী।

বস্তুত মানুষ আসলে এ পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি। এই দায়িত্ব পালনের জন্যে তার যতোটুকু শক্তি ক্ষমতা ও জ্ঞান দরকার তাই তিনি তাকে দিয়েছেন। তিনি তার তত্ত্বাবধায়ক অভিভাবক ও রক্ষক। জীবিকা ও অন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস তিনিই তাকে দিয়েছেন। তার রক্ষক হাত যদি মানুষের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সরে যায় তাহলে যে শক্তিগুলোকে তার অধীনে ও অনুগত করে দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল শক্তিও তাকে খতম করে দিতে সক্ষম। মশা, মাছি বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র সৃষ্টি তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা, আদেশ ও অনুগ্রহে তাকে রক্ষা করা হয়। এজন্যেই সে টিকে আছে, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছে। তার এই সম্মান ও মর্যাদা কোথা থেকে এলো তা তার জানা ও ভাবা উচিত।

**বিবেকের কাছে আহ্বান**

সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের পর্যায় অতিক্রম করে এবার কোরআন মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তা গবেষণার স্তরে। সে তাকে এমন একটা অংগনে নিয়ে যাচ্ছে যাকে মানুষ হরহামেশাই দেখতে পায়। কিন্তু তা নিয়ে খুব কমই চিন্তা ভাবনা করে। এ অংগনটি আল্লাহর ক্ষমতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন এবং তার সূক্ষ্ম ও নিপুণ রাজ্য পরিচালনার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। কোরআন বলছে,

'তারা কি পাখিকুলকে দেখে না যখন তা পাখা মেলে ও বন্ধ করে? করুণাময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ তো তাদেরকে মহাশূন্যে ধরে রাখতে পারে না। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুই দেখেন।'

প্রতিনিয়ত সংঘটিত এই অলৌকিক ঘটনা আমরা দেখেও দেখি না। বার বার সংঘটিত হওয়ার কারণে এর ভেতরে যে অসীম ক্ষমতা ও মহত্বের নিদর্শন নিহিত রয়েছে তা যেন ভুলে বসে আছি। পাখিকে নিয়ে একটু ভাবুন তো। সে তার ডানা মেলে ও বন্ধ করে। এই উভয় অবস্থায় সে বায়ুমন্ডলে অনায়াসে ভেসে বেড়ায়, নিচে পড়ে যায় না। তার তৎপরতা দেখে সময় সময় মনে হয় যে এগুলো নিছক বৃত্তাকারে ওঠানামার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

এ দৃশ্যটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করুন ও ভাবুন। যতো দেখবেন ততোই চোখ জুড়াবে এবং মনে আনন্দের হিল্লোল বইবে। এসব দেখে আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টির অনুভূতি জাগে এবং অনুরূপ এই দৃশ্য দেখিয়ে বলে,

'তারা কি দেখেনি তাদের মাথার ওপর পাখিরা ডানা মেলে ও বন্ধ করে?'

এর পর এর নেপথ্য পরিকল্পনা ও পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে তার দিকে ইংগিত করছে এই বলে,

'দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তাদেরকে আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না।'

দয়াময় আল্লাহ সৃষ্টিজগত পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী দ্বারা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই নির্দেশাবলীতে বিস্ময়কর সমন্বয় বিদ্যমান। প্রতিটি ছোট বড় সৃষ্টি এমনকি প্রতিটি অণু পরমাণু ও কোষ পর্যন্ত সমন্বয়ের আওতাভুক্ত। আল্লাহর এসব নির্দেশ তথা প্রাকৃতিক নিয়ম বিধির আলোকে ভূমন্ডলে ও নভোমন্ডলে বিরাজমান হাজারো অনুকূল উপাদান সৃষ্টি ও পাখিকুলের বিচিত্র গঠন সুসম্পন্ন হয়ে থাকে আর এরই বদৌলতে নিরন্তর সংঘটিত হতে থাকে প্রাকৃতিক জগতের যাবতীয় অলৌকিক ঘটনাবলী।

দয়াময় স্রষ্টা এই পাখিকুলকে নিজের দূরন্ত ক্ষমতা বলে নিয়ন্ত্রণ করেন। সব কিছুর ওপর তার সার্বক্ষণিক নিরলস পর্যবেক্ষণ ও তদারকী বিদ্যমান। এ জন্যেই প্রাকৃতিক বিধান চিরদিন নিখুঁত, সুশৃংখল ভারসাম্যপূর্ণ সুসমন্বিত। আল্লাহর ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম ছাড়া তার প্রাকৃতিক বিধানে কোনো গরমিল, কোনো ওলট পালট এবং কোনো ব্যতিক্রম একমুহূর্তের জন্যে ঘটে না।

'দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এই পাখিকুলকে আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না।'

এই সুস্পষ্ট উক্তিতে মহান দয়াময় আল্লাহর পরিপূর্ণ কৃতিত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়েছে প্রতিটি পাখির প্রতিটি ডানার নিয়ন্ত্রণের, চাই সে পাখি আকাশে ডানা ঝাপটে উড়ন্ত অবস্থায় থাকুক কিংবা ডানা বন্ধ করে ঝুলন্ত থাকুক।

'নিশ্চয়ই তিনি প্রতিটি জিনিসের দর্শক।'

অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে পাখিকে দেখেন, তাকে অবহিত করেন, আর এভাবে সমন্বয় সাধন করেন। সব কিছুকে প্রস্তুত করেন, শক্তি দেন, এবং সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ প্রভুর পক্ষে যেমনটি উপযুক্ত, তেমনভাবে তত্ত্বাবধান করেন।

এ কথা সত্য যে, আকাশে পাখিকুলকে নিয়ন্ত্রণ করা আর ভূপৃষ্ঠে জীব জন্তুকে নিয়ন্ত্রণ করা একইরকম ব্যাপার। এ দুইয়ে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কেননা পৃথিবী তো তার পিঠের যাবতীয় বোঝা নিয়ে মহাশূন্যে উড়ছেই। সেই মহাশুন্যের সকল গ্রহ নক্ষত্রকে যেমন আল্লাহ তায়ালা যথাস্থানে স্থির রেখেছেন, পৃথিবীকেও সেইভাবে এবং পাখিকেও সেইভাবেই স্থির রেখেছেন। কিন্তু কোরআন মানুষের চোখ ও মনকে প্রতিটি দর্শনযোগ্য ও প্রতিটি অনুধাবনযোগ্য দৃশ্যের কাছে নিয়ে যায় এবং সেই দৃশ্যটিতে কি কি শিক্ষণীয় জিনিস আছে তা জানিয়ে দেয়। এ কারণেই পাখির দৃশ্যটিকে অবলোকন করায়। নচেৎ আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিই অলৌকিক ও অকল্পনীয় উদ্ভাবন। সব কিছুতেই রয়েছে শিক্ষা এবং মনে দাগ কাটার মতো বিষয়। প্রতিটি মানুষ এর প্রতিটি প্রজন্ম থেকে সাধ্যমত এবং আল্লাহর দেয়া শক্তি ও প্রেরণা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করে।

আকাশে সাঁতাররত পাখির দৃশ্য অবলোকনের পর কোরআন পরবর্তী আয়াতে মানুষের মনকে পুনরায় নিয়ে যায় দুর্যোগ সংকুল দৃশ্যের কাছে। যেখানে ভূমিধস, আগুনের হলকাবাহী ঝড় ইত্যাদির উপদ্রব বিদ্যমান। সেখানে তার চেতনায় রকমারি অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করে। কেননা এ ধরনের বিচিত্র অনুভূতির পুনরাবৃত্তিতে আল্লাহর বান্দাদের হৃদয়ে কি ভাবান্তর ঘটাতে পারে, তা আল্লাহর জানা আছে। তাই কোরআন পরবর্তী আয়াতে বলছে,

'তোমাদের এই যে বাহিনী রয়েছে, সে কি তোমাদেরকে আল্লাহর মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে? কাফেররা তো কেবল প্রতারণার শিকার হয়ে রয়েছে।'

বস্তুত স্রষ্টার গযব থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করার ক্ষমতা একমাত্র স্রষ্টারই আছে, অন্য কারো নেই।

ইতিপূর্বে মানুষকে ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বংস ইত্যাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তোষের শিকার ধ্বংসপ্রাপ্ত অতীত জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতির কথা স্মরণ করানো হয়েছে। এক্ষণে পুনরায় মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কে আছে মানুষকে আল্লাহর নাযিল করা দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে পারে?

'কাফেররা তো প্রতারণার শিকার হয়ে রয়েছে।'

অর্থাৎ এমন একটা বিভ্রান্তিকর ধারণার মধ্যে তারা রয়েছে যে, তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত। কেউ তাদের পশমও স্পর্শ করতে পারে না। অথচ তারা আল্লাহর গযবের উপযুক্ত ও তার আযাবের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে। একমাত্র যে জিনিস আল্লাহর রহমত ও দয়ার উদ্রেক এবং গযবকে রোধ করতে পারে সেই ঈমান ও সৎ কাজও তাদের নেই যে, তা দ্বারা আল্লাহর দয়া ও করুণার আশা করতে পারে।

**অব্যাহত জীবিকা সরবরাহ**

এরপর আর একটি প্রশ্ন তুলে ধরা হচ্ছে মানুষের সামনে তার জীবিকার ব্যাপারে। এই জীবিকা সে প্রতিনিয়ত উপভোগ করে। অথচ তা কোথা থেকে এলো, তা ভুলে যায় এবং কখনো তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিনা, সে কথা ভেবেও দেখে না। এ জন্যে অহংকার ও অস্বীকৃতির আবরণে তারা অনড় ও অবিচল থাকে।

'আচ্ছা, যিনি তোমাদেরকে জীবিকা সরবরাহ করেন, তিনি যদি জীবিকা সরবরাহ বন্ধ করে দেন, তাহলে তোমাদের কী হবে? তথাপি তারা বিদ্রোহী ও বিদ্বেষী ভূমিকায় অবিচল রয়েছে।'

এ কথা আমরা আগেই বলেছি যে, সকল মানুষের জীবিকা প্রাথমিকভাবে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির অবকাঠামোতে এবং পৃথিবী ও বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদানে (মাটি, আলো, বাতাস, বৃষ্টি, তাপ ও ঋতু বৈচিত্রের আকারে) জীবিকা উৎপাদনের যেসব উপকরণ বিরাজ করছে, তার সবই নিরংকুশভাবে আল্লাহর হাতে। মানুষের হাতে তার কিছুই নেই এবং মানুষের কর্মকান্ডের সাথে তার আদৌ কোনো সম্পর্কও নেই। কেননা সে সকল উপায় উপকরণ মানুষের অনেক আগে জন্মেছে, মানুষের চেয়ে ওগুলো অনেক বেশী শক্তিশালী। আর আল্লাহ তায়ালা যখন জীবনের নির্দর্শনাবলীকে খতম করতে চান, তখন সেসব প্রাকৃতিক উপাদান সেগুলোকে ধ্বংস করার কাজে স্বয়ং মানুষের চেয়েও অনেক বেশী সক্ষম।

অতএব আল্লাহ তায়ালা যদি পানি না দেন, বাতাস না দেন, কিংবা জিনিসপত্রের সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদানগুলোর সরবরাহ বন্ধ করে দেন, তাহলে মানুষকে জীবিকা কে দেবে? কোথা থেকে আসবে তার খাদ্য, পানীয় ও জীবন ধারণের অন্যান্য মৌলিক উপকরণ?

রেযেক বা জীবিকা বলতে আমরা প্রাথমিকভাবে যা বুঝি, তার চেয়ে তার প্রকৃত মর্মার্থ অনেক বেশী ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। জীবিকার পর্যায়ে পড়ে এমন যে কোনো জিনিস যতো ছোট বা বড় হোক না কেন, তা আল্লাহর ক্ষমতা, পরিকল্পনা এবং আল্লাহ তায়ালা তার উপকরণাদি সরবরাহ করবেন না বন্ধ করবেন তার ওপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল।

উক্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী অর্থের আওতাভুক্ত রয়েছে রেযেক বা জীবিকা শব্দের অর্থের অতি নিকটবর্তী কিছু জিনিস, যাকে মানুষ নিজের উপার্জন এবং নিজের শক্তি সামর্থের নাগালের ভেতরের জিনিস বলে মনে করে। যেমন, শ্রম, উৎপাদন ও আবিষ্কার- উদ্ভাবন। এই তিনটি জিনিস এবং অনুরূপ আর যে যে জিনিস থাকা সম্ভব তার সবই একদিকে যেমন প্রাথমিক উপায় উপকরণের সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল, অপরদিকে তেমনি আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে কি পরিমাণে তা দান করেন বা আদৌ দান করেন কিনা তার ওপর নির্ভরশীল। একজন শ্রমিকের প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস ও প্রতিটি তৎপরতা আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবিকার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালাই তাকে শ্রমের উপযুক্ত শক্তি ও ক্ষমতা দান করেন। তার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস সৃষ্টি করেন এবং যে উপকরণটি তার শরীরে ব্যয়িত হয়ে শক্তির যোগান দেয়, তাও আল্লাহ তায়ালাই দান

করেন। একজন আবিষ্কারক যে বুদ্ধিবৃত্তিক চেষ্টা সাধনা ও গবেষণা চালান, তাও তো আল্লাহরই দেয়া জীবিকার ফল। কেননা আল্লাহ তায়ালাই তাকে চিন্তা-গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষমতা দান করেন।

কোনো শ্রমিক বা আবিষ্কারক যাই উৎপাদন করুন না কেন, তা প্রাথমিকভাবে আল্লাহর সৃষ্টি করা কোনো বস্তু বা পদার্থ থেকেই উৎপাদন করেন। এমন কোনো প্রাকৃতিক বা মানবীয় উপায় উপকরণের সাহায্যে করেন, যা মূলত আল্লাহরই প্রদত্ত জীবিকা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পটভূমিতে কোরআনের এ প্রশ্ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বার্থক যে,

'যিনি তোমাদেরকে জীবিকা দেন তিনি যদি তার জীবিকা সরবরাহ বন্ধ করে দেন তাহলে কি হবে! কিন্তু তবুও তারা তাদের অস্বীকৃতি ও বিদ্রোহী আবরণে অনড়।'

আয়াতটির ভাষা থেকে একটি ভ্রু কুঞ্চিত ও স্পর্ধিত মুখমন্ডলের ছবি ভেসে ওঠে। ইতিপূর্বে জীবিকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং মানুষ যে জীবিকার ব্যাপারে পুরোমাত্রায় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, তাও বলা হয়েছে। এমন একটা পরনির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী জীব যদি তার জীবিকা তথা খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহকারীর সাথে বিদ্রোহাত্মক, বিদ্বেষপূর্ণ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে তবে তার চেয়ে কুৎসিত ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। আয়াতটি এমন এক শ্রেণীর মানুষের ছবি অংকন করেছে, যারা চরম হঠকারিতার সাথে ও ঘৃণাভরে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতকে উপেক্ষা করেছে। তারা এ কথা ভুলে যায় যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই অনুগ্রহের ওপর বেঁচে রয়েছে এবং নিজেদের জীবন, জীবিকা ও আয়ুষ্কালের ওপর তাদের একেবারেই কোনো হাত নেই।

## হেদায়াত ও গোমরাহীর উদাহরণ

এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও তারা রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে গোমরাহ বা বিপদগামী এবং নিজেদেরকে সবচেয়ে নির্ভুল পথের যাত্রী ভাবতো। তাদের সমগ্রোত্রীয়রা প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর পথে আহবানকারীদের সাথে অনুরূপ আচরণই করে থাকে। এ জন্যে তাদের ও মোমেনদের প্রকৃত অবস্থা পরবর্তী আয়াতে নিম্নরূপ চিত্রিত করা হয়েছে!

'সুতরাং যে ব্যক্তি মাথা নিচের দিকে রেখে চলে, সে সঠিক পথের যাত্রী, না যে ব্যক্তি সোজা পথ ধরে স্বাভাবিকভাবে চলে সে?'

'যে ব্যক্তি মাথা নিচের দিকে রেখে চলে' এ কথার দু'রকম অর্থ হতে পারে। প্রথমত, এমন ব্যক্তি যে সত্যিই আল্লাহর দেয়া পায়ের ওপর সোজা হয়ে চলতে পারে না বরং উপুড় হয়ে চলে।

দ্বিতীয়ত, রূপক অর্থে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়ে থাকতে পারে, যে পথ চলতে গিয়ে ঠোকর খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। তারপর আবার ওঠে, অতপর আবার উপুড় হয়ে পড়ে। এ ধরনের মানুষ যে কখনো গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। যে ব্যক্তি এভাবে পথে ক্রমাগত ঠোকর খেয়ে থাকে এবং দুস্তর বাধার সম্মুখীন হতে থাকে, সে কোনো হেদায়াত বা কল্যাণ লাভ করতে পারে না। এই ব্যক্তির সাথে সেই ব্যক্তির তুলনা কিভাবে হতে পারে যে, বাধাবন্ধনহীন সোজাপথে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চলে এবং যার গন্তব্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট?

প্রথমোক্ত অবস্থাটা হেদায়াত থেকে বঞ্চিত ও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হতভাগা মানুষের অবস্থা। অনবরত আল্লাহর সৃষ্টি ও আল্লাহর নির্দেশাবলীর সাথে তার টক্কর লাগে। কেননা সে এগুলোর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তার পথ আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির পথ থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। তাই সে সব সময় ঠোকর খায়, সব সময় কষ্টের মধ্যে থাকে এবং সব সময় গোমরাহীর মধ্যে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থাটা হলো আল্লাহর সঠিক পথের সন্ধানপ্রাপ্ত ও সঠিক পথের যাত্রীর অবস্থা। সে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সঠিক ও সোজা পথে চলে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও আল্লাহর গুণগানে সদামুখরিত জীব জন্তু নির্বিশেষে গোটা সৃষ্টিজগতের কাফেলা এই পথেই ধাবমান।

বস্তুত ঈমানী জীবন সরল, সহজ, স্বচ্ছ সাবলীল, বাধাবন্ধন মুক্ত ও প্রত্যয়দীপ্ত। আর কুফরী জীবন কঠিন, পদে পদে ঠোকর খাওয়া এবং পথভ্রষ্ট।

এ দুটো পথ এবং এ দুটো জীবনের কোনটা ভালো ও সঠিক? এ প্রশ্ন কি কোন জবাবের অপেক্ষা রাখে! না, এ প্রশ্নের ভেতরেই রয়েছে এর ইতিবাচক জবাব। বস্তুত প্রশ্নের জবাবটি স্পষ্ট ভাষায় না দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন হৃদয়ের চোখ দিয়ে এই জীবন্ত ও চলন্ত দৃশ্য দেখতে পায়। এ দৃশ্যে একদিকে রয়েছে উপুড় হয়ে চলা একটি দলের ছবি, যাদের কোনো পথও নেই, গন্তব্যও নেই। অপরদিকে রয়েছে ঘাড় সোজা ও বুক টান করে চলা একটি দৃঢ় প্রত্যয়ী কাফেলার ছবি, যারা সঠিক পথে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে অপ্রতিহতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এটি কোরআনের একটি বিশেষ বর্ণনাভংগী। তত্ত্বকে বাস্তব রূপ দান এবং জীবনকে ছবির মত এঁকে পেশ করা এই বর্ণনাভংগীর বৈশিষ্ট্য।

**হেদায়াত ও সত্যোপলব্ধির উপকরণ**

হেদায়াত ও গোমরাহীর উল্লেখের পাশাপাশি আল্লাহ মানুষকে হেদায়াত ও সত্যোপলব্ধির যে সব উপকরণ দিয়েছেন, অথচ মানুষ তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সত্যের পথ চিনে নেয়নি এবং কৃতজ্ঞতার আচরণ করেনি, সেই উপকরণগুলোর কথা স্মরণ করানো হয়েছে পরবর্তী আয়াতে,

'হে নবী, তুমি বলো, তিনিই তো সেই মহান প্রতিপালক, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে চোখ, কান ও হৃদয় দিয়েছেন। অথচ তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।'

মানুষকে আল্লাহ তায়ালাই তৈরী করেছেন। এটি এমন একটি অকাট্য সত্য, যা মেনে নেয়ার জন্যে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করে এবং নিজেকে এমন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করে যে, অস্বীকার করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এ কথা কে না জানে, মানুষ জ্ঞানে, শক্তিতে ও মর্যাদায় সকল সৃষ্টির সেরা। এ কথাও অনস্বীকার্য যে, মানুষ নিজেকে কখনো নিজেই সৃষ্টি করেনি বরং কারো না কারো দ্বারা সে সৃজিত। সুতরাং তার চেয়ে বেশী জ্ঞানী, বেশী শক্তিশালী এবং বেশী মর্যাদাবান কেউ না থেকে পারে না যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবে একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব না মেনে উপায় থাকে না। কেননা খোদ্ মানুষের নিজের অস্তিত্বই তাকে এই সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়। এ সত্য নিয়ে বিবাদ ও বিতর্ক তোলা এক ধরনের বোকামি ছাড়া কিছু নয় এবং তা কোনোরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরও যোগ্য নয়। এখানে আল্লাহর এ তথ্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের জ্ঞান অর্জনের হাতিয়ার ও উপকরণগুলো সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে চান, অর্থাৎ

'তোমাদের জন্যে তিনি কান, চোখ ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন।'

আল্লাহ এ কথাও বলতে চান যে, অধিকাংশ মানুষ এসব নেয়ামতের শোকর আদায় করে না।

চোখ ও কান মানবদেহের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটো অংগ। এ দুটো অংগের গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর তথ্য জানা গেছে। চোখ ও কানের চেয়েও বিস্ময়কর অংগ হচ্ছে হৃদয়।

মানুষের বুঝা ও জানার ক্ষমতাকেই কোরআন 'ফুয়াদ' বা হৃদয় নামে অভিহিত করে থাকে। এই হৃদয় সম্পর্কে এ যাবত খুব কম তথ্যই জানা গেছে। আসলে হৃদয় হচ্ছে আল্লাহর এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত এক অজানা রহস্য।

আধুনিক বিজ্ঞান চোখ ও কানের বিস্ময়কর তথ্য সংগ্রহে অনেক চেষ্টা চালিয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের সামান্য কিছু এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক নাওফেল তার 'আল্লাহ ও আধুনিক বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

'শোনার কাজ বাইরের কান থেকে শুরু হয়। কিন্তু কোথায় গিয়ে শেষ হয় তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। বিজ্ঞানের বক্তব্য হলো, শব্দ হওয়া মাত্র বাতাসে যে তরংগের সৃষ্টি হয়, সেটা কানে গিয়ে লাগে। এরপর কান শব্দটিকে ভেতরে ঢোকানের ব্যবস্থা করে যাতে তা কানের পর্দায় গিয়ে লাগে। অতপর তা তাকে ভেতরে শূন্যস্থানে নিয়ে যায়। এই আভ্যন্তরীণ শূন্য জাগয়গাটি কয়েক প্রকারের নালায় পরিপূর্ণ। ওসব নালায় কতক গোলাকার এবং কত আধা গোলাকার। শুধুমাত্র গোলাকার নালাগুলোর ভেতরে ৪ হাজার ছোট ছোট ধনুক রয়েছে। এগুলো সবই কানের রগসমূহের মাধ্যমে মাথার ভেতরে সংযুক্ত রয়েছে।

এই ধনুকগুলোর দৈর্ঘ্য এবং আয়তন কত তা কেউ জানে না। সংখ্যায় কয়েক হাজারে উন্নীত এ সব ধনুকের প্রত্যেকটি কিভাবে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত, এতে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে এই সব অজানা রহস্য। এ ছাড়া আরো যে কত সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ঢেউ খেলানো হাড় রয়েছে, তার হিসাব কে রাখে? এসব কিছু কানের ভেতরের সেই শূন্য প্রান্তরে এমনভাবে রয়েছে, যা সহজে দেখাই যায় না। একটি কানে এক লক্ষ শ্রবণ কোষ থাকে। আর রগগুলোর শেষ প্রান্তে থাকে অতি অসংখ্য রজ্জু। এগুলোর সুক্ষ্মতা দর্শক মাত্রেরই বিবেককে স্তম্ভিত ও বিস্ময়াভূত করে।

দর্শনেন্দ্রিয়ের কেন্দ্র হচ্ছে চোখ। এতে রয়েছে ১৩ কোটি আলোগ্রাহী যন্ত্র। এগুলো হচ্ছে দর্শনেন্দ্রিয়ের রগের প্রান্ত ভাগ। স্কেনেরা, কর্ণিয়া, প্লাসেন্টা ও রেটিনা নামক অংশগুলো নিয়ে চক্ষু গঠিত। এ ছাড়া আরো বিপুলসংখ্যক রগ এ পর্দার অন্তর্ভুক্ত।

রেটিনা গঠিত হয় নয়টা পৃথক পৃথক স্তর নিয়ে। তন্মধ্যে অভ্যন্তর ভাগের শেষ প্রান্তে অবস্থিত স্তরটি বহুসংখ্যক বোটা ও মোচা দ্বারা গঠিত। হিউম্যান বায়োলোজির বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, বোটার সংখ্যা ৩ কোটি এবং মোচার সংখ্যা ৩০ লাখ। এর সব কটি পরস্পরের সাথে এবং লেন্সের সাথে সুষ্ঠু আনুপাতিক হারে সংযুক্ত। প্রত্যেক মানুষের চোখের লেন্সের ঘনত্ব উভয় চোখে এক রকম নয়। এ জন্যে সকল আলোকরশ্মি একটিমাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করা হয়। অথচ মানুষ এ ধরনের জিনিসকে একই জাতীয় একটি মাত্র বস্তুতে যথা কাঁচে একত্রিত করতে সক্ষম হয়না। ('আধুনিক বিজ্ঞান ঈমানের উদ্দীপনা জাগায়' নামক গ্রন্থ থেকে অধ্যাপক মাহমুদ সালেহ)।

**হৃদয় কি জিনিস?**

এরপর আসে হৃদয়ের প্রসংগ। হৃদয় মানুষের সেই বৈশিষ্ট যার বদৌলতে মানুষ মানুষ হয়। পৃথিবীরূপী এই বিশাল সাম্রাজের মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হবার গৌরব যে গুণাবলীর ভিত্তিতে অর্জন করেছে, তা হচ্ছে বোধশক্তি, বিচার বিবেচনা ও বাছাই করার ক্ষমতা এবং জ্ঞান। আর এ তিনটি গুণেরই আরেক নাম হলো হৃদয়। এই গুণবৈশিষ্ট্য সমূহের বলেই মানুষ সেই গুরুত্বপূর্ণ আমানত গ্রহণ করেছে, যা গ্রহণে আকাশ পৃথিবী ও পাহাড় পর্বত সাহস করেনি।(১)

---

(১) বোখারী ও মুসলিম এ হাদীসটিকে আবদুর রযযাক-এর বরাত দিয়ে রেওয়ায়াত করেছেন।

সেই আমানত বা গুরুদায়িত্ব আর কিছু নয়, স্বেচ্ছায় ঈমান আনা, হেদায়াতের পথ অবলম্বন করা এবং আল্লাহর পথের ওপর টিকে থাকার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করা। হৃদয় নামক এই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, এর উৎস বা কেন্দ্র কোথায়, শরীরের ভেতরে না বাইরে, তা কেউ জানে না। মানুষের ভেতরে এটি আল্লাহর এক দুর্ভেদ্য রহস্য। এ রহস্যের কুল কিনারা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত বা দায়িত্বকে মানুষ যাতে বহন করতে পারে সে জন্যে তাকে এতগুলো বড় বড় নেয়ামত দান করা হয়েছে। অথচ সে তাঁর জন্যে কৃতজ্ঞ হয় না। এ কথাই আল্লাহ বলেছেন আয়াতের শেষাংশে,

'তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করে থাক।'

এটি এমন একটি ব্যাপার, যা স্মরণ করলে লজ্জিত না হয়ে পারা যায় না। কোরআন এখানে সেই বিষয়টি প্রত্যেক কাফের ও নাফরমান বান্দাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

### সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য

এরপর কোরআন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা যে মানুষকে সৃষ্টি ও এসব মূল্যবান গুণাবলী দ্বারা তাকে ভূষিত করেছেন, সেটা উদ্দেশ্যহীনভাবে বা আকস্মিকভাবে করেননি। বরং এটা একটা নির্বাক পরীক্ষার ক্ষেত্র। মানুষ এখানে যা করবে, আখেরাতে তার প্রতিদান পাবে।

'তুমি বলো, তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে বৃদ্ধি করেছেন এবং তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

'আয্ যারউ' শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি করা। ছড়িয়ে দেয়া বা প্রসার ঘটানোর অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়।

'আল হাশ্‌র' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো জিনিসকে ছড়িয়ে দেয়ার পর আবার একত্র করা।

এই দুটো জিনিস অর্থাৎ 'আয যারউ ও আল হাশরু' সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। প্রথমটি হলো সৃষ্টিকে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা আর দ্বিতীয়টি হলো পৃথিবীর সকল জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে পুনরায় একত্রিত করা। এই দুটি দৃশ্যকে কোরআন নিজস্ব বর্ণনাভংগী অনুসারে একই আয়াতে একত্রিত করেছে, যাতে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার পরও স্মরণ করতে পারে যে, তাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিণতিতে উপনীত হতে হবে এবং একত্রিত হতে হবে। এই পার্থিব জীবনের অপর পারে এবং জীবন ও মৃত্যুর স্তর অতিক্রম করে আরেকটি অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

### দায়ীর কাজ শুধু সতর্ক করে যাওয়া

এরপর আল্লাহ মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় একত্রিত করার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের সন্দেহ ও সংশয়ের উল্লেখ করছেন। তিনি বলছেন,

'তারা বলছে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে?'

এ প্রশ্ন যেমন সত্যিকার সংশয়াপন্ন ব্যক্তিরও হতে পারে, তেমনি একগুয়ে হঠকারী অবিশ্বাসীরও হতে পারে। আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি পূরণের সঠিক সময় নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে জানা যাবে না। আর তার প্রকৃত স্বরূপ কারো জানা নেই। শুধুমাত্র এতটুকুই জানা যায় যে, পার্থিব জীবনের পরীক্ষার পরই এই কর্মফল পাওয়ার দিন নির্ধারিত রয়েছে। এই কর্মফল দিবস আগামীকালই হোক কিংবা লক্ষ লক্ষ বছর পরই হোক, মানব জাতির জন্যে দুটোই সমান। যে জিনিসটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, সেদিনটি একদিন আসবেই, সেদিন সকল মানুষ একত্রিত হবে এবং তারা নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল পাবে।

এজন্যে আল্লাহ তায়ালা তার কোনো সৃষ্টিকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় জানাননি। কেননা তা জেনে তাদের কোন লাভ নেই। উদ্দেশ্য কর্মফল দিবসের আয়োজন। তার সাথে তার সঠিক দিন তারিখ জানার কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি ওই দিনটির সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর অর্পিত হয়েছে, কর্মফল দিবসের সঠিক দিন তারিখ জানলে সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যের কিছুমাত্র বাড়বেও না, লাঘবও হবে না। বরঞ্চ গোটা সৃষ্টিজগতের কাছ থেকে সেই দিনটির সঠিক দিন তারিখ গোপন রাখাই অধিকতর লাভজনক। ওটা শুধুমাত্র আল্লাহর জ্ঞানে সীমিত থাকুক, আর কেউ না জানুক এটাই মংগলজনক। এ কথাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'তুমি বলো যে, প্রকৃত জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি তো শুধু প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কি পার্থক্য, তা এখানে সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সত্ত্বার সাথে কারো সাদৃশ্য নেই এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ একাই নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। আর রসূল ও ফেরেশতাসহ সকল সৃষ্টি নিজ নিজ স্থানে আল্লাহর সুমহান মর্যাদার সামনে বিনয়াবনত। রসূল (স.) নিজেরও যে কেয়ামতের সঠিক সময় কাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, সে কথা মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ীতে উদ্ধৃত একটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল যখন রসূল (স.)-কে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো তখন জবাবে তিনি বললেন,

'যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী অবহিত নয়।'

আর আলোচ্য আয়াতটিতেও বলা হয়েছে যে,

অর্থাৎ 'আমার কাজ ও দায়িত্ব শুধু কেয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করা এবং আমাকে যা জানানো হয় তা প্রচার করা। কেয়ামত কবে হবে সে কথা শুধু আল্লাহ তায়ালাই জানেন, আর কেউ নয়।'

'কেয়ামত যখন সামনে দেখতে পাবে'

সন্দিহান চিত্তে কাফেরদের প্রশ্ন এবং কুরআনে তার অকাট্য জবাব দান থেকে প্রতীয়মান হতো যে, যে দিনটির কথা তারা জিজ্ঞাসা করে তা সমাগত এবং যে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করতো তা একেবারেই আসন্ন হয়ে উঠেছে। যেন তারা একেবারেই তার মুখোমুখী হয়ে পড়েছে। তখন তাদের কি অবস্থা হতো, তা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'যখন তারা সেই প্রতিশ্রুত দিনটিকে একেবারে সামনাসামনি উপস্থিত দেখলো, তখন অবিশ্বাসীদের মুখ মলিন হয়ে গেল এবং বলা হলো যে, এই সেই দিন, যা নিয়ে তোমরা দাবী করতে।'

অর্থাৎ কোনো প্রত্যাশা ও ভূমিকা ছাড়াই তারা সেই দিনটিকে তাদের অতি নিকটে একেবারে সামনে উপস্থিত দেখতে পেল। তাতে তাদের মুখ কালো হয়ে গেল। তাদের মুখে বিব্রতকর ভাব ফুটে উঠলো। তাদেরকে ধিক্কার দেয়া হতে লাগলো এবং বলা হতে লাগলো যে, যে দিন সম্পর্কে তোমরা দাবী করতে যে তা কখনো আসবে না, সেদিনটি তো এসেই গেছে। এখন কি হবে?

এটি আসলে ভবিষ্যতের ঘটনা। ভবিষ্যতের ঘটনাকে এভাবে অতীতের ঘটনা হিসাবে ব্যক্ত করা কুরআনের বহুল প্রচলিত রীতি। এর উদ্দেশ্য হলো, চেতনার জগতে আকস্মিকভাবে একটি জ্বলজ্যান্ত দৃশ্য হাজির করার মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় ও অবিশ্বাসের মোকাবিলা করা। অবিশ্বাসকারী যে জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে এবং সন্দেহকারী যে জিনিসটাকে সন্দেহ করে, ঠিক সেই জিনিসটার দৃশ্যই তার সামনে উপস্থাপন করা হয়।

এটা একটা বাস্তব সত্যকে কল্পনা করারও শামিল। আল্লাহর জানা মতে এ দিনটা তো অবধারিতই। তবে সময়ের যে সীমারেখাটা তার ও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, তা কেবল মানুষের বিচারেই। এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। মূল সত্য আল্লাহর হিসাবে যেমন ছিলো তেমনি রয়েছে। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তিনি যেমন জানেন তেমনি মানুষও এক্ষুণি দেখে নিতে পারতো যে কেয়ামত কেমন জিনিস। মানুষকে এ আয়াতে যেরূপ আকস্মিকভাবে দুনিয়া থেকে আখেরাতের দিকে এবং সন্দেহ সংশয় থেকে চাক্ষুস দর্শনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, যে আল্লাহ কেয়ামতের এরূপ জ্বলজ্যান্ত মানচিত্র দেখাতে পারেন, তিনি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে তার আসল দৃশ্যই দেখিয়ে দিতে পারেন।

**কাফেরদের ভ্রান্ত চিন্তা**

মক্কার মোশরেকরা সব সময় এই বাসনা পোষণ করতো যে, রসূল (স.) এবং তাঁর মোমেন সংগীরা মরে গেলে তাদের হাড় জুড়োয়। এমনকি এ জন্যে তারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণেরও উপদেশ দিত যে, সময়মত তারা মারা যাবে এবং মুহাম্মদের দাওয়াতের দরুণ তাদের ঐক্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তাও জোড়া লেগে যাবে। কখনো কখনো তারা বড় গলা করে এরূপ আস্ফালনও করতো যে, আল্লাহ মোহাম্মদকে ও তার সাথীদেরকে ধ্বংস করবেনই। কারণ তারা তাদের ভাষায় আল্লাহর নামে মিথ্যা রটাচ্ছে এবং তারা বিপথগামী। তাদের এই মানসিকতার প্রেক্ষাপটে এখানে কেয়ামত ও কর্মফলের দৃশ্য তুলে ধরার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই বলে হুশিয়ারী দিচ্ছেন যে, তোমাদের কুৎসিত মনোবাসনাটি যদি পূরণ হবে বলেও ধরে নেয়া যায়, তবু তাতে তোমরা তোমাদের কুফরী ও গোমরাহীর পরিণাম থেকে রক্ষা পাবে না। সুতরাং কর্মফল দিবসের যে অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং যা একেবারেই আসন্ন রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, তা বাস্তবিকপক্ষে সংঘটিত হবার আগেই তোমার আচরণ সঠিক হচ্ছে কিনা একবার ভেবে দেখো

'তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখোছা যে, আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সাথীদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেন, তাহলে অবিশ্বাসীদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?'

এটি এমন প্রশ্ন, যা তাদেরকে তাদের প্রচলিত রীতি-নীতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এটাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কেননা তাদের মনোবাসনা যদি পূর্ণও হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও তার সাহাবাদেরকে ধ্বংস করে দেন, তাতে তাদের কোনো লাভ হবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ যদি তার নবী ও নবীর সহচরদের ওপর দয়া করেন, তবে তাতেও তাদের কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ তায়ালা তো চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি তাদেরকে যেমন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি তাদেরকে একত্রিতও করবেন। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলের বাঁচা বা মরা তার এই শাশ্বত নীতিকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করে না।

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তায়ালা একথা বলেননি,

'কে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?'

আবার তাদেরকেও সরাসরি কাফের বলে উল্লেখ করেননি যে শাস্তি কাফেরদের প্রাপ্য। সেই শাস্তির ব্যাপারে তাদেরকে শুধু ইংগিত দিলেন।

‘কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?’

বস্তুত এটা একটা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিচক্ষণ কৌশল। একদিকে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, অপর দিকে তাদেরকে তাদের বর্তমান নীতি থেকে ফিরে আসার সুযোগও করা হতো এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তাদের নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই বলা হতো, তাহলে হয়তো তারা গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতা দেখাতো এবং প্রত্যক্ষ অভিযোগ ও হুমকির মুখে পাপাচারের মধ্যেই তারা আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদা বোধ করতো।

বস্তুত, ক্ষেত্র বিশেষে ইংগিতমূলক বাচনভংগী স্পষ্ট বাচনভংগীর চেয়ে মনের ওপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

**মোমেনের বিশ্বাস ও ভরসা**

মোমেনদের ওপর দয়াই করা হোক কিংবা তাদেরকে কোনো শাস্তি দেয়া হোক, উক্ত উভয় অবস্থাই সমান। এ কথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন। মোমেনরা তাদের প্রতিপালকের ওপর কতোটা আস্থাশীল এবং নিজেদের সঠিক পথে থাকা ও মোমেনগণের ব্যাপারে কত প্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী এবং কাফেররাই যে বিভ্রান্ত, সে সম্পর্কে কত অবিচল বিশ্বাস পোষণ করে, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

এখানে ‘দয়াবান’ শব্দটির উল্লেখ দ্বারা রসূল ও তার সহচরদের প্রতি আল্লাহর বিরাট ও সুগভীর দয়া ও করুণার প্রতি ইংগিত করাই উদ্দেশ্য। বস্তুত কাফেরদের কামনা বাসনা অনুযায়ী আল্লাহ মোমেনদেরকে কখনো ধ্বংস করবেন না। এ আয়াতে আল্লাহ স্বীয় নবীকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, দয়াবান আল্লাহর সাথে যে গুণ দ্বারা তোমরা সম্পর্ক গড়ে তুলেছো, তা ব্যক্ত করো। প্রথম গুণ হচ্ছে ঈমান এবং দ্বিতীয় গুণ হলো তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ও আস্থা। এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নবী (স.) এবং মোমেনদের মাঝে যেমন, তেমনি নবী (স.) ও আল্লাহর মাঝেও এই একই ঈমানী সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এই সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বলার অর্থ প্রকারান্তরে এ কথা বলা যে, কাফেরদের কথায় তুমি ভয় পেয়ো না। কেননা তুমি ও তোমার সংগীরা আমার সাথে সম্পর্কিত। আর এই মহান মর্যাদা ও মহৎ সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার জন্যে তোমাকে অনুমিত দেয়া হলো। তুমি ঘোষণা দাও, এটা আল্লাহর পথ থেকে পরম সম্মান ও সম্প্রীতির নিদর্শন।

এরপরই রয়েছে সেই প্রচ্ছন্ন হুমকি।

‘অচিরেই জানতে পারবে কে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত।’

এটাও একটি চমকপ্রদ বাকরীতি, যা কাফেরদের অব্যাহত অস্বীকৃতি হঠকারিতায় ছেদ আনতে সক্ষম। এতে কাফেরদের প্রচলিত আকীদা বিশ্বাস ও আচরণ পুনর্বিবেচনা করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। তারাই গোমরাহ এবং এ আয়াতে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য বলে সাব্যস্ত হয় কিনা, সেই শংকা তাদের মনে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আবার এর পাশাপাশি তাদেরকে সরাসরি গোমরাহ বলা থেকে বিরত থাকা হয়েছে, যাতে তারা অন্যায় জিদ ও হঠকারিতার শিকার না হয়। এটা ইসলামের দাওয়াতের একটি বিশেষ কৌশল, যা স্থান কাল ও পাত্র ভেদে মানানসই ও কার্যকর।

সবার শেষে সুরার সর্বশেষ কার্যকর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, যাতে আখেরাতের আযাবের আগে দুনিয়াতেই আযাবের সম্ভাবনার ইংগিত দেয়া হয়েছে। জীবন যাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পানি থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে এই আযাব নাযিল করা যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে নবী, তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের পানি যদি ভুগর্ভে উধাও হয়ে যায় তাহলে তোমাদের কাছে কে আনবে প্রবহমান পানি?'

'আল- গাউরু' অর্থ ভূগর্ভে এমন নিখোঁজ হয়ে যাওয়া জিনিস যা মানুষের আওতার বাইরে চলে যায়। আল- মা-ঈনু অর্থ প্রবহমান ঝর্ণা। এটি তাদের জীবনের একটি অতি ঘনিষ্ঠ ও অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। এ উপকরণ থেকে তারা কখনো বঞ্চিত হতে পারে এটা তাদের কাছে ছিলো অকল্পনীয় এবং এতে তারা সন্দেহ পোষণ করতো। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র ক্ষমতা যার হাতে এবং যিনি সর্বশক্তিমান তিনি যদি তাদের জীবনের এই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জিনিসটি ছিনিয়ে নেন, তাহলে তাদের উপায় কি হবে? আল্লাহ এই সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের চিন্তা ভাবনা করার আহবান জানাচ্ছেন।

এভাবে এই সুরাটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুরাটি মানুষের চেতনায় ও বিবেকে মুহুর্মুহু করাঘাতকারী বক্তব্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের পর্যবেক্ষণ ও পরিভ্রমণ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় প্রতিটি আয়াতেই রয়েছে মন-মগযের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বিশেষ বক্তব্য। প্রায় প্রতিটি আয়াতেই রয়েছে মহাবিশ্বের বিভিন্ন অচেনা জগতে অথবা পরিচিত হয়েও উপেক্ষিত এমন জগতে বিচরণের আহবান।

আকৃতি আয়তন ও আয়াত সংখ্যার দিক দিয়ে সুরাটি যতো বড় আলোচ্য বিষয় ও বক্তব্যর দিক থেকে তা তার চেয়ে অনেক বড়। এর আয়াত গুলো যেন এক একটা নতুন জগত আবিস্কার করতে উদ্যত।

এ সুরা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি গঠন করে। মানুষের মনমগজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তার সর্ব শক্তিমান হওয়া, কেয়ামত ও কর্মফলের প্রস্তুতি হিসাবে জীবন ও মৃত্যু দ্বারা পরীক্ষা করার তত্ত্ব আল্লাহর সৃষ্টিতে সৌন্দর্য সুষমা ও পুর্ণতার ছাপ, গোপন ও প্রকাশ্য সকল জিনিস সম্পর্কে আল্লাহর নিরংকুশ ও সর্বাত্মক জ্ঞান, আল্লাহর কাছে জীবিকার উৎস, সকল সৃষ্টিকে একমাত্র আল্লাহই নিরন্তর প্রহরা দান তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করেন। তিনি সর্বত্র সকল সময় প্রতিটি সৃষ্টির সাথে আছেন। ইত্যাকার যাবতীয় বিশয় এই সুরায় স্থান পেয়েছে যার ওপর প্রত্যেকে মুসলমানদের স্বীয় প্রতিপালন সংক্রান্ত ধারণা বিশ্বাস এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক ও ধ্যান ধারণা নির্ভরশীল।

এ ধ্যান ধারণা ও আকিদা বিশ্বাস থেকেই মোমেনের গোটা জীবন পরিচালনার নিয়ম বিধি উৎসারিত– চাই তা আল্লাহর সাথে, সমাজের সাথে কিংবা গোটা জীব জগতের সাথে সম্পর্ক ভিত্তিক হোক অথবা তার ব্যাক্তিগত ভালো মন্দ ভিত্তিক হোক। একমাত্র এই আল্লাহর জীবন বিধানের সাথেই মানুষ তার চিন্তা চেতনা ব্যক্তিত্ব মুল্যবোধ ও জীবনের সামগ্রিক বিচার বিবেচনাকে সুসমন্বিত ও সংগতিশীল করতে সক্ষম।

# সূরা আল ক্বালাম

আয়াত ৫২ রুকু ২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٣

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. নূ-ন-, শপথ (লেখার মাধ্যম) কলমের, (আরো শপথ এ কলম দিয়ে) তারা যা লিখে রাখছে তার, ২. তোমার মালিকের (অসীম) দয়ায় তুমি পাগল নও, ৩. তোমার জন্যে অবশ্যই এমন এক পুরস্কার রয়েছে যা কোনোদিনই নিশেষ হবে না, ৪. নিসন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) রয়েছো। ৫. (সেদিন খুব দূরে নয় যখন) তুমি ও (তোমাকে যারা পাগল বলে) তারা সবাই দেখতে পাবে যে, ৬. তোমাদের মধ্যে (আসলে) কে বিকারগ্রস্ত (পাগল) ছিলো! ৭. তোমার মালিক ভালো করেই জানেন (তোমাদের মধ্যে) কোন্ ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, (আবার) যারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ৮. অতএব তুমি এ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অনুসরণ করো না। ৯. তারা (তো তোমার এ নমনীয়তাটুকুই) চায় যে, তুমি (তাদের কিছু) গ্রহণ করো! অতপর তারাও (তোমার কিছু) গ্রহণ করবে। ১০. যারা বেশী বেশী কসম করে (পদে পদে) লাঞ্ছিত হয়, এমন লোকদের তুমি কখনো অনুসরণ করো না, ১১. যে (বেহুদা) গালমন্দ করে, (খামাখা মানুষদের) অভিশাপ দেয় এবং চোগলখোরী করে বেড়ায়, ১২. যে ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে, (অন্যায়ভাবে) সীমালংঘন করে, (সর্বোপরি) যে পাপিষ্ঠ, ১৩. যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী, এরপর যে (জন্ম পরিচয়ের দিক থেকেও) জারজ,

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾ إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ أَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوْا إِنَّا لَضَالُّوْنَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ

১৪. যেহেতু সে (বিপুল) ধনরাশি ও (অনেকগুলো) সন্তান সন্ততির অধিকারী; ১৫. এ লোককে যখন আমার 'আয়াতসমূহ' পড়ে শোনানো হয় তখন সে বলে, এগুলো তো হচ্ছে আগের দিনের গল্প কাহিনী মাত্র! ১৬. (এ অহংকারী ব্যক্তিটিকে তুমি জানিয়ে রাখো,) অচিরেই আমি তার শুড়ে দাগ দিয়ে (তাকে চিহ্নিত করে) দেবো। ১৭. অবশ্যই আমি এ (জনপদের) মানুষদের পরীক্ষা করেছি, যেমনি (অতীতে) আমি একটি ফলের বাগানের কতিপয় মালিককে পরীক্ষা করেছিলাম, (সে পরীক্ষাটা ছিলো এমন যে, একদিন) তারা সবাই (একযোগে) শপথ করে বলেছিলো, অবশ্যই তারা সকাল বেলায় গিয়ে (বাগানের) ফল পাড়বে, ১৮. (এ সময়) তারা (আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্বলিত) কিছুই (এর সাথে) যোগ করেনি। ১৯. তখন (ভোর হতে না হতেই) তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তার ওপর এক বিপর্যয় এসে পড়লো, (তখনো) তারা ছিলো গভীর ঘুমে (বিভোর)। ২০. অতপর সকাল বেলায় তা মধ্যরাতের কৃষ্ণ বর্ণের মতো কালো হয়ে গেলো। ২১. (এদিকে) সকাল হতেই তারা (এই বলে) একে অপরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো, ২২. তোমরা যদি (সত্যিই) ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল নিজেদের বাগানের দিকে চলো। ২৩. (অতপর) তারা সেদিকে রওনা দিলো, (পথের মধ্যে) ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, ২৪. কোনো অবস্থায়ই যেন আজ কোনো (দুস্থ ও) মেসকীন ব্যক্তি তোমাদের ওপর (টেক্কা) দিয়ে বাগানে এসে প্রবেশ করতে না পারে, ২৫. তারা সকাল বেলায় সংকল্পবদ্ধ হয়ে এসে হাযির হলো, (যেন) তারা নিজেরাই (আজ সব ফসল তুলতে) সক্ষম হয়। ২৬. অতপর যখন তারা সে (বাগানের) দিকে তাকিয়ে দেখলো, তখন (হতভম্ব হয়ে) বলতে লাগলো (একি! এটা তো আমাদের বাগান নয়), আমরা নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট (হয়ে পড়েছি), ২৭. (না, আসলেই) আমরা (আজ) মাহরূম হয়ে

مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا

গেছি! ২৮. (এ মুহূর্তে) তাদের মধ্যকার একজন ভালো মানুষ (তাদের) বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি (সব কাজের ব্যাপারে আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে), কতো ভালো হতো যদি তোমরা (আগেই আল্লাহ তায়ালার মহান নামের) 'তাসবীহ' পড়ে নিতে! ২৯. (এবার নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে) তারা বললো, (সত্যিই) আমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা অনেক মহান, অনেক পবিত্র, (তাঁর নাম না নিয়ে) আমরা (আসলেই) যালেম হয়ে পড়েছিলাম। ৩০. (এভাবে) তারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করে একে অপরের ওপর দোষারোপ করতে লাগলো। ৩১. তারা (আরো) বললো, দুর্ভাগ্য আমাদের, (মূলত) আমরা তো সীমালংঘনকারী (হয়ে পড়েছি)। ৩২. আশা করা যায় আমাদের মালিক (পার্থিব জিনিসের) বদলে (আখেরাতে) এর চাইতে উৎকৃষ্ট (কিছু আমাদের) দান করবেন, আমরা আমাদের মালিকের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। ৩৩. আযাব এভাবেই (নাযিল) হয়, আর পরকালের আযাব, তা তো অনেক গুরুতর। কতো ভালো হতো যদি তারা তা জানতে পেতো!

## রুকু ২

৩৪. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলে তাদের জন্যে অবশ্যই তাদের মালিকের কাছে (অফুরন্ত) নেয়ামতে ভরপুর জান্নাত রয়েছে। ৩৫. যারা আমার আনুগত্য করে তাদের সাথে আমি কি অপরাধীদের মতো (একই ধরনের) আচরণ করবো? ৩৬. এ কি হলো তোমাদের। (আমার ইনসাফ সম্পর্কে) এ কি সিদ্ধান্ত তোমরা করছো? ৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোনো আসমানী কেতাব আছে যাতে তোমরা (এ কথাটা) পড়েছো যে, ৩৮. সেখানে তোমাদের জন্যে সে ধরনের সব কিছুই সরবরাহ করা হবে, যা তোমরা তোমাদের জন্যে পছন্দ করবে, ৩৯. না আমি তোমাদের সাথে কোনো চুক্তিতে

بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

স্বাক্ষর করেছি– এমন চুক্তি, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানা বাধ্যতামূলক হবে, এর মাধ্যমে তোমরা যা কিছু দাবী করো তাই তোমরা পাবে, ৪০. তুমি এদের জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে কে এ দায়িত্ব নিতে পারে, ৪১. (নিজেরা না পারলে) তাদের কি (অন্য কোনো) অংশীদার আছে? যদি তারা সত্যবাদী হয় তাহলে তারা তাদের অংশীদারদের সবাইকে নিয়ে আসুক! ৪২. (স্মরণ করো,) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে, তখন তাদের সাজদাবনত হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, এসব (হতভাগ্য) ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সাজদা করতে) সক্ষম হবে না, ৪৩. দৃষ্টি তাদের নিম্নগামী হবে, অপমান তাদের ভারাক্রান্ত করে রাখবে; (দুনিয়ায় এমনি করে) যখন তাদের আল্লাহর সম্মুখে সাজদা করতে ডাকা হয়েছিলো, (তখন) তারা সুস্থ (ও সক্ষম) ছিলো। ৪৪. (হে নবী,) অতপর তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, যে আমার এ কেতাব অস্বীকার করে (তার থেকে আমি প্রতিশোধ নেবো), আমি ধীরে ধীরে এদের (এমন ধ্বংসের) দিকে ঠেলে নিয়ে যাবো যে, এরা তার কিছুই টের পাবে না, ৪৫. আমি এদের অবকাশ দিয়ে রাখি, (অপরাধীদের ধরার) আমার এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকর। ৪৬. তুমি কি এদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, এরা তার দন্ডভারে একেবারে অচল হয়ে পড়েছে? ৪৭. না তাদের কাছে অজানা জগতের কোনো খবর রয়েছে যা তারা লিখে রাখে! ৪৮. (হে নবী,) তুমি (বরং) তোমার মালিকের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আসার জন্যে ধৈর্য ধারণ করো এবং (এ ব্যাপারে) মাছের ঘটনার সাথী (নবী ইউনুস)-এর মতো হয়ো না। যখন সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ডেকেছিলো;

لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৪৯. তখন যদি তার মালিকের অনুগ্রহ তার ওপর না থাকতো, তাহলে সে উন্মুক্ত সাগরের তীরে পড়ে থাকতো এবং (এজন্যে) সে নিজেই দায়ী হতো। ৫০. অতপর তার মালিক তাকে বাছাই করলেন এবং তিনি তাকে (তাঁর) নেক বান্দাদের (কাতারে) শামিল করে নিলেন। ৫১. কাফেররা যখন আল্লাহর কেতাব শোনে তখন এমনভাবে তাকায় যে, এক্ষুণি বুঝি এরা নিজেদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ঘায়েল করে দেবে, তারা একথাও বলে, সে (কেতাবের বাহক) একজন পাগল। ৫২. অথচ (এরা জানে না,) এ কেতাব তো মানবমন্ডলীর জন্যে একটি উপদেশ বৈ কিছুই নয়!

## সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সূরাটির নাযিল হওয়ার সঠিক সময় নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। সূরার প্রথমাংশেরও নয়, পুরো সূরারও নয়। সূরার প্রথমাংশটিই যে প্রথমে এবং শেষ অংশ যে শেষে নাযিল হয়েছে, এটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। এমনকি এই শেষোক্ত ধারণা অগ্রগণ্য কিনা তাও নির্ধারণ করার উপায় নেই। কেননা সূরার প্রথমাংশ ও শেষাংশের আলোচ্য বিষয় একই রকম।

বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর রসূলের ওপর কাফেরদের আক্রমণাত্মক ও মারমুখো হয়ে ওঠা এবং তাঁকে পাগল বা ভুতে ধরা ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতে থাকা। বেশ কিছু বর্ণনায় এটিকে সূরা 'আলাক'-এর পর নাযিল হওয়া দ্বিতীয় সূরা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সংকলনে যে এই সূরাটি দ্বিতীয় সূরা হিসাবে সংকলিত হয়েছিলো, সে ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু সূরার পূর্বাপর বক্তব্য, আলোচ্য বিষয় ও বাচনভংগী আমাদেরকে এই মত পোষণে বাধ্য করে যে, এটি সূরা 'আলাক্বের' অব্যবহিত পরে নাযিল হওয়া সূরা তো নয়ই; বরং খুব সম্ভবত সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াতের সূচনা হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে এটি নাযিল হয়েছিলো।

ইসলামের এই সার্বিক দাওয়াতের সূচনা হয়েছিলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের দাওয়াত চালু হওয়ার প্রায় তিন বছর পর। এই সূরা নাযিল হওয়ার সময়ে কোরায়শরা ইসলামী দাওয়াতকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছিলো এবং তার বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছিলো। এ জন্যে তারা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে সেই জঘন্য উক্তিও করতে পেরেছিলো যে, 'তুমি একটা পাগল' (নাউযুবিল্লাহ!) আর কোরআনও এ উক্তি খন্ডন ও তার প্রতিবাদ করা এবং ইসলাম বিরোধীদেরকে হুমকিও দিতে শুরু করেছিলো। এই সূরায় সেই হুমকি বর্ণিত হয়েছে।

এরূপ ধারণাও প্রচলিত আছে যে, সূরাটির প্রথমাংশ হয়তো সূরা 'আলাক্বের' প্রথমাংশের পরে নাযিল হয়েছিলো এবং এ সূরার শুরুতে যে বলা হয়েছে,

'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও'– তা হয়তো রসূল (স.)-এর নিজের ভীতি দূর করার জন্যেই বলা হয়েছে। কেননা ওহীর প্রথম দিকে তিনি নিজের সম্পর্কেই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মাথায় কোনো গোলমাল হয়ে গেলো কিনা এবং ওহী তারই কোনো উপসর্গ কিনা। কিন্তু এই ধারণাটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা রসূল (স.)-এতদূর ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বা এতখানি শংকিত হয়ে পড়েছিলেন, এর সপক্ষে কোনো প্রামাণ্য বর্ণনা নেই।

তাছাড়া সূরার নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা সাক্ষ্য দেয় যে, 'তুমি পাগল নও' এ উক্তিটি সূরার শেষাংশের এই উক্তির সাথে মিল রয়েছে,

'কাফেররা কোরআন শোনার পর তাদের চোখ দিয়েই তোমাকে পদস্খলিত করে দিতে চায় এবং বলে যে, সে তো পাগল।'

বস্তুত এ অপবাদটিকে সূরার শুরুতেই খন্ডন করা হয়েছে। আগাগোড়া সুসমন্বিত বক্তব্য সম্মিলিত এ সূরাটি পড়লে মনে প্রাথমিকভাবে এমন একটি ধারণাই সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ সূরায় কিছু মাদানী আয়াত রয়েছে। এই মতানুসারে ১৭শ আয়াত থেকে ৩৩তম আয়াত এবং ৪২তম আয়াত থেকে ৫০তম আয়াতগুলো মাদানী। প্রথমাংশ বাগানের মালিকদের ও তাদের ওপর আপতিত দুর্যোগ সংক্রান্ত। আর দ্বিতীয়াংশ মাছের পেটে প্রবিষ্ট হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা সম্বলিত। আমাদের মতে এ মতটিও সঠিক নয়। আমাদের মতে গোটা সূরাই মক্কী। কেননা উল্লিখিত আয়াতগুলোর বক্তব্যে মক্কী ভাবধারার সুগভীর ছাপ বিদ্যমান। সূরাটির আগাগোড়া বক্তব্য যেহেতু মক্কী, তাই আয়াতগুলোকে সূরার আলোচ্য বিষয় ও আলোচিত সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে বিবেচনা করাই অধিকতর সমীচীন।

সামগ্রিক বিবেচনায় আমরা এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি যে, সূরাটি নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় সূরা নয় বরং এটি নবুওত লাভের বেশ কিছুকাল পর সাধারণ দাওয়াতের সূচনা হওয়ার পর নাযিল হয়েছে। কারণ প্রথমত এর আগেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো যে, 'তোমার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক করো।'

দ্বিতীয়ত, অতীত জাতিসমূহের কাহিনীসমূহ বর্ণিত হয়েছে এমন বেশ কিছু সূরা ও আয়াত এর আগেই নাযিল হয়েছিলো। আর সে জন্যে কাফেরদের কেউ কেউ ওগুলোকে 'প্রাচীনকালের উপাখ্যান' বলে আখ্যায়িত করেছিলো।

তৃতীয়ত, কোরায়শকে গোষ্ঠীগতভাবে ও সার্বিকভাবে ইসলাম গ্রহণের আহবান ইতিপূর্বেই জানানো হয়েছিলো। আর কোরায়শ এ দাওয়াতকে মিথ্যা অপবাদ ও সর্বাত্মক আগ্রাসী আক্রমণ দ্বারা রুখতে চেয়েছিলো। এর প্রতিক্রিয়ায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যে তীব্র নিন্দাবাদ ও সমালোচনা এই সূরায় ধ্বনিত হয়েছে এবং সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে প্রচন্ড হুমকি উচ্চারিত হয়েছে, তা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, এ সূরা ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক যুগে নয়; বরং কঠিন প্রতিরোধ ও চরম শত্রুতার যুগে নাযিল হয়েছিলো।

চতুর্থত, এ সূরার সর্বশেষ দৃশ্যও আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। শেষের দিকের এ আয়াতটি লক্ষণীয়,

'কাফেররা স্মরণিকা (কোরআন) শ্রবনের পর তাদের চোখ দিয়েই তোমাকে পদস্খলিত করে দিতে উদ্যত হয় এবং বলে যে, সে তো একটা আস্ত পাগল।'

এই আয়াতটি এমন একটি পরিস্থিতির দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরে, যখন বড় বড় জনসমাবেশে ব্যাপকভাবে আগে থেকেই দাওয়াত দেয়া চালু হয়ে গিয়েছিলো। মক্কার কাফেররা প্রকাশ্য সমাবেশে কোরআন শুনতো, তারপর ক্রোধে অধীর হয়ে চোখ পাকাতো এবং রসূল (স.)-কে পাগল বলতো। দাওয়াতের সূচনা কালে এ পরিস্থিতি ছিলো না। তখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রচার চলতো, ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিকে গোপনে দাওয়াত দেয়া হতো। কাফেরদের প্রকাশ্য সমাবেশে দাওয়াত দেয়া হতো না। এ ধরনের দাওয়াতের কাজ বিশ্বস্ত সূত্র মতে দাওয়াতের সূচনার তিন বছর পর চালু হয়।

পঞ্চমত, এই সূরায় এমন কিছু আভাস ইংগিতও রয়েছে, যা দ্বারা মনে হয় যে, তখন মোশরেকরা রসূল (স.)-কে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে কিছু আপোস রফার প্রস্তাব দিয়েছিলো, যেন তিনি মাঝপথে স্বীয় কাজে বিরতি দেন। সূরার এক আয়াতে বলা হয়েছে,

'তারা চায় তুমি কিছু নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হয়।'

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত চলাকালে হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য, কেননা তখন তাতে তাদের কোনো ক্ষতির আশংকা ছিলো না। প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হওয়ার পরই মোশরেকদের শংকা বোধ করার কথা ছিলো এবং এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার সম্ভাবনা ছিলো।

এ সব যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে বলা যায় যে, এ সূরা ইসলামী দাওয়াতের সূচনাকালে নয় তারও বেশ কিছুদিন পরে নাযিল হয়ে থাকবে। মনে হয় দাওয়াতের সূচনা এবং এই সূরা নাযিলের মাঝখানে তিন বছরের কম তো নয়ই বরং বেশী সময়ও কেটে যেয়ে থাকতে পারে। আর এ কথাও বোধগম্য মনে হয় না যে, তিন বছরে কোরআনের মোটেই কোনো আয়াত বা সূরা নাযিল হয়নি। বরং এ সময়ে বহুসংখ্যক সূরা এবং বহু সংখ্যক আয়াত নাযিল হয়ে থাকতে পারে, যাতে হয়তো অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে এই সূরার মতো কোনো আক্রমণাত্মক সমালোচনা করা হয়নি, কেবল সাদামাটাভাবে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসই প্রচারিত হয়েছে।

তাই বলে এসব যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এই সূরা এবং সূরা মোয্যাম্মেল ও সূরা মোদ্দাসসের দাওয়াতের প্রাথমিক যুগের সূরাই নয়, যদিও তা একেবারে প্রাথমিক ওহী নয়। প্রাথমিক ওহী না হওয়ার কারণগুলো আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। সে কারণগুলো সূরা আল মোয্যাম্মেল ও মোদ্দাসসেরের বেলায়ও প্রযোজ্য।

এখানে প্রসংগত এ কথাটাও উল্লেখ করা দরকার যে, আরব ভূমিতে যখন ইসলামের চারাগাছটি প্রথম লাগানো হয় তখন শুধু আরব উপদ্বীপে নয়; বরং সমগ্র পৃথিবীতে বিরাজমান জাহেলিয়াতের কাছে তা একেবারেই অচেনা মনে হয়েছিলো। এরূপ মনে হওয়ার কিছু কারণও ছিলো। আরবে জাহেলিয়াত নিজেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারী হবার দাবী করতো। এটা ছিলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শের সুস্পষ্ট বিকৃতি। কোরায়শী পৌত্তলিকরা তাদের এই ধর্মীয় ভন্ডামীকে রকমারি মিথ্যা ও মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনীর আড়ালে লুকিয়ে রাখতো। তাদের সমাজে বহু সংখ্যক হাস্যকর আকীদা-বিশ্বাস, রসম-রেওয়ায ও পূজা উপাসনা চালু ছিলো।

রসূল (স.) তাদের কাছে যে ধর্ম পেশ করলেন, তা মৌলিক নীতিমালা ও আদর্শের দিক দিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মূল ধর্মের সাথে শুধু যে সামঞ্জস্যশীল ছিলো তাই নয়, বরং তা এতো নিখুঁত, নির্ভেজাল, স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও সহজ, সরল এবং এতো পূর্ণাংগ ছিলো যে, বিশ্ব মানবতার সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বিধান হবার যোগ্য প্রমাণিত হয়েছিলো। ইবরাহীমী (আ.) দ্বীনের নামে পৌত্তলিক কোরায়শদের ভন্ডামীর সাথে এই সত্যিকার ইসলামী ও ইবরাহীমী আদর্শের ব্যবধান এতো বেশী ছিলো যে, প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে উত্তরণ ছিলো এক বিরাট ও সর্বাত্মক পরিবর্তনের শামিল। কোরায়শরা এটা মেনে নিতে ও বরদাশত করতে রাজী ছিলো না।

কোরায়শ পৌত্তলিকরা এক আল্লাহর পরিবর্তে শত শত উপাস্য মানতো। ফেরেশতা, জ্বিন ও তাদের আত্মার প্রতিমূর্তির পূজা করতো। কোরআন তাদের সামনে পেশ করলো এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর সত্তাকে, তাঁর শক্তিমত্তা ও আর সকল সৃষ্টির সাথে তার ইচ্ছাকে অপরিহার্য শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করলো। পৌত্তলিকদের উক্ত আচরণটির সাথে কোরআনের এই দাওয়াতের ব্যবধান এতো দুস্তর ছিলো যে, প্রথমটি পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করা তাদের কাছে ছিলো কল্পনারও অতীত।

একদিকে ছিলো আরব উপদ্বীপের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় পুরোহিত সম্প্রদায়, কা'বার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অভিজাত গোত্রীয় সরদাররা এবং তাদের চেয়ে নিচু জাত বলে বিবেচিত সাধারণ আরববাসী। আর অপরদিকে ছিলো কোরআন প্রবর্তিত সরলতা, আল্লাহর চোখে সকল মানুষের সমতা এবং কোনো পুরোহিত ইত্যাদি ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের তত্ত্ব। এই দু'য়ের মাঝেও ছিলো দুস্তর ব্যবধান, যা অতিক্রম করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না।

তৎকালে জাহেলী সমাজে যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রচলিত ছিলো, তার সাথেও কোরআন বর্ণিত ও রসূল (স.)-এর পেশ করা নৈতিকতার সাথে দুস্তর ব্যবধান ছিলো। শুধুমাত্র এই ব্যবধান নতুন মতাদর্শের সাথে কোরায়শ, তাদের চিন্তাধারা ও চরিত্রের সংঘাত বেধে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। অথচ সেখানে শুধুমাত্র এই ব্যবধানই ছিলো না বরং এর পাশাপাশি আরো অনেক সামাজিক ধ্যান ধারণা ও চিন্তাধারা এমন ছিলো, যা কোরায়শ নেতাদের কাছে হয়তো তাদের ধর্মের চেয়েও অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

সামাজিক উঁচু নিচু ও আভিজাত্যবোধ তথা কৌলিন্য প্রথা এতো প্রবল ছিলো যে, কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক এর প্রভাবে একজন বলে বসেছিলো, 'এই কোরআন দুই শহরের কোনো প্রধান ব্যক্তির কাছে নাযিল হলো না কেন?' দুই শহর বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কা ও তায়েফকে। রসূল (স.)-এর উচ্চ বংশীয় মর্যাদা থাকা সত্তেও নবুওতের পূর্বে তিনি তেমন কোনো সমাজপতি বা গোত্রপতি ছিলেন না। মক্কার কোরায়শ বংশ ও তায়েফের সাকীফ বংশে গোত্রপতির মর্যাদা ছিলো সব কিছুর উর্ধে। তাই সেসব সরদার ও মোড়লদের পক্ষে মোহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্য মেনে নেয়া সহজ ছিলো না।

গোত্রীয় বা পারিবারিক আভিজাত্যবোধও এমন এক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, যা আবু জেহেলের মতো ব্যক্তিকে সত্য বাণীকে শুধুমাত্র এই বিবেচনায় প্রত্যাখ্যান করতে প্ররোচিত করেছিলো যে, নবী (স.) বনু আব্দে মানাফ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ সংক্রান্ত ঘটনাটি এই যে, একবার আবু সুফিয়ান, আখনাস বিন শুরাইয়া ও আবু জেহেল বিন হারব কোরায়শের এই তিন দিকপাল রসূল (স.)-এর কোরআন তেলাওয়াত শোনার আগ্রহ কোনোভাবেই দমন করতে না পেরে একদিন গভীর রাতে বেরিয়ে পড়লো। তার রসূল (স.)-এর বাড়ীর পাশে এক গোপন

জায়গায় বসে সারা রাত কোরআন শুনলো। এভাবে পর পর তিন রাত তারা শুনলো। প্রতি রাতেই তারা পরস্পরে অংগীকারবদ্ধ হতো যে, তারা এখানে আর আসবে না। কারণ কেউ দেখে ফেললে তাদের সম্পর্কে কোনো বিরূপ ধারণা পোষণ করতে পারে।

পরে আখনাস বিন শুরাইক আবু জেহেলের কাছে জিজ্ঞাসা করলো যে, মোহাম্মাদের কোরআন আবৃত্তি শোনার পর তোমার মনোভাব কি? সে বললো,

'কি আর শুনবো? আসল কথা হলো, বনু আবদে মানাফের সাথে আমাদের চিরকাল একটা প্রতিদ্বন্দিতা ছিলো। তারা মানুষকে খাইয়েছে, আমরা খাইয়েছি। তারা সামাজিক দায়দায়িত্ব বহন করেছে, আমরাও করেছি। তারা ছদকা করেছে, আমরাও করেছি। এমনকি আমরা যখন পাশাপাশি দুই ঘোড়ার মতো ছুটেছি, তখন তারা হঠাৎ দাবী করে বসলো যে, আমাদের ভেতরে একজন নবী আছে, তার কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে। এমন কৃতিত্ব আমরা কবে দেখাতে পারবো? আল্লাহর কসম, আমরা কখনো তার প্রতি ঈমান আনবো না এবং তাকে স্বীকার করবো না।'

এই সব জাহেলী গোষ্ঠী বিদ্বেষ ও উগ্র জাত্যাভিমান ছাড়াও আরো কিছু বিচার বিবেচনা আরব সমাজে এমনও ছিলো, যার কারণে কোরায়শরা ইসলামের নব উদগত চারা গাছটিকে উপড়ে ফেলতে চাইছিলো। এই সব বিচার বিবেচনার কোনো নৈতিক বা মানবিক মূল্যবোধের সাথে নয় বরং শুধু জাহেলী চিন্তাচেতনা থেকে উদ্ভুত ব্যক্তিগত শ্রেণীগত বা গোত্রীয় স্বার্থপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। ইসলামের চারা গাছটির শেকড় মজবুত হওয়া ও শাখা প্রশাখা বিস্তারের আগেই তারা তাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলো, কেননা পরে হয়তো এ কাজ করা দুরূহ হয়ে যাবে।

বিশেষত যখন ইসলাম ব্যক্তিগত দাওয়াতের যুগ পেরিয়ে সামষ্টিক দাওয়াতের যুগে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকে (স.) প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। ফলে দাওয়াতের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। কোরআন জাহেলিয়াতের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করেছে এবং শেরেকী আকীদা বিশ্বাস ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে দিয়েছে, তখন হয়তো পরে আর কখনো এ সুযোগ আসবেই না।

রসূল (স.) যদিও একজন নবী ছিলেন, স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে ওহী লাভ করতেন এবং আল্লাহর ঊর্ধতন ও ঘনিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি তো মানুষই ছিলেন। মানবীয় আবেগ উত্তেজনা তাকে মাঝে মাঝে বিব্রত করতো। মোশরেকরা তার বিরুদ্ধে যে সহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো এবং যে যুদ্ধ তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো, তা তাকে ও তার মুষ্টিমেয় মোমেন সাহাবাদেরকে জর্জরিত ও অস্থির করে তুলেছিলো। মোশরেকরা রসূল (স.)-কে যে সব আজেবাজে কথা বলে কটাক্ষ করতো 'পাগল' বলাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আর এ ছাড়াও আরো অনেক বিদ্রুপের বানে স্বয়ং রসূল (স.)-কে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে বিদ্ধ করতো—এ সবই তাদেরকে শুনতে হতো। এ সব বিদ্রুপ ও মশকরা কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সাহাবীদের অনেকে নিজের ঘনিষ্টজনদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের দৈহিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হতো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস-কটাক্ষ প্রত্যেক মানুষকেই যতখানি ব্যথিত ও মর্মাহত করে, ততখানি আর কোনটাই করে না। এমনকি তার শিকার যদি খোদ রসূলও হন, তবে তিনিও এর ব্যতিক্রম নন।

এ কারণেই আমরা আমপারার সূরাগুলো সহ সকল মক্কী সূরায় দেখতে পাই যে, আল্লাহ তায়ালা যেন রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরকে কোলে নিয়ে আদর করছেন, তাদেরকে সান্ত্বনা ও

প্রবোধ দিচ্ছেন, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন, তাদের প্রশংসা করছেন। ইসলামী দাওয়াতে ও রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বে ইসলামের যে চারিত্রিক মহত্ব ফুটে উঠেছে তা প্রকাশ করছেন। মোশরেকরা তাদের বিরুদ্ধে যেসব মনগড়া কথা বলে, তা খন্ডন করছেন এবং এই বলে দুর্বল মুসলিমদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে,

'তোমাদের শত্রুরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাদের নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিও না। তোমাদের পক্ষে আমিই তাদের সাথে লড়বো।'

সূরা আল-কালামের শুরু থেকেই আমরা রসূল (স.) সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তা উচ্চারিত হতে দেখি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কলমের শপথ এবং লোকেরা যা লেখে তার শপথ, তুমি স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও। নিসন্দেহে তোমার জন্যে চিরস্থায়ী প্রতিদান রয়েছে। নিসন্দেহে তুমি এক সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছো।'

দ্বিতীয় রুকুতে মোমেনদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এ সূরায় বলেন,

'নিশ্চয় আল্লাহভীরুদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বাগিচা রয়েছে। আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়েছে? এ কি ধরনের সিদ্ধান্তে তোমরা উপনীত হচ্ছো?'

অপর এক জায়গায় রসূল (স.)-এর জনৈক কট্টর দুশমন প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'সেই ব্যক্তির অনুসারী হয়ো না, যে ব্যক্তি কথায় কথায় শপথ করে, অত্যধিক পরনিন্দুক ও চোগলখোর। সৎ কাজে বাধা দানে অতীব তৎপর, অত্যাচারী ও পাপিষ্ট, অতি মাত্রায় অহংকারী ও জারজ, প্রচুর সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী হওয়ার কারণে যার এতো স্পর্ধা, যার সামনে কোরআন পাঠ করা হলেই বলে ওঠে, 'সব তো সেকেলে কিচ্ছা কাহিনী। অচিরেই আমি তার শুঁড়ে দাগ দিয়ে দেবো।'

অতপর যারা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের সকল শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'সুতরাং আমাকে এবং এই বাণীকে যে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমি প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এমনভাবে তিলে তিলে শেষ করে দেবো যে তারা টেরই পাবে না। আমি তাদেরকে ঢিল দেবো। আমার কৌশল খুবই সুক্ষ্ম।'

এই কৌশল আখেরাতের সেই আযাবের অতিরিক্ত, যা অহংকারীদের অহংকারকে ধুলায় মিশিয়ে দেবে। যে দিন অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতি দেখা দেবে এবং তাদেরকে সেজদা করার আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা তা করতে পারবে না। তাদের চোখ থাকবে আনত এবং তারা ঘোরতর লাঞ্ছনার শিকার হবে। অথচ ইতিপূর্বে তাদেরকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সেজদার জন্যে ডাকা হতো।

অহংকারের পরিণাম প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা একটা বাগানের মালিকদের ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধনবল ও জনবলে বলীয়ান হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী কুচক্রী কোরায়শ নেতাদের শাসানো ও ভয় দেখানো। সূরার শেষে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে তাই অটুট ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন!

'তোমার প্রভুর নির্দেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করো এবং মাছের পেটের অধিবাসীর মতো হয়ো না।'

এই সান্ত্বনা সহানুভূতি প্রশংসা ও প্রবোধসূচক বক্তব্য এবং ইসলামী দাওয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি কঠোর আক্রমণাত্মক ও হুমকিসূচক বক্তব্য উচ্চারণের পর আল্লাহ তায়ালা একই ধরনের কঠোর ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসব কিছুর মধ্যদিয়ে আমরা সেই সময়কার মুসলমানদের কিছু বৈশিষ্টের সন্ধান পাই। সেটা ছিলো মুসলমানদের দুর্বলতা ও সংখ্যা স্বল্পতার যুগ, তাদের জন্যে এক দুর্বিষহ কঠিন সময়। সেটা ছিলো সেই শত্রু ভূখন্ডে দ্বীনের সেই মহতী চারাগাছটিকে রোপনের জন্যে মোমেনদের দুঃসাহসী চেষ্টার এক পবিত্র মুহূর্ত। অনুরূপভাবে সূরার বাচনভংগী ও বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে আমরা সেই সময়কার ইসলামী আন্দোলন কি ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলো তাও জানতে পারি। সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তৎকালীন চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, আবেগ অনুভূতি, চেতনা এবং সমস্যা সব কিছুতেই একটি আদিমতার ছাপ পরিস্ফুট ছিলো।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরোধে তারা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলো, তাতেই আমরা এই আদিমতার সাক্ষাৎ পাই। তারা রসূল (স.) কে 'পাগল' বলেছিলো। এই অপবাদটি আরোপে বিন্দুমাত্রও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করা হয়নি। কোনরূপ যুক্তি ও ভূমিকা ছাড়াই নবীর প্রতি অশ্রাব্য গালি ছুঁড়ে মারা ছাড়া তারা দ্বিমত প্রকাশের আর কোনো ভাষাই খুঁজে পায় না, সভ্যতার সেই আদিম স্তরের লোকদের রীতিই এটা।

আদিম স্তরের মানুষের উপযোগী এই ভাষার সরলতা আমরা দেখতে পাই তাদের মিথ্যা অপবাদ খন্ডনে আল্লাহ তায়ালা যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাতেও। তিনি বলেন,

'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। তোমার জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী প্রতিদান। তুমি প্রতিষ্ঠিত আজ এক সুমহান চরিত্রের ওপর। অচিরেই তুমি দেখতে পাবে–দেখতে পাবে তারাও তোমাদের দু'পক্ষের মধ্যে কোনো পক্ষ ভ্রান্তির মধ্যে আছে।'

অনুরূপভাবে এটা দেখতে পাই সূরার এ আয়াতে ঝংকৃত প্রকাশ্য রোষ কষায়িত হুংকারে,

'আমাকে ও আমার বাণী প্রত্যাখ্যানকারীকে ছেড়ে দাও, আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে (অধপতনের শেষ স্তরে) এমনভাবে নিয়ে যাবো যে, তারা টেরও পাবে না। আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে দেই। আমার কৌশল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।'

ভাষার এই সরলতা কাফেরদের এক ব্যক্তির ওপর পাল্টা গালাগাল বর্ষণের মধ্য দিয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

'তুমি সেই ব্যক্তির অনুসরণ করো না যে ঘন ঘন শপথ করে, যে অত্যন্ত নীচ, যে অতিশয় নিন্দুক ও চোগলখোর, সৎ কাজে বাধা দানকারী, সীমাতিক্রমকারী পাপিষ্ঠ, ধিকৃত ও জারজ। ....'

ভাষার উক্ত সরলতা আমরা বাগানের মালিকদের সংক্রান্ত সেই ঘটনাতেও দেখতে পাই, যা আল্লাহ তায়ালা এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করেছেন। এটি ছিলো এমন একটি দলের ঘটনা, যারা আপন চিন্তাধারায়, ধ্যান ধারণায়, অহংকারে, কথাবার্তায় ও চালচলনে অসভ্য ও নির্বোধ মানুষের মতই সরল ছিলো। সূরার এক জায়গায় তাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে,

'তারা অতি সংগোপনে এরূপ শলাপরামর্শ করতে করতে রওনা হলো যে, আজ বাগানের ভেতরে কোনো মিসকীনই যেন ঢুকতে না পারে।....'

সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি যে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তাতেও একই ধরনের সরল ও সহজবোধ্য বাচনভংগী দেখতে পাই,

'তোমাদের কাছে কোনো কেতাব আছে নাকি, যা তোমরা পড়ো? তাতে কি তোমাদের অতি পছন্দনীয় কথাবার্তা আছে? তোমাদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন কোনো শপথ চাপানো রয়েছে কি, যার ভিত্তিতে তোমাদের যা ইচ্ছে তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার রয়েছে? হে নবী! ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, এ সব বিষয়ে জবাব দেয়ার দায়িত্ব কে নেবে?'

এ সব প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় মোশরেকরা কি ধরনের চিন্তাগত বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলো। সেই সাথে কোরআনের বিশিষ্ট বাচনভংগীর মাধ্যমে রসূল (স.)-এর জীবনের ঘটনাবলী জানা যায়, জানা যায় ইসলামী দাওয়াত কি কি অবস্থার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিলো, কোরআন সেই পরিবেশকে এবং ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত সেই দলটিকে রসূল (স.)-এর জীবনের শেষভাগে কতখানি উন্নীত করেছিলো এবং তাকে সেই প্রাক ইসলামী জাহেলী চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণা, চেতনা, মূল্যবোধ ও নির্বোধ সুলভ সরলতার স্তর থেকে কত উচ্চে উত্তোলন করেছিলো।

কোরআনের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায়, কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের পর তাদের জীবনে, আকীদা বিশ্বাসে, ধ্যান-ধারণায়, মূলবোধে, আবেগ-অনুভূতিতে ও বাস্তবতায় মাত্র বিশ বছরের মধ্যে কি আমূল পরিবর্তন এসেছিলো। বিশ বছর যদিও জাতিসমূহের জীবনে নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য একটি সময়, তবুও সেই সংক্ষিপ্ত সময়ে তাদের জীবনে যে সর্বব্যাপী ও সুদূরপ্রসারী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো, সমগ্র মানবেতিহাসে তার তুলনা নেই।

সেই বিপ্লবের বদৌলতে তারা গোটা মানব জাতির নেতৃত্ব হস্তগত করেছিলো এবং তাদের চিন্তাধারা ও স্বভাবচরিত্রের এতো উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছিলো, যা ইতিহাসে আর কখনো সাধিত হয়নি। সেই নযীরবিহীন বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো আকীদা বিশ্বাসের ধরনে ও গুণমানে, মানুষের পার্থিব জীবনে সেই আকীদা বিশ্বাসের বাস্তব রূপায়নে, সমগ্র মানবজাতিকে উদারতা ও সহমর্মিতার এক অখন্ড ও বিশালকার বৃত্তে সমবেতকরণ ও একীভূতকরণে, সর্বোপরি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের যাবতীয় চেতনাগত, চিন্তাগত, সামাজিক ও সাংগঠনিক প্রয়োজন পূরণে। তাদের জীবনে সংঘটিত এই সর্বাত্মক বিপ্লব ছিলো আসলেই একটা অলৌকিক ঘটনা।

এ বিপ্লব এবং এই সর্বাত্মক পরিবর্তন নিছক একটি সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করা এবং একটি দুর্বল মানবগোষ্ঠীকে শক্তিমানে পরিণত করার চেয়ে অনেক বড় ও ব্যাপক ব্যাপার। কেননা ব্যক্তি মানুষের মনমানস ও স্বভাব চরিত্র গঠন গোষ্ঠী ও সমাজ মানস গঠনের চেয়ে অনেক কঠিন কাজ।

**তাফসীর**

এবার সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করা যাক। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নুন, কলমের শপথ এবং যা কিছু লোকেরা লেখে তার শপথ! ....... আমি অচিরেই তাকে তার শুঁড়ে দাগ দেবো।'

**কলমের শপথ**

সূরাটির শুরুতে আল্লাহ তায়ালা 'নুন' ও 'কলম-এর শপথ করেছেন। 'নুন' অক্ষরটির সাথে কলম লেখার এ সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কলম ও লেখার নামে শপথ করার অর্থ হলো এর মর্যাদাকে বড় করে তুলে ধরা এবং যে আরব জাতি এই পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জনে অভ্যস্ত ছিলো না তাকে এটা শেখার আদেশ দান করা। আরবে লেখার প্রচলন ছিলো খুবই কম আর তাও ছিলো খুবই নিম্নমানের। অথচ আল্লাহর জানা ছিলো যে, এ সময় সে জাতিটির একটা বিশেষ ভূমিকা পালনের সময় ঘনিয়ে এসেছিলো এবং সে জন্যে এই যোগ্যতার সৃষ্টি হওয়া

ও তা তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করা খুবই জরুরী হয়ে উঠেছিলো। কেননা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে ও এই আকীদা ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া ও মানব জাতিকে প্রাপ্ত নেতৃত্ব দানের জন্যে এর প্রয়োজন ছিলো। এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্যে লেখা ও লেখনী যে একটা মৌলিক উপাদান সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।

'পড়ো'; এ কথা দিয়ে ওহীর শুরু হলো কেন?

সূরা 'আলাক'-এর প্রারম্ভিক আয়াতগুলো দিয়ে পবিত্র কোরআন নাযিলের উদ্বোধন থেকেও উপরোক্ত তাৎপর্যের সমর্থন মেলে। তাতে বলা হয়েছে,

'তুমি পড়ো তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রভু হচ্ছেন সেই সর্বাধিক সম্মানিত সত্তা, যিনি কলম দ্বারা শিখিয়েছেন, মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।'

আলোচ্য আয়াতে নিরক্ষর নবী (স.)-কে সম্বোধন করা থেকেও উক্ত তাৎপর্যের সমর্থন পাওয়া যায়। একটি সুনির্দিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিরক্ষর নবী করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও তার কাছে পাঠানো প্রথম ওহীতেই পড়া ও কলম দিয়ে শেখার বক্তব্য সন্নিবেশিত করলেন। শুধু তাই নয়, আরো জোরদার মনোযোগ আকর্ষণীয় সংকেত দেয়া হলো, 'নুন' অক্ষরের নামে, কলমের নামে এবং যা লোকেরা লেখে তার নামে শপথ করার মাধ্যমে। এটি ছিলো আসলে মুসলিম জাতিকে প্রশিক্ষণ দান এবং আল্লাহর গুপ্ত জ্ঞান ভান্ডারে রক্ষিত পরিকল্পনার আওতাধীন বিশাল মহাজাগতিক ভূমিকা পালনে তাকে প্রস্তুত করার জন্যে আল্লাহর বিধান সংক্রান্ত একটি পাঠচক্র।

আগেই বলে এসেছি যে, একমাত্র লেখার কাজটির গুরুত্ব ও মহত্বের প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা নুন, কলম ও লেখার শপথ করেছেন। এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো স্বীয় রসূলের ওপর মোশরেকদের আরোপিত অপবাদ খন্ডন। শুধু খন্ডন নয়, আল্লাহ তায়ালা সে অপবাদকে অসম্ভব ও সুদূর পরাহতও প্রমাণ করেছেন। কেননা তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহই প্রমাণ করে যে, তার ওপর আরোপিত অপবাদ সত্য হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তুমি পাগল নও।'

এই ক্ষুদ্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একটা বিষয় প্রমাণ করতে এবং আরেকটি বিষয় খন্ডন করতে চান। প্রমাণ করতে চান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ তার নবীর ওপর রয়েছে। 'তোমার প্রতিপালক' এই শব্দ দ্বয়ের প্রয়োগে যে ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতির ভাব প্রতিফলিত হয়, তা থেকেই অনুগ্রহের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আবার এই একই কথা দ্বারা এই মর্মেও আভাস পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে বান্দাকে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, ঘনিষ্ঠ করেছেন ও আপন করে নিয়েছেন, তার ওপর একই সাথে অনুগ্রহও বিতরণ করবেন এবং তাকে পাগলও বানাবেন এটা হতে পারে না।

## মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কাফেরদের ধারণা

রসূল (স.)-এর জীবনেতিহাসের ক্ষেত্রে যে কোনো পাঠকের কাছেই এটা একটা নিদারুণ বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যে মোশরেকরা নবুওতের অনেক বছর আগে রসূল (স.)-কে তাদের ভেতরের সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ বলে স্বীকার করতো, এমনকি 'হাজরে আসওয়াদ' সরানোর ব্যাপারে তারা তাকে শালিসও মেনেছিলো, তারাই কিনা তাকে নবুওতের পর পাগল বলে সাব্যস্ত করলো! তারা তাঁকে শুধু যে অধিকতর বুদ্ধিমান মনে করতো তা নয় বরং 'আল্ আমীন' অর্থাৎ বিশ্বাসী ও সৎ উপাধিও তারা তাকে দিয়েছিলো।

তারা তাঁর কাছে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র ও টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখতো, এমনকি এমন প্রচন্ড শত্রুতার মধ্যে হিজরতের দিনও তাঁর কাছে অনেকের আমানত গচ্ছিত ছিলো। সে জন্যে হযরত আলী (রা)-কে রসূল (স.)-এর হিজরতের পরেও কিছুদিন মক্কায় থাকতে হয়েছিলো, যাতে তিনি রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে সেসব গচ্ছিত জিনিস ফেরত দিতে পারেন। অথচ তখন তাঁর সাথে মোশরেকদের ঘোরতর শত্রুতা চলছিলো।

মক্কার মোশরেকেরা তাঁর নবুওত লাভের আগে তাকে একটিও মিথ্যা কথা বলতে শোনেনি। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন রসূল (স.)-এর দূত আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তাকে তাঁর নবুওতের আগে মিথ্যাবাদিতার দায়ে অভিযুক্ত করতে। আবু সুফিয়ান এর জবাবে বললো, না। অথচ সে ইসলাম গ্রহণের আগে রসূল (স.)-এর কট্টর দুশমন ছিলো। হিরাক্লিয়াস বললেন,

'তিনি যখন মানুষের সাথে মিথ্যা বলেন না, তখন আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন কেমন করে?'

যে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মানুষটিকে তারা নিজেদের ভেতরে সবচেয়ে বিচক্ষণ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী মনে করতো, তার বিরুদ্ধে তারা কিভাবে এ জাতীয় অভিযোগ আরোপ করলো তা ভাবলে মানুষ মাত্রেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। ক্রোধ ও বিদ্বেষ তাদেরকে এতো দূরে নিয়ে গিয়েছিলো যে, জেনে শুনেও এমন ভুল কথা তারা বলতে পেরেছিলো। আসলে হিংসা মানুষকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়। আর স্বার্থপরতা মানুষকে যে কোনো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে প্ররোচিত করে। এতে সে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ অপবাদ আরোপকারী নিজের সম্পর্কে অন্য যে কোনো লোকের আগে এ কথা জানে যে, সে নিজেই এক ভয়ংকর মিথ্যাবাদী এবং মহাপাপী। তাই পরম স্নেহ, মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সহকারে কাফেরদের সেই হিংসা এবং সেই মিথ্যা অপবাদের জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।'

তারপর বলা হচ্ছে,

'নিশ্চয় তোমার জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী প্রতিদান।'

'গায়রে মামনুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে অব্যাহত, অপ্রতিহত ও অফুরন্ত। অর্থাৎ তোমার যে প্রতিপালক তোমাকে নবুওতের মতো নেয়ামত দিয়েছেন, তার কাছে তোমার জন্যে অফুরন্ত প্রতিদান রয়েছে। এখানেও আপন করে নেয়ার ইংগীত স্পষ্ট। সকল রকমের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, যুলুম ও মোশরেকদের আরোপিত অপবাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রবোধ দান এ আয়াতের মূল বক্তব্য। বস্তুত যাকে তার প্রতিপালক পরম স্নেহ, সমাদর ও মর্যাদা সহকারে বলেন যে, তোমার প্রতিপালকের কাছে তোমার অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে, তার হারানোর কি থাকতে পারে?

### মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্য

এর পরই আসছে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য ও পরম সম্মান নির্ধারণী ঘোষণা,

'নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত মহান চরিত্রের অধিকারী।'

নবী (স.)-এর এ প্রশংসায় সমগ্র সৃষ্টিজগত মুখরিত হয়ে ওঠে। স্বয়ং বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর মুখ থেকে উচ্চারিত এই সুমহান প্রশংসা বাণীর মূল্য যে কত, তা লিখে ব্যক্ত করা লেখনীর সাধ্যাতীত এবং কল্পনা শক্তির কল্পনারও অতীত। এ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষ্য, আল্লাহর নিজস্ব মানদন্ডে নিজের একান্ত প্রিয় বান্দার মূল্যায়ন। সে মূল্যায়ন হচ্ছে এই যে, 'তুমি অতি উন্নত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী।'

এই উন্নত ও মহৎ চরিত্র বলতে কি বুঝানো হয়েছে, সেটা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। সৃষ্টি জগতের আর কেউ এর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।

এই মহান আয়াতটিতে রসূল (স.)-এর যে মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে তা একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষণীয়।

প্রথমত, এটা খোদ্ আল্লাহর সাক্ষ্য। গোটা সৃষ্টিজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ সাক্ষ্য প্রতিনিয়ত অনুরণিত হচ্ছে। গোটা বিশ্ববাসীর বিবেক এ সাক্ষ্যে মুখরিত। আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতারাও এ সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, সৃষ্টির প্রতিটি কণা ও বিন্দু থেকে এ সাক্ষ্য প্রকাশিত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে এই সাক্ষ্য অর্জন ও গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। রসূল (স.) নিজে জানেনও না যে, মহৎ চরিত্র কাকে বলে? কি তার মহত্ব? স্রষ্টা এই সাক্ষ্য কেন দিলেন? এই সাক্ষ্যের তাৎপর্য কি, এর শুরু কোথায় ও শেষ কোথায়, এর প্রতিক্রিয়া কি, এসব তত্ত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যতখানি জেনেছেন, ততটা আর কেউ জানতে পারে না। রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বের মহত্ব ও চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, তিনি এর সপক্ষে আল্লাহর এই সাক্ষ্য লাভ করেছেন এবং অত্যন্ত প্রশান্তভাবে ও ভারসাম্য সহকারে তা অর্জন করেছেন।

**মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে তার সাথীদের সাক্ষ্য**

সীরাত গ্রন্থাবলীতে রসূল (স.)-এর তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। তার বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী সেইসব বর্ণনার চেয়েও চমকপ্রদ ছিলো। কিন্তু পবিত্র কোরআনের এই সাক্ষ্য সব কিছুর উর্ধে এবং সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান। কেননা এ সাক্ষ্য স্বয়ং বিশ্বপ্রভু আল্লাহর। আর এ সাক্ষ্য লাভ করার পর রসূল (স.)-এর প্রশান্ত অচঞ্চল ব্যক্তিত্বে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আসেনি কোনো অহংকার ও আত্মগরিমা। মানুষের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের কোনো উচ্চাভিলাষও তাঁর মধ্যে কখনো জাগেনি।

বস্তুত এটিও তার মহৎ ও অতুলনীয় চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানতেন যে, তার রেসালাত ও নবুওতের উপযুক্ত কে। প্রকৃতপক্ষে রসূল (স.)-এর নিজের এই অতুলনীয় মহৎ ব্যক্তিত্বের কারণেই এই সর্বশেষ নবুওতের দায়দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য ছিলেন। বিশ্ব জগতে যত যোগ্যতা, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, তার সবই তাঁর সত্তার মাঝে একত্রিত হয়েছিলো। তাই তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হবার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি যাবতীয় মহৎ চারিত্রিক গুণাবলীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা জানতেন এই রসূল তার ওহী এবং শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার পরও কিছুমাত্র অহংকারও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

তিনি জানতেন যে, এই সর্বশেষ রেসালাত শ্রেষ্ঠত্বে, সৌন্দর্যে, মহত্বে, পূর্ণতায় ও সত্যনিষ্ঠায় এতো বড় হবে যে, তাকে ধারণ করতে আল্লাহর এই প্রশংসা লাভের যোগ্য শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সুষমামন্ডিত ব্যক্তিত্বেরই প্রয়োজন। তাকে শুধু প্রশংসিত হলেই চলবে না, প্রশংসা লাভের পরও তাঁকে পূর্ণ ভারসাম্য, দৃঢ়তা, উদারতা, শিষ্টাচার বজায় রাখতে সক্ষম হতে হবে। কেননা এ প্রশংসা লাভের পরও তার কোনো কাজে যদি আল্লাহর সমালোচনা বা তিরস্কার করেন, তবে তাও যেন তিনি একই ভারসাম্য, একই দৃঢ়তা ও একই ঔদার্য নিয়ে গ্রহণ করেন—যেমন করেন প্রশংসাকে।

তার এই প্রশংসা যেমন তিনি প্রকাশ করছেন, সেই তিরস্কারকেও তেমনি প্রকাশ করবেন। দুটোর কোনটা থেকে এক অক্ষরও গোপন করবেন না। উভয় অবস্থাতেই তিনি থাকবেন একই

রকমের উদারচেতা মহান নবী, অনুগত বান্দা এবং বিশ্বস্ত একনিষ্ঠ প্রচারক। উভয় অবস্থাতেই তিনি হবেন দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি হবেন গাম্ভীর্যে ও দৃঢ়তায় পর্বতের মতন অটল।

**মানুষ মোহাম্মদ ও রসূল মোহাম্মদ (স.)**

বস্তুত মানুষ মোহাম্মাদের ব্যক্তিসত্তা যেমন রসূল মোহাম্মাদের ব্যক্তি সত্তারই বাস্তব রূপ, ঠিক তেমনি মানুষ মোহাম্মাদের সুমহান ব্যক্তিসত্তার শ্রেষ্ঠত্ব নবী মোহাম্মাদের শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিণতি ও ফল। অনুরূপভাবে ইসলামের নিগুঢ় তত্ত্ব যেমন মানুষের নাগালের বাইরে, তেমনি ইসলামের পতাকাবাহী মোহাম্মাদের ব্যক্তিগত মহত্বের অতলান্ত রহস্যও মানুষের ধরা ছোঁয়ার উর্ধে। এই দুটি নিগুঢ় তত্ত্বের পর্যবেক্ষক কেবল দূর থেকে তাকে দেখতে সক্ষম, কিন্তু তার গভীরতম প্রকোষ্ঠে ও শেষ লক্ষ্যবিন্দুতে পৌছা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

রসূল (স.) আল্লাহর এই প্রশংসাকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়টি ভাবতে গিয়ে আমি বারবার স্তব্ধ হয়ে পড়ি। আমি উপলব্ধি করি যে, তিনি এ প্রশংসাকে পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে, পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও প্রশান্তি সহকারে, সম্পূর্ণ অবিচল ও অচঞ্চল চিত্তে গ্রহণ করেন। এহেন শ্রেষ্ঠতম দুর্লভ মর্যাদা লাভ করেও যিনি ভারসাম্য হারান না, ধরাকে সরা জ্ঞান করেন না, তিনি যে বিশ্ব জাহানে বাস্তবিক পক্ষেই শ্রেষ্ঠতম মানুষ, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

সত্যিকার অর্থে মর্যাদা ও মহত্বের এই সর্বোচ্চ শিখরে শুধুমাত্র মোহাম্মদই (স.) আরোহণ করতে পেরেছিলেন। মানবীয় পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা কোনো মানব সত্তার ভেতরে ঘটাতে পারেন, সেটা ঘটিয়েছিলেন মোহাম্মাদ (স.)-এরই পবিত্র ও নির্মল সত্তায়। আল্লাহর বাণীবাহক শ্রেষ্ঠ মানুষটি এই সত্তায় জীবন্ত রূপ লাভ করেছিলো এবং ভূপৃষ্ঠে একটি মানুষের অবয়ব নিয়ে চলাচল করেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁকেই তাঁর রসূল হবার যোগ্য বলে চিহ্নিত ও মনোনীত করেছিলেন। তাঁকেই শ্রেষ্ঠতম চরিত্রের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সাথে এ ঘোষণাও করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এবং তার ফেরেশতারা তাঁর ওপর প্রতিনিয়ত দরুদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকেন। আর এতোবড় মর্যাদার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট বান্দাকে বাছাই করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই।

**চারিত্রিক মহত্ব হচ্ছে ইসলামের প্রাণ শক্তি**

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ নবী ও রসূলের চরিত্রের এতো প্রশংসা কেন করলেন? এ প্রশ্নে আমরা যতই ভাবি, ততই এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মোহাম্মাদের মানব সত্তায় যেমন সুন্দর ও মহৎ চরিত্রই ছিলো সর্বাধিক মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠতম উপাদান, তেমনি সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও চারিত্রিক মহত্ব ইসলামেরও মূল প্রাণ শক্তি ও ভিত্তি। যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (স.)-এর জীবন ও চরিত্রকে এবং ইসলামের আকীদা, আদর্শ ও বিধানকে অধ্যয়ন করেছে, সে সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, ইসলামী বিধানের আইনগত ও সাংস্কৃতিক মূলনীতিগুলোর ভিত্তি ইসলামের নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, ন্যায়বিচার, দয়া ও ক্ষমা, আত্মীয়স্বজনের প্রতি বিশেষ সদাচার, দরিদ্রের প্রতি দয়া, ওয়াদা পালন, কথা ও কাজের সামঞ্জস্য বিধান এবং মন ও বিবেকের সাথে কথা ও কাজের সমন্বয় এ সব গুণাবলীর বাস্তবায়নে ইসলাম ইতিবাচক আহবান জানায়।

আর নিষেধ করে যুলুম, নির্যাতন, শোষণ, প্রতারণা ও অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করতে, মানুষের জানমাল ও ইযযতের ক্ষতি করতে এবং যে কোনো উপায়ে সমাজে অশ্লীলতার

বিস্তার ঘটাতে। ইসলামী বিধানে উল্লিখিত ইতিবাচক কাজগুলোর প্রতিষ্ঠা ও নিষিদ্ধ কাজগুলোর উচ্ছেদকে ইসলামী নৈতিকার ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এই ভিত্তি নির্মাণ করার আহবান জানানো হয়েছে চিন্তায়, কর্মে ও চেতনায়। বিবেকের গভীরে সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত, সামষ্টিক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামের সমগ্র জীবন বিধানে নৈতিকতার গুরুত্ব যে সর্বাধিক তা রসূল (স.)-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকেও বুঝা যায়।

'আমি শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনের জন্যে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।'

অর্থাৎ তিনি তার গোটা রেসালাত ও নবুওতের সার সংক্ষেপ নির্ধারণ করেছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে তাঁর হাদীসসমূহ এক এক করে প্রতিটি চারিত্রিক গুণকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত। আর তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এমন একটি জীবন্ত উদাহরণ, নির্মল নিষ্কলংক ও সর্বোচ্চ মানের ছবি তুলে ধরে, যা স্বভাবতই আল্লাহর পক্ষ থেকে এই প্রশংসা লাভের যোগ্য যে, 'তুমি সর্বোচ্চ মানের চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছো।'

বস্তুত এই প্রশংসা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীকেই শুধু নয় বরং রসূলের আনীত জীবন বিধানের নৈতিক ও চারিত্রিক উপাদানকেও মহিমান্বিত করেছেন। এ দ্বারা মানুষের পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহর ভক্তদেরকে আল্লাহর পছন্দনীয় জীবনের চরিত্রের সন্ধান দেয়া হয়েছে।

আসলে চারিত্রিক বিধানকে এতো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা ইসলামের বিরল ও একক কৃতিত্ব। কেননা ইসলাম যে নৈতিক ও চারিত্রিক বিধান পেশ করে, তা আশপাশের পরিবেশ থেকে বা পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভুত নয় মোটেই। এটা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কোনো রীতিপ্রথা, চলতি প্রজন্মের কোনো স্বার্থ, কোনো সুযোগ সুবিধা বা সম্পর্ক বন্ধন থেকেও এর উৎপত্তি ঘটেনি বা এ সবের ওপর তা নির্ভরশীলও নয়। শুধুমাত্র ওহী থেকেই এর উৎপত্তি এবং ওহীর ওপরই তা সর্বতোভাবে নির্ভরশীল।

পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে আল্লাহর অভিমুখী হতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে আকাশ থেকে ভেসে আসা বাণী এর উৎস। এ নৈতিক বিধানের উৎস আল্লাহর মহান গুণাবলী, যাতে মানুষ সাধ্যমত এ সব গুণকে আপন জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারে, উচ্চমার্গের মানবতাকে বাস্তব রূপ দিতে পারে। আল্লাহর দেয়া সম্মান, মর্যাদা ও খেলাফতের যোগ্য হতে পারে এবং পরকালে উন্নত জীবনের অধিকারী হতে পারে। এই উন্নত জীবনের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে সূরা 'কামার'-এর এ আয়াতে,

(আল্লাহভীরু লোকেরা ...) সর্বশক্তিমান সম্রাটের সান্নিধ্যে সত্যবাদিতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে।'

সুতরাং ইসলামের নৈতিকতা পার্থিব বিচার-বিবেচনার সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। এটি সীমাহীন, শর্তহীন এবং এর পরিধি মানুষ যত উর্ধে উঠতে পারে ততদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কেননা এর লক্ষ্য হলো আল্লাহর গুণাবলীকে আয়ত্ত করা ও বাস্তবায়িত করা। আর আল্লাহর গুণাবলীর কোনো সীমা সরহদ নেই।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এই নৈতিক গুণাবলী নিছক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত গুণাবলী নয় বরং সত্যবাদিতা, আমানতদারী, ন্যায়বিচার, দয়া ও বদান্যতা ইত্যাকার যে গুণের কথাই বলা হোক না

কেন এর সবই একটা পরিপূরক ও সুসংহত বিধানের অংশ। সামাজিক বিধি-বিধান ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ অনুশীলন এই উভয় মিলে এমন একটা সার্বিক অবকাঠামো গড়ে তোলে, যার ওপর মানুষের সামষ্টিক ও পূর্ণাংগ জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সবার শেষে তা মহান আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। পার্থিব জীবনের কোনো বিচার-বিবেচনার সাথে তার সাযুজ্য ঘটেনা।

ইসলামের এই পূর্ণাংগ নির্মল ও নিষ্কলুষ, ভারসাম্যপূর্ণ, সুদৃঢ়, সরল ও স্থীতিশীল নৈতিকতার আদর্শ হচ্ছে রসূল (স.) এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব। আর এ জন্যেই তার সুমহান সত্তাকে লক্ষ্য করে এই প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছিলো যে, 'তুমি শ্রেষ্ঠতম নৈতিক চারিত্রিক মানের অধিকারী।' নিজের প্রিয়তম বান্দার এই প্রশংসা করার পর আল্লাহ তাকে দুশমন মোশরেকদের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, যারা তোমার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপবাদ রটনা করেছিলো এবং তোমাকে পাগল বলে অপমানিত করেছিলো, তারাই যে গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে লিপ্ত সে কথা অচিরেই প্রমাণিত হবে। তিনি বলছেন,

'অচিরেই তুমি দেখবে এবং তারা দেখবে-কে বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী এবং কে সুপথপ্রাপ্ত তা তোমার প্রতিপালক সবচেয়ে ভালো জানেন।'

আয়াতে যে 'মাফতুন' শব্দটি রয়েছে তার অর্থ দু'রকম হতে পারে।

প্রথমত, বিপথগামী। দ্বিতীয়ত, যাকে পরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষার মাধ্যমে তার আসল স্বরূপ উন্মোচন করা হয়, এই দুটো অর্থই কাছাকাছি।

এখানে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাতে একদিকে যেমন রসূল (স.) ও তার সংগীদের জন্যে আশ্বাসবাণী রয়েছে, তেমনি রয়েছে সমানুপাতিকভাবে তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের বিরুদ্ধে হুমকি ও হুশিয়ারী। রসূল (স.)-এর ওপর আরোপিত পাগলামীর অপবাদটির প্রকৃত তাৎপর্য যাই হোক না কেন, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ দ্বারা তারা রসূল (স.)-কে পুরোপুরি 'মস্তিস্ক বিকৃত' বুঝায়নি। কেননা বাস্তব অবস্থা এরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী। তারা বলতো যে, রসূল (স.) ঘাড়ে জ্বিন সওয়ার হতো এবং এই অলংকার সমৃদ্ধ চমৎকার কথাবার্তা জ্বিনেরাই তাঁকে শেখায়।

কবিদের সম্পর্কেও তারা এ রকম ভাবতো। তারা মনে করতো যে, প্রত্যেক কবির সাথে একটা শয়তান থাকে এবং সেই তাকে এমন অদ্ভুৎ কথাবার্তা শেখায়। রসূল (স.)-এর বাস্তব অবস্থার সাথে এ ব্যাখ্যা মোটেই খাপ খায়না। আর তার কাছে যে নিখুঁত, সুদৃঢ় অকাট্য সত্য ওহী আসে, তার সাথে এ ব্যাখ্যার মিল নেই।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুতির মর্ম এই দাঁড়ায় যে, অনাগত ভবিষ্যত রসূল (স.) ও তাঁকে অবিশ্বাসকারী কাফেরদের মধ্যে কে বিপথগামী তা প্রকাশ করে দেবে। তিনি তাকে এই মর্মে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তোমার প্রভু এ কথা অন্য সবার চাইতে ভালো জানেন যে, কে বিপথগামী এবং কে সুপথগামী।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তার রসূলকে তিনি ওহী যোগেও এ কথাটা বলছেন। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা খোদ রসূল (স.) এবং তার সংগীদের সুপথপ্রাপ্ত হবার কথা জানেন। কাজেই এ উক্তিতে একদিকে রসূল (স.)-এর জন্যে রয়েছে আশ্বাসবাণী, অপরদিকে তার শত্রুদের জন্যে রয়েছে গুরুতর দুঃসংবাদ।

এরপর আল্লাহ তায়ালা আরো স্পষ্ট করে তাদের পরিচয় তুলে ধরছেন এবং তাদের আবেগ অনুভূতির স্বরূপ উদঘাটন করছেন। যে জাহেলী ধারণা বিশ্বাসে তারা নিজেদের অবিচল আস্থা প্রকাশ করে থাকে তার ব্যাপারে আসলে তারা দোদুল্যমান। অথচ এই দোদুল্যমানতা লুকিয়ে রেখে তারা রসূল (স.)-এর সাথে তাঁর আনীত সত্য দ্বীন ও নির্ভুল ওহী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

## আপোষহীনতা ইসলামী আন্দোলনের শর্ত

মক্কার মোশরেকেরা তাদের পোষণ করা আকীদা বিশ্বাসের অনেক কিছু বর্জন করতে প্রস্তুত ছিলো যদি রসূলও (স.) তাঁর আনীত আকীদা বিশ্বাসের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে রাজী হতেন, যার দিকে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তারা তাদের পৌত্তলিক ধ্যান ধারণার ব্যাপারে আপোস করতে, শিথিল হতে এবং কেবল বাহ্যিক প্রদর্শনী করতে প্রস্তুত ছিলো, যাতে রসূল (স.) ও তাঁর আদর্শ ও আকীদার ব্যাপারে অদ্রুপ করতে প্রস্তুত হয়ে যান।

অর্থাৎ তাদের অবস্থা এই যে, তারা এমন কোনো আকীদার ধারক বাহক নয়, যাকে তারা আন্তরিকভাবে সত্য ও সঠিক বলে মানে। তারা কেবল তার বাহ্যিক দিকটাকেই মানে এবং তাকে গোপন করে রাখাই সমীচীন মনে করে। আল্লাহ তায়ালা সে কথাই বলছেন পরবর্তী আয়াতে,

'কাজেই সেই সব অবিশ্বাসীর অনুসরণ করো না, যারা প্রত্যাশা করে যে, তোমরা আপোস করতে রাজী হলে তারাও আপোস করবে।'

এটা ছিলো একটা দরকষাকষির ব্যাপার। এ যেন পথের মাঝখানে সাক্ষাতকার, যা ব্যবসায়ীরা সচরাচর করেই থাকে। অথচ ব্যবসায় ও আকীদা বিশ্বাসে অনেক পার্থক্য। আকীদা বিশ্বাসের কিছুই বাদ দেয়া যায় না। কেননা তার ছোট বড় সবটাই সমান।

বরঞ্চ প্রকৃত সত্য এই যে, আকীদায় আদৌ কোনো ছোট বড় নেই। আকীদা সবই পরস্পরের পরিপূরক। এর কোনো একটির ব্যাপারেও কেউ অন্যের কথা মতো কাজ করে না এবং কখনো তার কিছুই বর্জন করে না।

ইসলাম ও জাহেলিয়াত পরস্পরের সাথে মিলিত হবে এটা অসম্ভব। জাহেলিয়াতের প্রতি ইসলামের এই আপোসহীন ভূমিকা সকল দেশে ও সকল কালে অব্যাহত। অতীতের জাহেলিয়াত বর্তমানের জাহেলিয়াত ও ভবিষ্যতের জাহেলিয়াত সবই এখানে সমান। জাহেলিয়াত ও ইসলামের মাঝখানে যে দূরত্ব ও ব্যবধান, তা অতিক্রম করার কোনো উপায় নেই, এই দুয়ের মাঝখানে কোনো পুল বা সাঁকোও নেই। কোনো ভাগ বাটোয়ারা বা জোড়াতালি দিয়েও এ ব্যবধান ঘোচানো যায় না। উভয়ে উভয়কে নিশ্চিহ্ন করতে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত। এ সংগ্রামে কোনো মীমাংসা বা সন্ধির অবকাশ নেই।

বহুসংখ্যক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রসূল (স.) যাতে আপোস রফায় প্রস্তুত হয়ে যান, তাদের দেবদেবীর নিন্দা না করেন, তাদের পূজা উপাসনাকে ভুল কাজ না বলেন অথবা তাদের কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে সহযোগিতা করেন এবং প্রয়োজনে তার বিনিময়ে তারাও তাঁর ধর্মীয় কোনো কোনো বিষয়ে সহযোগিতা করে, আর আরব জনসাধারণের সামনে মোশরেক নেতাদের মানসম্ভ্রম কিছুটা রক্ষা পায়, এ জন্যে তারা রসূল (স.)-এর কাছে বিভিন্ন রকমের আপোসের প্রস্তাব দিতো।

সামাজিক দ্বন্দ্ব মীমাংসার এটা অবশ্যই একটা চিরাচরিত রীতি। কিন্তু রসূল (স.) তার দ্বীনের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। কোনো মতেই আপোস মীমাংসা বা নতি স্বীকারে তিনি প্রস্তুত হননি। অথচ এ দ্বীনি বিষয় ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী, সবচেয়ে আপোস প্রয়াসী, সবচেয়ে সদাচারী এবং সহজ সরল আচরণে সবচেয়ে বেশী উদগ্রীব। কিন্তু দ্বীন দ্বীনই। ইসলাম ইসলামই। এ ব্যাপারে তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে তিনি অবিকল আল্লাহর এই নির্দেশের অনুগত ছিলেন যে,

'তোমার প্রতি যারা ঈমান আনে না তাদের তুমি আনুগত্য করবে না।'

এমনকি যে সময়ে রসূল (স.) মক্কায় সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলেন, যখন শুধুমাত্র তাঁর ইসলাম প্রচারের দায়ে ও তাঁর মুষ্টিমেয় সংগীদেরকে দুর্বিষহ নির্যাতনসহ অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হচ্ছিলো, তখনও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। যে কথা বলা উচিত, তা তিনি ক্ষমতাদর্পী প্রতাপশালী যুলুমবাজদের মুখের সামনেও বলতে কুণ্ঠিত হননি। অত্যাচারীদের মন একটু গলবে ও সদয় হবে কিংবা যুলুমের মাত্রা কিছুটা লাঘব হবে এই আশায় তিনি দ্বীন প্রচারের কাজে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরতি দেননি কিংবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামী আকীদা ও আদর্শের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন একটি কথা থেকেও নীরবতা অবলম্বন করেননি।

**নবী চরিত্রের সুকঠিন দৃঢ়তা**

ইবনে হিশাম স্বীয় সীরাত গ্রন্থে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, 'রসূল (স.) যখন তার জাতির কাছে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, তখন প্রথম প্রথম জাতি তাকে এড়িয়ে চলেনি, তার ওপর ক্ষিপ্তও হয়নি। কিন্তু আমার জানা মতে, তিনি যেই তাদের দেবদেবীর নিন্দা সমালোচনা শুরু করলেন, অমনি তারা তার বিরোধী হয়ে গেলো এবং সবাই এক হয়ে তার শত্রুতা শুরু করলো। কেবল মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাও কারো কাছে প্রকাশ করতো না। রসূল (স.)-এর চাচা আবু তালেব অবশ্য যথারীতি তাঁর প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন এবং তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ফলে রসূল (স.) আল্লাহর দ্বীন প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কেউ তাঁর পথ রোধ করতে পারলো না।

কোরায়শ নেতারা যখন দেখলো যে, তাদের শেরকী, কুফুরী ও দেবদেবীদের নিন্দা সমালোচনায় রসূল (স.) কিছুতেই দমছেন না, আর তাঁর চাচা আবু তালিব তাকে স্নেহ আদরে লালন করে চলেছেন এবং তাকে তাদের কাছে সমর্পণ না করে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছেন, তখন কতিপয় শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতা আবু তালেবের কাছে উপস্থিত হলো। এদের মধ্যে ছিলো রবীয়ার দুই ছেলে ওৎবা ও শায়বা, আবু সুফিয়ান বিন হারব, আবুল বুখতারী আস বিন হিশাম, আসওয়াদ ইবনুল মোত্তালেব, ইবনে আসাদ আবু জেহেল ওরফে আবুল হিকাম আমর ইবনে হিশাম, ওলীদ ইবনে মুগীরা, হাজ্জাজের দুই ছেলে নবীহ ও মোনাব্বেহ প্রমুখ।

তারা বললো, 'হে আবু তালিব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা এবং আমাদের ধর্মের সমালোচনা করেছে। শুধু তাই নয়, সে আমাদেরকে বোকা ঠাউরিয়েছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেছে। আপনি পারলে ওকে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করুন, নচেত ওকে শায়েস্তা করতে আমাদেরকে সুযোগ দিন। আপনিও তো আমাদের ধর্মমতের অনুসারী এবং ওর বিপক্ষে। কাজেই আমরা যদি ওকে শায়েস্তা করে দেই, তবে আপনারও কাজ হবে অথচ আপনার নিজের কিছু করতে হলো না।'

আবু তালেব তাদেরকে সৌজন্যপূর্ণ ও বিনম্র ভাষায় বুঝিয়ে সুজিয়ে বিদায় করলেন।

এ ঘটনার পরও রসূল (স.) ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখলেন। ফলে এরপর রসূলের (স.) সাথে তাদের বিরোধ আরো গুরুতর আকার ধারণ করলো। উভয়ের পারস্পরিক দূরত্ব ও ঘৃণা বিদ্বেষ বেড়ে গেলো। কোরায়শের লোকেরা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলো এবং একে অপরকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কে দিতে লাগলো। এরূপ বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতিতে তারা পুনরায় আবু তালেবের কাছে হাযির হলো।

তারা বললো, 'হে আবু তালেব! আমাদের ভেতরে আপনি যেমন বয়সে প্রবীণ, তেমনি মান মর্যাদায়ও বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আমরা আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিবৃত্ত রাখতে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু আপনি তার কাজ বন্ধ করতে পারেননি। আল্লাহর কসম, আমরা এ অবস্থা সহ্য করতে পারবো না। আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে তিরস্কার করা হতে থাকবে, আমাদেরকে বোকা ঠাওরানো হতে থাকবে এবং আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দা করা হতে থাকবে এটা আমরা চলতে দেবো না। এখন হয় আপনি ওকে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত রাখুন, নচেৎ আমরা আপনার ও ওর বিরুদ্ধে একসাথে লড়াইতে লিপ্ত হবো। যতক্ষণ দু'পক্ষের এক পক্ষ নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় ততক্ষণ এ লড়াই থামবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।'

এ কথাগুলো বলেই তারা চলে গেলো। এবার আবু তালেব প্রমাদ গুণলেন। কোরায়শের লোকেরা এভাবে শত্রু হয়ে যাওয়ায় তিনি খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। অথচ রসূল (স.) কে তাদের হাতে তুলে দিতেও তার মন সাড়া দিলো না, আবার তারা এভাবে এসে অপমানসূচক আচরণ করে যেতে থাকবে তাও তিনি মেনে নিতে পারলেন না। অগত্যা তিনি রসূল (স.) কে ডেকে বললেন,

'হে ভাতিজা! তোমার স্বগোত্রীয় লোকেরা আমার কাছে এসেছিলো এবং এসব কথা বলে গেছে। (তিনি তাদের বক্তব্যের বিবরণ দিলেন।) এখন তুমি নিজেকে এবং আমাকে উভয়কেই রক্ষা করো। আমার সাধ্যাতীত বোঝা আমার ওপর চাপিও না।'

এ কথা শুনে রসূল (স.) ভাবলেন, তার চাচা বুঝি একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তিনি হয়তো তাকে অপদস্থ হবার জন্যে তাদের হাতে তুলে দেবেন এবং হয়তো তিনি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে তাকে আর রক্ষা করতে পারলেন না। তাই তিনি বললেন,

'চাচাজান! আল্লাহর কসম, ওরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ তুলে দেয় এবং আমাকে এ কাজ ত্যাগ করতে বলে, তথাপি আমি ত্যাগ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে বিজয়ী হয় অথবা আমি এ কাজ করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাই।'

এ কথা বলার সাথে সাথে রসূল (স.)-এর চোখে অশ্রু এলো এবং তিনি কেঁদে ফেললেন। অতপর যেই চলে যেতে উদ্যত হলেন, আবু তালেব তাকে ডেকে বললেন,

'ভাতিজা! আমার কাছে এসো।'

তিনি কাছে এগিয়ে গেলে আবু তালেব বললেন,

'ভাতিজা! তুমি যাও, তোমার যা ভালো লাগে তা বলতে থাকো। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কোনো কারণেই কারো কাছে সোপর্দ করবো না।'

এই ছিলো ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতের কাজে রসূল (স.)-এর দৃঢ়তা ও অবিচলতার চিত্র। আর এই দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখিয়েছিলেন এমন সময়, যখন পৃথিবীতে তার সর্বশেষ রক্ষক, সহায় ও দুর্গরূপী চাচা তার দায়িত্ব ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অথচ এই চাচাই তাকে তাঁর রক্তপিপাসু দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করে আসছিলেন।

মূলত এ চিত্র তাৎপর্য, প্রভাব, অভিব্যক্তি এবং শব্দ– সব কিছুর দিক দিয়েই অভিনব, অতুলনীয়, বিস্ময়কর ও তেজোদ্দীপ্ত। যে আকীদা বিশ্বাসের জন্যে তাঁর এই দৃঢ়তা, তা যতখানি নতুন ও অভিনব এটিও ততখানি অভিনব। সে আকীদা বিশ্বাস যতখানি বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর, এটিও ততখানি মনোমুগ্ধকর। সে আকীদা যতখানি তেজস্বী ও শক্তিশালী, এটিও ততখানি শক্তিশালী।

তাই এই চিত্রটি আল্লাহর এই সুমহান উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করে যে, 'নিশ্চয় তুমি মহৎ চরিত্রের অধিকারী।'

ইবনে ইসহাকের অপর একটি বর্ণনায় আর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। মক্কার মোশরেকরা যখন রসূল (স.)-এর সাথে আর কোনোভাবেই এঁটে উঠতে পারছিলো না এবং প্রতিটি গোত্র তার মধ্যকার মোমেন নরনারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে ও ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেও যখন সুবিধা করতে পারছিলো না, তখন এ ঘটনাটি ঘটে।

এ সময় বিশিষ্ট কোরায়শ নেতা উতবা অন্যান্য কোরায়শ নেতাদের সাথে বসেছিলো, আর রসূল (স.) মসজিদুল হারামে একাকী বসেছিলেন।

ওৎবা বললো, 'ওহে কোরায়শ জনতা, আচ্ছা, আমি যদি মোহাম্মাদের কাছে যাই এবং কিছু কিছু প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা করি তাহলে কেমন হয়? তাকে এমন কিছু প্রস্তাব দিতে পারি, যার কিছু অংশও হয়তো সে মেনে নেবে, ফলে সে আমাদের ধর্ম নিয়ে বিরূপ কথাবার্তা বলা বন্ধ করবে।'

এ সময় হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসূল (স.)-এর সংগী সাথীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছিলো।

ওৎবার কথা শুনে সবাই একযোগে বললো, 'ঠিক আছে। তুমি যাও এবং আলোচনা করো।'

ওৎবা গিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে বসলো। অতপর সে বললো, 'হে ভাতিজা! তুমি তো ভালো করেই জানো যে, আমাদের মধ্যে তোমার মর্যাদা কতো উচ্চে। অথচ তুমি তোমার গোত্রের কাছে একটা মারাত্মক বিব্রতকর তত্ত্ব নিয়ে এসেছো। এ দ্বারা তাদের ঐক্য বিনষ্ট করেছো, তাদেরকে নির্বোধ ঠাওরিয়েছো, তাদের ধর্ম ও দেবদেবীর নিন্দা করেছো, তাদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে অবিশ্বাসী সাব্যস্ত করেছো। এখন আমার কথা শোনো, আমি তোমার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি, তুমি তা বিবেচনা করে দেখ। হয়তো এর অন্তত কিছু অংশ তুমি মেনে নেবে।'

তখন রসূল (স.) বললেন, 'আচ্ছা বলুন, শুনবো।'

সে বললো, 'ভাতিজা! তুমি যদি এই নয়া ধর্ম প্রচার দ্বারা ধন সম্পদ লাভের বাসনা পোষণ করে থাকো তবে আমরাই তোমাকে চাঁদা আদায় করে এতো টাকা দেবো যে, তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবে। আর যদি সম্মান লাভের আশায় এসব করে থাকো, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেবো। তখন তোমাকে বাদ দিয়ে আমাদের কোনো ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে না। আর যদি রাজা হতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে রাজা হিসাবে বরণ করে নেবো। আর যদি মনে করো, যে জ্বিনটি তোমার কাছে আসে, তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে আমরা তোমাকে এ থেকে উদ্বার করতে সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো এবং প্রয়োজন হলে প্রচুর সম্পদ ব্যয় করে তোমাকে আরোগ্য করে তুলবো। আসলে এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে, যেখানে একজন মানুষের অধীনস্থ জ্বিন তার ওপর পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে, আর এ রকমের অবস্থার প্রতিকার উপযুক্ত চিকিৎসা ছাড়া সম্ভব হয় না।'

এ পর্যন্ত উৎবার কথা রসূল (স.) মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। কথা শেষ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওলীদের বাবা! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?'

সে বললো, 'হাঁ।'

রসূল (স.) বললেন, 'এবার আমার কথা শুনুন।'

সে বললো, 'বেশ, বলো।'

তখন রসূল (স.) বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম সহকারে সূরা 'হা-মীম-আস সাজদা' পড়তে শুরু করলেন। ওৎবা পিঠের পেছনে হাত রেখে তার ওপর হেলান দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো।

সূরার চতুর্থ রুকুর সেজদার আয়াত পর্যন্ত পড়ে তিনি সেজদা করলেন। তারপর বললেন!

'ওহে ওলীদের বাবা, যা শুনলেন, তা তো শুনলেনই। এখন আপনিই বিবেচনা করুন।'

এরপর ওৎবা উঠে তার সাথীদের কাছে গেলো। দূর থেকে তাকে দেখেই তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো যে, ওলীদের বাবা যেরকম মুখমন্ডল নিয়ে গিয়েছিলো, এখন মনে হয় তা বদলে গেছে।

ওৎবা তাদের কাছে গিয়ে বসামাত্রই সবাই বললো, 'তোমার কী হয়েছে?'

ওৎবা বললো, 'কি আর বলবো? আমি এমন কথা শুনেছি, আল্লাহর কসম, তেমন কথা আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, তা কোনো কবিতা নয়, যাদুও নয়, জ্যোতিষীদের কথাও নয়। ওহে কোরায়শ জনতা! তোমরা আমার কথা শোনো। এই সমস্যাটা তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও। মোহাম্মদ যা করছে তা তাকে করতে দাও। তোমরা তাকে একলা থাকতে দাও। কেননা আল্লাহর কসম, তার কাছে আমি যে বাণী শুনেছি, একদিন তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াবে। আরবরা যদি তাকে হত্যা করে তা হলে অন্যদের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। আর যদি সে আরবদের ওপর জয়ী হয়, তবে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব হবে, তার সম্মান তোমাদেরই সম্মান হবে এবং তোমরা তাকে পেয়ে ইনশাআল্লাহ সুখী হবে।'

এ কথা শুনে সবাই বললো, 'আল্লাহর কসম, হে ওলীদের বাবা, মোহাম্মদ তার ভাষা দিয়ে তোমাকেও জাদু করেছে!'

ওৎবা বললো, 'আমার মতামত আমি ব্যক্ত করলাম। এখন তোমরা যা ভালো মনে করো তাই করো।'

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ওৎবা সূরা 'হামীম আস সাজদা'-এর তেলাওয়াত শুনতে শুনতে যখন এ আয়াতে উপনীত হলো,

'তারা যদি এ দাওয়াতকে উপেক্ষা করে তা হলে তুমি বলে দাও যে, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদ জাতির ওপর আপতিত বিকট চিৎকারের মতো বিপদ থেকে হুশিয়ার করে দিয়েছি।'

তখন সে ভীত হয়ে রসূল (স.)-এর মুখের ওপর হাত রেখে বললো, 'হে মোহাম্মদ! তোমাকে আল্লাহর দোহাই এবং রক্ত সম্পর্কের দোহাই দিচ্ছি, আর বলো না।'

সে ঘাবড়ে গিয়ে ভেবেছিলো যে, এক্ষুণি বুঝি সেই আযাব এসে পড়বে। এরপর সে নিজের লোকদের কাছে চলে যায়।

উপরোক্ত দুটি বর্ণনার যেটিই সঠিক হোক না কেন, এটা যে কাফেরদের পক্ষ থেকে দরকষাকষির একটা নমুনা ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে এখানে রসূল (স.)-এর মহৎ ও অনুপম চরিত্রেরও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। ওৎবার অসার ও ফালতু কথা রসূল (স.)-এর কর্ণপাতের যোগ্য ছিলো না। তথাপি তিনি তা ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করে যে আদবের পরিচয় দেন, তা সত্যিই অতুলনীয়।

**মোশরেকদের অপর একটি কৌশল**

সমস্ত কথা বলা শেষ হলে শুধু শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?'

এর ভেতরে একাধারে সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা এবং অন্যের কথা শ্রবণের উঁচুমানের আদব এই দুটি মহৎ চারিত্রিক গুণই প্রতিফলিত হয়েছে।

ইবনে ইসহাকের আরেকটি বর্ণনায় দরকষাকষির তৃতীয় একটি রূপও দেখতে পাওয়া যায়। সেটি নিম্নরূপ,

'একদিন রসূল (স.) কা'বা তওয়াফ করছিলেন, এসময় তাঁর সামনে উপস্থিত হলো আসওয়াদ ইবনুল মোত্তালেব, ওলীদ ইবনুল মুগীরা, উমাইয়া ইবনুল খালাফ এবং আ'স ইবনুল ওয়ায়েল। এরা সবাই নিজ নিজ গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন।

তারা বললেন, 'হে মোহাম্মদ, এসো, আমরা এই মর্মে আপোস করি যে, তুমি যার এবাদাত করো আমরাও তার এবাদাত করবো আর আমরা যার এবাদাত করি তুমিও তার এবাদাত করবে। তাহলে এ কাজে তুমি ও আমরা সমঅংশীদার হয়ে যাবো। তুমি যার এবাদাত করো সে যদি আমরা যার এবাদাত করি তার চেয়ে ভালো হয়, তাহলে তার এবাদাতের কিছু কৃতিত্ব আমরাও অর্জন করবো। আর যদি আমাদের দেব-দেবীরা তোমার মাবুদের চেয়ে ভালো হয়, তাহলে তুমিও আমাদের দেব-দেবীদের কল্যাণের কিছু অংশ পাবে।'

এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

'হে মোহাম্মদ! তুমি বলে দাও, হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা যার এবাদাত করো আমি তার এবাদাত করবো না .... ।' (সূরা আল কাফেরুন।)

এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের হাস্যকর আপোস প্রস্তাবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দিয়ে দিলেন আর রসূল (স.) স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ মোতাবেক তাদের জবাব দিয়ে দিলেন।

এর পরের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সেসব অবিশ্বাসীর মধ্য থেকে একজনের প্রতি ইংগিত করে তার আনুগত্য করতে রসূল (স.)-কে বিশেষভাবে নিষেধ করছেন। তার ঘৃণ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাকে ভয়ংকর অপমানের হুমকি দিচ্ছেন। এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আসলে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর জীবনের দুর্লভ চারিত্রিক উপাদানটিকে আর একবার স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

**জঘন্যতম ৯টি চারিত্রিক দোষ**

'ঘন ঘন শপথকারী সেই নরাধমের আনুগত্য করো না, যে নিন্দুক, চোগলখোর, কৃপণ, যুলুমবাজ, পাপিষ্ঠ, কুটভাষী ও জারজ। তার এতো ধৃষ্টতার কারণ শুধু এই যে, তার অনেক ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি রয়েছে। যখনই তার সামনে আমার আয়াতগুলো পড়া হয় অমনি বলে উঠে যে, এতো সেকেলে কেচ্ছাকাহিনী। আমি অচিরেই তার শুঁড়ে দাগ লাগিয়ে দেবো।'

অনেকের মতে এ লোকটি হচ্ছে ওলীদ ইবনুল মুগীরা। এই নরাধম সম্পর্কে সূরা 'আল মোদ্দাসসের'-এও কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে,

'আমাকে এবং আমার সৃষ্টি করা ওই নরাধমকে একলা ছেড়ে দাও। যাকে আমি প্রচুর সম্পদ দিয়েছি, সদা উপস্থিত সন্তান-সন্ততি দিয়েছি এবং তার মান সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটিয়েছি। এরপরও সে আরো বেশী পাওয়ার জন্যে লালায়িত। না, কখখনো নয়। সে আমার আয়াতগুলোর বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্বেষপরায়ণ।'

'....আমি অচিরেই তাকে সাকার নামক দোজখে দগ্ধ করবো।'

এই ব্যক্তি কিভাবে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্তের পর চক্রান্ত এঁটেছে, সাহাবীদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়েছে, ইসলাম প্রচারের কাজে কিভাবে বাধা দিয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণেচ্ছু লোকদেরকে কিভাবে দূরে হটিয়ে দিয়েছে, সে সম্পর্কে বহুসংখ্যক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অনেকের মতে সূরা আল-কালামের এ আয়াতগুলো আখনাস বিন শুরাইকের উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। ওলীদ এবং আখনাস এরা দুজনই দীর্ঘদিন পর্যন্ত রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক শত্রুতা ও হিংসাত্মক অভিযান চালিয়েছিলো।

এ সূরায় যে কঠোর নিন্দাবাদ এবং সূরা 'আল মোদ্দাসসের' যে ভয়াবহ হুমকি উচ্চারিত হয়েছে আর অন্যান্য সূরাতেও যেখানে যে কড়া সমালোচনা করা হয়েছে, তা দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, ওলীদই হোক বা আখনাসই হোক, রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতায় তারা অত্যন্ত জঘন্য ভূমিকায় ছিলো এবং তাদের মানসিকতা ছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট, দুর্নীতিপরায়ণ এবং যাবতীয় সৎ প্রবণতা থেকে বঞ্চিত। অবশ্য অধিকাংশ বর্ণনা অনুসারে এই ব্যক্তি ছিলো ওলীদ ইবনে মুগীরা—আখনাস নয়।

কোরআন এখানে এই নরাধমের নয়টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে এবং এর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই অত্যন্ত জঘন্য।

প্রথমত, সে অতিমাত্রায় ও কথায় কথায় শপথকারী। কথায় কথায় ও ঘন ঘন শপথকারী মাত্রেই মিথ্যুক হয়ে থাকে। সে জানে যে লোকে তাকে মিথ্যুকই ভাবে এবং বিশ্বাস করে না। এ জন্যেই সে বেশী করে শপথ করে, যাতে তার মিথ্যা চিরস্থায়ী হয় এবং তার পক্ষে মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে।

দ্বিতীয়ত, সে এতো হীনমনা ও নিচ যে, কেউ তাকে শ্রদ্ধা তো করেই না, উপরন্তু তার কোনো আত্মসম্মান বোধও নেই। তার এই হীনমন্যতাও তাকে ঘন ঘন শপথ করতে বাধ্য করে। কেননা তাকে অন্যরাও যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি তার নিজের ওপরও নিজের আত্মবিশ্বাস নেই। যদিও তার ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচুর। বস্তুত হীনতা ও নিচতা এমন একটা মানসিক ব্যাধি যা অত্যন্ত প্রতাপশালী ক্ষমতাদর্পী শাসককেও আক্রান্ত করতে পারে। পক্ষান্তরে মহত্ব ও আত্মসম্মানবোধ এমন একটা গুণ যা থেকে একজন সম্মানী মানুষ কখনো বঞ্চিত হয় না। এমনকি পার্থিব সহায় সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকলেও না।

তৃতীয়ত, পরনিন্দা ও ছিদ্রান্বেষণ করা তার স্বভাব। মানুষের উপস্থিতিতেই হোক কিংবা অসাক্ষাতেই হোক, সে ইশারায় ইংগিতে ও কথাবার্তায় তাদের নিন্দা করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত ঘৃণীত স্বভাব। এটি একটি কাপুরুষোচিত স্বভাব এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভদ্রতার বিরোধী। ছোট বড় সবাইকে সম্মান করা মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোরআনের একাধিক জায়গায় এই পরনিন্দা ও কুৎসা রটনার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। সূরা আল হুমাযা'তে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'প্রত্যেক নিন্দুক ও ছিদ্রান্বেষীর জন্যে জাহান্নামের আযাব নির্ধারিত রয়েছে।'

সূরা 'আল হুজুরাত'-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মোমেনরা, কোনো গোষ্ঠী যেন অপর কোনো গোষ্ঠীকে ঠাট্টা উপহাস না করে। তারা তাদের চেয়ে উত্তমও হতে পারে। নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে ঠাট্টা উপহাস না করে, তারা তাদের চেয়ে ভালোও হতে পারে। একে অপরের কুৎসা রটনা এবং একে অপরকে খারাপ নামে ডেকো না।' বস্তুত এ সবই হচ্ছে এক এক ধরনের নিন্দা।

চতুর্থত, সে চোগলখোর, অর্থাৎ একজনের কাছে গিয়ে আরেকজনের এমন দুর্ণাম করে যে, তার ফলে উভয়ের মন খারাপ হয় এবং প্রীতি স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হয়। এটা একটা জঘন্য ও নিকৃষ্ট স্বভাব। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কোনো মানুষ কিংবা অন্যদের কাছে সম্মান লাভে আকাঙ্খী কেউ নিজের ভেতরে এ ধরনের গুণ লালন করতে পারে না। এমনকি যারা চোগলখোরের চুগলী শোনার জন্যে কান পেতে থাকে তারাও চোগলখোরকে অন্তর দিয়ে সম্মান করে না।

রসূল (স.) স্বয়ং সবাইকে নিষেধ করতেন যেন কেউ তার কাছে তার কোনো সাহাবী সম্পর্কে এমন কোনো কথা না বলে যাতে তার ওপর তাঁর মন খারাপ হয়। তিনি বলতেন,

'তোমাদের কেউ যেন আমার কাছে আমার কোনো সাহাবী সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা না বলে। কেননা আমি চাই সম্পূর্ণ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে আমি তোমাদের কাছে আসি।'

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, একবার দুটি কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় রসূল (স.) বললেন,

'এদের উভয়ের আযাব হচ্ছে, আর এ আযাবের কারণ বড় কিছু নয়। একজন প্রস্রাবের সময় গোপনীয়তা অবলম্বনে যত্নবান হতো না, আর অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াতো।'

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, 'চোগলখোর ব্যক্তি বেহেশতে যাবে না।' (ইবনে মাজা ব্যতীত সকল সহীহ হাদীসগ্রন্থ)।

আর একবার রসূল (স.) বলেন, 'শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে। আর নিকৃষ্টতম মানুষ হলো চোগলখোর, যে প্রিয়জনদের ভেতর বিরোধ সৃষ্টি করে এবং নির্দোষ লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।'

এই ঘৃণ্য চারিত্রিক দোষটি সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার আগে মানুষের মন বিগড়ে দেয়, সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় এবং কুৎসা রটনাকারীকে সমাজের নিকৃষ্টতম মানুষে পরিণত করে। আর সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করার আগে মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা ধ্বংস করে দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি সাধন করে। তাই ইসলাম চোগলখুরিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরী বিবেচনা করে।

পঞ্চমত, সে সকল কল্যাণ ও মংগলের প্রতিবন্ধক। কল্যাণ থেকে নিজেকে এবং অন্যকে সমভাবে বঞ্চিত রাখতো। ঈমান হচ্ছে সকল কল্যাণের উৎস। সেই ঈমান থেকে সে সব সময় সবাইকে বাধা দিতো। বর্ণিত আছে যে, সে তার সন্তানদেরকে ও আত্মীয়স্বজনকে সর্বদাই বলতো যে, তোমাদের কেউ মোহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করলে আমি তার কোনো উপকার করতে পারবো না। যখনই তার কোনো আপনজন রসূল (স.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে বলে তার মনে হতো, তখনই এ ধরনের হুমকি দিয়ে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখতো। এ জন্যে কোরআন তাকে 'কল্যাণের প্রতিবন্ধক' এই বিশেষণ দ্বারা চিত্রিত করেছে। কেননা সে তার কথা ও কাজ দ্বারা যে কোনো মংগলের পথ আগলে রাখতো।

ষষ্ঠত, সে ছিলো চরম সীমা অতিক্রমকারী। সত্য ও ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করাই ছিলো তার স্থায়ী স্বভাব। রসূল (স.) তাঁর আপনজন ও মুসলমানদের ব্যাপারে সে সীমা অতিক্রম করতো। তাদেরকে হেদায়াত ও ইসলামের পথে অগ্রসর হতে বাধা দিতো। সীমা অতিক্রম করা, আগ্রাসন, একটা ঘৃণ্য চারিত্রিক দোষ। কোরআন ও হাদীস এই দোষের কঠোর সমালোচনা করেছে এবং ইসলাম এ দোষের যে কোনো রূপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এমনকি পানাহারের ব্যাপারেও সীমা লংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমার দেয়া পবিত্র জীবিকা থেকে আহার করো তবে সে ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করো না।' কেননা ন্যায়বিচার, মধ্যম পন্থা অবলম্বন ও ভারসাম্য রক্ষা করা ইসলামের মৌল বৈশিষ্ট্য।

সপ্তমত, সে পাপিষ্ঠ অর্থাৎ সে অব্যাহতভাবে পাপে লিপ্ত থাকার কারণে পাপাচার তার স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়। এখানে তাকে শুধু পাপিষ্ঠ বলা হয়েছে এবং কি কি পাপে সে লিপ্ত হয় তার উল্লেখ করা হয়নি। পাপাচার তার বৈশিষ্ট্য এবং পাপ তার চরিত্রের স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য অংশ—এ কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

অষ্টমত, সে উগ্র, একগুঁয়ে, গোঁয়ার, যুলুমবাজ, হিংস্র, কটুভাষী, দুরাচার ও লোভাতুর। মূল আরবী শব্দ হচ্ছে 'উতুল্লুন'।

উল্লেখিত একাধিক খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোর সমাবেশই এর তাৎপর্য। কেউ কেউ বলেন, উগ্র ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির দুরাচারী, অতি মাত্রায় পেটুক, সৎ কাজের পথে বাধা দানকারী ও প্রতিহিংসা পরায়ণ ব্যক্তিকে আরবীতে 'উতুল্লুন' বলা হয়। হযরত আবুদ্দারদার ব্যাখ্যা অনুসারে সব সময় খাওয়ার চিন্তায় বিভোর থাকে তার কথাই বুঝানো হয়েছে। বদস্বভাব, মাত্রাতিরিক্ত পেটুক, ভীষণ কৃপণ ও অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিকেও 'উতুল্লুন' বলা হয়। তবে 'উতুল্লুন' শব্দটি এই সমস্ত কু-খাসলাতের অধিকারী ব্যক্তি বুঝাতে অন্য যে কোনো শব্দের চেয়ে বেশী উপযোগী। এ শব্দটি সর্বদিক দিয়ে এই ব্যক্তির বিভৎস ব্যক্তিত্বের নিখুঁত ছবি তুলে ধরে।

নবমত, কোরআনের ভাষায় সে 'যানীম'। এটি ইসলামের কোনো শত্রুর মধ্যে যে সব নিন্দনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্টের সমাবেশ ঘটা সম্ভব তার সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যাদের ভেতরে বিরাজ করে তারাই প্রচন্ডভাবে ইসলামের শত্রুতা চালিয়ে যেতে পারে।

যানীমের অর্থ একাধিক। একটি অর্থ হলো, যার বংশ পরিচয় অজানা বা সন্দেহজনক, কোনো গোত্রে প্রবেশ করা নাম গোত্রহীন ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিজের কুকর্মের আধিক্য ও ঘৃণ্য স্বভাবের জন্যে ব্যাপক কুখ্যাতি অর্জন করে। এই শেষোক্ত অর্থটি ওলীদ ইবনুল মুগীরার সাথে অধিকতর সাম স্যপূর্ণ। শব্দটি তার ওপর প্রয়োগের দরুণ তাকে যদিও গোত্রের সবচেয়ে হীন ও নিচু ব্যক্তি বলে মনে হয়, কিন্তু সে ছিলো একজন প্রতাপশালী বলদর্পী ধুরন্দর ব্যক্তি।

এসব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা তার চরিত্রের আর একটি কালো দিক উন্মোচন করছেন। সেটি হলো আল্লাহর আয়াতের সাথে তার আচরণ এবং সেই সাথে এই আচরণের জন্যে তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর দেয়া বিপুল বিত্তবৈভব ও সন্তানাদির প্রতিদানে সে আল্লাহর আয়াতের সাথে এহেন আচরণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যেহেতু তার অনেক ধন সম্পদ ও সন্তানাদি আছে, তাই তার সামনে আমার আয়াত পড়া হলে সে বলে ওঠে যে, এতো হচ্ছে প্রাচীন আমলের কিংবদন্তির গল্প।'

একজন মানুষ আল্লাহর দেয়া অগাধ ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রতিদানে যদি আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপহাস করে—তাঁর চেয়ে জঘন্য আচরণ আর কি হতে পারে? এই একটিমাত্র অসৎ গুণ পূর্বে বর্ণিত সব কয়টি নিকৃষ্ট চারিত্রিক গুণের সমান।

এ জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে বজ্র কঠোর হুমকি। এ হুমকি দেয়া হয়েছে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির জন্যে তার গর্ব ও অহংকারের বিরুদ্ধে। ইতিপূর্বে নিজের পদমর্যাদা ও বংশ মর্যাদার কারণে অহংকার বোধ করার জন্যেও তিরস্কার ভর্ৎসনা করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর অকাট্য প্রতিশ্রুতিও উচ্চারিত হয়েছে যে,

'আমি অচিরেই তার শুঁড়ে দাগ দিয়ে দেবো।'

'খুরতুম'-এর শাব্দিক অর্থ যদিও শুঁড়, কিন্তু প্রচলিত পরিভাষায় এর অর্থ হলো শুকরের নাকের উঁচু অংশ। সম্ভবত এখানে এই শেষোক্ত অর্থই গৃহীত হয়েছে এবং তার নাকের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আবার আরবী ভাষায় 'আনফ' বা নাক দ্বারা রূপক অর্থে সম্মান বুঝানো হয়। তাই তার শুঁড়ে তথা নাকে দাগ দেবো এ কথার অর্থ দাঁড়ায় তাকে অপমান করবো।

এ কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, ওলীদ এই আয়াতগুলো দ্বারা নিদারুণ অপমানে জর্জরিত হয়েছিলো। কেননা সে এমন একটি জাতির লোক ছিলো, যারা ছোট খাটো নিন্দাসূচক কবিতাকেও যথার্থ নিন্দা মনে করতো, এমনকি তা ভিত্তিহীন নিন্দা হলেও। আরবের সম্ভ্রান্ত লোক মাত্রেই কবিদের সমালোচনা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতো। আর যদিও এই নিন্দা সমালোচনা কোনো কবির পক্ষ থেকে নয় বরং স্বয়ং আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার পক্ষ থেকে করা হয়, তাহলে কি অবস্থা হতে পারে সহজেই অনুমেয়। এই সমালোচনার কোনো তুলনা নেই। কেননা এটি এমন অমর ও অক্ষয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বে ও সকল মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়বে। আর এর ফলে এটি পৃথিবীতে একটা চিরস্থায়ী কলংক হিসাবে বিরাজ করবে। আল্লাহর রসূল (স.) ও তাঁর দ্বীনের দুশমনের জন্যে এরূপ ধিক্কার ও নিন্দারই প্রয়োজন ছিলো।

ধনবল ও জনবল নিয়ে গর্বিত ব্যক্তিদের জন্যে এখানে আল্লাহ তায়ালা উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনা আরবদের জানা ছিলো বলে প্রতীয়মান হয়। এ ঘটনার শিক্ষা এই যে, আল্লাহর দেয়া ধন সম্পদ নিয়ে অহংকার করা, কৃপণতা ও অন্যদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার পরিণতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে থাকে। এ ঘটনা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের হাতে যত ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আছে, তা পরীক্ষাস্বরূপ। আলোচ্য ঘটনার নায়কদেরকেও এরূপ পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। মক্কার কাফেরদেরকেও বিপুল ধন সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এ পরীক্ষার সুফল বা কুফল তাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

### একটি বিখ্যাত ঘটনা ও তার ব্যাখ্যা

এরশাদ হয়েছে, 'আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন করেছিলাম বাগিচার মালিকদেরকে। তারা কসম খেয়েছিলো যে, সকাল হতে না হতেই বাগানের ফল পেড়ে ফেলবো, তারা কিন্তু 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি। ফলে সেই বাগানের ওপর দিয়ে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা প্রলয়ংকরী ঝড় বয়ে গেলো। তখন তারা ঘুমিয়েছিলো। ব্যাস্, আর যায় কোথায়। সকালে দেখা গেলো গোটা বাগান যেন ফসল তুলে নেয়া মাঠে পরিণত হয়ে গেছে।

এদিকে ভোর বেলায় তারা পরস্পরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো যে, ফল পাড়তে হলে তোমরা বাগানে সকালে সকালে চলো। তারা গোপনে এরূপ সলাপরামর্শ করতে করতে গেলো যে, আজ যেন কোনো অভাবী মানুষ বাগানো ঢুকতে না পারে। এখন তারা হকদারদেরকে বঞ্চিত করাতে সক্ষম ছিলো। কিন্তু যখন তারা বাগানটি দেখলো তখন বললো যে, আমরা পথ ভুলে এসেছি। (পরক্ষণেই বললো) না, বরং আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিটি বললো, আমি তোমাদের বলেছিলাম না যে, তোমরা কেন আল্লাহর গুণগান করো না? তারা বললো, আমরা আল্লাহর গুণগান করছি। আমরা তো যুলুম করে ফেলেছি। অতপর একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো।

তারা বললো, 'হায় আফসোস, আমরা সীমা অতিক্রম করেছিলাম। আশাকরি আমাদের প্রভু আমাদেরকে এই বাগানের পরিবর্তে আরো ভালো কিছু দেবেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি অনুরক্ত।'

এরশাদ হয়েছে, 'এভাবেই আযাব এসে থাকে, আর আখেরাতের আযাব সবচেয়ে বড়, যদি তারা জানতো।'

এ ঘটনাটা হয়ত তৎকালের একটা বিখ্যাত ঘটনা ছিলো। তবে কোরআন শুধু গল্প বলার জন্যে এর অবতারণা করেনি। কোরআন শুধু আল্লাহর কাজ ও ক্ষমতা এবং তার কোনো কোনো বান্দাকে তিনি কিভাবে পরীক্ষা করেন তা বুঝানোর জন্যে এ ঘটনা বর্ণনা করেছে। এ বিবরণের নেপথ্যে একটা গ্রামের সহজ সরল অধিবাসীদের ছবি দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত এ ঘটনা যাদেরকে শুনানো হচ্ছে, সেই আরববাসীর জন্যে এটা অধিকতর উপযোগী ছিলো। তারা আল্লাহর বিধানকে অমান্যকারী হঠকারী লোক ছিলো বটে, তবে তাদের মগজ অপেক্ষাকৃত সরল ছিলো, পেঁচানো বা জটিল ছিলো না। কোরআন যে ভংগীতে ও যে উদ্দেশ্যে কিচ্ছা কাহিনী বলে, আলোচ্য ঘটনা সেই উদ্দেশ্যের দিকেই পথ নির্দেশ করছে। এ ঘটনা এমন নাটকীয়ভাবে ও আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছে যে, শ্রোতার মনে তা জানার প্রচন্ড কৌতুহল সৃষ্টি হয়।

এতে মানুষের চেষ্টা তদবীর ও চক্রান্তকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং আল্লাহর ব্যবস্থাপনার সামনে তা কতো অক্ষম ও অসহায় তা দেখানো হয়েছে। ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্যে এমন প্রাঞ্জল ও জীবন্ত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যে, শ্রোতা বা পাঠকের কাছে তা এই মুহূর্তের একটি ঘটনা বলে মনে হয়।

এবার আসুন কোরআনের ভাষায় ঘটনাটি যেভাবে এসেছে, আমরা সেভাবে তার ওপর দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করি।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কোনো এক সময়ে একজন পুণ্যবান ব্যক্তির একটি ফলের বাগান ছিলো। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, সে ফলের বাগানের ফলের একটা অংশ দরিদ্র লোকেরা নিয়মিত পেতো। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর উত্তরাধিকারীরা দরিদ্র লোকদেরকে কোনো অংশ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর থেকে ঘটনার বিবরণটি শুনুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি মক্কার কাফেরদেরকে অবিকল সেইভাবে পরীক্ষা করেছি যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে।'

তারা কসম খেয়েছিলো যে, সকাল বেলায় তারা ফল পাড়বেই এবং কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে কিছুই দেবে না। তারা জানতো যে, ফল পাড়ার খবর শুনে দরিদ্র লোকেরা অবশ্যই আসবে। তাই তারা গভীর রাতে পরামর্শ করলো যে, তারা সকাল সকালে ও দ্রুতগতিতে ফল পাড়তে হবে যেন কেউ জানতেই না পারে এবং কাউকে কিছু দিতে না হয়। কিন্তু সেই রাতের অন্ধকারে তাদের অজ্ঞাতসারে ঘটে গেলো অন্য এক ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা তো চিরজাগ্রত। তিনি কখনো ঘুমান না, তিনি তাদের অসদুদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্যে গভীর কৌশল খাটালেন। এটা ছিলো তাদের অকৃতজ্ঞতার শাস্তি। কেননা তারা আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরি করেছিলো, কল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত থেকেছিলো এবং দরিদ্র লোকদের নির্দিষ্ট প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য করেছিলো। তাই সবাই যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন অতর্কিতে অতি সংগোপনে এক সুক্ষ্ম ঘটনাটি সংঘটিত হলো। কোরআনের ভাষায়,

'তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক ঘুর্ণায়মান বস্তু (ঘূর্ণিবায়ু) সে বাগানের ওপর চক্কর দিলো। তখন তারা ঘুমন্ত ছিলো। ফলে সকাল বেলায় সে বাগান এমন একটা মাঠের রূপ ধারণ করলো যেখানে থেকে ফসল কেটে নেয়া হয়েছে।'

সেই ঘূর্ণিবায়ু বা আল্লাহর আযাব তার ফসলাদিকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে!

অতি প্রত্যুষে সেই কুচক্রী বাগান মালিকেরা তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক পরস্পরকে ডাকাডাকি করতে লাগলো যে,

'তোমরা তোমাদের খামারের দিকে সকাল সকাল চলো– যদি তোমাদের ফসল কাটার ইচ্ছা থেকে থাকে!'

অর্থাৎ সবাই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে, উৎসাহ দিতে দিতে এবং পরামর্শ দিতে দিতে চললো। এরপর কোরআন তাদেরকে নিয়ে কিভাবে উপহাস করছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদেরকে ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে চলমান দেখানো হচ্ছে। ভাবখানা এই যে, তারা তাদের কৌশলটাকে একেবারেই অব্যর্থ বানিয়ে ফেলেছে এবং তারা যেন নির্ঘাত গরীব দুঃখীদের বঞ্চিত করে সকল ফল কেটে না এনে আর ছাড়ছেই না!

'তারা চললো ফিসফিস করে এ কথা বলতে বলতে যে, আজ আর কোনো দরিদ্র যেন কিছুতেই বাগানে ঢুকতে না পারে।'

পরবর্তী আয়াতেও তাদের প্রতি উপহাস অব্যাহত রয়েছে। যেন আমরা কোরআনের পাঠক শ্রোতারা সে বাগানের ওপর কি ঘটেছিলো তা জানি, অথচ বাগানের মালিকরা জানেনা। আসলেও আমরা মোমেন পাঠক-পাঠিকারা বাগানের দিকে অগ্রসরমান গোপন ও সুক্ষ্ম হাতটিকে দেখেছি। দেখেছি তা কিভাবে তার সমস্ত ফসল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সেই ভয়ংকর গোপন ঘূর্ণিবায়ু সংঘটিত হবার পর দেখলাম, ক্ষেতটি এমন বিরাণ হয়ে আছে যেমনটি ফসল কেটে নেয়ার পর হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা যথারীতি উপহাসের সূরে বলছেন,

'তারা বঞ্চিত করার ক্ষমতা হাতে নিয়ে সকাল সকাল ছুটে গেলো।'

বস্তুত বঞ্চিত করার ক্ষমতা তাদের ছিলো বৈ কি? অন্যকে না হোক, অন্তত নিজেদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা তো তাদের ছিলোই!

তারা এরপর অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ভড়কে যাচ্ছে। আয়াতের বক্তব্যের সাথে সাথে আমরাও যেন উপহাস করতে করতে চলেছি এবং তাদেরকে দেখছি হতবুদ্ধি হয়ে যেতে।

'অতপর তারা যখন বাগানটি দেখলো, বললো 'আমরা পথ ভুলে এসেছি।'

অর্থাৎ এতো আমাদের সেই আপাদমস্তক ফলে টইটম্বুর বাগান নয়! আমরা নিশ্চয়ই সে পথ হারিয়ে অন্য কোথাও এসে পড়েছি। কিন্তু ক্ষণেক পরেই তারা সম্বিত ফিরে পায় এবং নিশ্চিত হয়ে বলে, 'বরঞ্চ আমরাই বঞ্চিত হয়ে গেছি।' বস্তুত এটাই হলো সুনিশ্চিত সংবাদ।

এখন তারা যখন তাদের রাতের বেলার সলাপরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের পরিণাম ভোগ করছে এবং অকৃতজ্ঞতা ও কৃপণতার শাস্তি হাতে হাতে পেয়ে গেছে। এখন তাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে মধ্যমপন্থী এবং সবচেয়ে সৎ ব্যক্তিটি এগিয়ে এলো। দেখে মনে হয় সে এদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতো। তবে নিজের ভিন্ন ও একক মত অন্যদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সেও তাদের অনুসরণ করে। যে সত্য সে সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলো তার ওপর সে দৃঢ়তা দেখায়নি। ফলে অন্যদের মতো তাকেও গ্রাস করলো বঞ্চনা। কিন্তু ঘটনার পর সে তাদেরকে তার পূর্বেকার সদুপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে বলে, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, 'তোমরা আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করো না কেন?' আর সময় ও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর এখন তারা তাদের সদুপদেশদাতার কথা মান্য করলো।

তারা বললো, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা অপরাধী।'

যখন একটি দল কোনো খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হয়, তখন তাদের একে অপরকে দোষারোপ করা একটি স্বাভাবিক রীতি।

এই বাগানের মালিকরাও তাই করলো,

'তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগলো।'

শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়ে পরক্ষণেই তারা পারস্পরিক দোষারোপ বন্ধ করে সকলেই নিজ নিজ ভুল স্বীকার করলো, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদের অকৃতজ্ঞতা, কৃপণতা ও চক্রান্তের দায়ে যে বাগান ধ্বংস হয়েছে যেন তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়।

তারা বললো, 'হায় পোড়া কপাল! আমরা সীমা অতিক্রমকারী ছিলাম। আশা করা যায়, অচিরেই আমাদের প্রতিপালক আমদেরকে এর চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প দেবেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি আগ্রহী।'

সর্বশেষ দৃশ্যের যাবনিকাপাতের আগে আমরা মন্তব্য শুনতে পাই 'এ রকমই হয়ে থাকে আযাব, আর আখেরাতের আযাব আরো বড়, যদি তারা জানতো!'

অনুরূপভাবে নেয়ামত দিয়েও মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। কাজেই মক্কার মোশরেকদের জানা উচিত যে, আমি সে বাগানওয়ালাদের মতো তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি। পরীক্ষার ফল কি হয় তার দিকে যেন তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। আর দুনিয়ার পরীক্ষা ও আযাবের চেয়েও ভয়াবহ যে আযাব, তা থেকে সতর্ক হওয়া উচিত, সেটি হচ্ছে আখেরাতের আযাব।

কোরআন এভাবে কোরায়শ জনগোষ্ঠীকে এই বাস্তব অভিজ্ঞতাটি অবহিত করে। এটি গল্পাকারে তাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো। তাই কোরআন অতীত ও বর্তমান কালের মানুষের মধ্যে আল্লাহর যে চিরাচরিত নীতি রয়েছে তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। আর তাদের মনে এই শিক্ষা বদ্ধমূল করে যে, আল্লাহর সেই নীতি এখনো তাদের বাস্তব জীবনে কার্যকর রয়েছে।

**শত্রুদের ধন সম্পদ দেখে প্রতারিত হয়ো না**

সংগে সংগে মোমেনদের মনে এই চেতনা সৃষ্টি করে যে, বড় বড় পৌত্তলিক নেতার বিশেষত কোরায়শ নেতাদের জীবনে জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসবহুল জীবনের যে লক্ষণ দেখা যায় তা আসলে আল্লাহর পরীক্ষা। এর ফলাফল আছে এবং পরিণতি আছে। আর আল্লাহর রীতি এই যে, তিনি দুঃখ কষ্ট দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেন, তেমনি সুখ সম্ভোগ দিয়েও পরীক্ষা করেন।

যারা অঢেল সুখ সমৃদ্ধি পেয়ে পরিণাম ভুলে যায় এবং কৃপণতা ও অকৃতজ্ঞতার প্রদর্শন করে, তাদের পরিণতির জন্যে এ ঘটনা একটা নমুনা। আখেরাতে তাদের জন্যে এর চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। আর মোত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তি যারা সংহত জীবন যাপন করেছেন, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশ্ত।

'নিশ্চয় সংযত আল্লাহভীরুদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ অনেক বেহেশত।'

এ হলো তুলনামূলক পরিণতির ঘোষণা। একই সাথে এ আয়াতে মত, পথ ও আচরণের তুলনা করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধী দুই আচরণের পথও ভিন্ন, গন্তব্যও ভিন্ন।

এখানে এসে কোরআন একটা বিতর্ক উপস্থাপিত করে। এ এক সহজ ও সরল বিতর্ক। মানুষকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কোরআন চ্যালেঞ্জ দেয়। সে প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জের একটিমাত্রই জবাব রয়েছে। এ জবাবের মধ্যে রয়েছে আখেরাতে ভয়াবহ দৃশ্যের হুমকি, আর দুনিয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার হুশিয়ারী।

'আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের সমপর্যায়ে রাখবো? তোমাদের কি হয়েছে?.....'

এর জবাব স্পষ্টতই নেতিবাচক। এর জবাব এই যে-না, তা হতেপারে না। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি অবিচল আস্থাশীল। তারা কখনো অপরাধীদের মতো হতে পারে না। কারণ অপরাধীরা স্বেচ্ছায় অপরাধের ভেতরে ডুবে থাকে। তাই বুদ্ধি ও ন্যায়নীতি উভয়ের বিচারেই মুসলিম-অমুসলিম নির্দোষ ও অপরাধীরা কখনো প্রতিদানের বেলায় একসমান হতে পারে না।

এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আর একটি প্রশ্ন করা হচ্ছে,

'তোমাদের কি হলো? তোমরা কি ধরনের বিচার বিবেচনা করো?'

অর্থাৎ কিসের ভিত্তিতে তোমরা বিচার বিবেচনা ও মতামত প্রতিষ্ঠা করে থাকো? কোন্ কষ্টিপাথরে তোমরা বিভিন্ন মূল্যবোধ যাচাই করো যে, তোমাদের দাঁড়িপাল্লায় ইসলাম গ্রহণকারীরা অপরাধীর সমপর্যায়ে পরিগনিত হয়?

এরপর কিছুটা বিদ্রুপের ভংগীতে বলা হয়,

'তবে কি তোমাদের কাছে কোনো গ্রন্থ আছে যা তোমরা পাঠ করে থাকো এবং সেই মতে তোমরা যা খুশী মত পোষণ করে থাকো।'

বস্তুত এটা সুস্পষ্ট বিদ্রূপ যে, মোশরেকদের কাছে কেতাব আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং সেই কেতাব এমন যে, আগে কোনো বুদ্ধি বিবেক বা ন্যায়নীতি দ্বারা সমর্থিত নয় এমন মতামতও তা সমর্থন করে এবং তা ইসলাম গ্রহণকারী ও অপরাধীকে এক কাতারে দাঁড় করানো হয়। ওটাতো একখানা হাস্যকর পুস্তক, যা তাদের প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনাকে সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়। যেমন ধরনের আইন বিধি তারা পছন্দ করে তা বানিয়ে নেয়ার অনুমতি দেয়। তা কোনো সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ নেয়না এবং ভালো ও যুক্তি সম্মত জিনিসের প্রতি সমর্থন দেয় না।

'তাদের কি আমার ওপর কেয়ামত পর্যন্ত এই মর্মে শপথ ছিলো যে, তোমরা যেমন খুশী সিদ্ধান্ত নিতে পারো?'

অর্থাৎ তাদের কাছে যদি সে ধরনের কোনো কেতাব না থেকে থাকে, তবে আল্লাহর নামে কিছু শপথ রয়েছে কিনা যা কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে এবং যা তাদেরকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দিয়েছে? জানা কথা যে, এ ধরনের কিছুই নেই। কাজেই আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে কোনো ওয়াদা নেই এবং অংগীকারও নেই।

'তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা করো, তাদের মধ্যে কে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল'।

অর্থাৎ কে তাদেরকে এ ধরনের অংগীকার দিয়েছে? কে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, আল্লাহর কাছে তারা যা চাইবে তাই পাবে এবং তাদের জন্যে কেয়ামত অবধি কার্যকর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তারা যা খুশী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে?

আসলে এ হচ্ছে তাদের প্রতি কোরআনের এক গভীর ও নির্মম পরিহাস।

'অথবা তাদের কি কিছু অংশীদার রয়েছে? থাকলে তাদেরকে নিয়ে আসুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে।' আল্লাহ তায়ালা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন যে,

'যাদেরকে তারা আল্লাহর অংশীদার ভেবে পূজা করছে তাদেরকে নিয়ে আসুক।'

**কাফেরদের করুন পরিনতি**

'যেদিন পায়ের নলা নগ্ন হবে এবং তাদেরকে সাজদা করতে বলা হবে কিন্তু তা করতে পারবে না।'

এখানে কোরআন কাফেরদেরকে এমনভাবে কেয়ামতের দৃশের মুখোমুখী দাঁড় করায় যেন সে দৃশ্য এই মুহূর্তেই উপনীত! যেন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে যে, তারা তাদের কল্পিত উপাস্যদেরকে ডেকে আনুক। শ্রোতাদের সামনে তাকে এভাবে তুলে ধরা কোরআনের চিরাচরিত রীতি এবং তা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও উদ্দীপক।

আয়াতটিতে যে 'পায়ের নলা নগ্ন হওয়ার' কথাটা বলা হয়েছে, প্রচলিত আরবীতে তার অর্থ হলো কঠিন বিপদ মুসিবত আপতিত হওয়া। তাই কেয়ামতের দিনের পরিচয় দাঁড়ালো এই যে, যেদিন কঠিন বিপদ মুসিবত আপতিত হবে এবং দিনটির ভয়াবহতা এতো বেশী হবে যে, মানুষ পায়ের নলার ওপর কাপড় তুলে ছুটোছুটি করবে। সেদিন এইসব অংহকারী মানুষকে সাজদা করতে ডাকা হবে কিন্তু তারা সাজদা করতে পারবে না। এর কারণ এও হতে পারে যে, তার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। কেননা সাজদার স্বাভাবিক সময় ছিলো কেয়ামতের আগে ও মৃত্যুর আগে। অথবা এও হতে পারে যে, কোরআনের অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে,

'কাফেররা সেদিন ঘাড় ঝুঁকিয়ে চোখ নামিয়ে থাকবে।'

তাদের দেহ ও দেহের রগসমূহ প্রচন্ড ভয়ে বাঁধা থাকবে এবং অনিচ্ছা সত্তেও তাদের দেহ এমনভাবে আড়ষ্ট থাকবে যে, কিছুতেই তা সাজদা দেয়ার জন্যে ঝুঁকতে পারবে না। মোটকথা, এ বিবরণ দ্বারা কেয়ামতের ভয়াবহ কষ্টদায়ক পরিস্থিতিকেই এখানে বুঝানো হয়েছে।

এরপর তাদের আকৃতির চিত্র অংকন সম্পূর্ণ করা হয়েছে এই বলে,

'তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত এবং তারা আপাদমস্তক লাঞ্ছনা গঞ্জনায় জর্জরিত থাকবে।'

এইসব অহংকারী সমাজপতিদের গর্বস্ফীত ঘাড় ঝুঁকে যাবে, তাদের চোখ নত হবে এবং অপমানে জর্জরিত হবে এটা বিস্ময়কর বৈ কি।

সূরার শুরুতে 'অচিরেই তার শুঁড়ে দাগ দেবো' যে হুমকি দেয়া হয়েছে এ আয়াত সেই হুমকি ও হুশিয়ারীকেই স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে। বস্তুত এ আয়াতে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থা দৃশ্যমান।

আর এ অবমাননাকর অবস্থা দেখা দেওয়ার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের শেষাংশে, 'অথচ ইতিপূর্বে যখন তাদেরকে সাজদা করার আহবান জানানো হতো, তখন তারা সুস্থ ছিলো।' অর্থাৎ সাজদা করার ক্ষমতা তাদের ছিলো, কিন্তু তারা সাজদা করতে অস্বীকার করতো। এ কারণেই কেয়ামতের দিন তাদের অমন শোচনীয় অবস্থা হবে।

**কাফেরদের জন্যে চরম হুমকি**

এর পরবর্তী আয়াতেও রয়েছে মনে আতংক সৃষ্টিকারী আরো একটি হুমকি,

'আমাকে ও আমার এই বাণীকে যে প্রত্যাখ্যান করে তাকে একলা ছেড়ে দাও।'

হৃদয় কাঁপানো এই হুমকিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে (স.) বলছেন যে, এই বাণীকে যে প্রত্যাখ্যান করে তার সাথে আমাকেই লড়তে দাও, তাকে শায়েস্তা করতে আমি একাই যথেষ্ট। এই প্রত্যাখ্যানকারী কে? সে হচ্ছে এই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও দুর্বল মানুষ। পিঁপড়ের মতো ক্ষুদ্র, তুলোর মতো হালকা, এমনকি বলতে গেলে মহা পরাক্রান্ত আল্লাহর দোর্দন্ড প্রতাপের সামনে সে একেবারেই অস্তিত্বহীন এইটি ক্ষুদ্র মানুষ।

তাই হে মোহাম্মদ! এই সৃষ্টিকে ও আমাকে একলা ছেড়ে দাও। তুমি ও তোমার সাথী মোমেনরা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো। কারণ ওদের যুদ্ধ তো আমার সাথে। তোমার সাথেও নয়, মোমেনদের সাথেও নয়। যুদ্ধ আমারই সাথে, আর এই সৃষ্টি আমার দুশমন। তার দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি। ওর সাথে বোঝাপড়ার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমরা বিশ্রাম নাও।

অবিশ্বাসীদের জন্যে কি সাংঘাতিক শাসানি! আর মোমেনদের জন্যে কি চমৎকার প্রশান্তি! এরপর মহা প্রতাপশালী আল্লাহ তায়ালা তার এই ক্ষুদ্র ও দুর্বল সৃষ্টির সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনা পেশ করছেন!

'তারা টেরও পাবে না এমনভাবে আমি তাদেরকে ধাপে ধাপে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবো। আমি তাদেরকে সময় দিচ্ছি। আমার কৌশল অতীব সূক্ষ্ম।'

অবিশ্বাসীরা এবং সমগ্র বিশ্ববাসীরা একত্রিত হলেও আল্লাহর সামনে এতো ক্ষুদ্র ও দুর্বল যে, তাদেরকে জব্দ করতে আল্লাহর এতসব কৌশল অবলম্বন করতে হয় না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সতর্ক করে দেন যেন সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তারা নিজেদেরকে সামাল দিতে পারে। তাদেরকে জানিয়ে দিতে চান যে, যে বাহ্যিক নিরাপত্তাটুকু তারা ভোগ করছে, তা আসলে একটা ফাঁদ মাত্র। অচিরেই তারা দিকভ্রান্ত অবস্থায় সে ফাঁদে আটকা পড়বে। যুলুম, অত্যাচার, গোমরাহী, অবাধ্যতা ইত্যাদি সত্ত্বেও তাদেরকে যেটুকু সময় দেয়া হচ্ছে তা আসলে নিকৃষ্টতম পরিণতিতে উপনীত হওয়ার জন্যে তাদের ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ারই অবকাশ মাত্র। ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে গৃহীত একটি ব্যবস্থা ও কৌশল–যার উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের অপরাধ ও পাপাচার যেন ষোলকলায় পূর্ণ হয় এবং তারা চরম অবমাননাকর আযাব ভোগ করার যোগ্য হয়ে যায়।

এই সতর্কীকরণ এবং এই ধাপে ধাপে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা সংক্রান্ত এই হুশিয়ারী প্রদানের চেয়ে বড় ন্যায়বিচার ও অনুকম্পা আর কিছুই হতে পারে না। এই সর্কীকরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার নিজের, তাঁর দ্বীনের এবং তাঁর নবীর দুশমনদেরকেও ন্যায়বিচার ও দয়া ভিক্ষা দিচ্ছেন। এর পরে তারা সৎ পথে ফিরে আসার এই শেষ সুযোগ গ্রহণ করে কিনা, সেটা তাদের ব্যাপার। প্রয়োজনীয় তথ্য সব জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু তার কোনো কিছুই তিনি উপেক্ষা করেন না। যালেমকে তিনি সময় দেন। অবশেষে যখন পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। তাঁর স্বেচ্ছায় গৃহীত ও অনুসৃত এই কর্মপন্থা তিনি এখানে মানুষকে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা তার রসূলকে বলছেন,

'আমাকে ও আমার বাণী অস্বীকারকারীকে একলা ছেড়ে দাও। ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অহংকারে যারা মত্ত, তাদেরকে আমি দেখে নেবো। তাদেরকে আমি অবকাশ দেবো এবং এই নেয়ামতকে তাদের জন্যে ফাঁদে পরিণত করবো।'

এভাবে রসূলকে (স.) সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেয়ার পর স্বীয় শত্রুকে সতর্ক করার জন্যে তাদেরকে উপরোক্ত কঠোর হুমকি দেয়া হচ্ছে।

### নবীদের দাওয়াত নিঃস্বার্থ

কেয়ামতের দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দান এবং এই হুমকি প্রদানের পর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বিতর্ক ও চ্যালেঞ্জ এবং তাদের আচরণে বিস্ময় প্রকাশের উপসংহার টানছেন এই বলে,

'তবে কি তুমি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাইছো, যার ফলে তারা দায়ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে?'

অর্থাৎ তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে তুমি তাদের কাছে যে পারিশ্রমিক চাইছো, সেই পারিশ্রমিক দেয়ার ভয়েই কি তারা তোমাকে এড়িয়ে চলছে এবং তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে! এর কারণেই কি তারা সেই শোচনীয় পরিণামকে বেছে নিয়েছে,

'নাকি তাদের কাছে অদৃশ্যের তথ্য রয়েছে যে, তারা (তা) লেখে রাখছে!'

অর্থাৎ এই অদৃশ্য তথ্য জানার কারণে কি তাদের আত্মবিশ্বাস আছে এবং তাদের কোনো ভয় নাই? তারা আখেরাতে কার কি পরিণাম হবে তা কি জেনে ফেলেছে অথবা তারাই কি তা লিখেছে? এরা নিজেরা যা পছন্দ করে তা নিজেদের জন্যে নিশ্চিত করেই লিখে নিয়েছে? এর কোনটাই তো হয়নি। তাহলে কোন্ ভরসায় তারা এরূপ অদ্ভুত আচরণে লিপ্ত?

একদিকে এক চমকপ্রদ ও ভয়ংকর ভংগীতে আল্লাহ তায়ালা 'আমাকে ও আমার বাণী অস্বীকারকারীকে একলা ছেড়ে দাও' এ কথা বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে এ কথাও বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর শত্রুদের মাঝে এ যুদ্ধ আল্লাহর চিরাচরিত ও শাশ্বত নীতি। এ দুটো কথার মাধ্যমে আসলে আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে এই বলে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, এখন তোমরা পেছনে সরে যাও, হক ও বাতিল এবং ঈমান ও কুফরের লড়াই আসলে আমার নিজের লড়াই এবং আমি নিজেই কাফেরদের সাথে বোঝাপড়া করবো।

**এ যুদ্ধ স্বয়ং আল্লাহর**

বাহ্যত যদিও মনে হয় যে, হক ও বাতিলের লড়াইয়ে মোহাম্মদ (স.) ও তার সহচর মোমেনদের ভূমিকাই প্রধান, কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, রসূল (স.) ও মোমেনদের ভূমিকা এ লড়াইতে খুবই সীমিত। আল্লাহর অদৃশ্য পরিকল্পনায় তাঁরা শুধু বাহ্যিক উপকরণ বা লড়াই এর হাতিয়ার মাত্র। এর পেছনে আসল কার্যসম্পাদনকারী হাত হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর। তিনি কখনো চাইলে তাদেরকে কাজে লাগাবেন, নচেৎ লাগাবেন না। উভয় অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বয়ংক্রিয়।

এ সব আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রসূল (স.) মক্কায় ছিলেন। আর তার সহচর মোমেনরা সংখ্যায় এতো কম ছিলেন যে, তারা কিছুই করতে সক্ষম ছিলেন না। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এ আয়াত কয়টিতে দুর্বল মোমেনদের জন্যে যেমন সান্ত্বনা ও উৎসাহের বাণী রয়েছে, তেমনি ধনবল, জনবল ও প্রভাব প্রতিপত্তির বলে গর্বিত কাফেরদের জন্যে এতে ছিলো ভয়াল হুমকি ও আতংক। এরপর মদীনায় পরিস্থিতি পাল্টে যায়। সে সময়ে আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হক ও বাতিলের যুদ্ধে রসূল (স.) এর মক্কী জীবনে মোমেনদের সংখ্যা স্বল্পতাজনিত দুর্বলতার সময়ে তাদেরকে যে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন, মদীনাতে একটু ভিন্ন আংগিকে তারই পুনরাবৃত্তি করলেন।

বদরের রণাঙ্গনে অর্জিত ঐতিহাসিক বিজয়ের পর আল্লাহ তায়ালা বললেন,

'ওদের সাথে তো তোমরা লড়াই করোনি, লড়েছেন এবং ওদেরে হত্যা করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তুমি যখন তীর বর্শা নিক্ষেপ করেছো, তখন সে বর্শা আসলে তুমি নিক্ষেপ করোনি, নিক্ষেপ করেছেন আল্লাহ তায়ালা; যেন আল্লাহ তায়ালা এ দ্বারা মোমেনদের একটি সুষ্ঠু পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শ্রোতা ও জ্ঞানী।'

এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের মনে এ সত্য বদ্ধমূল করে দিতে চান যে, হক ও বাতিলের যুদ্ধ আসলে আল্লাহরই যুদ্ধ। এ লড়াই আল্লাহরই লড়াই। এ সমস্যা আল্লাহরই সমস্যা। আল্লাহ তায়ালা যদি মোমেনদেরকে এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করান তবে সেটা তাদের জন্যে একটা উত্তম পরীক্ষা। এ দ্বারা তিনি তাদের নামে সওয়াব লিখবেন। আসল যুদ্ধ আল্লাহ তায়ালা নিজেই পরিচালনা করেন। আর আসল বিজয়ও আল্লাহ তায়ালা নিজেই দেন। এ যুদ্ধ আল্লাহ তায়ালা একাও চালাতে পারেন, মোমেনদেরকেও এতে কাজে লাগাতে পারেন। তারা যখন যুদ্ধে অংশ নেন তখন তারা আল্লাহর অস্ত্র ও সরঞ্জাম হিসাবে অংশ নেন, তবে তারা আল্লাহর একমাত্র অস্ত্র নয়।

পবিত্র কোরআনে এ সত্যকে একাধিকবার স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ সত্য আল্লাহর শক্তি ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত ঈমান ও বিশ্বাসের সাথেও সংগতিপূর্ণ। আল্লাহর শাশ্বত নীতি ও তার ইচ্ছার সাথেও মানানসই। আর আল্লাহর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সক্রিয় মানবীয় শক্তি সামর্থ্যের সাথেও এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের যা কিছুর শক্তি সামর্থ্য আছে, তাতে সে এ লড়াইয়ে শুধু অস্ত্র হিসাবেই ব্যবহৃত হতে পারে তার বেশী কিছু নয়।

এ সত্য মোমেনকে সর্বাবস্থায় আশ্বস্ত করে–চাই সে সবল হোক কিংবা দুর্বল। মোমেন যদি আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ হয় এবং জেহাদে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে ঈমান ও কুফরের লড়াইতে এবং হক ও বাতিলের সংগ্রামে শুধুমাত্র তার শক্তিই তাকে বিজয় এনে দিতে পারে না–বিজয় শুধু আল্লাহ তায়ালাই এনে দিতে পারেন এবং দিয়েও থাকেন, আর তার দুর্বলতাও তাকে পরাজিত করতে পারেনা। কেননা তার নেপথ্যে সক্রিয় রয়েছে আল্লাহর শক্তি। তিনিই যুদ্ধ চালান এবং তিনিই জয় পরাজয়ের নিয়ন্তা। কাফেরদেরকে সময় দেয়া, ধাপে ধাপে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া এবং নির্ধারিত সময়ে ঘটনাবলী ঘটানো আল্লাহর চিরন্তন নীতির অন্তর্ভুক্ত। এ সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা, দয়া ও ন্যায়বিচারের নীতিমালা দ্বারা।

যুদ্ধের আসল পরিচালক যে আল্লাহ তায়ালা, সে সত্যটি মোমেনদের জন্যে যেমন সান্ত্বনাদায়ক, কাফেরের জন্যে তেমনি ত্রাস সঞ্চারক। চাই সে সময় মোমেন সবল অবস্থায় থাকুক বা দুর্বল অবস্থায়। কেননা কাফেরের সাথে মোমেন লড়ছে না বরং লড়ছেন আল্লাহ তায়ালাই, তিনি লড়ছেন তার সমস্ত শক্তি ও প্রতাপ নিয়ে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেন,

'আমাকে ও আমার বাণী প্রত্যাখানকারীকে একা ছেড়ে দাও।'

আল্লাহ তায়ালা তার এ শত্রুকে সময় দেন এবং ধাপে ধাপে ঠেলে দেন ভয়াবহ ফাঁদের মুখে। সে যতই শক্তিমান হোক এবং তার যত সাজসরঞ্জামই থাকুক, তাতে কিছু এসে যায় না। তার শক্তিই তার জন্যে ফাঁদ আর তার সাজ সরঞ্জামই তার জন্যে বধ্যভূমি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। আমার কৌশল অত্যন্ত সুক্ষ্ম।'

এখন সেই অবকাশ কখন শেষ হবে এবং কখন সে ফাঁদে আটকা পড়বে সে কথা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। সেই অজানা অদৃশ্য ও অনিশ্চিত বিষয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জানা। ভয়াল পরিণতি সম্পর্কে বেপরোয়া হওয়া কিভাবে সমীচীন হতে পারে? কখন যে আল্লাহর সেই ভয়াবহ আযাব এসে পড়ে তা কে জানে? সেটা হিসাবে না রেখে কাজ করা তো একমাত্র নাফরমান বান্দাদের পক্ষেই সম্ভব।

এই সত্যের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে উপদেশ দিয়েছেন ধৈর্যধারণের। নবুওতের দায়িত্ব পালনে সুদৃঢ় ও অবিচল সংকল্প গ্রহণ, বিভিন্ন মানুষের স্বভাবের বক্রতা সহ্য করা, অনেকের প্রত্যাখ্যান, অশালীন ও কটুবাক্য বর্ষণ বরদাশত করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত

ফয়সালার সময় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা এ সবই ধৈর্যের আওতাভুক্ত। এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে তাঁর পূর্বতন এক ভাইয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যিনি এতোসব কষ্টকর পরিস্থিতি সহ্য করতে পারেননি। আল্লাহ তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা তাকে সাহায্য না করলে তিনি আল্লাহর রোষের শিকার হতেন।

**ইউনুস (আ.)—এর ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ**

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তুমি স্বীয় প্রতিপালকের ফয়সালা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো এবং মাছ সম্পর্কিত ঘটনার ব্যক্তিটির মতো হয়ো না। তাকে গিলে ফেলার পর সে আল্লাহ তায়ালাকে ডেকেছিলো। আল্লাহর অনুগ্রহ তাকে সাহায্য না করলে সে উষর প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতো নিন্দিতভাবে। তখন তার প্রভু তাকে বাছাই করে নিলেন এবং তাকে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।'

এই মাছের ঘটনার ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত ইউনুছ আলাইহিস সালাম। সূরা 'আস্ সফ্ফাত'-এও এ কথাই বলা হয়েছে। এখানে তাঁর অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যাতে এটা তার পাথেয় হয়। কারণ তিনি শেষ নবী। নবুওতের দায়িত্ব পালনে তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীর অভিজ্ঞতা তাঁর জানা দরকার। তাকে হতে হবে সকল অভিজ্ঞতার, সকল পাথেয় ও সকল কীর্তির সর্বশেষ মালিক। এটা তাঁর এই বিরাট গুরুদায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে। গুরুদায়িত্বই বটে, একটি গোত্রের নয়, একটি গ্রামের নয় একটি জাতির নয়; বরং সমগ্র মানব জাতির হেদায়াতের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। একটি প্রজন্মের দায়িত্ব নয়, একটি শতাব্দীর দায়িত্বও নয়- যেমনটি ছিলো পূর্ববর্তী নবীদের দায়িত্ব। বরং তাঁর পরবর্তী সর্বকালের সকল প্রজন্মের সমগ্র বিশ্ববাসীকে হেদায়াত করা তাঁর দায়িত্ব।

মানব জাতি তার সমগ্র জীবনে যত রকমের অবস্থার সম্মুখীন হয়, যত রকমের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং প্রতিদিন যত রকমের সমস্যায় জর্জরিত হয়, তার সব কিছুর সুষ্ঠ সমাধান দিতে পারে এমন একটি সুষ্ঠ ও চিরস্থায়ী বিধান দিয়ে মানবজাতির নেতৃত্ব দান করা তাঁর দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব তাকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে পূর্ববর্তী নবীদের অভিজ্ঞতা তাঁর জানা প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষাপটেই এখানে একজন পূর্বতন নবীর অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

এই অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার এই যে, হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা 'নিনোয়া' নামক একটি শহরে পাঠিয়েছিলেন। এই শহরটি ইরাকের মু'সেল অঞ্চলে অবস্থিত ছিলো। সেখানকার অধিবাসীরা তার ওপর ঈমান আনতে বড্ড বেশী বিলম্ব করে ফেলে। এতে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর বিরক্ত হয়ে তিনি তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মনে মনে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আমাকে এইসব একগুঁয়ে হঠকারী লোকদের মধ্যে পড়ে থাকার জন্যে আটকে রাখবেন না। তিনি তো আমাকে অন্য কোনো জাতির কাছেও পাঠাতে পারেন।'

বিরক্তি ও রাগের বশে তিনি সমুদ্রের কিনারে চলে গেলেন। সেখানে তিনি নৌকায় উঠলেন। নৌকা অতিমাত্রায় বোঝাই হওয়ায় সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। বোঝা হালকা করার জন্যে একজন যাত্রীকে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। এ জন্যে লটারি করা হলো। লটারি উঠলো হযরত ইউনুসের নামে। তাকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলো। সমুদ্রে পড়া মাত্রই তাকে একটা মাছে গিলে ফেললো। সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে মাছের পেটের গভীর অন্ধকারে

বসে নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের মধ্যে তিনি আল্লাহ তায়ালাকে সম্বোধন করে বললেন, 'লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সোবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালেমীন।' (তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, অবশ্যই আমি অপরাধীদের একজন।')

এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য এলো। মাছটি তাকে সমুদ্রের কিনারে উগড়ে ফেললো। তার গায়ে তখন চামড়া ছিলো না। চামড়া মাছের পেটে গলে গিয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে তার জীবন রক্ষা করলেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহর এই অনুগ্রহ যদি না হতো, তবে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায় মাছের পেট থেকে নিক্ষিপ্ত হতেন, নিন্দিত হতেন তার ধৈর্যের স্বল্পতার জন্যে, আল্লাহর অনুমতি লাভের আগে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে।' আল্লাহ তায়ালা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর ওপর অনুগ্রহ করলেন। তার তাসবীহ, ক্রটির স্বীকারোক্তি ও অনুশোচনাকে তিনি গ্রহণ করলেন এবং এটাকে তার অনুগ্রহ লাভ ও মনোনীত ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা হিসাবে গ্রহণ করলেন। তাই নিন্দিত ও ধিকৃত হওয়ার পরিবর্তে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর মনোনীত ব্যক্তিরূপে পরিগণিত এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

মাছের গ্রাসে পরিণত নবী ইউনুস (আ.)-এর এই ছিলো অভিজ্ঞতা। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূল মোহাম্মদ (স.) কে সেই অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কেননা তিনিও ছিলেন একই রকমের একগুয়েমী, হঠকারিতা ও প্রত্যাখ্যানের শিকার। ইতিপূর্বে তিনি তাঁকে লড়াইয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। যুদ্ধের ভার আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। আল্লাহর সেই যুদ্ধের সময় নির্ধারিত সময় সমাগত হওয়া পর্যন্ত যত বিপদ মুসিবত আসুক, ধৈর্য ধারণ করে যেতে হবে। এই হলো রসূল (স.)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

### ইসলামী আন্দোলনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট

বস্তুত ইসলাম প্রচার ও ইসলামী আন্দোলনের আসল কষ্টটা হলো, আল্লাহর স্বীয় প্রজ্ঞা, সুক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতা মোতাবেক যখন কাফেরদের দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করবেন, তখন পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা। এই পথে অনেক বাধা বিপত্তি ও দুঃখকষ্ট রয়েছে। কাফেররা শুধু ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানই করেনা বরং মোমেনদের ওপর নির্যাতনও চালায়। এসব ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বাধা সৃষ্টি করে কাফেরদের একগুঁয়েমি এবং বুদ্ধির বক্রতাও।

তাছাড়া বাতিলের বিকাশ, বৃদ্ধি ও প্রতাপ এবং বাতিলের আপাত দৃশ্যমান সাময়িক বিজয় দ্বারা সাধারণ মানুষের ভড়কে যাওয়া ও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাওয়াও মোমেনের জন্যে মানসিক ও দৈহিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও বাধাবিপত্তির মুখে মনকে প্রবোধ দিয়ে আল্লাহর সত্য ওয়াদা বাস্তবায়িত হবার সময় পর্যন্ত সকল সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত মনে অপেক্ষা ও ধৈর্য ধারণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়। এটা অত্যন্ত কঠিন জেহাদ, যা আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক ছাড়া সম্ভব হয় না। বাতিল শক্তির সাথে যে আসল লড়াই, সেটা তো আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং করবেন বলে আগেই স্থির করে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এটা তো স্থির করেই রেখেছেন যে, তিনি বাতিল শক্তিকে আত্মশুদ্ধির জন্যে সময় দেবেন, আর যদি তার সংশোধনের সম্ভাবনা না থাকে তাহলেও তাকে এক নিমেষে শেষ করে দেয়ার পরিবর্তে ধাপে ধাপে ও তিলে তিলে নিশেষ করে দেবেন। এটা তার বৃহত্তর কল্যাণ চিন্তা এবং প্রজ্ঞা ও দুরদর্শিতা থেকে উদ্ভুত সিদ্ধান্ত। তিনি রসূল (স.)-কেও বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন এবং সে ওয়াদা একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পরই পূরণ করেছেন।

## ইসলাম বিরোধীদের চরিত্র

সর্বশেষ আল্লাহ তায়ালা ধর্মদ্রোহী বাতিল শক্তির চরিত্রের একটা দিক তুলে ধরেছেন। একপর্যায়ে তারা রসূল (স.)-এর কাছ থেকে দাওয়াত পাওয়ার সময় প্রচন্ড ক্রোধে ও গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। সে সময় তাদের রোষ কষায়িত চোখ থেকে এমন বিষাক্ত দৃষ্টি রসূল (স.)-এর দিকে নিক্ষিপ্ত হয় যেন তা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। কোরআন এই দৃশ্যটাকে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে, যার তুলনা সত্যিই বিরল,

'কাফেররা যখন স্মরণিকা (কোরআন) শ্রবণ করে, তখন তাদের দৃষ্টি দিয়েই তোমাকে পদদলিত ও পথচ্যুত করে দিতে উদ্যত হয়, আর তারা বলে যে, সে তো একটা পাগল।'

বস্তুত এই দৃষ্টি রসূল (স.)-এর ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে যেন তার পা ডগমগ করে, পিছলে যায় ও মাটির ওপর তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কাফেরদের এই দৃষ্টিতে কত আক্রোশ, কত হিংস্রতা, কত বিদ্বেষ, কত জিঘাংসা, কত বিষ এবং কত হিংসা মিশ্রিত থাকে, তা এ বর্ণনায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। আর এই হিংসার আগুন ঝরা ও বিষ মাখা দৃষ্টি যখন অশ্রাব্য ও অকথ্য গালির সাথে যুক্ত হয় এবং সেই সাথে রসূল (স.)-কে 'পাগল' বলার জঘন্য মিথ্যাচারও চলে, তখন বাতিল শক্তির আসল কদাকার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

নিসন্দেহে এটি মক্কার মুক্তাংগনে দেয়া সাধারণ দাওয়াতী কার্যক্রমেরই একটি দৃশ্য। এ ধরনের রক্তচক্ষু প্রদর্শন যে বড় বড় কোরায়শ নেতাদের দ্বারাই সম্ভব, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের মন থেকেই এতো হিংসা উদগীরণ হওয়া এবং তাদের চোখ থেকেই এতো বিদ্বেষ ভরা ভ্রুকুটি নিক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব।

সর্বশেষে যে মন্তব্যটি দিয়ে সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে তা হলো,

'এটা সমগ্র বিশ্বাসীর জন্যে স্মরণিকা ছাড়া কিছু নয়।'

বস্তুত স্মরণিকা বহন ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার কাজ কোনো পাগলের কাজ হতে পারে না। তাই অকাট্যভাবে বলা যায়, আল্লাহর কথাই সত্য আর সেসব অপপ্রচারকদের কথা মিথ্যা।

শেষ করার আগে 'সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে' এ কথাটার বিশ্লেষণ দরকার। ইসলাম প্রচারের কাজ যখন মক্কায় প্রচন্ড বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন, রসূল (স.) যখন রক্তচক্ষুর বিষময় ভ্রুকুটি হযম করে চলেছেন, আর মোশরেকরা যখন ইসলামী আন্দোলনের মোকাবেলা করার জন্যে নিজেদের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের সংকীর্ণ পরিসরে এবং অত আগাম মুহূর্তে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এ দাওয়াত ও আন্দোলন একটা বিশ্বজোড়া আন্দোলন।

ইসলাম তার স্বভাব প্রকৃতি অনুসারে যেমন আন্তর্জাতিক, তেমনি বাস্তবেও তাই। এ যুগের কোনো কোনো মিথ্যাচারী বলে থাকে যে, ইসলাম মদীনায় গিয়ে সার্বিক বিজয় ও সাফল্য লাভ করার পরই শুধু আন্তর্জাতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এ কথা আদৌ ঠিক নয়। ইসলাম মক্কায় তার সূচনাকালীন মুহূর্তেও একটা বিশ্বজোড়া ও আন্তর্জাতিক দাওয়াত ছিলো। কেননা তার প্রাথমিক ভাষণগুলোতেও তার আন্তর্জাতিক আবেদন ও চরিত্র সুস্পষ্ট ছিলো। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই ইসলামকে তৈরী করেছেন এবং শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তা এ রকমই থাকবে। আল্লাহ তায়ালাই ইসলামের মালিক ও রক্ষক। ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেছেন। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের নিশানবাহীদের কাজ আল্লাহর ফয়সালা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

# সূরা আল হাক্কাহ

আয়াত ৫২ রুকু ২

**মক্কায় অবতীর্ণ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ
بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ
صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى
الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ
بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا رَسُوْلَ
رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. একটি অনিবার্য সত্য (ঘটনা)! ২. কি সেই অনিবার্য সত্য (ঘটনা)? ৩. তুমি কি জানো সেই অনিবার্য সত্য ঘটনাটা আসলেই কি? ৪. আ'দ ও সামুদ জাতির লোকেরা মহাপ্রলয় (সংক্রান্ত এমনি একটি সত্য ঘটনা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। ১৫. (পরিণামে দাম্ভিক) সামুদ গোত্রের লোকদের এক প্রলয়ংকরী বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ৬. আর (শক্তিশালী গোত্র) আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে প্রচন্ড এক ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে, ৭. একটানা সাত রাত ও আট দিন ধরে তিনি তাদের ওপর দিয়ে এ প্রচন্ড বায়ু প্রবাহিত করে রেখেছিলেন, (তাকালে) তুমি (সে) জাতিকে দেখতে পেতে, তারা যেন মৃত খেজুর গাছের কতিপয় অন্তসারশূন্য কান্ডের মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে! ৮. তুমি কি দেখতে পাচ্ছো— তাদের একজনও কি এ গযব থেকে রক্ষে পেয়েছে? ৯. (দাম্ভিক) ফেরাউন, তার আগের কিছু লোক এবং উপড়ে ফেলা জনপদের অধিবাসীরাও (একই) অপরাধ নিয়ে (ধ্বংসের মুখোমুখি) এসেছিলো, ১০. এরা সবাই (নিজ নিজ যুগে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে যারা রসূল হয়ে এসেছে তাদের অবাধ্যতা করেছে, ফলে আল্লাহ তায়ালা (এ বিদ্রোহের জন্যে) তাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। ১১. (নবী নূহের সময়) যখন পানি (তার নির্দিষ্ট) সীমা অতিক্রম করলো, তখন আমি তোমাদের (বাঁচানোর জন্যে) নৌকায় উঠিয়ে নিয়েছিলাম,

لِنَجۡعَلَهَا لَكُمۡ تَذۡكِرَةٗ وَتَعِيَهَآ أُذُنٞ وَٰعِيَةٞ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٞ وَٰحِدَةٞ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَٱلۡجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٗ وَٰحِدَةٗ ﴿١٤﴾ فَيَوۡمَئِذٖ وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوۡمَئِذٖ وَاهِيَةٞ ﴿١٦﴾ وَٱلۡمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَاۚ وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ ﴿١٧﴾ يَوۡمَئِذٖ تُعۡرَضُونَ لَا تَخۡفَىٰ مِنكُمۡ خَافِيَةٞ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰبِيَهۡ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٞ ﴿٢٣﴾ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓـَٔۢا بِمَآ أَسۡلَفۡتُمۡ فِي ٱلۡأَيَّامِ ٱلۡخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ

১২. যেন তোমাদের জন্যে আমি তাকে একটি শিক্ষামূলক ঘটনা বানিয়ে রাখতে পারি, তাছাড়া উৎসাহী কানগুলো যেন এ (বিষয়)-টা (পরবর্তী মানুষদের জন্যে) স্মরণ রাখতে পারে। ১৩. অতপর যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে- (তা হবে প্রথমবারের) একটি মাত্র ফুঁ, ১৪. আর (তখন) ভূমন্ডল ও পাহাড় পর্বত (স্বস্থান থেকে) উঠিয়ে নেয়া হবে, অতপর উভয়টাকে একবারেই (একটা আরেকটার ওপর ফেলে) চূর্ণবিচূর্ণ করে (লন্ডভন্ড করে) দেয়া হবে, ১৫. (ঠিক) সেদিনই (সে) মহাঘটনাটি সংঘটিত হবে, ১৬. এবং আকাশ ফেটে পড়বে, অতপর সেদিন তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, ১৭. ফেরেশতারা (আল্লাহর আদেশ পালন করার জন্যে) আকাশের প্রান্তে অবস্থান করবে; আর (তাদেরই) আট জন ফেরেশতা তোমার মালিকের 'আরশ' তাদের ওপর বহন করে রাখবে; ১৮. সেদিন (আল্লাহ তায়ালার সামনে) তোমাদের পেশ করা হবে, তোমাদের কোনো কিছুই (সেদিন) গোপন থাকবে না। ১৯. সেদিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে (খুশীতে লোকজনকে ডেকে) বলবে, তোমরা (কে কোথায় আছো এসো) এবং আমার (আমলনামার) পুস্তকটি পড়ে দেখো। ২০. হাঁ, আমি জানতাম আমাকে একদিন এমনি হিসাব নিকাশের সামনাসামনি হতে হবে, ২১. অতপর (বেহেশতের উদ্যানে) সে (চির) সুখের জীবন যাপন করবে, ২২. (সে উদ্যান হবে) আলীশান জান্নাতের মধ্যে, ২৩. এর ফলমূল (তাদের) নাগালের মধ্যেই ঝুলতে থাকবে। ২৪. (আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিনন্দনপূর্ণ ঘোষণা আসবে,) অতীতে যা তোমরা (কামাই) করে এসেছো তারই পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা (প্রাণভরে এগুলো) খাও এবং তৃপ্তি সহকারে পানীয় গ্রহণ করো। ২৫. (আর সে হতভাগ্য ব্যক্তি), যার আমলনামা সেদিন তার বাম হাতে দেয়া হবে, (দুঃখ

فَيَقُولُ يٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَآ أَغْنٰى عَنِّى مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّى سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخٰطِئُونَ ﴿٣٧﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

ও অপমানে) সে বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজ) আমাকে কোনো রকম আমলনামাই না দেয়া হতো, ২৬. আমি যদি আমার হিসাব (-এর খাতাটি) না-ই জানতাম, ২৭. হায়! (আমার প্রথম) মৃত্যুই যদি আমার জন্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী (বিষয়) হয়ে যেতো! ২৮. আমার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য (আজ) কোনো কাজেই লাগলো না, ২৯. (আজ) আমার সব কর্তৃত্ব (ও ক্ষমতা) নিশেষ হয়ে গেলো, ৩০. (এ সময় জাহান্নামের প্রহরীদের প্রতি আদেশ আসবে, যাও) তোমরা তাকে পাকড়াও করো, এরপর তার গলায় শেকল পরিয়ে দাও, ৩১. অতপর তাকে জাহান্নামের (জ্বলন্ত) আগুনে প্রবেশ করাও ৩২. এবং তাকে সত্তর গজ শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলো; ৩৩. কেননা, সে কখনো মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি, ৩৪. সে কখনো দুস্থ অসহায় লোকদের খাবার দেয়ার জন্যে (অন্যদের) উৎসাহ দেয়নি; ৩৫. (আর এ কারণেই) আজকের এ দিনে তার (প্রতি দয়া দেখানোর) কোনো বন্ধু নেই, ৩৬. (ক্ষতনিসৃত) পুঁজ ছাড়া (আজ তার জন্যে দ্বিতীয়) কোনো খাবারও এখানে থাকবে না, ৩৭. একান্ত অপরাধী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউই (আজ) তা খাবে না।

## রুকু ২

৩৮. তোমরা যা কিছু দেখতে পাও আমি তার শপথ করছি, ৩৯. (আরো শপথ করছি) সেসব বস্তুর– যা তোমরা দেখতে পাও না, ৪০. নিসন্দেহে এ কেতাব একজন সম্মানিত রসূলের (আনীত) বাণী, ৪১. এটা কোনো কবির কাব্যকথা নয়; যদিও তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো, ৪২. এটা কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর কথাও নয়; যদিও তোমরা খুব কমই বিবেক বিবেচনা করে চলো;

تَنۡزِيۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٤٣﴾ وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ الۡاَقَاوِيۡلِ ﴿٤٤﴾

لَاَخَذۡنَا مِنۡهُ بِالۡيَمِيۡنِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ الۡوَتِيۡنَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنۡكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ

عَنۡهُ حٰجِزِيۡنَ ﴿٤٧﴾ وَاِنَّهٗ لَتَذۡكِرَةٌ لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ﴿٤٨﴾ وَاِنَّا لَنَعۡلَمُ اَنَّ مِنۡكُمۡ

مُّكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٩﴾ وَاِنَّهٗ لَحَسۡرَةٌ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿٥٠﴾ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الۡيَقِيۡنِ ﴿٥١﴾

فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ ﴿٥٢﴾

৪৩. (মূলত) এ কেতাব বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই (তাঁর রসূলের ওপর) নাযিল করা হয়েছে। ৪৪. রসূল যদি এ (গ্রন্থ)-টি নিজে বানিয়ে আমার নামে চালিয়ে দিতো, ৪৫. তবে আমি অবশ্যই শক্তভাবে তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, ৪৬. অতপর আমি তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলে দিতাম, ৪৭. আর (সে অবস্থায়) তোমাদের কেউই তাকে তাঁর থেকে বাঁচাতে পারতো না! ৪৮. (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে, এ কেতাব তাদের জন্যে উপদেশ বৈ কিছু নয়! ৪৯. আমি ভালো করেই জানি, তোমাদের একদল লোক হবে এ (কেতাব)-কে মিথ্যা সাব্যস্তকারী। ৫০. এটি তাদের জন্যে গভীর অনুতাপ ও হতাশার কারণ হবে, যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) অস্বীকার করে। ৫১. নিসন্দেহে এ মহাগ্রন্থ এক অমোঘ সত্য। ৫২. অতএব (হে নবী, এমনি একটি গ্রন্থের জন্যে) তুমি তোমার মহান মালিকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো।

**সংক্ষিপ্ত আলোচনা**

এটি একটি ভয়ংকর আতংক সৃষ্টিকারী সূরা। এটি শোনামাত্রই স্নায়ুতে একটা তীব্র ঝাকুনি অনুভুত হয়। সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেতনায় ক্রমাগত করাঘাত করতে থাকে। এটি যেই পড়ে এক অবর্ণনীয় ভীতি তার গোটা সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিভীষিকাময় দৃশ্যগুলো একের পর এক তার সামনে আসতে থাকে এবং তা তার স্বায়ুতন্ত্রীকে ঝাকুনি দিয়ে চলে যায়। কখনো ভীতি ও শংকা, কখনো ভক্তি ও শ্রদ্ধা আবার কখনো শান্তির অনুভূতি জাগে। আর প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয় এক অতন্দ্র ও সদা জাগ্রত সত্তার দৃপ্ত তৎপরতা।

সূরাটি সামগ্রিকভাবে শ্রোতার চেতনায় সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে যে অনুভূতি জাগ্রত করে তা হচ্ছে এই যে, দ্বীন ও ঈমানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা কোনো তামাশার বিষয় নয়। এতে কোনো তামাশার অবকাশই নেই। এটি দুনিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ, আখেরাতেও গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহর দাড়িপাল্লায় ও হিসাব-নিকাশেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। তাই এ বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। যে কেউ এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা বা

অবজ্ঞা করার চেষ্টা করবে, সে আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য গযবের কবলে পড়বে। রসূল (স.) যদি একে উপেক্ষা বা অবহেলা করতেন, তাহলে তাঁরও রেহাই ছিলো না। কেননা দ্বীন ও ঈমান গোটা মানব জাতির চেয়েও মূল্যবান, দুনিয়া জাহানের সবকিছুর চাইতেও বেশী গুরুত্বপুর্ণ, মহীয়ান ও গরিয়ান।

বস্তুত আল্লাহর এ দ্বীনই হচ্ছে চুড়ান্ত সত্য, চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য এবং দৃঢ় প্রত্যয়মূলক, অকাট্য মহা সত্য– যাতে সন্দেহ সংশয়ের লেশমাত্রও নেই। সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এ দ্বীন তাই সৃষ্টি জগতের সব কিছুর উর্ধে।

উপরোক্ত নিগুঢ় তত্ত্ব এই সূরার নাম থেকেই প্রতিভাত হয়। সূরাটিতে কেয়ামতেরও একটি নাম মনোনীত করা হয়েছে। নামটি হচ্ছে 'আল-হাক্কাহ'। এ শব্দটি শাব্দিক ও অর্থগত উভয় ভাবেই মানবীয় স্নায়ূতে সত্য প্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা এবং সত্যের জন্যে দৃঢ়তা ও স্থীতিশীলতার ভাবধারা বদ্ধমূল করে দেয়। শব্দটির ধ্বনিতাত্বিক ও উচ্চারণগত ভারত্বের বিশ্লেষণ করলেও মনে হয়, এটি শ্রোতার ওপর এমন ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয় যে সত্যের অবস্থানে সে একেবারেই স্থির স্থীতিশীল হয়ে যায়।

এই দ্বীন, এই আকীদা এবং আখেরাতে অবিশ্বাসীদের শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়েও এই তাৎপর্য প্রতিভাত হয়। সেই পরিণামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ধারাবাহিকভাবে সূরার শুরু থেকেই। সে বিবরণে দেখানো হয়েছে কি সাংঘাতিক ও বীভৎস পরিণতি ইসলামের দুশমনদের কপালে জুটেছিলো। বলা হয়েছে,

'সামূদ ও আদ জাতি অবিশ্বাস করেছিলো সেই অতর্কিতে নেমে আসা ভয়ংকর ঘটনাকে। সামুদ তো এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে, আর আদকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড় দিয়ে।'

'.......যেন কোনো সংরক্ষক তার স্মৃতিকে সংরক্ষণ করে রাখে।'

এভাবে যে বা যারাই এই সত্যকে অগ্রাহ্য করেছে, তাকে বা তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। সে পরিণতি ছিলো ততটাই ভয়াবহ ও মারাত্মক, যতটা গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব এই মহাসত্য। এতে আদৌ কোনো তামাশা বা অবজ্ঞা অবহেলার অবকাশ ছিলো না।

কেয়ামতের যে ত্রাস-সঞ্চারী দৃশ্য এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে, তাতেও সত্যের উল্লেখিত তাৎপর্য প্রতিফলিত। সে সময়ে সৃষ্টি জগতের শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং মহান আল্লাহর জ্যোতির বিস্ফোরণ ঘটবে। বলা হয়েছে, 'যখন শিংগায় একটি ফুঁক দেয়া হবে..... তোমার প্রভুর সিংহাসন সেদিন মাথার ওপর বহন করবে আটজন।'

পূর্বেকার আতংকজনক বিবরণ আর এখানকার ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুভুতি জাগ্রতকারী বিবরণ এ দুয়ে মিলে হিসাব নিকাশের দৃশ্যের ভয়াবহতা আরো বাড়িয়ে দেয় এবং উল্লিখিত নিগুঢ় তাৎপর্যকে চেতনায় আরো গভীরভাবে বদ্ধমূল করে। এরপর মুক্তিলাভকারী ও শাস্তি ভোগকারীদের বাক্যালাপের উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে। যথা,

'যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে বলবে এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমার এই হিসাব-নিকাশ হওয়ার এই দিনটির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো।'

এই ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে গেছে। তবু স্পষ্ট করে নিজের মুক্তির কথা ব্যক্ত করবে না। পক্ষান্তরে যাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে বলবে, 'হায়, আমার আমলনামা না দিলেই ভালো হতো। আমার হিসাব যদি আমি না জানতাম এবং আমার মৃত্যুই যদি আমাকে নিশ্চিত করে

দিতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। আমার সহায় সম্পদ (আজ) কোনো কাজে লাগলো না। আমার ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তিও আমার হাত ছাড়া হয়ে গেলো।' এভাবেই অপরাধীর শোচনীয় পরিণতি মানবীয় অনুভূতিতে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

এরপর সেই ভয়াবহ দিনের বিভীষিকাময় দৃশ্যে আরো একটা ব্যাপার সংযোজিত হয়। সেটা হলো সে দিনের সর্বময় কর্তার এই ঘোষণা, 'ওকে গ্রেপ্তার করো এবং ওর ঘাড়ে শেকল পরাও। তারপর ওকে জাহান্নামে ছুড়ে মারো। তারপর সত্তর হাত লম্বা শেকলে ওকে বাঁধো।' এ আয়াত কয়টির প্রতিটি আয়াত যেন সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর সমান ভারী হাতুড়ি হয়ে আমাদের বুকে অত্যন্ত ভয়ংকর ভাবে আঘাত হানে।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে এই ভয়াবহ পরিণতির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সে (আসলে) মহান আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না, দরিদ্রকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না। আজ তাই এখানে তার কোনো অন্তরংগ বন্ধু নেই। ক্ষতস্থানের নোংরা নির্যাস ছাড়া তার আর কোনো খাদ্য নেই, যা কেবল পাপিষ্ঠ লোকদের খাদ্য।'

তারপর সেই তাৎপর্য এই শপথ বাক্যেও প্রতিফলিত হয়, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন সম্পর্কে উচ্চারণ করেছেন, 'তোমরা যা দেখতে পাও ও যা দেখতে পাওনা তার শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই এ বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মহান দূতের বাণী। এটা কোনো কবির কথা নয়.... বিশ্ব প্রভুর প্রত্যাদেশ।'

সর্বশেষে এই মর্মে চূড়ান্ত হুমকি ও হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে যে, এই দ্বীনকে নিয়ে কেউ যদি ছিনিমিনি খেলে বা বিকৃত করে, তা সে যেই হোক না কেন, এমনকি খোদ রসূলও যদি হয়, তবু তার রেহাই নেই,

'ধরে নাও, যদি মোহাম্মদ (স.)ও নিজের কোনো মনগড়া কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠ-শিরা ছিঁড়ে ফেলতাম। আর সে অবস্থায় তোমাদের কেউই তাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারতে না।' বস্তুত এ দ্বীন এমন একটি জিনিস, যার ব্যাপারে কোনো আপোষ, দরকষাকষি বা উদাসীনতার অবকাশ নেই।

সূরার শেষে কোরআন ও তার উপস্থাপিত দ্বীন সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে,

'নিশ্চয়ই এই কোরআন আল্লাহভীরুদের জন্যে স্মরণিকা। .....অতএব তোমার মহান প্রভুর নামে পবিত্রতা ঘোষণা করো।' সূরার শেষে এ হচ্ছে কোরআন সম্পর্কে চূড়ান্ত বক্তব্য।

এই সূরার বর্ণনাভংগী এমন দৃশ্য তুলে ধরে যে, পাঠক তার সামনে একেবারে সত্য ঘটনা চলন্ত ও জীবন্ত দেখতে পাচ্ছে বলে অনুভব করে। এ দৃশ্য সমূহ অত্যন্ত নাটকীয়, প্রভাবশালী, সংক্ষিপ্ত ও ক্ষীপ্রগতিসম্পন্ন। সামূদ, আদ, ফেরাউন ও লুত (আ.)-এর জাতির বিধ্বস্ত জনপদগুলোর দৃশ্য একের পর এক আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। এর দ্বারা আমরা নিদারুণ ভাবে প্রভাবিত হই।

হযরত নূহ (আ.)-এর আমলের মহাপ্লাবনের ঘটনা, কিছু সংখ্যক মানুষের নৌকায় আরোহন ও বাদবাকীদের ধ্বংসের দৃশ্য এবং একটি ঐতিহাসিক সত্যকে মাত্র কয়েকটি শব্দে ব্যক্ত করে দিচ্ছে। আদ জাতির ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য এবং তাদের সম্পর্কে এই শব্দগুলো এরূপ উপমা দেয় যে, তারা খেজুরের পুরানো পতিত ডালের মতো বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিলো। সাত রাত ও আট দিন ধরে এক নাগাড়ে ঝড় চলতে থাকা এবং আদ জাতিকে সমূলে উৎখাত করার বিবরণ এমন চমৎকার অলংকার সমৃদ্ধ ভাষায় দেয়া হয়েছে যে, তার তুলনা বিরল। কোরআন যে আসলেই ভাষার মোজেযা, এ সূরা অধ্যয়ন করলে সে সম্পর্কে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়।

কেয়ামতের ভয়াবহ বিস্ফোরণের কথা এমন ভাষায় বলা হয়েছে যে, মনে হয় এ বিস্ফোরণ এক্ষুণি আমাদের সামনেই সংঘটিত হবে। আকাশ ও পৃথিবীকে এক সাথে উত্তোলন করা ও তারপর এক সাথে আছাড় দেয়া। তারপর আকাশ ফেটে যাওয়া এবং সেদিন আকাশের খুবই দুর্বল হওয়া এবং ফেরেশতাদের আকাশের প্রান্তে অবস্থান এ সব আল্লাহর দোর্দন্ড প্রতাপের এমন ভয়াল দৃশ্য যেন তা এক্ষুণি সংঘটিত হচ্ছে। তা ছাড়া আটজন ফেরেশতার আল্লাহর আরশকে ঘাড়ে তোলা, মানুষের যাবতীয় কৃতকর্ম সহ আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া এবং তাদের কোনো কাজ বা কথাই গোপন না থাকা এ সব বিবরণ পড়ে সত্যি যেন কেয়ামতের মাঠ ও আল্লাহর আদালতের ছবি চোখের সামনে প্রতিভাত হয়।

এরপর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তার ডান হাতে তার আমলনামা। তার এতো আনন্দ যেন সমগ্র পৃথিবী তার সে আনন্দে মাতোয়ারা। উল্লসিত হয়ে সে সবাইকে তার আমলনামা পড়ে দেখার জন্যে ডেকে। বলছে, 'এই যে আমার আমলনামা তোমরা পড়ো। আমি বিশ্বাস করতাম যে, একদিন হিসাব নিকাশের সম্মুখীন আমাকে হতে হবে।' অপরদিকে ব্যর্থকাম মানুষের দৃশ্য। তার বাম হাতে তার আমলনামা। আর তার প্রতিটি বাক্য থেকে অনুতাপ, দুঃখ ও হতাশা প্রতিফলিত। 'হায় আফসোস! আমাকে আমার আমলমানা না দেয়া হলেই ভালো হতো.....আমার সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

আল্লাহ তায়ালা যখন বলবেন 'ওকে গ্রেফতার করো অতপর শেকল পরাও.....' একথা শুনে কম্পিত হবে না এমন কে আছে? সেদিন আল্লাহর এ আদেশ কেমন ক্ষিপ্রগতিতে প্রতিপালিত হবে তা সবাই দেখতে পাবে। সেদিন যারা ব্যর্থ হবে তাদের অবস্থা হবে বড়ই করুণ। বলা হয়েছে, সেদিন সেখানে তার কোনো বন্ধু থাকবে না ......' এ সব কিছু সত্যিই খুব ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরে।

সবার শেষে যে হুমকি আল্লাহর নামে মনগড়া মিথ্যা রটনাকারীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে তা শুনে আতংক অনুভব করে না এমন মানুষ অত্যন্ত কম।

'যদি সে আমার ওপর কোনো অপবাদ আরোপ করতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে তার প্রাণের শিরা কেটে দিতাম এবং কেউ তাকে বাঁচাতে পারতো না।' এক কথায় বলা যায়, এই সূরার এই দৃশ্যগুলো অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং তা মানুষের মনে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এই সুরায় ব্যবহৃত শব্দ সমূহের ধ্বনাত্মক বৈশিষ্ট খুবই লক্ষণীয়। বাক্যের ভেতরে যে দৃশ্য সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সব দৃশের অনুপাতে শব্দের স্বরগত তারতম্য রয়েছে। উদারহণ স্বরূপ সূরার শুরুতে 'আল-হাক্কা, উচ্চারণে দীর্ঘ টান, দ্বিত্ব প্রয়োগ ইত্যাদি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্রথম আয়াত দুটিতে থামলেও যেমন শ্রোতার মনে তা বিশেষ প্রভাব পড়ে, না থামলেও তেমনি। এ শব্দগুলো দুনিয়া ও আখেরাতে আনন্দ ও বেদনা, আশা ও নিরাশার যে দৃশ্যাবলী রয়েছে, তাও যেন সংশ্লিষ্ট শব্দ সমূহ উচ্চারণের সাথে সাথেই জীবন্ত ও মূর্ত হয়ে ওঠে। আর এই শব্দগুলোর ধ্বনি ও গঠন প্রণালীর সাথে সে দৃশ্য সমূহের ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। তারপর যেই অপরাধীর শাস্তির বিবরণ শুরু হয় অমনি শব্দের সূর ও ধ্বনি পাল্টে যায়।

'ওকে ধরো, শেকল পরাও, অতপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো' এর প্রতিটি শব্দের সূর বক্তব্য বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। অতপর সহসাই সূর প্লাল্টে যায় যখন আল্লাহ তার সিদ্ধান্তের কারণ বর্ণনা করে বলেন, 'সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না, .....তোমার মহান প্রভুর নামে তাসবীহ পাঠ করো।'

এখানে শব্দগুলোর সুর ও ধ্বনি দীর্ঘায়িত হয়েছে। কেননা এখানে আদেশ নিষেধ নয় বরং কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ কয়টা জিনিস আমি উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করলাম। নচেৎ সমগ্র সূরা আসলে এরূপ। বস্তুত এ সূরার শব্দ কাঠামোই এমন যে, যে-ই তা শুনবে, সে প্রকম্পিত না হয়ে পারবে না এবং তা যে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অলংকার বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী।

**তাফসীর**

এবারে সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করা যাক।

সূরার প্রথম তিনটি আয়াত অত্যন্ত অতর্কিতে ও নাটকীয় ভংগিতে বর্ণিত হয়েছে। এর শুরুই হয়েছে 'আল হাক্কাহ' অর্থাৎ কেয়ামতের নাম দ্বারা। এ সূরার অধিকাংশ আয়াত কেয়ামত ও তার ঘটনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই সূরাটির এভাবে সূচনা স্বার্থক হয়েছে।

'আল হাক্কাহ' শব্দটি 'হক' ধাতু থেকে গৃহীত। এর অর্থ হতে পারে সত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ, সত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়ে নাযিল হওয়া সূরা, সত্য অনুসারে সংঘটিত ঘটনা। এর ভেতরে যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন, সূরার আলোচ্য বিষয়ের সাথে তা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই সঠিক সত্য। ও নির্ভুল, যা কিছু ঘটবে সবই সত্য, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলী সত্য, অবিশ্বাসীদের সত্য প্রত্যাখ্যানে তাদের যে গালমন্দ করা হয়েছে ও যে শাস্তি দেয়া হবে তা ন্যায় সংগত- এ সবই এ শব্দের অর্থ হতে পারে। মোট কথা, বলতে গেলে এই একটি শব্দ থেকে পুরো সূরারই তাফসীর বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সমগ্র সূরার প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ কেবল সত্যকে বর্ণনামূলক ও আতংকজনক করে তোলে। এ পরিবেশ একদিকে যেমন আল্লাহর সীমাহীন কুদরত বা ক্ষমতার অনুভূতি সৃষ্টি করে, অপরদিকে তেমনি এই অসীম ক্ষমতার সামনে মানব সত্তার দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ভয়াবহ পাকড়াও, সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে গেলে মানুষকে কঠিন শাস্তি দানের হুঁশিয়ারী এবং নবীদের দাওয়াত প্রতাখ্যান করার পরিণামও এতে প্রকাশ করে।

কেননা নবীরা সত্যের পথ প্রদর্শক। তাদের শিক্ষা ও শরীয়ত সম্পূর্ণ সত্য। আর এ সব যখন সত্য, তখন তাদের আগমন নিরর্থক নয়। আল্লাহর রসূলরা ভক্তি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভের জন্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এ আয়াত তিনটিতে 'আল হাক্কাহ' শব্দটি তিনবার এসেছে।

প্রথম আয়াতে শব্দটি 'উদ্দেশ্য' হিসাবে এসেছে, এর 'বিধেয়' কি তা কেউ জানে না। দ্বিতীয় আয়াতে প্রশ্নবোধক বাক্য দ্বারা এর বক্তব্য বিষয়কে আরো ভয়ংকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশেষত, প্রশ্নের জবাব দানে নীরবতা অবলম্বন করার দরুণ এর ভীতিপ্রদ বৈশিষ্ট বহুগুণ বেড়ে গেছে।

**আদ ও সামুদ জাতির পরিণতি**

এর পরবর্তী আলোচনা শুরু হয়েছে ইসলামের আহবান প্রত্যাখ্যানকারীদের দিয়ে এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের বর্ণনা দিয়ে। ৪র্থ আয়াত থেকে ৮ম আয়াত পর্যন্ত আদ ও সামূদ জাতির বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের শাস্তির কথা একটা বিস্ফোরণের আকারে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সামূদ ও আদ জাতি সেই ভয়ংকর কর্ণবিদারী শব্দকে অস্বীকার করেছিলো। সামূদ তো একটা ভয়ংকর দুর্যোগে ধ্বংস হয়ে গেলো। আর আদকে ধ্বংস করা হলো প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড় দ্বারা। 'তুমি কি এখন তাদের আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট দেখতে পাও?'

এ আয়াত কয়টিতে কেয়ামতের আরেকটি নাম 'কারিয়া' ব্যবহৃত হয়েছে। এটি 'হাক্কা' বা সত্যের চেয়ে কিছু বেশী কঠিন। এ শব্দের অর্থ হচ্ছে যা প্রচন্ড শব্দ করে, আঘাত করে, ছিদ্র করে। কেয়ামত স্বীয় আতংক ও ভীতি দ্বারা মানুষের মনে আঘাত করবে। বিশ্বজগতকে বিকট শব্দ দ্বারা ধ্বংস করে দেবে। এই কেয়ামতকে সামূদ ও আদ জাতি অস্বীকার করেছিলো। এর পরিণাম তারা কি শাস্তি ভোগ করেছিলো, তা আমাদের দেখতে হবে।

হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী 'আল হেজর' নামক স্থান ছিলো সামুদের আবাসভূমি। তাদেরকে যে আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিলো তা ছিলো বিকট চিৎকার। কোরআনে একাধিক জায়গায় এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে এই চিৎকারের নাম দেয়া হয়েছে 'তাগিয়া।' এ শব্দ দ্বারা পূর্বের ও পরের আয়াতগুলোর সাথে ধ্বনি ও ছন্দগত মিল যেমন রক্ষা করা হয়েছে, তেমনি এ সূরার প্রেক্ষাপট ও পরিবেশের সাথে এর সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। এই একটি মাত্র শব্দ দ্বারা সামূদ জাতির ঘটনার বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে এবং আর কোনো বিশ্লেষণের দরকার মনে হয়নি। কেননা সামুদের ঘটনা আকস্মিকভাবেই ঘটেছিলো এবং তার আর কোনো জের ছিলো না।

তবে আদ জাতির ঘটনা কিছুটা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এটা সাত রাত আট দিন ধরে ঘটেছিলো। 'রীহ সরসর' শব্দটির অর্থ হলো তীব্র ও ঠান্ডা ঝড়। এই শব্দটির ধ্বনিগত বিন্যাসেও ঝড়ের তীব্রতা ও শীতলতা পরিলক্ষিত হয়। তারপর 'আতিয়া' শব্দটি এসে এতে আরো তীব্রতা যুক্ত করেছে, যাতে কোরআনের বর্ণনা অনুসারে আ'দ জাতির হঠকারিতা ও বিদ্রোহী আচরণের সাথে এ আয়াতের শাব্দিক সমন্বয় ঘটে। আদ জাতির আবাসভূমি ছিলো দক্ষিণ আরব, ইয়ামান ও হাদরামাওতের মধ্যবর্তী 'আহকাম' নামক স্থান। আদ জাতি অত্যন্ত হিংস্র, লড়াকু ও শক্তিশালী জাতি ছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাত দিন আট রাত ধরে প্রচন্ড ঝড় দ্বারা শাস্তি দিলেন।

'হুসুম' শব্দটির অর্থ হলো, যা ক্রমাগত কোনো জিনিসকে কাটতে থাকে। তাদের লাশগুলোকে খেজুরের মরা ডালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত চমকপ্রদ তুলনা। এ দ্বারা সেই দীর্ঘকায় শক্ত মানবদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মৃত দেহগুলোর যথার্থ ছবি ফুটে ওঠে। আর শেষ কথাটা এই ভয়াল দৃশ্যের চুড়ান্ত রূপ প্রকাশ করেছে। 'তুমি তাদের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট দেখতে পাও কি?'

এ হচ্ছে আদ ও সামূদের পরিণাম। পরবর্তী আয়াতগুলোতে অন্যান্য আল্লাহদ্রোহীদের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া জনপদের লোকেরা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিলো। তারা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত নবীর কথা অমান্য করেছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করলেন।'

## আরো তিনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি

এখানে ফেরাউন দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফেরাউনের কথা বলা হয়েছে। তার পূর্ববর্তীদের বিবরণ দেয়া হয়নি। উল্টে যাওয়া জনপদ ছিলো হযরত লুত (আ.)-এর জাতির। তাদের ভেতরে বাস করতো অত্যন্ত বিকৃত স্বভাবের কিছু মানুষ। এ সব জাতির কাছে ভিন্ন ভিন্ন নবী এসেছিলেন। কিন্তু এক বচনের উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, নবুওত জিনিসটা মূলত একই জিনিস। একজন রসূলকে অস্বীকার করলে তা সবাইকে অস্বীকার করারই শামিল হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করলেন।

এরপর বর্ণনা দেয়া হয়েছে নূহ (আ.)-এর জাতির ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন বন্যা এলো, আমি তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে) নৌকায় আরোহণ করালাম, যাতে সেই ঘটনাকে তোমাদের জন্যে শিক্ষাপ্রদ বানাই এবং স্মরণকারীর কান তা স্মরণ করে।'

নূহ (আ.)-এর জাতির ভেতরে যারা মোমেন ও সৎলোক ছিলো, এই অনুগ্রহ শুধু তাদের জন্যে নির্ধারিত ছিলো। তারাই পরবর্তী মানব জাতির পূর্ব পুরুষ ছিলেন। কাজেই তাদের প্রতি এই অনুগ্রহ গোটা মানব জাতির প্রতি অনুগ্রহের শামিল। বন্যা, নৌকা এবং নৌকায় আরোহণের দৃশ্যাবলী এই সূরার অন্যান্য দৃশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ ঘটনাকে শিক্ষাপ্রদ বানানো এবং তাকে গোঁয়ার লোকদের কান খোলার হাতিয়ার বানানোর উল্লেখ ভাষাগত অলংকার ও শ্রুতি মাধুর্যের অতি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত।

এই সকল ভয়াল দৃশ্য 'আল হাক্কা' ও 'আল কারিয়া' শব্দদ্বয়ের মধ্যে নিহিত দৃশ্যাবলীর সামনে নিতান্তই তুচ্ছ। এ দৃশ্যকে অস্বীকারকারীদের কি পরিণাম হয়েছে তা জেনে শুনেও তারা এটা অস্বীকার করে। পরবর্তী আয়াত কয়টিতে এ ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে, 'অতপর যখন শিংগায় প্রথম ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পাহাড়গুলোকে উত্তোলন করে এক সাথে আছাড় দেয়া হবে; সেদিন আটজন (ফেরেশতা) তোমার প্রতিপালকের আরশ ঘাড়ে তুলে নেবে।'

শিংগায় ফুঁকের কথা কোরআন ও হাদীসে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। আমরা শুধু এতটুকুই বিশ্বাস করি যে, শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে অর্থাৎ বিউগল বাজিয়ে দেয়া হবে, তার পর সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এর চেয়ে বেশী কিছু আমাদের জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এটা অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয়। আমাদের কাছে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া আর কিছু নেই। এর চেয়ে বেশী জানার কোনো উপায়ও আমাদের হাতে নেই। কোরআন ও হাদীসে যেটুকু বিবরণ দেয়া থাকে তার চেয়ে বেশী বিবরণ অনুসন্ধান করে কোনো লাভও নেই, তার কোনো উপকারিতাও নেই। বরং এতে কেবলমাত্র ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করা হয়, যা মূলত নিষিদ্ধ।

### কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা

এই শিংগায় ফুঁকের ফলাফল এতোই ভয়াবহ হবে যে, তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক এর সংগে সংগেই পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতকে উঠিয়ে ভীষণ জোরে ছুড়ে মারা হবে। এভাবে ছুড়ে মেরে পৃথিবীর উচুঁ নিচু সব সমান করে ফেলা হবে। এ দৃশ্য সত্যিই আতংকজনক। আজ এই পৃথিবীর ওপর মানুষ পরম নিশ্চিন্তে বাস করছে আর পৃথিবীও মানুষের পায়ের নিচে রয়েছে নির্ভাবনায়। আর বিশাল উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বত মানুষকে স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত করেছে। আর এই দুটো জিনিসকে ছুড়ে মারা হবে একটা ছেলের হাতের ফুটবলের মতো।

এ দ্বারা শুধু মহান স্রষ্টার সীমাহীন ক্ষমতার সামনে মানুষের অক্ষমতার ব্যাপারটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অবশ্য পাহাড় ও পৃথিবীকে কিসের ওপর ছুড়ে মারা হবে তার উল্লেখ করা হয়নি। শিংগায় ফুঁকের পর সেই ঘটনাটি ঘটবে যাকে এখানে 'আল ওয়াকেয়া' বলা হয়েছে। এটিও 'কারিয়া' ও 'হাক্কা'-এর মতো কেয়ামতের আর একটি নাম। 'আল ওয়াকেয়া' অর্থ ঘটনা। বস্তুত কেয়ামত তো একটা ঘটনাই বটে। সৃষ্টি জগতের ইতিহাসে এটি হবে একটি মহা ঘটনা ও ভয়াবহ ঘটনা। 'ওয়াকেয়া' বা ঘটনা নামকরণের উদ্দেশ্য হয়তো এই যে, সংশয় পোষণকারী ও অবিশ্বাসকারীদেরকে বিশেষভাবে জানিয়ে দেয়া হোক যে, তোমরা অস্বীকার করলেও এটি একটি অবধারিত বাস্তব ও স্বাভাবিক ঘটনা। এ দিনের ভয়াবহতা শুধু পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করবে না বরং আকাশকেও প্রভাবিত করবে,

'আকাশ ফেটে যাবে এবং তারপর তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।'

আমরা সঠিকভাবে জানি না এখানে আকাশ বলতে কি বুঝানো হয়েছে। তবে সে দিনের ঘটনাবলীর বর্ণনা দানকারী এই আয়াত ও অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, সৌর জগতের পারস্পরিক বন্ধন খুলে যাবে। বিশ্ব প্রকৃতির যে সংযোগ এতকাল তাকে আগলে রেখেছিলো তা ধ্বংস হয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানও এখন স্বীকার করছে যে, একদিন একটি ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বজগত বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিধারা দেখে আন্দায করেছে যে, সেই ঘটনাটি হবে প্রকৃতির ইতিহাসে একটি নযীরবিহীন ঘটনা এবং তার ফলে সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। (১)

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরা পড়ে আমরা এ ঘটনার কিছুটা আঁচ করতে পারি। এ ছাড়া এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের এমন কোনো মাধ্যম আমাদের নেই, যা দ্বারা এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও খুটিনাটি বিষয় জানতে পারি। আমরা যেটুকু জানতে পারি তা সংক্ষিপ্ত হলেও সুনিশ্চিত। কেননা এ জ্ঞান স্বয়ং স্রষ্টাই পাঠিয়েছেন। আমরা এটুকু জানি যে, এই বিশাল পৃথিবী যে ভারী ও কঠিন পর্বতমালাকে বহন করছে পৃথিবী ধ্বংস হবার সময় ওগুলোও ধ্বংস না হয়ে পারে না। সেদিন নক্ষত্রগুলো ঝরে পড়ে যাবে, চাঁদ সুর্য আলোহীন হয়ে যাবে, পাহাড় তুলোর মতো হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। এরপর বলা হয়েছে যে, 'ফেরেশতারা আকাশের চতুর্দিকে থাকবে এবং আটজন ফেরেশতা তোমার মালিকের আরশ মাথায় বহন করবে।'

সমগ্র জগত তখন বিধ্বস্ত এবং আকাশ ভেংগে খান খান হয়ে যাবে। তখন ফেরেশতারা তার চারদিকে অবস্থান নেবে। আল্লাহর আরশ বহনকরীরা ৮ জন ফেরেশতা, না ফেরেশতাদের আটটি দল, বা শ্রেণী, না ৮টি অন্য কিছু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, এই আটটি কি জিনিস এবং কিভাবে তারা আরশ বহন করবে, এমনকি আরশ কি বস্তু তারও আমরা কিছু জানি না। এ সবের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানানো হয়নি।

এগুলো আমাদের অজানা গায়েবী জিনিস। এসব বিষয় না জানলে আমাদের ঈমানের কোনো ক্ষতি নেই এবং আমাদের জানতে বাধ্যও করা হয়নি। এ সব বিবরণের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, আমরা যেন সেই ভয়াবহ দিন সম্পর্কে সর্তক ও সচেতন হই। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে দিন তোমাদেরকে এমনভাবে হাযির করা হবে যে, তোমাদের কোনো গোপন ব্যাপারই গোপন থাকবে না।' সব কিছুই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। দেহ, প্রাণ, বিবেক, মন মগয, জ্ঞান ও কাজ,

(১) কেয়ামতের সেই মহাবিপর্যয় আসার আগেই বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের পৃথিবীটি একটি বড়ো আকারের ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এর নাম 'এস্টরয়ড এক্সপ্লোশন'। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই এক্সপ্লোশনের দিন তারিখও আমাদের বলেছেন। তাদের মতে ২০২৮ সালের ১৫ই অক্টোবর বৃটিশ সময় মোতাবেক সন্ধ্যা ছ'টায় এ বিপর্যয়টি সংঘটিত হবে। ৭ মাইল চওড়া এই বিশাল এস্টরয়ডটি ঘন্টায় ২৭ হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে তেড়ে আসছে। বিজ্ঞানীদের এই বক্তব্য সত্য হলে আমাদের এই পৃথিবী এক মৃতপুরীতে পরিণত হবে। আড়াইশ'ফুট উচু সামূদ্রিক জলোচ্ছাসের ধাক্কায় বিলিন হয়ে যাবে দুনিয়ার দু' তৃতীয়াংশ ভূমি। এই গৃহের দুই তৃতীয়াংশের বেশী জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এসিড রেইনের ফলে পরবর্তি ৫০ বছর পৃথিবীতে কোনোরকম ফসলাদী জন্মাবে না। এসময় পৃথিবীটা মনে হবে একটি আঁধারপুরী। বিজ্ঞানীদের মতে এ ধরনের বিপর্যয় এর আগেও একাধিকবার ঘটেছে। বিজ্ঞানীদের অনেকেই এই বিষয়টি নিয়ে এখন দারুণভাবে আতংকিত। আমাদের কাছে এই আতংকের খবরটি প্রথম পরিবেশন করেছেন ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব আরিজোনার মহাকাশ বিজ্ঞানী জীম স্কট। যারা এব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে উৎসুক তারা আমার 'সাক্ষীর কাঠগড়ায় নারী' বইটি দেখতে পারেন।—সম্পাদক

অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত, সবই প্রকাশ্য হয়ে পড়বে। সকল গুপ্তভেদ বেরিয়ে পড়বে। মানুষের প্রাণ দেহের মতো প্রকাশ্য হবে। মানুষের সকল চালাকি, গোপন ফন্দি, মনের গোপন চিন্তা চেতনা ও ধ্যান ধারণা এবং যা কিছু মানুষ গোপন রাখা পছন্দ করে কিংবা প্রকাশ পাওয়ায় লজ্জা বোধ করে সবই সকল সৃষ্টির সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। যদিও আল্লাহর চোখে সব সময়ই সব কিছু প্রকাশ্য। কিন্তু মানুষ হয় তো এ কথাটা যথাযথভাবে উপলব্ধি করে না। পৃথিবীতে অনেক কিছু গোপন থাকে দেখে মানুষ এই ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হয় যে, আল্লাহর কাছেও হয়তো অনেক কিছু গোপন থাকে।

তবে কেয়ামতের দিন পুরোপুরি বুঝতে পারবে যে, বিশ্ব জাহানে সব কিছু কত প্রকাশ্য। আকাশ ভেংগে খান খান এবং পৃথিবী ও পাহাড় বিধ্বস্ত হয়ে সমান হয়ে যাওয়ার ফলে সব কিছু প্রকাশ্য হয়ে পড়বে। তবে আদি অন্তের সকল মানুষের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে সব কিছু প্রকাশিত হওয়া বড়ই কঠিন ও উদ্বেগজনক ব্যাপার। সকল জ্বিন, ফেরেশতা ও মানুষের সামনে মানুষের দেহ, মন, আবেগ অনুভুতি, ইতিবৃত্ত, গোপন ও প্রকাশ্য কাজকর্ম সবকিছু নগ্ন হয়ে প্রকাশিত হওয়া বড়ই অবমাননাকর ও কষ্টকর হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ স্বভাবতই তা চায় না। মানুষের স্বভাবটাও খুবই জটিল। তার মন মগযে অনেক বক্রতা ও জট আছে। মানুষ চায় তার এসব জট ও বক্রতা গোপন থাকুক। তার মন, ভাবাবেগ, ঝোঁক, পছন্দ অপছন্দ, চিন্তাধারা, সব কিছু লুকিয়ে থাকুক।

সামুদ্রিক ঝিনুকের ভেতরে লুকানো নরম প্রাণী এতো সংবেদনশীল হয়ে থাকে যে, ক্ষুদ্র একটি সূচের খোঁচা অনুভব করতেই ঝিনুকের শক্ত খোলসের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করে ফেলে। মানুষ যখন অনুভব করে যে, তার গুপ্তভেদ কেউ জেনে ফেলছে, তখন এ জলজ প্রাণীর চেয়েও ক্ষীপ্ততার সাথে লুকাতে ও আবদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়। এমন তীব্র সংবেদনশীল প্রাণীর কেয়ামতের ময়দানে কি অবস্থা হবে তা সত্যিই ভেবে দেখার বিষয়। যেখানে সর্ব দিক দিয়ে আপাদমস্তক নগ্ন হয়ে তাকে আল্লাহর সামনে ও সমগ্র মানব জাতির সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে হাযির হতে হবে? নিসন্দেহে সে অবস্থাটা হবে সর্বাধিক বিব্রতকর ও দুর্বিসহ।

## অপরাধীদের শাস্তি ও মোমেনদের পুরস্কার

এরপর পেশ করা হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্তদের ও দন্ডিতদের দৃশ্য। দৃশ্যটা একেবারেই চাক্ষুস ও প্রত্যক্ষ বলে মনে হয়! 'অতপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখো। আমার যে হিসাব নিকাশ হবে, সে ব্যাপারে আমার অটল বিশ্বাস ছিলো। অতপর সে বড়ই আরামদায়ক ও সুখকর জীবন যাপন করবে। ..... তোমরা সৎ কাজ করেছিলে।'

আমলনামা ডান হাতে, বাম হাতে ও পিঠের পেছন দিয়ে পাওয়া আক্ষরিকভাবে বাস্তব ব্যাপার হতে পারে, অথবা রূপক বাকধারাও হতে পারে। আরবীর প্রচলিত পরিভাষায় ভালো জিনিসকে ডান এবং খারাপ জিনিসকে বাম বা পেছনের জিনিস বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেটাই বুঝানো হোক না কেন, এ দ্বারা মূল দৃশ্য একই থাকে। মূল দৃশ্য এই যে, মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই সংকটময় দিনে নিজের আনন্দ-উল্লাস সমবেত জনতার মাঝে এভাবে প্রকাশ করবে যে, 'এই আমার আমলনামা। এটা পড়ে দেখো।'

তারপর আরো আনন্দের সাথে বলবে যে, আমি এতো সহজে মুক্তি পেয়ে যাবো ভাবিনি। আমার বিশ্বাস ছিলো আমাকে পুংখানুপুংখ হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। হযরত আয়েশা (রা.)

বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, যার হিসাব কড়াকড়িভাবে পর্যালোচনা করা হবে, তার শাস্তি হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ কি বলেননি যে, যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজ করা হবে এবং সে তার পরিবার পরিজনের কাছে আনন্দিত অবস্থায় ফিরে যাবে?' রসূল (স.) বললেন, ওটা হলো শুধু হাযির হওয়ার ব্যাপার। সুক্ষ্মভাবে যার হিসাব নেয়া হবে সে রেহাই পাবে না।' অর্থাৎ নেককারদের ভাসাভাসা হিসাব হবে।

হযরত আবু ওসমান থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) বলেছেন, মোমেনকে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে পর্দার আড়ালে। সে তার খারাপ কাজগুলো পড়তে থাকবে আর সাথে সাথে তার মুখমন্ডলের বর্ণ বিকৃত হতে থাকবে। অবশেষে যখন তার সৎ কাজগুলোর বিবরণ পড়তে আরম্ভ করবে তখন তার মুখের বর্ণ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পুনরায় আমলনামার ওপর দৃষ্টি বুলাতেই দেখবে তার সকল খারাপ কাজ সৎ কাজে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তখন সে বলে উঠবে, 'তোমরা আমার আমলনামা পড়ো।'

ফেরেশতারা যার লাশ গোছল করিয়েছিলেন সেই ভাগ্যবান সাহাবী হযরত হানযালার ছেলে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এক বান্দাকে কেয়ামতের দিন থামিয়ে তার আমলনামার ওপরে তার খারাপ কাজ দেখিয়ে বলবেন, তুমি কি এ কাজ করেছিলে? সে বলবে, হাঁ। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি এ জন্যে তোমাকে অপমান করলাম না। তোমাকে মাফ করে দিলাম। তখনই সে বান্দা বলে উঠবে, 'এই আমার আমলনামা। তোমরা পড়ে দেখো। আমি বিশ্বাস করতাম যে, আমি হিসাবের সম্মুখীন হব।'[১]

কেয়ামতের দিনের গোপন আলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর জনৈক বান্দাকে কাছে ডেকে নিয়ে তার সমস্ত গুনাহর স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। এভাবে সে বান্দার ধারণা জন্মাবে যে, তার আর মুক্তির আশা নেই। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি দুনিয়াতেও তোমার এ সব গুনাহ লুকিয়ে রেখেছিলাম। আর আজও তা মাফ করে দিচ্ছি। তারপর তার সৎ কাজের বিবরণ তার ডান হাতে দেবেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মোনাফেক সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে 'যালেমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত!'

এরপর আল্লাহ তায়ালা সেই সাক্ষীদের সামনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যে বরাদ্দকৃত নেয়ামত সমূহের নাম ঘোষণা করবেন। সে সব নেয়ামত হবে বাহ্যিক নেয়ামত, যা তখনকার শ্রোতাদের জন্যে উপযোগী হবে। কেননা তারা প্রথম জীবনে জাহেলিয়াতের অনুসারী ছিলো। এ নেয়ামত সুদীর্ঘ কাল আগে ঈমান আনয়নকারীর জন্যে তৃপ্তিকর হবে না। তাকে দেয়া হবে আরো উঁচু স্তরের ও মূল্যবান নেয়ামত। তাই বলা হয়েছে, 'সে থাকবে তৃপ্তিকর জীবনে। উচ্চ বেহেস্তে। তার ফলসমূহ ঝুলতে থাকবে। বলা হবে, তোমরা অতীত দিনগুলোতে যে সৎ কাজ করে পাঠিয়েছো, তার বিনিময়ে আজ যত খুশী পানাহার করো।' এ সম্ভাষণের মধ্য দিয়ে শুধু মোমেনদের

---

(১) হযরত হানযালা ওহদ যুদ্ধে শহীদ হন। তার সম্পর্কে রসূল (স.) বললেন, তোমাদের এই সহকর্মীটিকে ফেরেশতারা গোসল করাচ্ছেন। সাহাবীরা কৌতুহলী হয়ে হানযালার পরিবারকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, হানযালা জেহাদের ডাক শুনে যখন বেরিয়ে যান তখন তার গোসল ফরয ছিলো। (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন বাংলাদেশ সেন্টার পরিবেশিত 'আর রাহীকুল মাখতূম' গ্রন্থটি দেখুন।)

নেয়ামতের উঁচু মানই ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, বরং তাদের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদাও প্রকাশ পেয়েছে। তবে যারা প্রাথমিক যুগে কোরআনের আহবানে সাড়া দিয়ে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ট সখ্যতা গড়ে তুলেছে, তারা এ সব নেয়ামতের চেয়েও মূল্যবান যে জিনিসটি পাবে তা হলো আল্লাহর নৈকট্য ও ঘনিষ্ট সান্নিধ্য।

এটাই মহাসত্য যে, আল্লাহর নৈকট্যই যুগে যুগে মানুষের বহু সমস্যার সমাধান করে দিয়ে থাকে, আর নেয়ামত তো হাজারো রকমের হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তিকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে তো বুঝতেই পারবে যে, তার খারাপ কাজগুলোর কঠোর হিসাব নেয়া হবে এবং তার আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই। সে সেই বিশাল জনতার ভিড়ে হতাশা ও অনুতাপের গ্লানি নিয়ে বলতে থাকবে 'হায়! আমার আমলনামা একেবারে না দিলেই ভালো হতো এবং আমার হিসাব যদি আদৌ না জানতাম তাহলেই ভালো হতো। হায়! আফসোস! প্রথম মৃত্যুই যদি আমার জন্যে চূড়ান্ত হতো! আবার যদি জীবিত না হতে হতো! তাহলে কতই না ভাল হতো। আমার ধনসম্পদ কোনো কাজে লাগলো না। আমার প্রভাব প্রতিপত্তি সবই বিফলে গেলো!'

এটা হবে একটা দীর্ঘ একটানা বিবৃতি। দীর্ঘ হতাশার হা হুতাশ। চরম অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে ওঠেছে এর মধ্য দিয়ে। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা ধারায় এ অবস্থাটাকে দীর্ঘস্থায়ী বলে চিত্রিত করা হয়েছে। মনে হয় যেন এর কোনো শেষ নেই। এ হতাশা ও আক্ষেপ যেন অনন্তকাল ধরে চলবে। কোরআনের এ এক চমকপ্রদ বর্ণনাভংগী যে, কোনো বিষয়কে সংক্ষেপে বর্ণনা করে আবার কোনোটার দীর্ঘ বিবরণ দেয়। এটা নির্ভর করে মানুষের মনে সে কি ধরনের ভাব বদ্ধমূল করতে চায় তার ওপর। এখানে সে সেই অনুতাপপূর্ণ দৃশ্যের মধ্য থেকে তার আক্ষেপ ও অনুশোচনার অবস্থাটাই শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করতে চায়।

তাই সে এটার একটু দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছে। সেই হতাশাগ্রস্ত লোকটি কি কি ভাববে আর কি কি বলে বিলাপ করবে তা সবিস্তারে তুলে ধরেছে। এই পরিস্থিতি মোটেই তার সামনে না পড়লে ভালো হতো, হিসাব নিকাশ না হয়ে যে মৃত্যু তার হয়েছিলো, সেই মৃত অবস্থায় থাকতে পারলেই ঢের ভালো হতো। তার এতো সহায় সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি কোনো কিছুই তার কাজে আসলো না....... ইত্যাদি কোরআন তার এই সমস্ত বিলাপোক্তির বিবরণ দিয়েছে।

**আল্লাহ তায়ালার এক কঠোর নির্দেশ**

তার এই দীর্ঘ আক্ষেপ ও বিলাপের সমাপ্তি ঘটাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে উচ্চারিত একটি বজ্র কঠিন নির্দেশ,

'ওকে ধরো এবং শেকল পরাও। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।....' 'ওকে ধরো' এই ক্ষুদ্র কথাটি বলার সময় কি নিদারুণ ভীতিবিহবলতা, আতংক ও গুরুগম্ভীর পরিবেশ সেখানে বিরাজ করবে, তা ভাবতে গা শিউরে ওঠে।

সর্বোচ্চ মালিকের থেকে এ নির্দেশ ঘোষিত হওয়া মাত্রই তার আশেপাশে অবস্থানরত সকল সৃষ্টি যেন এই অসহায় ব্যক্তিটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। হযরত মিনহাল ইবনে আমর বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেই বলবেন 'ওকে ধরো' অমনি ৭০ হাজার ফেরেশতা তাৎক্ষণিকভাবে আদেশ পালন করতে এগিয়ে আসবে। তাদের মধ্যে যে কোনো একজন ফেরেশতা এ ধরণের ইংগিত দিয়ে ৭০ হাজার ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে।'

সবাই এই ক্ষুদ্র অনুতপ্ত প্রাণীটির দিকে ধেয়ে আসবে। এরপর যখন শেকল পরানোর নির্দেশ আসবে, তখন তাদের যে কেউ সে নির্দেশ বাস্তবায়িত করবে, তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাকে আগুনে কিভাবে দগ্ধ করা হবে তার শব্দ আমরা শুনতে পাবো। তারপর তাকে ৭০ হাত লম্বা শেকলে বাঁধতে বলা হবে। যদিও তাকে বাঁধার জন্যে এক হাত শেকলই যথেষ্ট। তথাপি সম্ভবত আযাবের ভয়াবহতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব বুঝাতে ৭০ হাতের কথা বলা হয়েছে।

ব্যাপারটা যখন এ পর্যন্ত পৌঁছবে তখন এ শাস্তির কারণ সমবেত জনতার সামনে ঘোষণা করা হবে এই বলে যে, 'নিশ্চয়ই এই লোক আল্লাহর ওপর ঈমান রাখতো না এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করতো না।'

অর্থাৎ এই হতভাগার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমানও ছিলো না, তার বান্দাদের প্রতি দয়াও ছিলো না। তাই এমন হৃদয় দোযখের আগুন ও শাস্তিরই যোগ্য। আল্লাহর প্রতি ঈমান থেকে বঞ্চিত হৃদয় তো একটা বিরাণ ও বিধ্বস্ত হৃদয়, হেদায়াতের জ্যোতি থেকে তা বঞ্চিত হৃদয়। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের মানুষ জগতের একটি বিকৃত সৃষ্টি। সে যে কোনো প্রাণী এমনকি জড় পদার্থের চেয়েও অধম। কেননা বিশ্ব নিখিলের সব কিছুই আল্লাহকে মানে, তাঁর গুণ বর্ণনা করে এবং নিজের স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। শুধু মানুষগুলোই হচ্ছে এর ব্যাতিক্রম।

তা ছাড়া তার হৃদয়ে দয়ামায়াও থাকে না। দুর্গত ও দরিদ্র মানুষ দয়া দাক্ষিণ্যের সবচেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী। কিন্তু কাফেরের মনে দরিদ্র মানুষের প্রতি সহায়তার প্রেরণা জাগে না। সে নিজে খাওয়ানো তো দূরের কথা, দরিদ্র মানুষকে খাওয়াতে কাউকে উৎসাহও দেয়না বা অনুরোধ করে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, দরিদ্র মানুষের সাহায্য করা ও অভাব মেটানো মোমেনদের একটা সামষ্টিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তার ঈমানী দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। কোরআন ও হাদীসে এ দায়িত্ব তার ওপর অর্পন করা হয়েছে এবং দাঁড়িপাল্লায় তার এ দায়িত্ব পালনের সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাণ করা হবে। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'এখানে আজ (কেয়ামতের দিন) তার কোনো বন্ধু নেই, 'গিসলীন' ছাড়া তার কোনো খাবার নেই, আর তা পাখীরা ছাড়া অন্য কেউই খাবে না।'

এ আয়াত কয়টার মাধ্যমে হতভাগা কাফেরের পরিণাম সম্পর্কে চুড়ান্ত আল্লাহর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। ঈমান না এনে সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, দরিদ্র মানুষের সাহায্য না করে সে সমাজচ্যুতও হয়েছে। কাজেই এখানেও সে বন্ধুহীন ও সম্পর্কহীন থাকবে। তা ছাড়া খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ থেকেও সে বঞ্চিত থাকবে। 'গিসলীন' ছাড়া তার জন্যে কোনো খাদ্য থাকবে না। 'গিসলীন' হলো জাহান্নামবাসীর দেহের যাবতীয় নোংরা নির্যাস, যথা পুঁজ, কফ, থুথু ইত্যাদি।

এসব জিনিস তার দয়া মমতাহীন নিষ্ঠুর হৃদয়ের সাথে মানানসই। এ সব জিনিসই পাপীদের খাদ্য। আর সে তো তাদেরই ঘনিষ্ঠ সহচর। এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা বেড়ি ও ৭০ হাত লম্বা শেকল পরানো এবং জাহান্নামের কঠিনতর আযাবের স্তরে নিক্ষেপের যোগ্য বিবেচনা করেছেন। কেননা সে মেসকীনদের খাদ্য দিতে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাতো না। ভেবে দেখা উচিত তাহলে যারা মেসকীনদেরকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে, অনাহারে ধুকিয়ে ধুকিয়ে মারে, যারা চরম স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র ও আর্ত মানুষের সাহায্যকারীদের গতিরোধ করে, যাতে তাদের কাছে খাদ্য ও বস্ত্র না পৌঁছুতে পারে, তাদের কি পরিণাম হতে পারে?

এ ধরনের স্বৈরাচারী যালেম শাসক মাঝে মাঝেই তো পৃথিবীর দেশে দেশে আবির্ভূত হয়। যে আল্লাহ তায়ালা খাদ্য বিতরণের উৎসাহ না দেয়াকে এতো বড় অপরাধ গন্য করেছেন যে, এ জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত করেছেন, তিনি এ সব নরাধমের জন্যে কি শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন তাও ভাবা দরকার।

কোরআন নাযিল হবার প্রাক্কালে আরবের সামাজিক পরিবেশ ছিলো দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের ওপর নির্যাতনে পরিপূর্ণ, সেই নিষ্ঠুর নির্যাতন কমিয়ে আনার জন্যে যালেম ও শোষক স্বৈরাচারীদের এই শোচনীয় পরিণতির দৃশ্য তুলে ধরার প্রয়োজন ছিলো। এ ধরণের পরিবেশ বিভিন্ন যুগের জাহেলিয়াত নিয়ন্ত্রিত সমাজে বারবার দেখা দিয়ে থাকে। কোরআন এ ধরণের সকল যুগের সকল সমাজকেই সম্বোধন করে এবং এর সমাধানের পথ প্রদর্শন করে। যখন যে সমাজের মানুষ যে ধরণের ভাষায় প্রভাবিত হতে পারে, তখন তাদের সাথে সে ধরণের প্রয়োগ করে। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। এখানে দেশে দেশে এমন সব নিষ্ঠুর ও নির্মম অপরাধপ্রবণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়, যারা এ ধরণের অগ্নিক্ষরা হুমকি ও হুংকারের ভাষা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই কর্ণপাত করে না।

উল্লেখিত হুমকি ও হুঁশিয়ারী এবং ভীতিপ্রদ দৃশ্যাবলীর প্রেক্ষাপটে এবার আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে পাঠানো বাণীর সত্যতা পুণর্ব্যক্ত করছেন, যাকে মক্কার কাফেররা সংশয়, বিদ্রুপ ও প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টিতে দেখেছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা যা দেখতে পাও এবং যা দেখতে পাওনা উভয় প্রকারের জিনিসের শপথ করে বলছি যে, এ বাণী একজন সম্মানিত রসূলের মুখ উচ্চারিত বাণী–কোনো কবির উক্তি নয়। তোমরা আসলে কদাচিতই ঈমান এনে থাকো। এটা কোনো জ্যোতিষীর কথাও নয়। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। এটা আসলে বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিল করা শিক্ষা।'

ইসলাম যে সত্য, তার শিক্ষা যে সত্য ও নির্ভুল, তার আকীদা বিশ্বাস ও কর্মের শিক্ষা যে অত্যন্ত যুক্তিসংগত, সে কথা কোনো শপথের অপেক্ষা রাখে না। এ বাণী যে কোনো কবি, কোনো জ্যোতিষী কিংবা কোনো মনগড়া মিথ্যা অলীক কাহিনী রচনাকারীর মুখ থেকে বের হয়নি বরং একজন নিরক্ষর ও পরম সত্যবাদী মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তা তৎকালীন আরবরাও খুব ভালো করে জানতো। তা সত্তেও এভাবে কসম খাওয়ার তাৎপর্য এই যে, যে বিশ্বজগতকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা যত প্রকাশ্যই হোক না কেন, যে জগত তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, তা আরো বড় আরো বিশাল। মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র অংশই মানুষ দেখতে পায়। মহাবিশ্বের যে অংশে আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন, শুধু সেইটুকু নিয়েই তার বিবরণ। এ ছাড়া যে মহাবিশ্ব তার দৃষ্টির বাইরে, তা যে কত বড় তা সে ভাবতেও পারে না।

এই পৃথিবী তার সামনে একটি ধুলিকণার চেয়ে বড় কিছু নয়। আল্লাহর বিশাল মহাবিশ্বের মোকাবেলায় তাকে অনুভব করাই দুষ্কর। এই বিশাল মহাবিশ্বের যেটুকু দেখা বা উপলব্ধি করা মানুষের নাগালের ভেতরে আছে, মানুষ তার সীমা ডিংগাতে সক্ষম নয়।

### আল কোরআন ও মহাবিশ্ব

বস্তুত, 'তোমরা যা দেখতে পাও এবং যা দেখতে পাওনা তার শপথ' এ কথাটা প্রমাণ করে যে, মহাবিশ্বের যে অংশ মানুষ দেখতে পায় তার বাইরেও বহু গোপন জগত রয়েছে। এ উক্তি মানুষের মনে প্রশস্ততা ও উদারতা জন্মায়। সে বুঝতে পারে যে, আমি অনেক কিছু দেখি না ও

বুঝি না, তবু তা বাস্তবে বিরাজমান। এতে তার মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, নিজের চোখ, কান ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে সে মুক্তি পায়। তার চিন্তা জগতের ব্যপ্তি বাড়ে। সে উপলব্ধি করে যে, শুধুমাত্র খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে যতটুকু দরকার, মহাবিশ্বের ততটুকুই আমার নাগালে। নচেৎ আল্লাহর রাজ্য এর চেয়ে অনেক বড়। যারা নিজেকে নিজের দৃষ্টি ও উপলব্ধির সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে এবং এর বাইরের কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, তারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আওতাধীন বস্তুজগতের বন্দী। এই বাহ্যিক জগতের অলিগলির মধ্যে তারা ঘেরাও হয়ে আছে।

অথচ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে যে জগত রয়েছে, তা জড় জগতের চেয়ে অনেক বড় ও মহান। মানবেতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোলামী মেনে নিয়ে নিছক বর্তমান ও দৃশ্যমান জগতের চৌহদ্দীতে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে এবং নিজের চারপাশে আলো ও জ্ঞানের জানালা বন্ধ করে দেয়। ফলে তারা মহা সত্যের নাগাল পায় না। মূলত মহাসত্যের নাগাল শুধু ঈমান ও চেতনার পথ ধরেই পাওয়া যায়। নিজেদের জন্যে এই পথ বন্ধ করার পর তারা অন্যদের জন্যেও তা বন্ধ করে দিতে চায়। এ কাজ তারা কখনো নিরেট জাহেলিয়াতের নামে করে, আবার কখনো করে বিজ্ঞান ও ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে। আসলে এগুলোও এক একটা বড় বড় কারাগার এবং দুরন্ত একগুয়েমি ও হীনতার বদ্ধ খাঁচা। এগুলো জ্ঞান ও আলোর উৎস থেকে বিচ্ছিন্নতার আরেক রূপ।

বিজ্ঞান বিগত দুশো শতাব্দীতে নিজেকে লৌহ কপাটের আড়ালে আটকে রেখেছিলো। কিন্তু এখন তা থেকে নিজেকে কিছুটা মুক্ত করে নিচ্ছে নিজেরই অভিজ্ঞতার পথ ধরে। তারপর মুক্ত আলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। ইতিপূর্বে ইউরোপে চরম স্বেচ্ছাচারী ধর্মযাজক শ্রেণী বিজ্ঞানকে খাঁচায় আবদ্ধ করেছিলো।(১) এখন সে তা থেকে শুধু মুক্তই হয়নি বরং নিজের চৌহদ্দিও চিনে নিয়েছে। সে এ অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছে যে, তার সীমিত সাজ-সরঞ্জাম ও বিশ্বজগতে ও তার নিজ সত্তায় বিরাজমান বাস্তবতাই তাকে অসীমের দিকে পথ নির্দেশ করে। তারপর এই বিজ্ঞানই আজ ঈমানের দিকে আহবান জানাচ্ছে।(২) এটা একটা আনন্দদায়ক পরিবর্তন, যা মানুষের চিন্তার রাজ্যে আলোড়ন তুলেছে। তাই এখন মানুষ এই সব লৌহকপাট যুক্ত কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে।

১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ফ্রান্সের মানবতত্ত্ব ইনষ্টিটিউটের পরিচালক বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী আলোক্সিস কারিল বলেন, 'সমগ্র প্রাকৃতিক জগত জুড়ে আমাদের বিবেক বুদ্ধি ছাড়া আরো বহু বিবেক বুদ্ধি তৎপর রয়েছে। মানুষের

---

(১) ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের আগে খৃস্টান ধর্মযাজকরা যেভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরোধীতা করেছে সে ইতিহাস আমাদের কারোই অজানা নয়। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও যখন আজ থেকে ৪শ বছর আগে বলেছিলেন যে, সূর্য নয় পৃ-থিবীই তার চারদিকে ঘোরে, তখন এই খৃস্টান ধর্মযাজকরাই তাকে গরম তেলের কড়াইতে পুড়িয়ে মেরেছে। তাদের মতে খৃস্টপূর্ব ২ শতাব্দীর মিশরীয় ভৌগলিক টলেমীর—পৃথিবীটা একটা সমতল ভূখন্ডের ন্যায়-এই থিউরী হচ্ছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অংশ। গত বছর খৃস্টানদের পোপ ভ্যাটিকানের এক বিশ্ব সম্মেলনে গ্যালিলিওর প্রতি খৃস্টান পুরোহিতদের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে বিষয়টি আমাদের সামনে আরো পরিস্কার হয়ে উঠেছে। আরো বিস্তারিত জানার জন্যে মোহাম্মদ কুতুব রচিত 'ইসলাম বনাম বস্তুবাদী সভ্যতা' পুস্তকটি দ্রষ্টব্য ।—সম্পাদক

(২) নিউইয়র্কস্থ বিজ্ঞান একাডেমীর চেয়ারম্যান ক্রেসি মরিসন রচিত ও মহাশূন্য বিজ্ঞানী মাহমূদ সালেহ অনুদিত গ্রন্থ 'বিজ্ঞান ঈমানের দিকে আহবান জানায়' দেখুন।

আশপাশে যে বিশাল শূন্যতা রয়েছে, তা থেকে মানুষ যদি সঠিক পথের সন্ধান পেতে চায় তবে তার বিবেক স্বেচ্ছায় সে পথের সন্ধান দিয়ে থাকে। আমাদের আশপাশে যে বিবেকগুলো সক্রিয় রয়েছে, তার সাথে সংযোগ স্থাপনের একটা মাধ্যম হলো নামায। নামায আমাদেরকে সেই আদি বিবেকের সাথেও সংযুক্ত করতে সক্ষম, যা সকল সৃষ্টির ওপর নিরংকুশভাবে কৃর্তত্বশীল, চাই তা দৃশ্যমান হোক কিংবা অদৃশ্য হোক।(১)

'ধর্মীয় চেতনা যখন আধ্যাত্মিক তৎপরতায় নিয়োজিত শক্তি সমূহের সাথে মিলিত হয় তখন তা মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রাখে। কেননা তা আমাদেরকে আধ্যাত্মিক জগতের গোপন স্থানগুলোর সাথে সংযুক্ত করে দেয়।'

অধ্যাপক কুরী ও মাদাম কুরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আর একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডঃ দিনভে লিখেছেন, 'অনেক সদুদ্দেশ্যপ্রনোদিত প্রতিভাবান লোকই ভাবেন যে, তারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে সক্ষম নন, কেননা তাঁরা আল্লাহকে কল্পনা করতে পারেন না। তা সত্তেও একজন সৎ ও বিদ্যোৎসাহী মানুষের জন্যে আল্লাহর কল্পনা করা জরুরী নয়। অবশ্য অতটুকু কল্পনা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে করা যায় যতটুকু একজন বিজ্ঞানী বিদ্যুৎ সম্পর্কে অনিবার্যভাবেই করে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই কল্পনা ত্রুটিপূর্ণ ও বাতিল। কেননা বিদ্যুৎ স্বীয় বস্তুগত অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। কিন্তু স্বীয় লক্ষণ ও প্রভাবের দিক দিয়ে বিদ্যুৎ কাঠের টুকরোর চেয়েও বাস্তব ও স্পষ্ট।'

স্কটল্যান্ডের খ্যাতনামা পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার আরথার থমসন বলেন, 'আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি যখন শক্ত মাটিও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে। আর তা তার বস্তুগত সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। বস্তুগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি করার কারণে সততা ও পূণ্যকর্মে এ যুগের অবদান খুবই কম।'

একই বিজ্ঞানী 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' নামক গ্রন্থে বলেন, 'ধর্মীয় যুক্তিবাদীদের আজ এ নিয়ে আক্ষেপ করা উচিত নয় যে, প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির গন্ডী থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির স্রষ্টা ও বিধাতার দিকে মনোনিবেশ করছে না। কারণ এটা তার দৃষ্টিকোণ নয়। বিজ্ঞানীরা যখন প্রকৃতি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত থেকে সূত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতি প্রাকৃতিক জগতের দিকে ধাবিত হবেন, তখন সূত্রের চেয়ে সিদ্ধান্ত অনেক বড় হবে। তবে আপাতত আমরা এ জন্যে গর্বিত যে, প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে বৈজ্ঞানিক পরিবেশে টিকে থাকার সুযোগ এনে দিয়েছেন, যা আমাদের বাপ-দাদাদের আমলে মোটেই সহজ ছিলো না।'

'মানুষ ও তার জগত' নামক অভিনব গ্রন্থে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মি লিংতেন ডেভিস এই ভ্রান্ত মত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাজ নয়। কিন্তু আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো, সে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত উদার ও ভদ্রজনোচিত মনোভাব গড়ে তুলেছে। এমনকি আমাদের এ কথা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে, বিজ্ঞান মানুষের জন্যে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করেছে এবং সেখান থেকে তাকে বিকশিত করে তাকে তার বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনার শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। এ জন্যে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক সময় সে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির সীমান্ত অতিক্রম করেই শান্তির নাগাল পেয়ে থাকে। আর এই সীমান্ত পেরিয়ে যে নতুন জায়গায় সে পা রখে তা হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস।'

---

(১) আববাস মাহমুদ আল আক্কাদ রচিত 'বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের আকীদা বিশ্বাস' দ্রষ্টব্য।

আরেকজন বিজ্ঞানীকে আমরা দেখি। তিনি হচ্ছেন নিউইয়র্কের বিজ্ঞান একাডেমীর চেয়ারম্যান ও আমেরিকার জাতীয় গবেষণা পরিষদের পরিচালনা কমিটির সাবেক সদস্য ক্রেসী মরিসন। 'মানুষ একা অবস্থান করে না' শীর্ষক গ্রন্থে **(যার অনুবাদ করা হয়েছে 'ঈমানের দিকে বিজ্ঞানের আহবান')** বলেন,

'আমরা বাস্তবিক পক্ষে এক সুপরিসর অজানা জগতের কাছাকাছি হতে যাচ্ছি। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পদার্থ মাত্রই এমন একটি মহা জাগতিক এককের প্রতীক যা মূলত বৈদ্যুতিক। তবে এ কথা সন্দেহাতীত রূপে সত্য যে, বিশ্ব সৃষ্টির মূলে আকস্মিক দুর্ঘটনার কোনো ভূমিকা নেই। কেননা এই মহাবিশ্ব আইনের অনুগত।' তিনি আরো বলেন, 'মানুষের পাশবিক সত্ত্বার একটি চিন্তাশীল ও আত্মোপলব্ধিসম্পন্ন প্রাণীতে রূপান্তর নিছক বস্তুগত রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সম্ভব ছিলো না, বরং তার সৃষ্টির মূলে একটি উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিলো। এই উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টির তত্ত্বকে যদি বাস্তব বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে এ হিসাবে মানুষ নিছক একটি হাতিয়ার বা সাজ-সরঞ্জাম বলে গন্য হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, এই সাজ-সর ামকে ব্যবহার করে এমন কে আছে? ব্যবহার করা ছাড়া তো তার দ্বারা কিছু অর্জিত হবে না। এই হাতিয়ার বা সরঞ্জামকে কে ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞান আমাদেরকে কিছু বলে না। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান এ কথাও বলে না যে, মানুষ নিছক জড় পদার্থের মতো প্রকৃতির নিয়মে রূপান্তর প্রক্রিয়ার অনুসারী এবং তাকে ব্যবহার করার জন্যে বিশেষ কেউ নেই।'

'আমরা অগ্রগতির এমন এক ধাপে পৌঁছে গেছি, যেখানে আমাদেরকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নূরের একটা মশাল দিয়েছেন।'

এভাবে বিজ্ঞান নিজস্ব উপায় উপকরণ দ্বারা বস্তুবাদের কারাগার ও তার চতুর্দেয়ালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। বেরিয়ে এসে মুক্ত পরিবেশের সাথে সংযোগ স্থাপন করা আরম্ভ করেছে। এই বিষয়টিই আল্লাহ তায়ালা ব্যক্ত করেছেন এ দুটি আয়াতের মাধ্যমে, 'তোমরা যা দেখতে পাও ও যা দেখতে পাও না উভয়ের শপথ করছি।'

আমাদের ভেতরে যদি এমন কোনো মতিভ্রম লোক থেকে থাকে, যে সব সময় জ্ঞানের আলো অন্তরে প্রবেশের সকল দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে ও অন্যদেরকে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত রাখে, তাহলে বুঝতে হবে, সে বিজ্ঞান থেকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, ধর্ম থেকে আধ্যাত্মিকভাবে এবং মহা সত্যকে জানার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন থেকে সচেতনভাবে পিছিয়ে আছে। সর্বোপরি মানুষ নামক মহৎ ও সম্মানিত প্রাণীর জন্যে যে উন্নতি ও উৎকর্ষ অর্জন করা প্রত্যাশিত, মানুষ হিসাবে তা থেকেও সে পিছিয়ে আছে। 'তোমার যা দেখতে পাও এবং যা দেখতে পাও না উভয়ের শপথ করে বলছি....... বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিল করা গ্রন্থ।'

## কোরআন ও কবিতার মৌলিক পার্থক্য

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কোরআন ও রসূল (স.) সম্পর্কে কাফেররা যে সব অপবাদ দিত তার মধ্যে এও ছিলো যে, তারা তাঁকে কবি ও জ্যোতিষী বলতো। কারণ কোরআনের ভাষা সাধারণ মানবীয় ভাষার তুলনায় অনেক উঁচু মানের হওয়ার কারণে তারা এরূপ সন্দেহ করতো। তাদের ভেতরে এরূপ কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো যে, কবি ও জ্যোতিষীর অধীন একটা জিন থাকে, সেই তাকে উঁচু মানের ভাষা শেখায় এবং অতি প্রাকৃতিক জ্ঞান ও তথ্য সরবরাহ করে। অথচ কোরআন ও নবুওতের প্রকৃতি এবং কবি ও জ্যোতিষীর প্রকৃতি নিয়ে সামান্য চিন্তাভাবনা করলেই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

কবিতায় সুরেলা ছন্দ, অভিনব চিন্তা এবং চমকপ্রদ দৃশ্য ও ছবির সমাবেশ ঘটতে পারে। কিন্তু সে জন্যে তা কোরআনের সাথে কখনো সাদৃশ্যপূর্ণ ও একাকার হয়ে যেতে পারে না। উভয়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোরআন জীবনের জন্যে একটা পূর্ণাংগ ব্যবস্থা দেয়, যা পরিপূর্ণ ও চিরন্তন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার আগাগোড়া একই ধরণের দৃষ্টিভংগী বিরাজ করে, যা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে অটল অনড় ও সার্বিক ধারণা পোষণ করে।

পক্ষান্তরে কবিতা হলো ধারাবাহিকভাবে উদ্ভুত প্রতিক্রিয়া এবং উদ্বেলিত ও উচ্ছসিত ভাবাবেগের নাম। এতে স্থীতিশীলতা ও দৃঢ়তা অত্যন্ত কম। আনন্দ ও বেদনা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রীতি-ভালোবাসা, সন্তোষ ও ক্রোধ এবং সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি পরিবর্তনশীল অবস্থায় কবিতা কখনো একই মত, পথ ও দৃষ্টিভংগীর ওপর স্থির থাকে না। পক্ষান্তরে কোরআন যে আদর্শ ও মতবাদ নিয়ে এসেছে, তার আগাগোড়া খুটিনাটি সহ একেবারে ভিত্তিমূল থেকে তাকে গড়ে তুলেছে কোরআন নিজেই। তার উৎস যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, সে কথাও সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে।

কোরআনের আনীত এই আদর্শের সব কিছুই সাক্ষ্য দেয় যে, এ আদর্শ কোনো মানুষের গড়া নয়। এ ধরণের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পুর্ণাংগ মহাজাগতিক আদর্শ ও মতবাদ গড়া মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়, সে ক্ষমতা তার ভেতরে জন্মগতভাবেই নেই, কোনোদিন ছিলো না, কোনো দিন হবেও না। মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি সৃষ্টিজগত এবং তার স্রষ্টা ও পরিচালক সম্পর্কে যেসব মতবাদ ও মতাদর্শ উদ্ভাবন করেছে এবং দর্শন, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে যেসব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছে, তাকে যখন কোরআনের উপস্থাপিত মতবাদ  মতাদর্শের সাথে তুলনা করা হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই কাব্য কবিতার মতাদর্শ ও চিন্তাধারার উৎস কোরআনী আদর্শের উৎস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং যাবতীয় মানবীয় চিন্তাধারা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী।

জ্যোতির্বিদ্যা ও এ ধরনের অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। ইতিহাসের প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোনো যুগেই এমন কোনো জ্যোতিষীর সাক্ষাৎ মেলে না যে, কোরআনের আনীত বিধানের মতো একটি পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমগ্র জীবনব্যাপী বিধান রচনা করবে। জ্যোতিষীদের কাছ থেকে যা কিছু কিংবদন্তী, প্রবাদ বা জনশ্রুতির আকারে সমাজে প্রচলিত, তা হয় কিছু ছন্দবদ্ধ বাক্য, নতুবা কিছু জ্ঞানের কথা, নয়তো কোনো হেয়ালী বা রহস্যময় আভাস ইংগিত।

### কোরআনে বর্ণিত কিছু তত্ত্ব ও তথ্য

কোরআনে এমন বহু সংখ্যক প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণিত হয়েছে, যার সমমানের তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। আলোচ্য তাফসীর গ্রন্থে আমি এ ধরণের বহু বর্ণনার প্রতি পাঠক-পাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছি। অত সুক্ষ্ম, ও ব্যাপক জ্ঞান সম্বলিত বক্তব্য দেয়া কোনো মানুষের পক্ষে অতীতেও সম্ভব ছিলো না, আজও সম্ভব নয় এবং ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। কোরআনে বর্ণিত এ ধরনের কিছু কিছু তত্ত্ব লক্ষ্য করুন, (সূরা আল আনয়া'ম আয়াত ৫৯)

'তাঁরই কাছে রয়েছে সকল অদৃশ্য জ্ঞানের চাবিকাঠি। তিনি ছাড়া আর কেউ তার সন্ধান জানে না। জলে ও স্থলে কোথায় কি আছে ও ঘটছে, তা তিনিই জানেন। তিনি জানেন না এমন

একটি পাতাও কোথাও পড়ে না, পৃথিবীর কোনো তিমিরাচ্ছন্ন জায়গায় এমন একটি বীজও লুকিয়ে থাকতে পারে না এবং এমন কোনো সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ, পরিণত বা অপরিণত জিনিসও থাকতে পারে না, যা তাঁর উজ্জ্বল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই।' (সূরা আল হাদীদ আয়াত ৪)

'পৃথিবীর অভ্যন্তরে কি ঢোকে এবং কি বের হয়, আর আকাশ থেকে কি নামে এবং আকাশে কি ওঠে সবই তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যাই করো, তিনি তা দেখেন।' (সূরা আল ফাতের আয়াত ১১)

'কোনো নারী তাঁর অজান্তে সন্তান ধারণও করে না, প্রসবও করে না, কারো আয়ুস্কাল বাড়ুক বা কমুক, তা একখানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছেই। আল্লাহর জন্যে এসব রেকর্ড রাখা একেবারেই সহজ।'

কত বড় শক্তিধর ও বিচক্ষণ সত্ত্বা, কি নিপুনভাবে মহাবিশ্বের সংরক্ষণ ও পরিচালনা করছেন, তার যে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত বর্ণনা কোরআন দিয়েছে, অমনটি কোনো মানুষ অতীতে বা আগামীতে দিতে পারেনি এবং পারবেও না।

'আকাশ ও পৃথিবী যাতে পতন ও বিপর্যয়ের কবলে না পড়ে, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করছেন, আর যদি তা বিপর্যয়ের কবলে পড়েই যায়, তবে তাকে ঠেকিয়ে রাখে এমন সাধ্য কারো নেই।' (সূরা আল ফাতের আয়াত ৪১)

সূরা আল আনয়া'ম-এর ৯৫-৯৯ আয়াতে মহান স্রষ্টার অতুলনীয় কুশলী হাতের অকল্পনীয় উদ্ভাবনী ক্ষমতার ছোয়াঁয় বিশ্ব প্রকৃতিতে জীবনের আবির্ভাব এবং তার চতুর্দিকে বিরাজমান প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার বদৌলত জীবনের অনুকুল ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠার যে অনবদ্য বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাও কোনো মানবীয় ভাষায় দেয়া সম্ভব নয়,

'আল্লাহ তায়ালা বীজ ও তার আঁটি থেকে অংকুরোদগত করেন। তিনিই মৃত থেকে জীবকে এবং জীব থেকে মৃতকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ তায়ালা। অতএব তোমরা উদভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ? তিনি উষ্ণকালের উদগাতা। রাতকে তিনি বিশ্রামের সময় এবং সূর্য ও চাঁদকে হিসাব নিকাশের উপায় বানিয়েছেন। এটা হচ্ছে মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর পরিকল্পনা। তিনিই তোমাদের জন্যে নক্ষত্ররাজি তৈরী করেছেন, যাতে জল স্থলের অন্ধকারে তোমরা তা দ্বারা পথের সন্ধান পাও। জ্ঞানী লোকদের জন্যে আমি আয়াতগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছি। তিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বসবাসের জায়গাও দিয়েছেন, কবরের জায়গাও দিয়েছেন। বুদ্ধিমানদের জন্যে আমি আয়াতগুলোকে বিশ্লেষণ করেছি। তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে আমি সকল রকমের উদ্ভিত উদগত করি, তারপর তা থেকে তৈরী করি সবুজ ডালপালা এবং সেই সবুজ ডালপালা থেকে স্তরে স্তরে সাজানো খাদ্যশস্য। খেজুর গাছের ঝুলে থাকা খেজুরের কাঁদি, আংগুরের বাগান, যায়তুন ও আপেল, যা সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈশাদৃশ্যপূর্ণ দু'রকমেরই আছে। এ সব ফসল যখন ফলে ও পাকে তখন তাকিয়ে দেখো। জ্ঞানীদের জন্যে এতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।'

কোরআনে এ ধরণের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত অনেক রয়েছে। কোরআনের এসব বর্ণনায় যে মনোজ্ঞ তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে, তার কোনো তুলনা মানুষের রচনায় দুর্লভ, আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এ কেতাবের উৎস একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং এটা তাঁরই রচনা। এ ব্যাপারে আর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না।

## কোরআন নিয়ে ভিত্তিহীন সংশয়

সুতরাং কোরআন মানব রচিত কবিতা বা জ্যোতিষীর বাণী কি-না এ জাতীয় সন্দেহ সংশয় একেবারেই বাজে ও ভিত্তিহীন। এমনকি কোরআন যখন পুরোপুরি নাযিল হয়নি, কেবল কতিপয় সূরা ও আয়াত মাত্র নাযিল হয়েছে, তখনো এ সন্দেহ ধোপে টেকেনি। তখনো এর ভেতরে আল্লাহর বাণীর বৈশিষ্ট্য ও তার অতুলনীয় উৎসের সাক্ষ্য প্রমাণ পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো।

কোরায়শ নেতারা নিজেরাও যখন চিন্তাভাবনা করতো, তখন এসব সন্দেহ সংশয়কে সময় সময় নিজেরাই খন্ডন করতো। কিন্তু স্বার্থপরতা মানুষকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়। কোরআন নিজেই বলেছে যে, 'যখন তারা কোরআনের হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়, তখন বলে এ তো সেই প্রাচীন মিথ্যাচার।'

সীরাত গ্রন্থাবলীতে কোরায়শ নেতাদের এ ধরণের বেশ কিছু ঘটনা ও মতামত পাওয়া যায়। যাতে দেখা যায় যে, তারা নিজেরা এ জাতীয় সন্দেহ সংশয়কে ভুল আখ্যায়িত করতো।

ওলীদ ইবনুল মুগীরা, নযর ইবনুল হারেস এবং উতবা ইবনে রবীয়া কোরায়শ বংশের এই তিন দিকপাল সম্পর্কে ইবনে ইসহাক থেকে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ওলীদ ইবনুল মুগীরা সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ,

'হজ্জের মওসুম সমাগত হলে প্রবীণ কোরায়শ নেতা ওলীদ ইবনুল মুগীরার কাছে গোত্রের কিছু লোক সমবেত হলো। ওলীদ তাদেরকে বললো, হে কোরায়শের জনগণ! হজ্জের মওসুম এসে গেছে। এ সময় সমগ্র আরব থেকে বিভিন্ন তীর্থযাত্রী দল তোমাদের এখানে আসবে। তোমাদের এই স্বগোত্রীয় লোকটির (অর্থাৎ মোহাম্মদের) কথা নিশ্চয়ই তাদের কানে গেছে। কাজেই তার ব্যাপারে তোমরা একটা ঐক্যবদ্ধ কৌশল গ্রহণ করো। ভিন্ন ভিন্ন মতো অবলম্বন করো না, তাহলে তোমাদের একজনের মত আরেক জনের মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

সবাই বললো, 'আপনিই বলুন আমাদের কী করতে হবে। আমাদের সবার জন্যে একটা বক্তব্য স্থির করে দিন, সবাই সেটাই বলবো।'

ওলীদ বললো, 'বরং তোমরাই বলো, আমি শুনি।'

তখন তারা বললো, 'আমরা তো বলি মোহাম্মদ একজন জ্যোতিষী।'

ওলীদ বললো, 'না, আল্লাহ্র কসম! সে জ্যোতিষী নয়। আমরা অনেক জ্যোতিষী দেখেছি। মোহাম্মদ তাদের মতো করে কথা বলে না। তার কথায় সে ধরণের ছন্দও নেই, হেঁয়ালীও নেই।'

তারা বললো, 'তাকে পাগল বলা যেতে পারে।'

ওলীদ বললো, 'সে পাগলও নয়। পাগলামি আমরা দেখেছি এবং তা চিনি। পাগলের মতো শ্বাসবদ্ধতা, বেহুঁশ হয়ে যাওয়া এবং মানসিক অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি এ রকম কিছু তো মোহাম্মদের ভেতরে নেই।'

তারা বললো, 'তাহলে তাকে আমরা কবি বলি।'

ওলীদ বললো, 'না, সে কবিও নয়। আমরা সব ধরণের কবিতা দেখেছি। মোহাম্মদ যা বলে, তার সাথে কবিতার কোনো মিল নেই।'

তারা বললো, 'তাহলে আমরা তাকে জাদুকর বলবো।'

ওলীদ বললো, 'না সে জাদুকরও নয়। আমরা জাদুকরও দেখেছি, জাদুও দেখেছি। তাদের গিরে দেয়া ও গিরে খোলা মোহাম্মদের কালামে নেই।'

তখন সবাই বললো, 'তাহলে আপনি কী বলেন?'

ওলীদ বললো, 'মোহাম্মদ যে বাণী পাঠ করে তা বড়ই মধুর। তার মূলে অজস্র শেকড় আর ডালে রয়েছে প্রচুর ফল।'

তোমরা এ সব কথার যেটিই বলবে, লোকে তা বাতিল বলেই ধরে নেবে। তবে যে কথাটা সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি তা এই যে, তোমরা তীর্থযাত্রীদেরকে বলবে, সে একজন জাদুকর। সে এমন বাণী নিয়ে এসেছে, যা জাদুই বটে। এ বাণী বাপ বেটায়, ভাইয়ে ভাইয়ে, ও স্বামী স্ত্রীতে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি আত্মীয়স্বজন থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কাজেই তোমরা তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলো।

এরপর লোকেরা তীর্থযাত্রীদের আগমনের পথের মোড়ে মোড়ে বসতে লাগলো। যে ব্যক্তিই তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতো, তাকেই সাবধান করে দিত এবং মুহাম্মাদ (স.)-এর ব্যাপারটা স্মরণ করিয়ে দিত।

নযর ইবনুল হারেস সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বলেন,

'সে বললো, ওহে কোরায়শ! আল্লাহর কসম, তোমাদের ওপর এক মহা আপদ নেমে এসেছে। তোমরা একে প্রতিরোধের কোনো কার্যকর কৌশল এখানো খুঁজে পাওনি। মোহাম্মদ তোমাদের ভেতরে একটা বালক হিসেবে বসবাস করেছে। সবচেয়ে সত্যবাদী, সবচেয়ে বিশ্বাসী এবং সবচেয়ে প্রিয়। তারপর যেই তার ভেতরে পরিপক্কতা এলো এবং একটা নতুন মত প্রচার করা শুরু করলো, অমনি তোমরা বললে, সে এ একজন জাদুকর। আল্লাহর কসম, সে জাদুকর নয়। আমরা জাদুকর অনেক দেখেছি, তাদের গিরে দেয়া গিরে খোলা ইত্যাদি দেখেছি। তোমরা তাকে জ্যোতিষীও আখ্যায়িত করলে। আল্লাহর কসম, সে জ্যোতিষী নয়। আমরা জ্যোতিষীদের কান্ডকারখানা অনেক দেখেছি। তাদের ছন্দবদ্ধ ও হেয়ালীপূর্ণ কথাবার্তা শুনেছি। তোমরা তাকে কবিও বলেছ। আল্লাহর কসম, সে কবিও নয়। আমরা সব রকমের কবিতা শুনেছি। তোমরা তাকে পাগল বলেছ। আল্লাহর কসম, সে পাগলও নয়। পাগলের হাবভাব চালচলন কিরকম হয় আমরা জানি। হে কোরায়শ! তোমরা এখন বুঝে দেখ কী করবে। আমি শুধু বলতে পারি, তোমাদের সামনে এক মহা সংকট উপনীত হয়েছে।'

নযর ও ওলীদের কথাবার্তায় প্রায় ষোল আনা মিল দেখা যায়। হতে পারে আসলে ঘটনা একটাই ছিলো। বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় কখনো এটা ওলীদের কখনো নাদারের ঘটনা হিসাবে পরিচিত হয়েছে। আবার এটাও বিচিত্র নয় যে, দু'জন শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতার বক্তব্য একই রকম হবে। কারণ কোরআনের সামনে তাদের সকলেরই এমনি অসহায় অবস্থা ছিলো এবং সেটাই হয়তো তাদের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে।

আর ওৎবার বক্তব্য সূরা আল কলামের তাফসীর প্রসংগে আমি ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি। মোহাম্মদ (স.) ও কোরআন সম্পর্কে তার বক্তব্যও ওলীদ ও নযরের বক্তব্যের কাছাকাছি।

রসূল (স.)-কে তারা জাদুকরই বলুক আর জ্যোতিষীই বলুক, তা কখনো ছিলো একটা প্রতারণার কৌশল আবার কখনো একটা সংশয় মাত্র। অথচ সামান্য চিন্তাভাবনা করলেই স্পষ্ট হয়ে যেত যে, কথাটা আসলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটা অপবাদ মাত্র। তাই এ নিয়ে আদৌ কোনো শপথের প্রয়োজন পড়ে না।

'রসূল (স.)-এর বাণী' বলতে কী বুঝায়

'এ বাণী একজন সম্মানিত রসূলের বাণী' এ কথার অর্থ এ নয় যে, এটা তাঁর রচনা। এ কথা দ্বারা আসলে বুঝানো হয়েছে এই যে, এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কথা, কোনো কবি বা জ্যোতিষী এ

ধরণের কথা বলে না। শুধু রসূলই এ ধরণের কথা বলতে পারেন। কেননা তিনি এ কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পান। পরবর্তী আয়াত 'বিশ্ব প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বাণী' থেকে এ ব্যাখ্যা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয়।

আর এ মন্তব্য যে, 'তোমরা কমই ঈমান এনে থাকো' এবং 'কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো' এর অর্থ হচ্ছে মোটেই ঈমান আনো না এবং মোটেই উপদেশ গ্রহণ করো না। প্রচলিত বাকরীতি অনুসারে এই অর্থ গৃহীত হয়ে থাকে। হাদীসে রসূল (স.) এর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'তিনি খুব কমই বাজে কথা বলতেন।' অর্থাৎ বাজে কথা একেবারেই বলতেন না।

বস্তুত, তাদের মধ্যে আদৌ ঈমান এবং উপদেশ গ্রহণের মনোভাব নেই একথাই বলা হয়েছে। নচেৎ কোনো মোমেন রসূল (স.) কে কবি বা জ্যোতিষী বলতে পারে না। যে ব্যক্তি কোরআন থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক সেও এ ধরণের উক্তি করতে পারে না। বস্তুত এ ধরণের উক্তির মধ্য দিয়ে একজন কাফের ও চরম উদাসীনের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়।

সর্বশেষে একটি ভয়ংকর হুমকি উচ্চারিত হয়েছে। আকীদা বিশ্বাসের প্রশ্নে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে, তার বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে এক কড়া হুশিয়ারী। এ হুশিয়ারীতে বিন্দুমাত্র নমনীয়তার অবকাশ রাখা হয়নি। এতে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানানো হয়েছে যে, রসূল (স.) যে ওহীর বাণী মানুষের কাছে পৌছান, তাতে তিনি সম্পূর্ণ সৎ ও বিশ্বস্ত। এ ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্রও উদাসীনতা, বিচ্যুতি বা অসততার সম্ভাবনা নেই। কেননা আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি তাকে এ ধরণের কোনো কিছুর দায়ে কখনো পাকড়াও করেননি। অথচ ইসলামের বাণী প্রচারে সামান্যতম ক্রটি বিচ্যুতি হলেও তিনি তাকে সমালোচনা না করে ছাড়েন না। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'যদি সে আমার সম্পর্কে মনগড়া কোনো কথা বলতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে বসতাম এবং তার ঘাড়ের শিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউ তাকে বাঁচাতে পারতো না।'

এ উক্তির মর্মার্থ এই যে, মোহাম্মদ (স.) ওহীর বাণী পৌছানোর ব্যাপারে পুরোপুরি ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী। তিনি যদি তাঁর কাছে পাঠানো হয়নি এমন কোনো কথা বানিয়ে বলতেন, তাহলে এ আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হত্যা করতেন। এ ধরণের কোনো ব্যাপার যখন ঘটেনি, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ তো হলো তাত্ত্বিকভাবে আল্লাহর সাক্ষ্যদান ও সত্যায়নের ব্যাপার। কিন্তু যে বাস্তব প্রেক্ষাপটে এ সাক্ষ্য ও হুশিয়ারী এসেছে তা একটা ভিন্ন জিনিস। এর তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, আর এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত আতংকজনক ও ভীতিপ্রদ। ডান হাত ধরে ঘাড়ের শিরা কেটে দেয়ার বক্তব্য একদিকে যেমন ভীতিকর ও লোমহর্ষক কর্মকান্ডের ছবি তুলে ধরেছে, অপরদিকে তেমনি এতে আল্লাহর দোর্দন্ড প্রতাপ ও পরাক্রমেরও প্রতিফলন ঘটেছে। সমগ্র মানবজাতি যে তার সামনে একেবারেই অক্ষম ও অসহায় এবং তাঁর কোনো ইচ্ছায় বাঁধ সাধতে পারে না, তা এখানে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এ কথাও পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দ্বীন ওহীর বিষয় অত্যন্ত নাযুক ও গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ব্যাপারে কোনো অবস্থাতেই কোনো মানুষের ব্যাপারেই নমনীয়তা দেখানো হয়না, এমন কি স্বয়ং আল্লাহ্‌র প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ (স.) এর সাথেও নয়।

**আল্লাহর বাণী অস্বীকারকারীদের পরিণতি**

সূরার উপসংহারে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন ও কোরআনের সত্যতা ও অকাট্যতার বিষয়ে পুনরায় দৃঢ়তার সাথে বক্তব্য দিয়েছেন, 'নিশ্চয়ই এটি আল্লাহভীরুদের জন্যে স্মরনিকা। আমি জানি যে, তোমাদের ভেতরে অনেকে একে মিথ্যা মনে করে থাকো। নিশ্চয়ই এ বাণী অবিশ্বাসীদের অনুশোচনার কারণ হবে। নিশ্চয়ই এ বাণী সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিখুঁত, নির্ভুল, বিশুদ্ধ ও অকাট্য সত্য বাণী।'

বস্তুত এই কোরআন আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের মনকে সত্য, ন্যায় ও আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয়া মাত্রই তারা তা স্মরণ করে ও সংযত হয়। কেননা যে বক্তব্য নিয়ে কোরআন নাযিল হয়েছে, তা তাদের মনে আগে থেকেই সুপ্ত থাকে। কোরআন শুধু তাকে জাগায় ও স্মরণ করিয়ে দেয়। এতেই তাদের মন আলোড়িত ও জাগ্রত হয়। কিন্তু যারা আল্লাহভীরু নয় এবং পাপ থেকে সংযত ও সাবধান নয়, তাদের মন ও রুচি বিকৃত হয়ে যায়। ফলে তাদের উদাসীনতা কোরআনের হুঁশিয়ারীতেও ঘোচে না। কোনো উপদেশে তাদের কাজ হয় না, কোনো কথায় তারা সম্বিত ফিরে পায় না। অথচ আল্লাহভীরু ও সদাচারী লোকেরা কোরআনে এমন জ্ঞান, জ্যোতি, কর্মস্পৃহা, চেতনা ও জীবনী শক্তি খুঁজে পায়, যা গাফেল ও উদাসীন লোকেরা পায় না।

'আমি জানি তোমাদের অনেকে ওহীকে অবিশ্বাস করো।'

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বলতে চান যে, তোমাদের অবিশ্বাসে কিছু এসে যায়না। কিছু লোক অবিশ্বাস করলেই সত্য অসত্য হয়ে যায় না। সত্য সত্যই থাকে, চাই কেউ তা মানুক বা না মানুক।

'নিশ্চয়ই এ কোরআন কাফেরদের অনুশোচনার কারণ হবে।'

অর্থাৎ এটা হবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায়। দুনিয়ায় হক একদিন বিজয়ী হবে, তখন মোমেনদের মর্যাদা ও প্রতাপ বেড়ে যাবে, অবিশ্বাসীদের কদর কমে যাবে এবং তারা যে বাতিলকে আঁকড়ে ধরে আছে, তা পরাভূত ও পর্যুদস্থ হবে। আর আখেরাতে কোরআন কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদী হবে। অতপর কঠিন আযাবে ভুগবে ও অনুশোচনায় দগ্ধ হবে। তারা যদি কোরআনকে অমর্যাদা ও অবিশ্বাস না করতো, তাহলে অনুশোচনার কোনো প্রয়োজন পড়তো না।

'নিশ্চয়ই এ কোরআন সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিশ্চিত ও অকাট্য সত্য বাণী।'

অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা যতই একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক, তথাপি তা চরম সত্য ও অকাট্য সত্য। 'হক্কুল একীন' একটি পরিভাষা। চরম ও অকাট্য সত্যকে 'হক্কুল একীন' বলা হয়। অর্থাৎ যা নিজে সত্য, নির্ভেজাল সত্য বহন করে এবং নির্ভুল উৎস থেকে আবির্ভূত।

বস্তুত এ কোরআন কবির কবিতাও নয়, জ্যোতিষীর হেঁয়ালীও নয়, মনগড়া কল্পকথাও নয়। এটা শুধু আল্লাহর নাযিল করা বিধান। মোত্তাকী লোকদের জন্যে স্মরণিকা।

অতপর বলা হচ্ছে, 'তুমি তোমার মহান প্রভুর তাসবীহ পাঠ করো।'

তাসবীহ বলতে বুঝায় কারো পবিত্রতা ও নিস্কলুষতা ঘোষণা করা। মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা। অধীনতা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি দান ও অংগীকার করা। আল্লাহর সীমাহীন প্রতাপ ও শক্তির বর্ণনার পর স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা অনুসারেই এই আনুগত্যের স্বীকৃতি ও পবিত্রতার ঘোষণা এসেছে।

# সূরা আল মা'য়ারেজ

আয়াত ৪৪ রুকু ২

**মক্কায় অবতীর্ণ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ﴿۱﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ﴿۲﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ﴿۳﴾ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ﴿۴﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿۵﴾ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ﴿۶﴾ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ؕ﴿۷﴾ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۙ﴿۸﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ﴿۹﴾ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۚۖ﴿۱۰﴾ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۙ﴿۱۱﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ﴿۱۲﴾ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۙ﴿۱۳﴾

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. (একজন) প্রশ্নকারী ব্যক্তি (আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুত অমোঘ ও) অবধারিত আযাব (দ্রুত) পেতে চাইলো, ২. (এ আযাব তো) হচ্ছে কাফেরদের জন্যে, তার প্রতিরোধকারী কিছুই নেই, ৩. (এ আযাব আসবে) সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে; ৪. ফেরেশতাকুল ও (তাদের নেতা জিবরাঈল) 'রূহ' আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একটি দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর, ৫. অতএব (হে নবী, কাফেরদের ব্যাপারে) তুমি উত্তম ধৈর্য ধারণ করো। ৬. কাফেররা (তাদের) এ (অবধারিত আযাব)-কে একটি দূরের (ব্যাপার) হিসেবেই দেখতে পায়, ৭. অথচ আমি তো তা দেখতে পাচ্ছি একেবারে আসন্ন; ৮. যেদিন আসমান গলিত তামার মতো হয়ে যাবে, ৯. আর পাহাড়গুলো হবে (রং বেরংয়ের) ধুনা পশমের মতো, ১০. (সেদিন) এক বন্ধু আরেক বন্ধুর খবর নেবে না, ১১. অথচ তারা একজন আরেকজনকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, (সেদিন) অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে (নিজেকে) বাঁচাতে মুক্তিপণ হিসেবে তার পুত্র সন্তানদের দিতে পারলেও তা দিতে চাইবে, ১২. (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাইকেও ১৩. এবং নিজের পরিবারভুক্ত এমন আপনজনদেরও, যারা তাকে (জীবনভর) আশ্রয় দিয়েছিলো,

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً

لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ

خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا

الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ

حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

১৪. (সম্ভব হলে) ভূমন্ডলের সবকিছুই (সে দিতে চাইবে), তারপরও (জাহান্নাম থেকে) সে বাঁচতে চাইবে, ১৫. না (কোনো কিছুর বিনিময়েই তা থেকে সেদিন বাঁচা যাবে না); সে (জাহান্নাম) হচ্ছে একটি প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখা, ১৬. যা চামড়া ও তার আভ্যন্তরীণ মাংসগুলোকে খসিয়ে দেবে, ১৭. (সেদিন) সে (আগুন) এমন সব লোকদের (নিজের দিকে) ডাকবে, যারা (দুনিয়ার জীবনে অবহেলা করে তা থেকে) ফিরে গিয়েছিলো এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলো, ১৮. (যারা দুনিয়ার জীবনে বিপুল) ধনরাশি জমা করে তা একান্তভাবে আগলে রেখেছিলো। ১৯. (আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে খুব (সংকীর্ণ মনের এক) ভীরু জীব হিসেবে, ২০. যখনি তার ওপর কোনো বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়, ২১. (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন সে (আগের কথা ভুলে গিয়ে) কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে, ২২. (কিন্তু) সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, ২৩. যারা নিজেদের নামাযে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম থাকে, ২৪. (যারা বিশ্বাস করে) তাদের সম্পদে সুনির্দিষ্ট অধিকার আছে– ২৫. এমন সব লোকদের, যারা (অভাবের তাড়নায় কিছু পেতে) চায় এবং যারা (যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে) বঞ্চিত, ২৬. (তারাও নয়–) যারা বিচার দিনের সত্যতা স্বীকার করে, ২৭. (তদুপরি) যারা তাদের মালিকের আযাবকে ভয় করে, ২৮. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের আযাবের বিষয়টি এমন যে, এ থেকে (মোটেই) নিশ্চিন্ত (হয়ে বসে) থাকা যায় না। ২৯. যারা (হারাম কাজ থেকে) নিজেদের যৌন অংগসমূহের হেফাযত করে, ৩০. অবশ্য নিজেদের স্ত্রীদের কিংবা এমন সব মহিলাদের বেলায় (এটা প্রযোজ্য) নয়, যারা (আল্লাহ তায়ালার অনুমোদিত পন্থায়) তাদের মালিকানাধীন রয়েছে, (এদের ব্যাপারে সংযম না করা হলে এ জন্য) তারা তিরস্কৃত হবে না,

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ

لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾ أُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ؕ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا

يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ إِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَلٰٓى

أَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا

وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ

مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾

৩১. (আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত এ সীমারেখার) বাইরে যারা (যৌন সম্ভোগের জন্যে) অন্য কিছু পেতে চাইবে, তারা হবে (শরীয়তের সুস্পষ্ট) সীমালংঘনকারী, ৩২. যারা তাদের আমানত ও তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ৩৩. যারা (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে অটল থাকে, ৩৪. (সর্বোপরি) যারা নিজেদের নামাযের হেফাযত করে; ৩৫. (পরকালে) এরাই আল্লাহর জান্নাতে মর্যাদা সহকারে প্রবেশ করবে;

**রুকু ২**

৩৬. এ কাফেরদের (আজ) কী হলো ? এরা কেন এভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে তোমার সামনে ছুটে আসছে, ৩৭. (ছুটে আসছে) ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে দলে দলে! ৩৮. তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি এ (মিথ্যা) আশা পোষণ করে যে, তাকে (আল্লাহর) নেয়ামতভরা জান্নাতে দাখিল করা হবে? ৩৯. না, তা কখনো সম্ভব নয়, আমি তাদের এমন এক জিনিস দিয়ে বানিয়েছি যা তারা (ভালো করেই) জানে । ৪০. আমি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের শপথ করছি, অবশ্যই আমি (বিদ্রোহীদের ধ্বংস সাধনে) সক্ষম, ৪১. (আমি সক্ষম) এদের চাইতে উৎকৃষ্ট কাউকে দিয়ে এদের বদলে দিতে এবং আমি (এতে) কখনো অক্ষম নই। ৪২. (হে নবী,) তুমি বরং এদের ছেড়ে দাও, এরা কিছুদিন খেল তামাশায় নিমগ্ন থাক– ঠিক সেদিনটির সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যেদিনের (ব্যাপারে বার বার) তাদের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে। ৪৩. সেদিন যখন এরা (নিজ নিজ) কবর থেকে বের হয়ে আসবে, তখন এমন দ্রুতগতিতে এরা দৌড়াতে থাকবে, (দেখে মনে হবে) তারা (সবাই বুঝি) কোনো শিকারের (লক্ষ্যবস্তুর) দিকে ছুটে চলেছে,

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, অপমান ও লাঞ্ছনায় তাদের সবকিছু থাকবে আচ্ছন্ন; (তখন তাদের বলা হবে) এ হচ্ছে সেই (মহা) দিবস, তোমাদের কাছে যেদিনের ওয়াদা করা হয়েছিলো।

**সংক্ষিপ্ত আলোচনা**

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সে সকল সূরার অন্যতম যা মানুষের অন্তরকে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে আমরা যদি একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে, প্রাচীনকালের জাহেলিয়াত এবং আধুনিক কালের জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য শুধুই বাহ্যিক, মৌলিকভাবে এতে কোনো পার্থক্য নেই, তাই আধুনিককালের যে কোনো জাহেলিয়াতের মোকাবেলায়ও এ সূরাটি সমভাবে ক্রিয়াশীল।

অন্যকথায় বলতে গেলে অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব মনে যতো প্রকার সংকট ও সমস্যা এসে তাকে কঠিন অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে এবং সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জিভূত যে সকল কুসংস্কার মানুষকে সরল সত্য পথ গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে, সবকয়টাই তৎকালীন মুসলমানদেরকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে তাদেরকে এই সব ধরনের জটীলতারই সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। যে অবধারিত সত্যটি এ সূরার আলোচ্য বিষয় তা হচ্ছে–

আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং সেখানে প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে, বিশেষ করে কাফেরদেরকে অবশ্যই আযাব পেতে হবে।

কোরআনে করীমের বহু স্থানে এই আযাবের বিশদ বর্ণনা এসেছে। ঈমানের পথে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবনকে গড়ার জন্যে যে মযবুত ইচ্ছার প্রয়োজন তাকে এক রকম পাগলামীর সাথেই তুলনা করা যায়, কারণ জীবনলক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে পাগলপ্রায় না হলে সে লক্ষ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এ কাজে দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা ও অনেক রকমের ত্যাগ স্বীকারের দাবী জানায়।

এ বাস্তব সত্যটি ঈমানে পরিপূর্ণ দিল এবং ঈমানশূন্য অন্তর উভয়ের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। যদিও লক্ষ্য তাদের সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী, কিন্তু উভয় শ্রেণীর মানুষই নিজ নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে দেওয়ানা না হয়ে সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। চিন্তার ক্ষেত্রে, চলার পথে ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্খায়, সর্বত্র তার এই একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর পথকে পরিহার করে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বড় হয়ে থাকার জন্যে তার সকল কাজ ও ব্যবহারকে পরিচালনা করবে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হীনতা, অপমান এবং ঘৃণা নির্ধারিত করে রেখেছেন। এই দুই শ্রেণীর মানুষের মূল্যের পার্থক্য আল্লাহর কথা থেকে যেমন জানা যায় তেমনি প্রকাশ পায় মানুষের কথা থেকেও। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও তাদের এই পার্থক্য ধরা পড়ে।

জাহেলিয়াতের সে জটীল গ্রন্থীগুলো খোলা এবং মানুষের মন-মানসিকতার দুর্ভেদ্য সংকট দূর করার জন্যে এ সূরাটির অবতারণা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোরআনে কারীম যে প্রচেষ্টা

চালিয়েছে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং গোটা সমাজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোই তার উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে ব্যক্তি জীবনে পরিবর্তন এনে সমাজের মধ্যে তাকে মডেল হিসেবে তুলে ধরার মাধ্যমে কোরআনে কারীম আপন বক্তব্য তুলে ধরেছে। একারণেই মোমেনের হাতে তরবারি তুলে দেয়ার পূর্বে তাদেরকে এমন সব মানবীয় গুণাবলীতে ভূষিত করা হয়েছে যার ফলে ইসলামের দুশমনদেরকে শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে।

কোরআনে পাককে যারা মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে তাদের কাছে নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধুর চরিত্র এমনভাবে মুর্ত হয়ে ওঠে যে, তা এদের মন মেজাযের ওপর এক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। সে শক্তিশালী প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাদের জন্যে আর সম্ভব হয় না। রসূলুল্লাহ (স.)-এর এই অদ্ভুত ও আশ্চর্য আকর্ষণ অবশেষে তাদেরকে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে। মক্কার জনগণ এভাবেই তাঁকে শেষপর্যন্ত তাদের নেতা হিসেবে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিলো।

তাঁর এই সর্বগ্রাসী চারিত্রিক প্রভাবকে কখনও এক ভীষণ তুফানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার আওতা থেকে কিছুই রেহাই পায় না। আবার কখনও সে যাঁতাকলের সাথে তুলনা করা যায়, যার মধ্যে কিছু পড়লে তা গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় অথবা এমন চাবুকের সাথে তুলনা করা যায় যার ভীষণ যন্ত্রনাদায়ক কষাঘাত থেকে যেমন রেহাই পাওয়া যায় না তেমনি তা সহ্যও করা যায় না। এর অগ্নিবর্ষি আয়াতে হৃদয় মন বিকল হয়ে যেতে চায়, আবার সে আকুল আবেদনের সাথে কখনও তুলনা করা যেতে পারে যা অগ্রাহ্য করা মুশকিল। অথবা তুলনা করা যায় সে মনোরম সফরের সাথে যা যে কোনো যাত্রীর হৃদয় মনকে মুগ্ধ-আবেগে এমনভাবে বিমোহিত করে যেন তার সেখানে নিজস্ব চেতনা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

কখনও আবার তার ভীষণ প্রভাবকে এক নিদারুণ ভীতি ও ভয়ংকর চীৎকার ধ্বনির সাথে তুলনা করা যায়, যার কারণে মানুষ ভীত বিহবল চিত্ত ও বিস্ফোরিত নয়নে তার দিকে চেয়েই থাকে, কখনও এই প্রভাব বলয়ের মধ্যে পতিত হওয়ার কারণে তার কাছে সত্য এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগই তার থাকে না।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর মধুর চরিত্রের সংস্পর্শে এসে সুন্দর এক সপ্নিল আশায় মোমেনের মনপ্রাণ ভরপুর হয়ে যায়, পার্থিব যে সংকটাবর্তে ইতিপূর্বে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিলো তা থেকে স্বানন্দে বেরিয়ে আসে। অনাগত দিনের আগমন কামনায় তাদের অন্তর উদ্বেলিত হয়।

আবার কখনও একে তুলনা করা যায় সে অবস্থার সাথে যে, সত্যের সংস্পর্শে এসে বিরোধীদের ভ্রুকুটিতে মন যখন বিচলিত হয়ে পড়তে চায়, তখন মনে হয় বন্ধুর গিরিসংকট অতিক্রম করার পর্যায়ে এসে ক্লান্ত পথিকের সামনে সেই হতাশ মুহূর্তে তা যেন অকস্মাৎ আশার এক আলোক রেখা। যেন সংকটাবর্তের গভীরে নিজ চোখে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

এগুলোর যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি লজ্জিত করে তোলে, সত্যের এই প্রসারকে তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, সত্য থেকে গাফেল এই গোষ্ঠি তখন নানা প্রকার

প্রতিহিংসায় ফেটে পড়তে চায়। এই বিরোধিতায় যারা সত্যের বিজয়কে গভীর উৎসাহের সাথে অবলোকন করতে থাকে, তাদের সামনে যখন কোরআনের পাঠক তার দিগবিজয়ী দাওয়াতকে তুলে ধরে এবং 'একজন দায়ী ইলাল্লাহ' (সত্যের দিকে আহ্বানকারী) সকল কিছুর বিনিময়ে সত্যের এই সংগ্রামী পথ পরিক্রমায় সফলতা লাভ করে–যখন সত্যের মুঠো মুঠো আলোতে সে নিজে অবগাহন করতে তাকে তখন সমাজ জীবনের ব্যাধিসমূহ এমনিই ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে। এ সময় এই সত্য সন্ধিৎসু ব্যক্তি দেখতে পায় কেমন করে কোরআনে পাক সেই বিদ্রোহী ও কঠিন হৃদয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে চলেছে।

সত্যের এই উদাত্ত আহ্বান পেশ করে জাহেলিয়াতের পর্দা উন্মোচনের প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে সূরাটি আখেরাতের বাস্তবতাকেও ফুটিয়ে তুলেছে। এই আখেরাত-কেন্দ্রিক জীবন গ্রহণ করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও কঠিন পথ পরিক্রমের প্রয়োজন।

আখেরাতের বাস্তবতা মেনে নেয়ার জন্যে বিরোধীদের কাছে সূরা 'আল হাক্কা'তে প্রচুর যুক্তি পেশ করা হয়েছে। অবশ্য সেখানে আলোচনা এসেছে কিছুটা ভিন্নভাবে, সেখানে সম্পূর্ণ এক নতুন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সূরা 'আল-হাক্কা'-তে আখেরাতের ভয়াল ও বিভীষিকাময় অবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে, কিন্তু এ সূরার আলোচনা এসেছে ভিন্ন পদ্ধতিতে। এখানে নতুন এক দৃষ্টিকোণ পেশ করা হয়েছে, নতুন চিত্র ও মর্মস্পর্শী কিছু নতুন অবস্থা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে, 'যখন একটিবার মাত্র শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতও যখন একটিবার ভীষণভাবে দুলে উঠবে সেই দিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং তখন সে আকাশ ফেটে পড়বে। সেদিন সেই ভয়ানক অবস্থা সকল কিছুকে শক্তিহীন করে দেবে।'

'ফেরেশতারা সেদিন নিজ নিজ স্থানে স্থবির হয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষমান থাকবে এবং তোমার মালিকের আরশ-কে সেদিন আটজন (ফেরেশতা) তাদের মাথার ওপরে ধরে রাখবে।' সে অবস্থার বর্ণনা মানুষের চেতনাসমূহকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত ও অভীভূত করে। এরশাদ হচ্ছে, 'সেদিন তোমাদের সবাইকে হাযির করা হবে, কোনো আত্মগোপনকারীই সেদিন নিজেকে গোপন রাখতে পারবে না।'

এভাবে সেই দিনের আযাবের দৃশ্যসমূহ মানুষের মনে এমন ভয় ভীতির সঞ্চার করবে যে এতে তাদের বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যাবে। হুকুম হবে, 'পাকড়াও করো ওকে, কষে বেঁধে ফেলো তাকে, তারপর ওকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দাও। অতপর সত্তর গজ দীর্ঘ শেকলে আবদ্ধ করে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও।'

এ বর্ণনায় শাস্তিপ্রাপ্ত এ ব্যক্তিদের চীৎকার হা-হুতাশ ও হাহাকারের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তারা বলবে,

'হায় আফসোস, আমাকে যদি আমার আমলনামা নাই দেয়া হতো, যদি আমি আমার ভাগ্য-লিখন মোটেই না জানতাম! হায়, আমি যদি (আজ জ্যান্ত মানুষ না হয়ে) মৃত হতাম!'

এ সূরার মধ্যে কেয়ামতের বিভীষিকার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে সেখানে তাদের চেহারার কি ভয়ানক রূপ হবে তা দেখানো হয়েছে, কেমন সন্ত্রস্তভাবে তারা হাঁটবে এবং তাদের চলার পথ কতো ভয়ংকর হবে। এ অবস্থা পৃথিবীর যে কোনো ভয়ংকর অবস্থা থেকে অনেক বেশী গুণে কঠিন হবে। আসলে সে ভয়ংকর অবস্থার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, অর্থাৎ যতো প্রকার ভীতিজনক অবস্থা মানুষ চিন্তা করতে পারে এটা তার থেকেও অনেক কঠিন।

আগুন এর শাস্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তা পায়ের গিরা স্পর্শ করলে তার তাপে মাথার মগয পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে বর্ণনা দিতে গিয়ে কোরআনে পাক বলছে–

'সেদিন আকাশ বিগলিত তামার মতো হয়ে যাবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো সব হয়ে যাবে ধুনা তুলার মতো।'

সে সময় অন্তরংগ বন্ধু তার পরম বন্ধুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। অপরাধী ব্যক্তি সেই কঠিন দিনে নিজের ছেলেকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে তার বিনিময়ে কঠিন আযাব থেকে বাঁচতে চাইবে। শুধু তাই নয়, নিজের জীবন-সংগিনী, ভাই, নিজের এমন আত্মীয় যার কাছে সে (প্রয়োজনের সময়) আশ্রয় নিয়েছে এবং পৃথিবীর যতো মানুষ ও সম্পদ আছে সকলের বিনিময়ে হলেও নিজেকে সে শাস্তি থেকে বাঁচাতে চাইবে।

জাহান্নামের যে ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে মনে হয় তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র এক গতিশক্তি এবং এক অনুভূতি থাকবে। এ জাহান্নাম জীবন্ত কিছুর মতো জীবন্ত প্রাণীকে ভীতি প্রদর্শনে সক্ষম হবে। এরশাদ হচ্ছে–

'জাহান্নামের সে ডগডগে আগুন গোটা দেহকে ঝলসে দেয়ার পর শরীরের চামড়া ও মাংসকে খসিয়ে দিতে থাকবে। সে ওই ব্যক্তিকে তার দিকে ডাকতে থাকবে যে সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিলো! যে ধন সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখতো এবং তাই নিয়েই সর্বদা মাথা ঘামাতো ও তাতেই মেতে থাকতো।'

আর যে আযাবের কথা এখানে বলা হচ্ছে তা অপরাধীদেরকে ঘিরে ফেলবে এবং অকল্পনীয়ভাবে একের পর এক তার ওপর বিপদসমূহ আসতে থাকবে। বলা হচ্ছে–

'সেদিন তারা কবর থেকে এমন দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসবে যেন কোনো এক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্যে তারা সবাই ছুটে চলেছে। তাদের চোখগুলো থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত এবং হীনতা-দীনতা ও বে-ইযযতির গ্লানিতে তাদের গোটা সত্বা ঢাকা থাকবে, এ দিনের আগমন সম্পর্কেই তো তাদের কাছে ওয়াদা করা হচ্ছে।'

এ দিনের দৃশ্য, বাস্তব ছবি ও প্রতিবিম্বের যেসব কথা এই সূরাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তা সূরা 'আল হাক্কা'–এর বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সূরা দুটিতে বর্ণনার ভিন্নতা থাকলেও বিষয়বস্তু মূলত একই।

সুখে দুঃখে, সংকটে সচ্ছলতায় এবং ঈমানদার অবস্থায় বা ঈমানহীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে গিয়ে একজন মানুষের মধ্যে যতো প্রকার অবস্থা দেখা দিতে পারে সূরায়ে 'মায়ারেজ'-এ তার বিশদ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে যে অভ্যাসটি একই রকম দেখা যায় তা হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যস্ত চরিত্রের সৃষ্টি রূপে, যখন কোনো দুঃখ কষ্ট বা অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে পেরেশান হয়ে যায়, আবার যখন কল্যাণ ও শুভদিনের মুখ দেখে তখন কাউকে দান করার ব্যাপারে সে সংকীর্ণ-হৃদয় হয়ে ওঠে, তবে সেই সকল নামাযী, যারা সদা সর্বদা নামাযে যত্নবান তাদের কথা আলাদা।'

তারপর বর্ণনার ধারা সাবলিল গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং মোমেনদের গুণাবলী, মন মানসিকতা ও তাদের চলার প্রকাশ্য ও গোপন পথ সম্পর্কে এ সূরাটির মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ, আল্লাহর অনুগত ও না-ফরমান উভয় প্রকার লোকই বর্তমান

থাকে। আল্লাহর অনুগত যারা, সকল যামানায় তাদের বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যেসব গুণ থাকতে পারে এ সূরার মধ্যে সেগুলোও তুলে ধরা হয়েছে এবং আল্লাহর ভাষায় তা হচ্ছে,

'তবে সে সকল মুসল্লী যারা নামাযে যত্নবান, তাদের সম্পদের মধ্যে সে সব লোকের হক্ব রয়েছে যারা হাত পেতে কিছু চায় এবং যারা প্রয়োজনীয় মৌলিক বস্তুসমূহ থেকে বঞ্চিত। (সে সকল ব্যক্তিও সদগুনের অধিকারী) যারা বিচার দিনের সত্যতা মেনে নেয় এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসা আযাবকে ভয় করে।'

সূরা 'আল হাক্কা'-তে যে মূল বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায় তা হচ্ছে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, মূলত এর ভিত্তিতেই মানুষের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। তারপর অন্য যে সব বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে আখেরাত অন্যতম। এ সূরায় আলোচ্য আরো কিছু বিষয় হচ্ছে সত্য অস্বীকারকারী এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে। এরা আখেরাতে ধরা পড়ে যাবে এবং তাদের রেহাই পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকবে না।

অপরদিকে সূরা 'মায়ারেজ'-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাতের বাস্তবতা তুলে ধরা এবং সেখানে যে প্রতিফল ভোগ করতে হবে সে বিষয়ের প্রামাণ্য চিত্র অংকন করা। আসলে সূরাটির মূল বক্তব্যই হলো আখেরাত যে সংঘটিত হবেই, সকল প্রকার সম্ভাব্য যুক্তির মাধ্যমে তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা।

অন্যান্য যতো কথাই এ সূরার মধ্যে বলা হয়েছে তার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে আখেরাতের সাথে অর্থাৎ আখেরাতকে কেন্দ্র করেই অপর সকল বিষয়ের অবতারণা। আলোচনার মধ্যে আখেরাত অস্বীকারকারীদের প্রতি আল্লাহর পাকড়াও এবং মানুষের তরফ থেকে তাদের ওপর নেমে আসা শাস্তির বর্ণনাও পেশ করা হয়েছে। অতপর এরশাদ হচ্ছে–

'তাঁর কাছে ফেরেশতারা এবং রূহ উঠে যায় এমন এক দিনে যেদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান; অতএব সুন্দরভাবে সবর করো, সে (বিষয়)-কে তারা সুদূর পরাহত মনে করে আমি তো তা দেখছি খুবই কাছে.....।'

একথাগুলো আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। ঈমানদার ও বে-ঈমান লোকদের দুঃখ ও সুখের জীবন যাপনের মধ্যে এই ধরনেরই পার্থক্য সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই উভয় প্রকার লোকদেরকেই শেষ বিচারের দিনে নিজ নিজ কাজের বদলা পেতে হবে।

সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে এটাও আলোচ্য বিষয় যে, কাফেররা চরম ধোকার মধ্যে রয়েছে, তারা এটা মনে করে খুবই আশান্বিত হয় যে, তারা সবাই (সনাতন ধর্মের ওপর থাকার কারণে) অবশ্যই নেয়ামতে ভরা জান্নাতে যাবে, যতোই তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলুক বা পরকাল সম্পর্কে যতোই উদাসীন থাকুক না কেন। সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে কাফেরদের এই মিথ্যা আশার কথা পেশ করা এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এই সূরা আখেরাতের অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া থেকে বিরত থেকেছে, অথচ সে বিষয়ের অন্যান্য তথ্য জানার জন্যে পাঠকের হৃদয় মন ব্যাকুল হয়ে থাকে।

আর একটি বিষয়ও এ সূরার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে দেখা যায় তা নতুন এক ভংগিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা অন্য সূরাগুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সূরায়ে 'আল হাক্কা' এবং এ সূরার বর্ণনায় ভংগির মধ্যে আরো কিছু পার্থক্য বিদ্যমান, যদিও আভ্যন্তরীন

আলোচ্য বিষয় একই। সূরা 'মায়ারেজ'-এর এ বর্ণনায় বৈচিত্র রয়েছে, একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, শুধু বাক্যের ছন্দের মিলই নয় বরং প্রতিটি শব্দও অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এখানে সজ্জিত রয়েছে।

এখানে প্রতিটি বাক্যের মধ্যে যে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয় তা অন্য যে কোনো সূরার তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক। সূরাটির প্রথমার্ধে আরো কিছু বর্ণনা বৈচিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রথমার্ধের শুরুর তিনটি বাক্যের দিকে তাকালে সূরাটির বর্ণনা বৈচিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি বুঝা সহজ হবে। এখানে দেখা যায়, বাক্যের মধ্যে আলোচিত কথাগুলো তার সমাপনী কথার দৈর্ঘের সাথে ও নিম্ন বর্ণিত কিছু বিষয়ের সাথে পরিপূর্ণভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। এরশাদ হচ্ছে,

'জিজ্ঞাসা করলো এক ব্যক্তি সে আযাব সম্পর্কে যা কাফেরদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে এবং যাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার মতো কেউ নেই।' (আয়াত ১-২)

পঞ্চম আয়াতের শেষে সবর-এর কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘ টান দেয়ার মতো 'আলিফ' ব্যবহার করা হয়েছে। 'ওরা তো দেখছে সে দিনটি অনেক দূরে, আর আমি দেখছি সে দিনটিকে অত্যন্ত কাছে।' এখানেও দ্বিতীয় বারের মতো দীর্ঘ 'আলিফ' ব্যবহার হয়েছে। 'সে দিন আকাশ হবে বিগলিত (তরল) তামার মতো, আর পাহাড়গুলো হবে ধুনা তুলার মতো এবং সে দিন কোনো অন্তরংগ বন্ধুই তার বন্ধু সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না-কেউ কারো খোঁজ খবরও নেবে না।'এখানেও তৃতীয়বারের মত দীর্ঘ 'আলিফ' দ্বারা বাক্য শেষ করা হয়েছে, আয়াতের অভ্যন্তরে কিন্তু একই ধরনের শব্দ বা বর্ণনাভংগী ব্যবহার করা হয়নি। আযাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে আযাবের দৃশ্যগুলো যখন তাদেরকে দেখানো হবে তখন অপরাধী সেই কঠিন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে নিজের ছেলেকে মুক্তিপন হিসেবে সোপর্দ করতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখানেও দেখা যায় প্রথম বারের মতো দীর্ঘায়িত 'আলিফ' দ্বারা বাক্যটি শেষ করা হয়েছে।

'সে ভয়ানক আগুন ঝলসিয়ে দিয়ে শরীরের চামড়া ও রক্ত মাংসকে খসিয়ে দিতে থাকবে, ডাকতে থাকবে সে ব্যক্তিকে যে (সত্যকে) পেছন (ফেলে) চলে গিয়েছিলো এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো।' (আয়াত ১৫-১৭)

এ সূরার মধ্যে যে পাঁচ জায়গায় দীর্ঘায়িত 'আলিফ' রয়েছে সেখানকার দুটি সমাপনী 'আলিফ-এর' উচ্চারণ প্রথম তিনটি আয়াতের উচ্চারণ থেকে আবার একটু ভিন্ন।

এরপর সূরার অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে দেখা যায় 'মীম' এবং 'নূন' দিয়ে শেষ করা হয়েছে এবং এগুলোর প্রায় সবগুলোর পূর্বেই 'ওয়াও' অথবা 'ইয়া' এসেছে।

আর একটি বৈশিষ্ট এ সূরার শুরুতে রয়েছে যা সূরাটিকে অত্যন্ত গোছালো এবং এর বর্ণনা পরম্পরাকে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে দিয়েছে এবং তা হচ্ছে, যে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, সে ঘটনা সংঘটিত হবেই। যে কোনো শ্রোতার মনে একথাটি দৃঢ় প্রত্যয় জাগায়। তৎকালীন আরব পরিবেশে যে ধর্ম-বিশ্বাস বিরাজ করছিলো তাতে পরকালের আযাবের কথা বলা যেমন কোনো পরিচিত বিষয় ছিলো না, তেমনি আরববাসীদের কানগুলোও এমন কোনো কথা শুনতে এবং তার প্রভাব গ্রহণ করতে মোটেই অভ্যস্থ ছিলো না। এ অবস্থায়

(১) উৎসাহীদের এ ব্যাপারে 'আত তাসওয়ীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' পুস্তকের 'আত তানাসুকুল ফান্নী ফিল কেতাব' অধ্যায় দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

আখেরাতের আযাব সম্পর্কে কোরআন অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে মানুষকে এমন কিছু কথা জানিয়েছে যা তৎকালীন আরববাসীরা সাধারণভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছে, যদিও তারা যেভাবে জীবন যাপন করছিলো তাতে এ দাওয়াত তাদের কাছে ছিলো নতুন এবং অপরিচিত। (১)

**তাফসীর**

এবার আমরা সূরাটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

'একজন প্রশ্নকারী সে আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা অবশ্যই আসবে। সে আযাব আসবে কাফেরদের ওপর, যা রোধ করার কেউ থাকবে না।'

আরবের মোশরেকদের কাছে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি সঠিকভাবে অনুভব করানো আসলেই দুরূহ ব্যাপার ছিলো। কেউ কেউ এ সম্পর্কে চিন্তা করতো, এটাকে সম্পূর্ণ একটা নুতন কথা বলে মনে করে কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে এ সম্পর্কিত কথাবার্তা শুনতো, তারা প্রায়ই আখেরাত সম্পর্কিত কথাগুলোকে অস্বীকার করতো, তারা রসূল (স.)-কে বিভিন্নভাবে চাপ দিচ্ছিলো-ওয়াদা করা আযাবকে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ে আসার জন্যে। আবার কখনও প্রশ্ন করছিলো 'কখন এটা সংগঠিত হবে?'

**আখেরাত সম্পর্কিত প্রশ্ন**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো সে ছিলো নাযার ইবনুল হারেস। একই বর্ণনাকারী থেকে আর একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সাধারণভাবেই কাফেররা প্রশ্ন করতো যে, কখন এটা সংঘটিত হবে!

সূরাটির মধ্যে বলা হয়েছে যে এক ব্যক্তি আখেরাত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো এবং দাবী করছিলো যে 'সেই আযাবকে জলদী করে নিয়ে আসা হোক', এর জবাবে বলা হয়েছে, আসবে সে আযাব নির্দিষ্ট সময়ে, যাকে কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এর দ্বারা সেই ব্যস্ত স্বভাবের মানুষ নিজের জন্যে পরিস্কারভাবে একটা ধ্বংশই ডেকে আনছিলো।

এ আযাব হবে সাধারণভাবে কাফেরদের জন্যে। এর অন্তর্গত হবে তারাও যারা এই আযাবকে অস্বীকার করার মনোভাব নিয়ে আশ্চর্য হয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন তুলতো।

'এ আযাব তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে যিনি সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী।'

সিঁড়ির মালিক বলতে আল্লাহর বড়ত্ব এবং উঁচু মর্যাদার কথা বুঝানো হয়েছে, যেমন অন্য একটি সুরায় বলা হয়েছে, 'তিনি বিভিন্ন স্তরের মর্যাদাবৃদ্ধিকারী এবং আকাশের মালিক।'

এইভাবে সূরাটির সূচনাতে চূড়ান্ত কথার মাধ্যমে আযাবের বিষয়টি যে বাস্তব সত্য তার প্রমাণ হাযির করা হয়েছে এবং কে তার ভাগী হবে তাও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে। আরও বলা হচ্ছে, কার কাছ থেকে তা হঠাৎ করে এসে পড়বে এবং যার কাছ থেকে তা আসবে তাঁর মর্যাদা কত বড়। তাঁর উঁচু মর্যাদার এটা একটা দিক যে তাঁর ফয়সালা হবে খুব উঁচু এবং সে ফয়সালা আসবেই। সে ফয়সালাকে ফিরিয়ে দেয়ার বা বাতিল করে দেয়ার মতো ক্ষমতা কারোই থাকবে না।

যাদের ওপর সেই আযাব আসবে এবার তাদের কথা বলা হচ্ছে, তারা হচ্ছে। **সেই** সব লোক যারা এ আযাবের ব্যাপারে খুবই ব্যস্ততা দেখাচ্ছে। (তারা বলছে কেন আসে না সে আযাব,

জলদি নিয়ে এসো তা, কিন্তু তারা জানে না যে,) সে আযাব তাদের খুব কাছেই আছে। বরং সকল সত্যের বড় সত্য হচ্ছে যে আল্লাহর ফয়সালা বান্দার ফয়সালার চাইতে বড়, তাঁর মাপকাঠিও ওদের মাপকাঠি থেকে ভিন্ন।

**একটি দিন হবে ৫০ হাজার বছরের সমান**

'তাঁর কাছে ফেরেশতারা এবং পবিত্র আত্মা (রূহ-জিবরাঈল) উঠে যায় এমন একটি দিনে যার দৈর্ঘ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতএব উত্তমভাবে সবর করো। সে আযাবকে তারা অনেক দুরে ভাবছে, কিন্তু আমি তো দেখছি তা খুব কাছে।'

সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কথা এটাই যে, যে দিনের কথা এখানে বলা হয়েছে সেই দিনেই ফেরেশতারা ও পবিত্র রূহ, জিবরাঈল (আ.) উর্ধাকাশে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে পৌঁছুবেন। এমন একটি দিন যার দৈর্ঘ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। রূহ বলতে এখানে জিবরাঈল (আ.)-কেই যে বুঝানো হয়েছে। সেই অর্থই অধিকতর গ্রহণযোগ্য, যেমন অন্যত্র এই নামেই তাঁর কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতাদের কথা বলার পর তাঁর কথা পৃথকভাবে বলায় তাঁর বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায়।

আবার সেই দিনে ফেরেশতাদের ও পবিত্র আত্মার আরোহন করার কথা আলাদা করে বলায় সেই দিনেরও আলাদা বৈশিষ্ট নিরূপিত হয়েছে। সেই দিনে তাদের উর্ধমুখে আরোহণ করাটাও সেই দিনের বিশেষ কাজগুলোর অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যেও একটি। আসলে এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে কিছুই জানিনা, আর তার গুরুত্ব সম্পর্কে না জানার জন্যে আমাদেরকে দায়ীও করা হবে না। ফেরেশতারা সেখানে কেমন করে উঠবেন এবং উঠে কোথায় পৌঁছুবেন তাও আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

এ সব বিষয় হচ্ছে গায়ব (অদেখা জিনিস)-এর ব্যাপার। এ ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণীর মূল রহস্য আমাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়, আল্লাহর এসব জ্ঞানগর্ভ কথার রহস্য বুঝার কোনো উপায়ও আমাদের কাছে নেই। এসব বিষয়ের কোন দলীল প্রমাণও আমাদের হাতে নেই। সুতরাং এসব দৃশ্যের বর্ণনা থেকে আমরা সেই দিনের গুরুত্বই অনুধাবন করতে পারি মাত্র; যেহেতু সেই ফেরেশতারা এবং পবিত্র আত্মা (জিবরাঈল) উর্ধাকাশে আরোহণ করার ব্যাপারে সেদিন সক্রিয় হয়ে উঠবেন এবং তাঁদের এই ভুমিকাই এ মহান দিনের অন্যতম বৈশিষ্ট হবে। সেই দিনের বৈশিষ্ট জানাতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'দিনটি দৈর্ঘ্যে হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।'

একথা দ্বারা সেই দিনের দৈর্ঘের দিকে ইংগীত করা হয়েছে এবং আরবী ভাষায় সময়ের দৈর্ঘ্য বুঝানোর জন্যে এই ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করার রীতি চালু আছে। এর দ্বারা একটি সুনির্দিষ্ট সত্যকে বুঝানো হয়েছে মাত্র। এদিনের পরিমান বা দৈর্ঘ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পৃথিবীবাসীদের গণনা মতে 'পঞ্চাশ হাজার বছর' সংখ্যাটি একটি দীর্ঘ সময়ের জন্যেও ব্যবহার করা হতে পারে।

আমরা পৃথিবীতে যে দিন গণনা করি তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা এবং এই চব্বিশ ঘন্টার দিনকেই মাপকাঠি হিসেবে এখানে ধরা হয়েছে। এইভাবে তারকারাজির আবর্তনের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়েও আমাদের ব্যবহৃত হাজার হাজার ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং একেবারে পঞ্চাশ হাজার বছর সুনির্দিষ্টভাবেই হতে হবে তা জরুরী নয়। এ সত্যটিকে আমি এই জন্যে উল্লেখ করলাম যে, এতে করে আজকের এক দিনের সাথে সেই দিনের একটা পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

আবার যখন আল্লাহর দিনগুলোর মধ্যকার একটি দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে বলে তারা জানতে পারছে সে সময় তারা সে দিনটিকে বা সেই দিনের আযাবকে আবার বহু দূরে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে করছে, অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন সে ভয়ানক দিনটি খুব কাছে। সেই অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে উত্তমভাবে সবর করতে বলছেন। বলছেন ঠিক যখন– তারা আযাবকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করছে সেই মুহূর্তে। এরশাদ হচ্ছে–

**দাওয়াতের কাজে ধৈর্য্য অপরিহার্য**

'অতএব তুমি উত্তমভাবে সবর করো, ওরা সেই দিনকে দূরে দেখছে, কিন্তু আমি দেখছি তা খুব কাছে।'

সবর করার আহবান এবং আল্লাহর দিকে রুজু করার জন্যে জনগনের মনোযোগ আকর্ষণ করা সকল দাওয়াতেরই মূলকথা। প্রত্যেক রসূলকেই এই একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর রসূলের অনুসারী প্রত্যেক মোমেনের জন্যেও সেই একই নির্দেশ রয়েছে। প্রতিটি কঠিন ও ক্লান্তিকর অবস্থার মধ্যে এই সবরই হচ্ছে জরুরী জিনিস, যা মানবমন্ডলীকে রক্ষার জন্যেও প্রয়োজন। প্রসন্ন বদনে সবর করতে পারলেই দূরবর্তী লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার আশা করা যায় এবং আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত সাফল্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়।

দুশ্চিন্তাহীন ধৈর্য!

আর 'সবরে জামীল' অর্থাৎ সুন্দর সবর হচ্ছে নিশ্চিন্ততা-দানকারী সবর যার সাথে কোনো ক্রোধ, কোনো অস্থিরতা, কোনো সন্দেহ জড়িত থাকে না, এমন সবর যার পরিণতি সুন্দর ও নিশ্চিত, সবরকারী ব্যক্তি সত্য পথে টিকে থাকার সংকল্পে অবিচল এবং ধৈর্য অবলম্বনের শুভ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত, আল্লাহর নির্দ্ধারিত ভাগ্য লিখনে সে সন্তুষ্ট। যে কোনো পরীক্ষার মধ্যেই যে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন–তা সে গভীরভাবে অনুভব করে, একদিন সে তাঁর কাছেই পৌঁছুবে। যা কিছু সুকীর্তি তার আছে এবং যা কিছু সে করছে সকল ব্যাপারেই তাকে হিসাব দিতে হবে বলে সে বিশ্বাস করে।

এখানে 'সবর'-এর এই গুনটি বিশেষ ভাবে ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদের মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা সবর করার দাওয়াত হচ্ছে জনগণের কাছে আল্লাহরই দাওয়াত, আর ইসলামের দাওয়াত বলতে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোই বুঝায়। এই দাওয়াতে তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই এবং এই দাওয়াত দান করার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সুযোগও নেই। এর মাধ্যমে আল্লাহর পথে কাজ করা ব্যতীত অন্যকিছু সে আশাও করে না। একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কেই সে মানুষকে জানাতে থাকে। সুতরাং এই কাজ করতে গিয়ে সে যে সুন্দর ধৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করে, তা তার দাওয়াতী কাজের জন্যে অত্যন্ত উপযোগী এবং তার বিবেকের গভীরে এই সবর-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন এই দাওয়াতের মূল মালিক। তাঁর দিকেই মানুষকে ডাকা হয়। সত্যকে অস্বীকারকারী কাফেররা এই দাওয়াতের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। আযাবের ওয়াদা-প্রদানকারী আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তারা জলদী করে আযাব পাঠানোর দাবী জানায়, 'আসলে আযাব যে আসবে' একথাটাকে তারা একটা মিথ্যা বলে মনে করে।

যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই সে সব বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং কোন সময়ে সেগুলো ঘটবে সে সময়ও আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। গোটা বিশ্বের প্রয়োজনকে সামনে রেখে তাঁর জ্ঞান ও সুকৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সে ঘটনাগুলো ঘটতে

থাকে। কিন্তু মানুষ তাঁর ব্যবস্থাপনা ও পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত না জানা ও না বুঝার কারণে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার কোনো উদ্দেশ্য সফল হতে বিলম্ব হলে তার সাফল্য সম্পর্কে সে সন্দিহান হয়ে যায়। এর ফলে দাওয়াত দানকারীদের অন্তরের মধ্যেও কিছুটা পেরেশানী এসে পড়ে। এ কারণে তাদের মধ্যে প্রতিশ্রুত মনযিলে মকসূদে পৌঁছানোর আকাঙ্খা, আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখা যায়। এমনই পর্যায়ে এসে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে সান্তনার-বাণী দান করা হয় 'অতএব, সুন্দর ভাবে সবর করো', নিজ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সংগ্রামে অবিচল থাকো।

এর মাধ্যমে রসূল (স.)-এর অন্তরকে এ কঠিন দুঃসময়ে শক্তি যোগানো হয়েছে, বিশেষ করে যখন তিনি চরম বিরোধিতা ও উপেক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাঁর কথাগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো। সেই সময় আল্লাহ তায়ালা এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, মানুষ যা ভাবে তা হয় না, হয় তাই যা আল্লাহ তায়ালা করতে চান এবং যে কর্মকান্ডের ভাল মন্দের ব্যাপারে তাঁর মাপকাঠিগুলোই সঠিক. মানুষের সংকীর্ণ-দৃষ্টিসম্মত মাপকাঠি কস্মিনকালেও সঠিক নয়। এরশাদ হচ্ছে—

'ওরা দেখছে সে দিনটিকে অনেক দূরে, আর আমি দেখছি সে দিনটিকে খুবই কাছে।'

**কেয়ামতের কিছু খন্ড চিত্র**

তারপর আল্লাহ তায়ালা এ দিনটিকে বুঝার জন্যে বিশ্বের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বহু দৃশ্য ছড়িয়ে রেখেছেন, আর তা বুঝার জন্যে মানুষকে দিয়েছেন সুতীব্র এক অনুভূতি। এই দৃশ্যগুলো যেমন ভীতিপ্রদ, তেমনি সারা বিশ্বের বুকে এবং খোদ মানুষের অন্তরের মধ্যে সমানভাবে প্রকম্পন-সৃষ্টিকারী। এরশাদ হচ্ছে—

'যে দিন মহাকাশ বিগলিত তামার মতো হয়ে যাবে আর পাহাড় পর্বতগুলো ধূনা তূলার মতো হয়ে যাবে।'

'মুহ্ল' বলতে বুঝায় খনির কর্দমাক্ত বা আবর্জনাযুক্ত গলিত লাভা। তেলের গড়ানিকেও 'মুহ্ল' বলে। আর 'এহ্নুন' অর্থ পশম ধূনা। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে যে সব বর্ণনা এসেছে তাতে বুঝা যায়, বিশ্বজোড়া মহাবিপর্যয় সার্বিকভাবে সেই দিনেই সংঘটিত হবে। সে সময় সারা জাহানব্যাপী একটা পরিবর্তন দেখা দেবে, সব কিছুর পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। গ্রহ নক্ষত্রর একটার সাথে অন্যটার যে যোগাযোগ আজ বিদ্যমান রয়েছে সে সব কিছু থেমে যাবে। সে দিন যে পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হবে সেগুলোর মধ্যে এটাও একটি যে, আকাশকে দেখা যাবে গলিত তামার মতো।

এসব বর্ণনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ও জোতির্বিদ্‌দের জ্ঞান-গবেষণার জন্যে অত্যন্ত সহায়ক বিষয়। এ সকল বিজ্ঞানীদের মতে সেই মহা-প্রলয়ের দিন আকাশের মধ্যেকার গ্রহ নক্ষত্রগুলো তরল পদার্থে পরিণত হওয়ার পর বায়বীয় বা গ্যাসের আকার ধারণ করবে; অতপর আরও কয়েকটি বিবর্তনের মাধ্যমে প্রবাহমান তরল অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পরই এটা সংঘটিত হবে। কেয়ামতের দিন সব কিছু জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। যেমন পুনরায় বলা হয়েছে, 'আর যখন তারকারাজি জ্যোতিহীন হয়ে যাবে।' এর পরে হয়তো সব কিছু ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং সব কিছু পুনরায় বায়বীয় পদার্থের রূপ নেবে, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

এ সব হচ্ছে সম্ভাবনা। তবে যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত তাদের জন্যে এসব বর্ণনাকে সামনে রেখে যখন কিছু লিখতে শুরু করি এবং আশপাশের সকল কিছুর দিকে যখন সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে আমরা তাকাই তখন সত্যিই আমরা অবাক বিস্ময়ে অভীভূত হয়ে যাই। এখানে কোরআন অত্যন্ত চমৎকার ও প্রাণস্পর্শী বর্ণনা পেশ করছে,

'সেই দিন কোনো বন্ধু তার বন্ধুর খোঁজ খবর নেবে না।' তাদেরকে সেই সময়কার সকল দৃশ্যই দেখানো হবে। সেদিন প্রত্যেক অপরাধী ব্যক্তিই চাইবে নাজাত পেতে, তাতে যদি তার পুত্র-সন্তানকে মুক্তিপন দেয়ার প্রয়োজন হয় তাও দেয়ার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে যাবে, তার প্রিয়তমা জীবন সাথীকে দিয়ে দিতে রাযি হবে, তার গোষ্ঠির লোকজন যারা তাকে সারাটি জীবন আগলে রেখেছে তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করতে রাযি হবে, এমনকি পৃথিবীর সমুদয় অর্থ সম্পদের মালিকও যদি সে হতো, তাও সেদিনের সে মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুক্তিপন হিসেবে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সব কিছুর বিনিময়েও যদি নাজাত লাভ করা যায় তাও সে পেতে চাইবে।

গুরুত্ব সহকারে এগুলোর আলোচনা দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে যে, সে সময়ের লোকদের মাঝে কৃপণতা, লালসা, কুফুরীর প্রতি ঝোঁক প্রবণতার অভ্যাস বিদ্যমান ছিলো। আরো ছিলো নবীকে উপেক্ষা ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার প্রয়াস এবং গোমরাহীর প্রতি ঝুঁকে থাকার প্রবণতা, আর এ সকল অবস্থার মোকাবেলায় নবীকে ইসলামী দাওয়াত পেশ করার কাজ করতে হয়েছে।

এই দাওয়াতের প্রসারকল্পে বারবার এক কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সময় থাকতেই তাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা সাবধান হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কুফুরী ও আল্লাহর সাথে কারো শরীক করার পরিণামে তাদের জন্যে যে কঠিন শাস্তি অবধারিত রয়েছে তাও জানানো হয়েছে।

### ইসলামী দাওয়াত.অস্বীকারের কারণ

এই সূরার মধ্যে আরও কিছু ইশারা ইংগীত পাওয়া এগুলো সবই তৎকালীন মক্কার পরিবেশে মজুদ ছিলো। সেখানে সাধারণভাবে লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সূদী কারবার করে ধন সম্পদ সঞ্চয় করতো, আর কোরায়শদের দলপতিরাই ছিলো এর প্রধান হোতা। শীত ও গ্রীষ্মের দুটি মৌসুমে যে কাফেলাগুলো বাণিজ্য যাত্রা করতো তাদের মধ্যেও প্রধানত কোরায়শ সর্দার বা তাদের প্রতিনিধিরাই থাকতো বেশী।

সেখানে ধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতো। সম্পদ বৃদ্ধির লোভ ও তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা অভাবগ্রস্তদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চিত করতো। এতীমদের সর্বনাশ সাধন করতো। এই কারণেই কোরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়টি বারবার উল্লেখ করে এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে। আল কোরআন এই লোভ ও লালসাকে দমন করার অনেক ব্যবস্থা নিয়েছে। মক্কা বিজয়ের আগে ও পরে লোভ-লালসার টানাপোড়েনে থাকার কারণে সত্যপথ গ্রহণ করতে মানুষ যে বিলম্ব করছিলো সে বিষয়েও কোরআনে পাক বিশদ আলোচনা করেছে।

এগুলোর মধ্যে স্পষ্টভাবে যে জিনিসটি নযরে পড়ে তা হচ্ছে সূদী কারবার। সে বিষয়ে কোরআনের বহু সতর্কবাণী এসেছে। তৎকালীন আরব সমাজে মানুষের ধন-সম্পদ মেরে খাওয়ার প্রবণতা এবং বিশেষভাবে এতীমদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে সর্বশান্ত করে দেয়া ও তাদের ধন-সম্পদ দ্বারা নিজেদের পুঁজির পাহাড় গড়া ইত্যাদির আলোচনা এসেছে।

এর পাশাপাশি এতীম মেয়েদের প্রতি যুলুম এবং তাদের সম্পদের লোভে তাদেরকে জোর করে বিয়ে করতে চাওয়া, দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত যারা অভাবে পড়ে হাত পাততে বাধ্য হয় তাদেরকে ধমক দেয়া, এতীমদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করা এবং বাস্তহারা নিস্ব ব্যক্তিদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করা ইত্যাদি নিষ্ঠুর আচরণ তৎকালীন আরব-পরিবেশকে বিষাক্ত করে ফেলেছিলো। সুতরাং তাদের মন মানসিকতার মধ্যে আমুল পরিবর্তন আনা এবং সকল পরিস্থিতিতে মানবতার

উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। সম্পদের মোহব্বত এবং অর্থবৃদ্ধির লালসার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্তরের সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পায়। সম্পদের দিকে পরিপূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়া এমন একটি অবস্থা, যা মানুষের গলায় মরণ ফাঁদের মতো ফাঁস পরিয়ে দেয়। তাই এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রবল প্রচেষ্টা ও ক্রমাগত সংগ্রাম প্রয়োজন। অর্থগৃধুতার ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্যে একটা দীর্ঘ চিকিৎসা জরুরী।

এ পর্যন্ত এসে সে ভয়ংকর দিনের ছবি পেশ করা সমাপ্ত হলো। কি কঠিন আযাব সে দিন আসবে তাও এখানে আলোজনা করা হলো। এবারে সে আযাবের ও পুরস্কারের অধিকারী শ্রেণী দুটোর চিত্র আঁকা হচ্ছে। একদল ঈমানী জীবন যাপন করেছে এবং অপর দল বে-ইমানী জীবন কাটিয়েছে। এর ফলে মোমেনদের আচরণ এবং কাফেরদের আচরণ ও প্রকৃতিও আলাদা হয়ে গেছে। দেখুন আল্লাহর বাণী,

'মানুষকে সৃষ্টি করাই হয়েছে ব্যস্তস্বভাবের সৃষ্টি রূপে; যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে অস্থীর হয়ে যায়, আবার যখন তাকে কোনো কল্যাণ দান করা হয় তখন সে অন্যকে কিছু দান করা থেকে বিরত হয়ে যায়। তবে এ অবস্থা থেকে তারা মুক্ত যারা সর্বক্ষণ নামাযে যত্নবান হয়, যারা প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত অসহায় দরিদ্রদের সাহায্য করে, দান করে। যারা শেষ বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে এবং যারা তাদের পরোয়ারদেগারের পক্ষ থেকে যে ভয়ানক আযাব আসবে তাকে মনে প্রাণে ভয় করে।'

নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের কাছে যে আযাব রয়েছে তা কোনো নিরাপদ জিনিস নয়, যারা নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী, নিজেদের স্ত্রীদের ও অধীনস্থ দাসীদের বাদে- তাদের ব্যাপারে এটা কোনো নিন্দনীয় নয়।(১) আর যারা সকল প্রকারের সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বনকারী। সর্বোপরি নামায আদায় করার ব্যাপারে তারা সদা সতর্ক। এই সকল গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিরাই আল্লাহর জান্নাতগুলোতে স্থান লাভে ধন্য হবে, সেখানে তারা থাকবে সম্মান ও মর্যাদার সাথে।'

### ঈমান শূন্য মানুষের মন

ঈমান শূন্য মানুষের অবস্থা হচ্ছে এমন এক অদ্ভুত ধরনের, যার বর্ণনা কোরআন বিশদভাবে পেশ করেছে। কোরআনের বর্ণনা মতে সে এই সৃষ্টির মধ্যে সবার কাছে এক ভিন্ন জাতের সৃষ্টি হিসেবে গণ্য। কারণ যে প্রকৃত সত্য অন্য সব সৃষ্টি স্বীকার করছে- তা সে মানতে প্রস্তুত নয়। সে

---

(১) দাসীদেরকে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করার রীতি বহু শতাব্দী ধরে সমাজে চলে আসছিলো। পরবর্তী কালে ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষের মর্যাদার উন্নয়ন সাধন করে। ইসলাম গ্রহণের পর 'সকল মুসলমান ভাই ভাই' এই ঘোষণার ব্যাপ্তির কারণে সমাজ থেকে ধীরে ধীরে এই কুপ্রথার অবসান ঘটেছে।

এই দাস প্রথা চালু ছিলো দুইভাবে। এক. যুদ্ধবন্দী বিনিময় না হওয়া অবস্থায় তাদেরকে দাস বা দাসী হিসেবে বিজয়ী সেনাদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। দুই. বাজারে গরু-ছাগলের মতো তাদের বিক্রি করা হতো। আদম ব্যবসায়ী ছিনতাইকারীরা স্বদেশ ও বিদেশ থেকে ধরে নিয়ে এদের বাজারে বাজারে বিক্রি করতো। আর এটা সম্ভব ছিলো এই জন্যে যে, তৎকালে বিশেষ করে আরব দেশে কোনো কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা সবার গ্রহণযোগ্য কোনো আইন কানুন চালু ছিলো না। ইসলাম ধীরে ধীরে এ অবস্থার উন্নয়ন করেছে। ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয় ও যুদ্ধবন্দীর ক্ষেত্রে বিনিময় প্রথা চালু করা হয়। 'দাস-মুক্তিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলে' এ ঘোষণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ দাস-দাসীদেরকে মুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং অবশেষে তাদেরকে নিজেদের মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে জামাই বানানোর প্রথাও সমাজে চালু হয়ে যায়। এইভাবে দেরীতে হলেও দাস প্রথা সমাজ থেকে বিদূরীত হয়ে যায়। বিস্তারিত আলোচনার জন্যে এই তাফসীরের (সূরা মুহাম্মদ) ১৯ তম খন্ড দ্রষ্টব্য- সম্পাদক

তার মালিককে মানতে গিয়ে নানা প্রকার সংশয় অনুভব করে। এই দুর্বিসহ সংশয়ে পতিত হতভাগ্য ব্যক্তিটি ঈমানের বর্ম ব্যতীত মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পায় না। সমস্যা-পীড়িত এই ব্যক্তির সকল অস্থিরতা তখনই দূর হওয়া সম্ভব যখন সে ঈমানের বলে বলীয়ান হবে, আর তখনই সে অকল্যাণ ও সংকীর্ণতার ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে পারে।

'অবশ্যই মানব জাতিকে 'বে-সবর' বা ধৈর্যহীন করে পয়দা করা হয়েছে। তার প্রকৃতিই হচ্ছে, যখন তাকে কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে অস্থির হয়ে যায়। আবার কোনো কল্যাণ বা সাফল্য যখন সে পায় তখন এতো সংকীর্ণ হৃদয়ের হয়ে যায় যে, আর কাউকেই সে কিছু দিতে চায় না।'

তখন এমন এক ভাবমূর্তি তার মধ্যে সৃষ্টি হয় যে, সে আরাম-আয়েশের স্পর্শে অন্যদের ভুলে যায়, যেখানেই সে একটু সুখ সম্পদের খোঁজ পায়, সেখানেই গিয়ে সে তা হাসিল করার জন্যে পাগল হয়ে উঠে। এ সময় তার মধ্যে প্রধানত তিনটি অবস্থা দেখা যায়,

এক. অহংকারে সে তখন অন্যের সাথে বেশী কথা বলতে চায় না।

দুই. আরাম-আয়েশের স্পর্শে জীবনের স্পন্দন তার গোটা সত্তাকে আন্দোলিত করতে থাকে, কিন্তু ফলে ফুলে শুশোভিত দেহ-অবয়ব নিয়ে থাকা সত্তেও তার মধ্যে সব সময় হাহাকার লেগেই থাকে এবং যখনই কোনো সামান্য সংকট এসে হাযির হয় তখন সে একেবারে অস্থির হয়ে যায়, সমস্যার জ্বালা তাকে দারুণভাবে পীড়া দিতে থাকে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে এমন ভাবে সে অস্থির হয়ে যায় যে মনে করতে থাকে এ সংকটের অবসান বুঝি আর কোনোদিন হবে না।

সে এও ভাবতে থাকে যে, এই অবস্থাই তার স্থায়ী ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়ে গেছে, যার থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। বিপদ বা দুঃখের সেই অবস্থায় তার মনের মধ্যে নানা প্রকার বদখেয়ালও জটলা পাকাতে থাকে। এর কোনো পরিবর্তন এবং এ দুঃখ বেদনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে সে হতাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর কোনো সমাধান আসবে বলেও তার মনে বিশ্বাস আসতে চায় না, এইভাবে চরম এক অস্থিরতা তাকে গ্রাস করে ফেলে। সকল ধৈর্যের বাঁধ তার ভেংগে যায়। এমন কোনো অবলম্বন সে সামনে দেখতে পায় না, যা ধরে সে দাঁড়াতে পারে। হতাশার আঁধারে আশার আলোর ক্ষীণতম রেখাও সে দেখতে পায় না। আবার এই অবস্থা থেকে যখন সে উদ্ধার পেয়ে যায় সে মনে করতে থাকে, নিজ কৃতিত্ব বলেই সে এ মহাসংকট থেকে নাজাত লাভ করেছে, এতে কারো কোনো হাত বা অবদান নেই।

এইভাবে যা কিছু সে লাভ করে তার মধ্যে তার মন-মগয, এমনকি তার গোটা সত্ত্বা আবদ্ধ হয়ে যায়, সে তখন লালসার পরিপূর্ণ দাসে পরিণত হয়। কেননা সে জানে না যে, জীবন ধারণের যাবতীয় উপায়- যা সে আজ লাভ করেছে এবং বিপদ-আপদ যা এখানে আসে তার আসল উৎস কোথায়? সে বুঝতে চায় না যে, এসব কিছুই তার মালিকের দান। কাজেই স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল উভয় অবস্থাই তার জন্যে এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে যায় যে, সে কখনও স্থির হয়ে বসতে পারে না। দুর্দিনে সে যেমন থাকে তেমনি সুদিনেও সে সুস্থির থাকে না। মূলত ঈমানের অভাবেই এই অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে।

এবার শুরু হচ্ছে ঈমান সম্পর্কিত আলোচনা। মানুষের জীবনে ঈমানের প্রশ্নটি এতো বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে এর সমকক্ষ অন্য কিছুই নেই। এই ঈমান একমাত্র হৃদয়ের অভ্যন্তরেই অনুভব করা সম্ভব।

এই ঈমানের ব্যাপারটি মানুষ সম্পূর্ণভাবে তার অন্তরের গভীরে পোষণ করে, যার ভিত্তিতে তার কাছে জীবন পরিচালনার এক বিশেষ নিয়ম পদ্ধতি নির্ণিত হয়। জীবনকে মূল্যবান বানানোর জন্যে, জীবনের যাবতীয় কাজ ও ব্যবহারকে সুনির্দিষ্ট গতি দান করার জন্যে এটি একটি বড় পরিচালিকা শক্তি। এ শক্তি মানুষকে সাহস দেয়, নির্ভীক বানায়, তাকে কর্মতৎপর করে এবং যে কোনো ঝুঁকি নিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। যে অন্তরে ঈমান নেই সে অন্তর হয় দোদুল্যমান এবং পাখীর পাখনার মতো তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে বেড়ায়। তাই ঈমান-শূন্য হৃদয় সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয়-ভীতির শিকার হয়।

এসব অন্তরের প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, যদি কোনো অকল্যাণ বা দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করে তাহলে সে অস্থির হয়ে যায়, আবার যখন সে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির অধিকারী হয় তখন তার মধ্যে সংকীর্ণতা ও কৃপণতা এমনভাবে বাসা বাঁধে যে সে ভুলেই যায় যে এগুলো পাওয়ার পেছনে তার নিজের ভূমিকা ছিলো একেবারেই গৌণ, আল্লাহর কুদরতই ছিলো এখানে মুখ্য। এ কারণেই বলা হয়, যার দিলে ঈমান স্থান করে নিয়েছে সে শান্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে। নিশ্চিন্ততায় তার মন ভরপুর থাকে, এ অবস্থায় অন্যদেরকেও সে তার সুখ-শান্তির সাথে ভাগী বানিয়ে নিতে চায়, যেহেতু সে ভালোভাবে অনুভব করে যে এসব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, সবই আল্লাহর দান, তাঁরই মেহেরবাণীতে সে এগুলো লাভ করেছে। যে কোনো সময়ে তার এসব ভোগ্য বস্তুকে সংকুচিত করে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করা হতে পারে। এ কথা সে জানে এবং বুঝে বলেই সে তার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

আবার প্রতিটি বিপদের পর অথবা তার পাশাপাশি বিপদমুক্তি ও স্বচ্ছলতা অবশ্যই আসবে- একথাও সে বিশ্বাস করে, তাই সে কোনো অবস্থাতেই অস্থির হয় না। যখন সুদিন আসে তখন কৃতজ্ঞচিত্তে সে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর দেয়া 'রেযেক' (সুখ-সম্পদের জিনিস) থেকে নির্দ্বিধায় সে খরচ করে। আর আল্লাহর পথে যখন সে খরচ করে তখন সে এর বিনিময়ে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রতিদান পাবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। আখেরাতে বদলা পাওয়ার পূর্বে দুনিয়ার প্রাপ্য হিসেবে সে মুখ্যত ঈমানী প্রেরণাই পেতে চায়, যার কারণে সে পরম শান্তি ও তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে এবং জীবনের দীর্ঘ কঠিন পথে সে তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততার সাথে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। মোমেনদের প্রধান গুণই হচ্ছে তারা সর্বাবস্থায় অস্থিরতা মুক্ত থাকে, অথচ সাধারণভাব মানুষ বিপদে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। ঈমানদার ও বে-ঈমান ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এই গুণটি একটি প্রধান গুণ, তাই বলা হচ্ছে, 'তবে সে সকল নামাযী ব্যক্তি ছাড়া যারা নামাযে সদা যত্নবান থাকে।'

### নামায কি ও কেন?

নামায হচ্ছে ইসলাম রূপী ঘরটির প্রধান স্তম্ভ। ঈমানের লক্ষণ প্রকাশ করার মাধ্যম ছাড়াও নামায মোমেনের জীবনে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেহেতু নামায হচ্ছে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান উপায় এবং নামাযের মাপকাঠি দিয়েই এই সম্পর্কের গভীরতা নির্ণয় করা হয়। যে আনুষ্ঠানিক এবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রভুত্ব ও মানুষের দাসত্ব প্রকাশ পায় তা হচ্ছে এই নামায। মোমেনের এই স্থায়ী গুণটি সম্পর্কে এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তারা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা নিয়মিতভাবে নামায পড়ে।' নামাযীদের গুণের কথাটি বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কোনো সময়ের জন্যেও নামাযের সাথে সম্পর্ক-মুক্ত হয় না, অবহেলা বা ঢিলেমীও করে না। এইভাবে তারা আল্লাহর সাথে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কায়েম রাখে।

রসূলুল্লাহ (স.) আনুষ্ঠানিক এবাদাতের কোনো একটি একবার করতে শুরু করলে তাকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখতেন, অর্থাৎ একবার শুরু করলে তা আর ছাড়তেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহর কাছে সেই কাজটিই অধিক প্রিয় যা অল্প, কিন্তু নিয়মিতভাবে তা পালন করা হয়। বিশেষভাবে খেয়াল করার জিনিস হচ্ছে, আল্লাহর সংগে সম্পর্কের ভিত্তিতেই নামাযের প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণেই এই স্থায়িত্ব সম্ভব। এটা কোনো খেল-তামাশা নয় যে, ইচ্ছা হলো এই সম্পর্ক স্থাপন করলাম, আবার ভালো লাগলো না- সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলাম!

তাই মোমেনদের বৈশিষ্ট উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে-

**ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা**

'আর তাদের ধন সম্পদের মধ্যে অধিকার রয়েছে তাদের-যারা কৃপা প্রার্থী হয়ে হাত পাতে, আর যারা বঞ্চিত, একথা ওরা জানে ও মানে।'

যে সম্পদের দিকে এখানে ইংগীত দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে যা সম্পদশালী ব্যক্তির ওপর ফরয এবং কোনো ব্যক্তির কাছে তা অজানাও নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল-সম্পদ এক বছর যাবত হাতে থাকলে অথবা ব্যবসায় পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করা থাকলে সেই মালের ওপর যাকাত ফরয হয়ে যায়। প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তি এটা স্বীকারও করে। কিন্তু আয়াতের অর্থ আরও ব্যাপক হতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তি জানে ও অনুভব করে যে, তার মালের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। এই অনুভূতিই তাকে সংকীর্ণতা ও অহংকার থেকে দূরে রাখে।

ধন-সম্পদের আসল মালিক যিনি, তিনি এতে প্রার্থী ও বঞ্চিত অধিকার রেখে দিয়েছেন- এই বাণী মানুষকে উদার হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ বাণী তাকে এ কথাও শেখায় যে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন অভাবপূরণকারী। অভাবগ্রস্তদের আবার কয়েকটি শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা নিজের অভাবের কথা নিজেই অন্যদের জানায়, আর এক শ্রেণীর অভাবগ্রস্ত আছে যারা আত্ম-সম্ভ্রমবোধের কারণে চাইতে পারে না, দাঁতে দাঁত এঁটে পড়ে থাকে, কষ্ট হযম করে। কষ্ট তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠুক, এরা তা চায় না- চাইতেও পারে না। মোমেনের দিল তাই এদের জন্যে করুণায় ভরে যায়, তার মন বলে অবশ্যই ওদের সাহায্য করা দরকার। সে ওদের এই অধিকার অন্তরের মধ্যে অনুভব করে।

আসলে তার এই অনুভূতি হচ্ছে তার প্রতি আল্লাহর এক মহা মেহেরবানী, এই অনুভূতি তার মধ্যে এক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে যার অপর নাম হচ্ছে মানবতাবোধ। এই অনুভূতি মজ্জাগত সংকীর্ণতা ও কৃপণতার বিপরীত। ঈমানের কারণেই এই গুণটি তার মধ্যে সৃষ্টি হয়, আর এই জিনিসটাকেই বর্তমানে নাম দেয়া হয়েছে সামাজিক জামানত বা সোশ্যাল সিকিউরিটি।

এই সামাজিক জামানতের অনুভূতি গোটা জাতির মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা, সহানুভূতি ও অনুকম্পনার এক স্রোতধারা প্রবাহিত করে দেয়। এই কর্তব্যবোধকেই ইসলামী সমাজে ফরয

(অবশ্য করণীয়) হিসেবে চালু করা হয়েছে। এই অনুভূতির প্রসার ঘটিয়ে ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদের জন্যে এক রক্ষাকবচের করেছে। এই অনুভূতি মানুষের সুপ্ত বিবেককে জাগিয়ে তুলেছে। এদের সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে,

'তারা বিচার দিনের সত্যতাকে স্বীকার করে।'

এই গুণটি সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। মোমেনের চরিত্রে এই গুণটি উল্লেখযোগ্যভাবে বর্তমানে থাকবে।

হিসাব দিবসের ওপর ঈমান হচ্ছে গোটা ঈমানের অর্ধেক। এর অর্থ হচ্ছে আখেরাত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই মানুষের জীবনপথকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার অনুভূতি ও চলার পথকে সঠিক গতি দান করে। রোজ হাশরের প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে এমন এক পাল্লা, যার দ্বারা সে নিজেই নিজের কাজ কর্মের পরিমাপ করতে পারে।

অপরদিকে যে ব্যক্তি রোজ-হাশর সংঘটিত হবে বলে বিশ্বাস করে না দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে দুনিয়ার চাওয়া ও পাওয়ার মাপকাঠিতেই সকল কিছুর পরিমাপ করে। যার মধ্যে আখেরাত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ আছে তার পরিমাপযন্ত্রও হবে একই রকম। দুনিয়ার স্বার্থের মাপকাঠিতেই সে জীবনের মূল্য নির্ধারণ করে, সেই মাপকাঠি দিয়েই সে তার বিভিন্ন কাজ ও ঘটনার পরিমাপ করে।

**মানব জীবনে পরকাল বিশ্বাসের সুফল**

পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি কোনো কাজ করার সময় আকাশে রক্ষিত মাপ যন্ত্রের দিকে আগে তাকায়, পৃথিবীতে তার মূল্য কতটা সে বিচার করে না। তার কাছে আখেরাতের হিসাবটাই হচ্ছে আসল হিসাব, দুনিয়ার হিসাব তার কাছে সম্পূর্ণ গৌণ। আখেরাতের পরিণতির মানদন্ডে সে কোনো ঘটনার ভালো-মন্দ নির্ণয় করে। অর্থাৎ ঘটনা যাই ঘটুক না কেন যদি সে বুঝে আখেরাতে তার দ্বারা সাফল্য আসার সম্ভাবনা আছে তাহলে তার হৃদয়ের অনুভূতি ভালো মন্দ সর্বাবস্থায় অবিচল থাকে। আবার আখেরাতে কর্মফল ভালো হবে না– কোনো কাজের ব্যাপারে এমন যদি সে বুঝে তাহলে সে আল্লাহর কাছে কেঁদে পেরেশান হয় এবং আখেরাতের বিচারে আশানুরূপ ফল লাভ করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প হয়ে তখন চেষ্টায় লেগে যায়। অপরদিকে আখেরাতের জীবনের পরিণতিকে যারা বিশ্বাস করে না বা তাতে সন্দেহ করে তাদের চেষ্টা সাধনা হয় সম্পূর্ণ দুনিয়াকেন্দ্রিক। অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার মাপকাঠিতেই সে সবকিছুকে পরখ করতে থাকে। দুনিয়ালোভী আখেরাতে অবিশ্বাসী সেই ব্যক্তির সব কিছুর সীমা হচ্ছে এই দুনিয়া এবং এই দুনিয়ার জীবন। এই কারণে তার হিসাবও হবে ভিন্ন ধরনের এবং তার পরিমাপের ফলাফলও হবে বিভিন্ন। এর ফলে সর্বকালে ও সর্বদেশে সে অপরাধী বলেই বিবেচিত হবে, যদিও এই সময়কালটি একান্ত সীমাবদ্ধ।

সর্বত্রই সে সীমাহীন কষ্টের মধ্যে পতিত হবে, সর্বহারা এবং দিশেহারা হবে। কারণ জীবনের দুটি ভাগের মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ তথা পরপারের জন্যে যখন সে পাথেয় সঞ্চয় করতে পারতো তখন সে হিসাব করে চলেনি, যার ফলে দুনিয়ার জীবনে প্রকৃত সুখ বা শান্তি কোনোটাই সে লাভ করতে পারেনি। সে নিজের ওপর ইনসাফ করতে পারেনি- না অপর লোকদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে পেরেছে। না তার ব্যবহারগুলো যুক্তিসংগত বিবেচিত হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকবে তার জীবনের অপর ভাগ না আসা পর্যন্ত, যখন তার কষ্ট আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং তা আরও দীর্ঘায়িত হবে।

আখেরাতের জীবনে যে তাকে হাযির হতে হবে এই হিসাব করে সে জীবন যাপন করেনি বলে অপরকে কষ্ট দিয়েছে, এই কারণে তার আখেরাতের জীবন অন্ধকারময় হবে, আর এ জীবনের ব্যাপারেও স্পষ্ট কথা এই যে, সে কারো কাছ থেকেই কোনো প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য নয়। এ সকল কারণ ও অবস্থাগুলোকে সামনে রেখে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে যে কোনো লোক বুঝতে পারবে যে, পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যবস্থাকেই সে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে মেনে নিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী নিজের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছে, আর এ আখেরাত বিশ্বাস তার দুনিয়ার জীবনকে সুষমামন্ডিত করেছে। এরশাদ হচ্ছে–

'সফলকাম ব্যক্তি তারা, যারা তাদের পরোয়ারদেগারের আযাবকে ভয় করে। অবশ্যই তাদের পরোয়ারদেগারের আযাব মোটেই নিরাপদ কিছু নয়।'

আখেরাতের ওপর এই সাধারণ বিশ্বাসের পরবর্তী যে কাজ মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে নাড়া দেয় তা হচ্ছে অতন্দ্র প্রহরীর মতো আল্লাহর যাবতীয় হুকুম পালন করার ব্যাপারে বান্দার সদা সতর্ক থাকা এবং অন্তরের মধ্যে এ জন্যে একটা তীব্র অনুভূতি জাগ্রত রাখা। অন্তরের অন্তস্থলের মধ্যে আল্লাহর এই ভয়কে জিইয়ে রাখা যে, যে কোনো সময় আল্লাহর আযাব তাকে পাকড়াও করতে পারে। আল্লাহর সহায়তার জন্যে তাঁর কাছে মোনাজাত করা ও তার আযাব থেকে বাঁচার জন্যে তাঁর কাছে আকুতি পেশ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো এমন গুণ যা তার মর্যাদাকে একধাপ উন্নীত করে।

রসূলুল্লাহ (স.) কে? তাঁর মর্যাদা আল্লাহর কাছে কতটা তা তিনি ভালো করেই জানেন। তিনি জানেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিচালনা করছেন; এতোদসত্তেও তিনি আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক ও শংকিত থাকতেন। দৃঢ়ভাবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর কাজ তাঁকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না এবং তা তাঁকে জান্নাতেও প্রবেশ করাতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতেই তিনি নাজাত পেতে পারেন এবং বেহেশত লাভ করতে পারেন।

'একদিন তিনি সাহাবাদের বললেন, 'ব্যক্তির কাজ তাকে কখনও জান্নাতে দাখেল করাবে না।'

সাহাবারা বললেন, 'আপনাকেও না ইয়া রসূলাল্লাহ?

তিনি বললেন, 'না, আমাকেও না, আমাকেও আমার কাজ জান্নাতে দাখেল করাতে পারবে না, তবে আল্লাহর মেহেরবানীই আমার একমাত্র ভরসা, তিনি যদি দয়া করে আমাকে নাজাত দেন! (বোখারী ও মুসলিম)।

এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে– 'নিশ্চয়ই তাদের পরোয়ারদেগারের আযাব থেকে কেউই নিরাপদ নয়।'

এ ঘোষণা মানুষকে এমন এক স্থায়ী অনুভূতি দান করে, যা সে এক মুহূর্তও বিস্মৃত হয় না। যখন মানুষ আযাবের কথা ভুলে যায় বা উদাসীন হয়ে যায় তখনই সে এমন কিছু কাজ করে বসে যা তাকে আযাবের হকদার বানিয়ে দেয়। আসলে আল্লাহ তায়ালা মানুষের শুধু এই সজাগ অবস্থা এবং এই সচেতনাটুকুই চান। তবুও যখন কোনো সময় দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসে তখন আল্লাহর সুমহান রহমতই হয় তার একমাত্র ভরসা। তাঁর ক্ষমার ভান্ডার সর্বদা তার জন্যে উন্মুক্ত থাকে। তাঁর তাওবার দরজা সর্বদা খোলা রয়েছে, কোনো বান্দার জন্যে কখনো তা বন্ধ হয় না।

এই ক্ষমার আশ্বাসবাণী শত বাধাবিঘ্ন, অসুবিধা ও অস্থিরতার মধ্যেও মুসলিম সমাজের জন্যে এক পরিচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রাপ্তির চাইতেও বেশী প্রশান্তি মানুষকে দেয়া হয়েছে। আবার যে অন্তর আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে তা একাধারে সচকিত ও আশ্বান্বিত থাকে; সে আল্লাহকে যেমন ভয় করে, তেমনি তাঁর কাছে আশাও সে রাখে। মোমেনের দিল আল্লাহর রহমত পাবে বলে সদা নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর (তারা সফল) যারা তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযতকারী, তবে তাদের স্ত্রী ও দাসীরা বাদে, তাদের সাথে মেলামেশায় কোনো প্রকারের দোষ নেই। এই অনুমোদিত সীমার বাইরে যারা যাবে তারা সীমালংঘনকারী হবে।'

**পরিবার ইসলামী সমাজের ভিত্তি**

পরিবার ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেই ইসলাম সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চায় এবং এ জন্যে শরীয়তে মযবুত পরিবার গড়ে তোলার বিধান রয়েছে।

বাড়ীর খোলামেলা পরিবেষ্টনীর সব কয়টি জায়গাই সাধারণত পরিবারের সবার কাছে পরিচিত থাকে। ঘরোয়া পরিবেশে এ সমাজের প্রত্যেকটি বাচ্চা তার বাপকে জানে এবং নিজের জন্মের পরিচয় দিতে লজ্জা বা দ্বিধাবোধ করে না। এটা এই জন্যে নয় যে, একথা বলতে তার কোনো লজ্জা শরম নেই। মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই তার সমাজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর ভিত্তিতেই মানুষের প্রসার ঘটেছে। এর ভিত্তিতেই মানুষের আশা ভরসা ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা রচিত হয়।

এটা কোনো এলোমেলো বা বিক্ষিপ্ত চিন্তা নয়, এর উদ্দেশ্য একান্ত স্পষ্ট। এই সম্পর্ক স্থাপনের শুরুতেই এর মানবীয় ও সামাজিক গুরুত্বসমূহ সুবিদিত থাকে। শুধুমাত্র একটা পাশবিক ইচ্ছা পূরণ ও যৌন সম্ভোগের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা নারী পুরুষের পারস্পরিক এই মিলনের ব্যবস্থা দেননি। এই প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে কোরআনে কারীমে মোমেনের চরিত্র ও ব্যবহার কি হবে তা জানিয়ে দিয়েছে,

'সাফল্যমন্ডিত তারা, যারা তাদের লজ্জাস্থানগুলোকে সুরক্ষিত রাখে নিজেদের স্ত্রী এবং (আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অনুমোদিত) দায়িত্বাধীন মহিলাদের ছাড়া।'

এদের সাথে মেলামেশায় আল্লাহর বিধানক্রমে কোনো বাধা নেই বা তা কোনো নিন্দনীয়ও নয়। এই সীমারেখা ডিংগিয়ে অন্য কোনো পন্থায় যারা যৌন সম্ভোগের পথ খুঁজবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী, আল্লাহর আইনের সুস্পষ্ট অমান্যকারী। একমাত্র বিয়ের মাধ্যমে অথবা কোনো মহিলার অধিকার হাসিল করে তার পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমেই এই বৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।(১) সূরা মোহাম্মদ-এ সম্পর্কিত ঘোষণায় জানা যায় যে একমাত্র আল্লাহর যমীনে তাঁর জীবন

---

(১) বন্দী বিনিময় বিষয়টির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করায় ও সারা পৃথিবীতে এখন মানুষ কেনাবেচা প্রথার বিলোপ সাধিত হওয়ায় দাসত্ব প্রথা এখন অনেকটাই বিলুপ্ত; তবে এমন যদি কখনও হয় যে বন্দী বিনিময় দীর্ঘদিন বিলম্বিত হয়ে পড়ে, রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ বন্দী ও বন্দিনীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সৈনিকদের মধ্যে তাদেরকে বন্টন বা বিলি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বোধ করে, তখন পুনরায় হয়তো এর অনুমতি দেয়া হবে। কোরআন ও হাদীস নানা কারণে স্থায়ীভাবে এ প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেনি। এমন সব পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল মালিকদের কর্তব্য থাকবে তাদেরকে মুসলিম ভাইবোনের মর্যাদা দান করে, খোরাক পোশাক সমান সমান দান করা। তাদের দ্বারা কোনোরকম দেহ ব্যবসা না চালানো, তাদের গর্ভজাত সন্তানদেরকে স্ত্রীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সন্তানদের সমান মর্যাদা দান করা, এরপর রয়েছে বিভিন্ন অপরাধের কাফফারা স্বরূপ তাদেরকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা, আরও রয়েছে তাদেরকে মুক্ত করে দিলে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার বহু আশ্বাস বাণী। এ সকল অবস্থা বিবেচনায় আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা চমৎকার এক পদ্ধতিতে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করেছেন এবং প্রকারান্তরে এর বিলুপ্তিই সাধন করেছেন, যদিও সরাসরি এই ঘোষণা দেয়া হয়নি। কারণ অনাগত ভবিষ্যতে কোন সমাজে কার কি প্রয়োজন দেখা দেবে তা তিনিই ভালো জানেন।- সম্পাদক

ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে যুদ্ধ করা হবে, তাতে গ্রেফতারকৃত বন্দীদেরকে দাস বা দাসী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে উক্ত সূরার আয়াতগুলো প্রণিধানযোগ্য।

'অতএব যুদ্ধের ময়দানে যখন এই কাফেরদের মুখোমুখি হবে তখন তোমরা তাদের হত্যা করো, তারা সম্পূর্ণভাবে পর্যদুস্ত হওয়ার পর তোমরা বন্দীদেরকে শক্ত করে বেঁধে রাখো। এরপর তোমরা হয়তো দয়া করে তাদের এমনিতেই ছেড়ে দেবে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেবে। তবে যতোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ তার বোঝা ফেলে না দেয় ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও ক্ষান্ত দেবে না।'

দুনিয়া যতোদিন আছে ততোদিন হক ও বাতিলের সংঘর্ষও থামার কথা নয়। যুদ্ধ চলতে থাকবে, চালাতে হবে। এ কাজ তারা করবে, যারা রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করার মাধ্যমে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু কখনও যদি এমন হয় যে দয়া প্রদর্শন কিংবা মুক্ত করা সত্তেও কোনো কোনো বন্দী বা বন্দিনী থেকেই যায়। তখন এই অনুমতি হবে একমাত্র সেই ব্যক্তির জন্যে যার মালিকানায় তাকে দেয়া হবে।

এই বন্দীদের সাথে এ ধরনের ব্যবহার তখনই করা যাবে, যখন প্রতিপক্ষের ক্যাম্পে মুসলমানদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করা হবে। তাদেরকে তারা দাস দাসী নামে অভিহিত না করলেও তাদের সাথে সেই ব্যবহার করা হতে থাকবে। কিন্তু তা সত্তেও এই প্রথার বিলোপ সাধন ও মানবতার মূল্যায়নের জন্যে ইসলাম বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সেগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে সমাজে চালুও করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, এ কুপ্রথার অবসানের জন্যে একেবারে শুরু থেকে এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফলে ধীরে ধীরে এ প্রথা সমাজ থেকে প্রায় উঠেই গেছে। এ প্রথাকে বর্তমান রেখে অতীতের ন্যায় বর্তমানেও যদি কোনো অমুসলিম ক্যাম্পে তাদের সাথে এ ধরনের ব্যবহার করা হয় তাহলে শুধু যৌন সম্ভোগের উদ্দেশ্যে ইসলাম এ প্রথাকে কখনো চালু থাকার অনুমতি দেবে না। স্বাধীন করে দেয়ার নাম নিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে দাসীরূপে ব্যবহার করার কোনো বাঁকা পথও ইসলাম গ্রহণ করবে না।

ইসলামী ব্যবস্থা পরিষ্কার এবং যাবতীয় ধোকাবাজি থেকে মুক্ত।(১) অন্যরা স্বাধীনতার নাম দিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাদের দাসীরূপেই ব্যবহার করছে। এসব ধোকাবাজি নারীদের সাথে এবং দুর্বল

---

(১) যৌন স্পৃহা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত একটি শক্তি এবং সৃষ্টিকুলের জন্যে একটি বড় নেয়ামত। এ নেয়ামত দান করে আল্লাহ তায়ালা নিজে এ নেয়ামত ভোগ করার পদ্ধতিও তাকে জানিয়েছেন। যারা নিজেদেরকে আল্লাহর অনুগত বলে মনে করে এবং না-ফরমানী করলে পরকালে জবাবদিহি করার ভয় রাখে, তাদের পক্ষে অবশ্যই আল্লাহর সেই পদ্ধতি ও নিয়মের মধ্যে থাকা সম্ভব। যিনি সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতপক্ষে তিনিই জানেন- কাকে কতোটা শক্তি সামর্থ ও চাহিদা তিনি দিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দার প্রতি সর্বাধিক দরদী-বিধায় তাদের প্রয়োজন মিটানোর সুষ্ঠুপথও তিনি বাতলে দিয়েছেন। কিসে মানুষের কল্যাণ তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়– আল্লাহ তায়ালাই সব জানেন। নারী পুরুষের মাঝে শক্তি ও চাহিদাও আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সমান দেননি, কাকে কতোটা দিয়েছেন তা তিনিই ভালো জানেন। এ ব্যাপারে আসল কথা বুঝতে পারে না বিধায় মূর্খের মতো অনেকেই নানা অর্বাচিন মন্তব্য করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির এ সকল অবস্থা বিবেচনা করেই তাকে এক থেকে চার পর্যন্ত রাখার অনুমতি দিয়েছেন। অবশ্য সাথে সাথে ইনসাফ করার কঠিন শর্তও তিনি জুড়ে দিয়েছেন। আসলে মিলনাকাংখাও হচ্ছে একটি দ্বিপাক্ষিক প্রয়োজন-এর প্রয়োগে যদি ক্ষমতা ও শক্তি থাকে তাহলে একাধিক বিয়ের অনুমতি থাকবে, নচেৎ তার জন্যে একজনই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে নারীকে বিয়ের পূর্বে প্রস্তাবিত ব্যক্তির সবকিছু বিবেচনা করে সম্মতি দেয়া না দেয়ার অধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রে বাছাই ভুল হলে পরে নিজেকে মুক্ত করে পছন্দ মতো লোক বেছে নেয়ার অধিকারও তার থাকবে। এটাই আল্লাহর বিধান ও এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি। এতেই শান্তি ও কল্যাণ রয়েছে।- সম্পাদক

মানুষের সাথে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহর সাথে কখনো চলতে পারে না। এই জন্যেই বলা হয়েছে, 'এই সীমারেখা অতিক্রম করে যারা অন্য কোনো পথ তালাশ করবে তারা সীমালংঘনারী হবে।'

এভাবে যৌন সম্ভোগের ঘৃণ্য সম্পর্ক স্থান করার অবকাশ কখনো ইসলাম দেয়নি। এটা যে কোনো সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকই বুঝতে পারবে যে কু-প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে কোনো ঘৃণ্য ও বাঁকা পথে চলা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর।

**আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করা**

পরিচ্ছন্ন, মযবুত ও শান্তি বিধানকারী সফলকাম ব্যক্তিদের মধ্যে যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন সেগুলোর অন্যতম প্রধান গুণ হচ্ছে আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করা। এরশাদ হচ্ছে–

'যারা আমানতসমূহ রক্ষা করে এবং ওয়াদা ও চুক্তির হক আদায় করে।

নৈতিক চরিত্রের এই প্রধান গুণগুলোর ওপরই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এসব আমানত, ওয়াদা ও চুক্তি যা তারা অন্যদের সাথে সম্পন্ন করে সেগুলোর হক আদায় করা থেকেই ইসলামী সমাজ গড়ার কাজটি শুরু হয়। এই সবগুলোর ভিত্তি হচ্ছে সেই মহান আমানত রক্ষা করা যার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কাছে পেশ করেছিলেন, কিন্তু তারা এ দায়িত্ব বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করেছিলো।

তারা এ দায়িত্বভার বহন করার কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু মানুষ এ দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিলো, আর সে আমানত হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাসের আমানত যা মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার পর দৃঢ়তার সাথে তার ওপর টিকে তাকে। এই দৃঢ়তা সে স্বেচ্ছায় অবলম্বন করে- বাধ্য হয়ে নয়; (আল্লাহকে মেনে নেয়ার কাজটি তার নিজের ইচ্ছা অনুসারেই সম্পন্ন করে এবং এ ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বনও সে তার নিজ এখতিয়ারেই করতে থাকে)। চুক্তির হক আদায় করা ও ওয়াদা পূরণ করার প্রবণতা মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই তার মধ্যে মজ্জাগত হয়ে আছে।

পরবর্তীকালে এ যোগ্যতা ও অনুভূতি বংশপরম্পরায় মানুষের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে; আল্লাহর সাথে সম্পাদিত এই চুক্তিটি হলো, সৃষ্টির সূচনাতে মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা নিয়েছিলেন যে একমাত্র তাঁকেই তারা রব বা প্রতিপালক বলে মানবে, একমাত্র তাঁরই আইন কানুন তারা মেনে চলবে। সৃষ্টিগতভাবে এ চুক্তির ব্যাপারে তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর সাক্ষী; অর্থাৎ তাদের সৃষ্টি যেমন আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়, তেমনি অন্য কাউকে শক্তি ক্ষমতার মালিক বলে মানা তাদের জন্যে উচিত নয়- একথার সত্যতার ব্যাপারে তারা নিজেরাই সাক্ষী। এই আল্লাহ-বিশ্বাসের আমানত ও তাঁকে রব বলে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করার সে দুটো হক যে ব্যক্তি আদায় করতে পারে সে ব্যক্তি সমাজের সাথে চুক্তি ও ওয়াদা পূরণ করার ক্ষেত্রে সদা সজাগ থাকবে বলে অবশ্যই আশা করা যায়।

ইসলাম এই জন্যেই আমানতের হক আদায় এবং ওয়াদা পূরণ করার ওপর কঠোর গুরুত্ব আরোপ করেছে, যাতে করে গোটা ইসলামী সমাজ মযবুত একটা বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, মানুষ মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে পারে, একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে এবং শান্তি ও স্বস্তির সাথে তারা এই সমাজে জীবন যাপন করতে পারে।

বিশ্বাস ঠিক রাখা ও ওয়াদা পূরণ করার গুণটিকে ইসলাম মোমেনের প্রধান গুণ বলে জানিয়েছে, যেমন করে মোনাফেকের ক্ষেত্রে আমানতের খেয়ানত ও ওয়াদা ভংগ করাকে তাদের বৈশিষ্ট বলে দেখানো হয়েছে। কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে এই দুটো গুন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এসেছে। ইসলামে এই বিষয় দুটোর গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

**সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান**

'যারা তাদের সাক্ষ্যদানের বিষয়গুলোতে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকে।'

একথা সত্য যে, সঠিকভাবে সাক্ষ্যদানের সাথে আরও অনেকেরই হক জড়িত থাকে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত যাবতীয় বিধানের সীমানা মূলত সঠিকভাবে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়। অতএব সঠিক সাক্ষ্যদানের কথাটি আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে ঘোষণা করা জরুরী মনে করেছেন। জানা সত্তেও সাক্ষ্য দানে অস্বীকার করা বা সাক্ষ্যদানকালে কোনো কথা গোপন করাকে তিনি কঠোরভাবে মানা করেছেন। আর এ ব্যাপারে টালবাহানা করা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলা এবং কারো প্রভাবে পড়ে সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকাকেও আল্লাহ তায়ালা কড়াকড়িভাবে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই সাক্ষ্যদানের কাজগুলোকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের একটি অংশ হিসেবেও ঘোষণা করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহর বাণী, 'আল্লাহ তায়ালার জন্যে সাক্ষ্যদানের কাজটিকে সঠিকভাবে কায়েম করো।'

মোমেনের জীবনে চলার যতো পথ আছে সেগুলোর মধ্যে 'সঠিক সাক্ষ্য দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ', অন্য কথায় বলতে গেলে যতো প্রকার আমানত বা বিশ্বাসের বিষয় আছে তন্মধ্যে সঠিক সাক্ষ্যদান একটি বড় গুণ। এ গুণটির কথা পৃথকভাবে কায়েম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে গুণটির মহত্ব ও গুরুত্ব বিশেষভাবে পেশ করা।

**নামাযের সংরক্ষণ**

'আর যারা তাদের নামাযগুলোকে সংরক্ষণ করে।'

এ গুণটি হচ্ছে কোরআনে বর্ণিত সকল গুণের সেরা গুণ, আর তখনই এটা সেরাগুণে পরিণত হয় যখন নামায, ফরয সুন্নাত সহ যথাসময়ে যথাযথভাবে আদায় করা হয়। যেভাবে ধীর স্থিরভাবে ভক্তি-নিষ্ঠার সাথে এবং ভীতিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে নামায পড়া দরকার সেভাবে নামায আদায় করলেই নামাযগুলোর হেফাযত করার হক আদায় হয়। এভাবে যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে পারে সে কখনও অবহেলা করে বা অলসতা করে কোনো নামাযকে নষ্ট হতে দেয় না।

শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, পরিবার ও পরিবেশের মধ্যেও নামাযের ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে সে নিজ কর্তব্য পালন করে এবং কোনো সময়ই সে এই বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন করে না। সূরাটি শুরু হয়েছে মোমেনের গুণাবলীর মধ্য থেকে নামাযের গুণ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। মোমেনের অপরিহার্য সকল গুণের বর্ণনা সমাপ্তও করা হয়েছে সার্বিকভাবে এই নামায সংরক্ষণ করার কথা বলে। জামায়াতের সাথে ও সযত্নে এই নামায আদায় করার নির্দেশ এসেছে। মোমেনদের মধ্যে বাঞ্ছনীয় গুণাবলীর মধ্যে নামাযের সংরক্ষণই সেরা গুণ এ কথার উল্লেখ করেই এ প্রসংগের ইতিটানা হয়েছে।

সীমালংঘনকারীদের পরিণতি বর্ণনা করার পর নামায সংরক্ষণকারীদের প্রত্যাবর্তন স্থলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তারাই হবে বাগ বাগিচায় ভরা জান্নাতসমূহের অধিবাসী।'

কোরআনে কারীমের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে যেমন বাহ্যিক অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত নেয়ামতের বর্ণনা পাওয়া যায়, তেমনি যেসব নেয়ামত আত্মার গভীরে প্রশান্তি আনে তার বর্ণনাও পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, ওরা জান্নাতসমূহে বসবাস করবে। সেই ফুল ফলের বাগিচায় তারা হবে সম্মানিত মেহমান। অতএব যাবতীয় নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করার সাথে সাথে তারা সেখানে অভূতপূর্ব সম্মানও লাভ করবে। মহৎ গুণের প্রতিদানস্বরূপ মোমেন এই পুরস্কার লাভ করবে, কেননা এসব গুণই তাকে বৈশিষ্টমন্ডিত করেছে।

**রসূল (স.)-এর মক্কী জীবনের একটি দৃশ্য**

রসূলের মক্কী-জীবনে যে সব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে একটি দৃশ্য এখানে পেশ করা হচ্ছে, একদিন রসূলুল্লাহ (স.) এক বাড়ীতে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। কথাটা জানতে পেরে মোশরেকদের একটি দল সেইদিকে ছুটে গেলো। তারপর তারা বাড়ীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়লো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মনে হলো এভাবে দৌড়ে আসাটা মনে হয় ভালো হলো না। হেদায়াতের কথাগুলো শোনার সময় তাদের মনে হতে লাগলো যে, এভাবে দৌড়ে এসে গলা লম্বা করে শুনতে যাওয়াটাও ঠিক হয়নি। সে সময়ে তেলাওয়াত হচ্ছিলো,

'এই কাফেরদের আজ হলো কি এরা কেন আজ উর্ধশ্বাসে তোমার সামনে ছুটে আসছে?'

'আল-মুহতিয়ু' শব্দটি অর্থ ঘোড়ার লাগামের মতো গলা লম্বা করতে করতে ছুটে আসা এবং 'ইযীন' 'ইয়াযন' এর বহুবচন, এর অর্থ হচ্ছে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, অন্তরের মধ্যে সন্দেহ নিয়ে এগিয়ে আসার কারণে তাদের মধ্যে খুব সংগোপনে একটা ভাংগন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এরই কারণে তাদের প্রতিটি নড়াচড়া বা গতিবিধির মধ্যে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিলো। জিজ্ঞাসাবাদের কারণে তাদের প্রতিটি কথায় বিস্ময় ফুটে বের হচ্ছিলো। তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর দিকে জোর কদমে এগিয়ে আসছিলো তাঁর কথা শোনার জন্যে বা হেদায়াত লাভ করার জন্যে নয়; বরং এক মারাত্মক আতংক নিয়ে তারা তাঁর কথাগুলো জানতে এসেছিলো। জানার পর তারা ওখান থেকে আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে চেয়েছিলো। যে ষড়যন্ত্র ও বদখেয়াল চরিতার্থ করার মনোবৃত্তি নিয়ে তারা এখানে এসেছিলো নবী (স.)-এর কথা শোনার পরও শলা-পরামর্শ করে সেখানে কিছুক্ষণ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে চেয়েছিলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কি হলো তাদের? তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি নেয়ামত ভরা জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়?'

অথচ তাদের বুঝা উচিত যে, এই অবস্থান তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর চিন্তা অবাস্তব এক ধারণা মাত্র। তাদেরকে তো নিয়ে যাওয়া হবে টগবগে আগুনের মধ্যে যা তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। তারা কি এখনো আল্লাহর কাছে বিশেষ এক মর্যাদার অধিকারী বলে নিজেদেরকে মনে করে? ওরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও কোরআনে কারীমকে অস্বীকার করছে, নবী (স.)-কে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছে, আর কোরআনের কথাগুলো শোনার পরও সবাই মিলে চিন্তা ভাবনা করে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে, এর পরও তারা মনে করে তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে বিশেষ স্থানের অীধকারী এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে!

'কাল্লা' (কখনও নয়) শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ঘৃণাভরে, তাদের কথাগুলোকে তাদের মুখের ওপরেই ছুঁড়ে মারার উদ্দেশ্যে।

'আমি কি দিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।'

জানে তারা কোন সে (তুচ্ছ ও অপবিত্র) জিনিস দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই নাপাক পানি দ্বারাই তো! যা তাদের প্রত্যেকেরই জানা আছে। কোরআনের জীবন্ত ও সৃজনী ব্যাখ্যা তাদের অন্তরে কথাটা গভীরভাবে রেখাপাত করিয়ে দেয়, কিন্তু অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে তার প্রভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থান্বেষিতা তাদের অন্তর থেকে সঠিক চিন্তার রেখাপাত অচিরেই ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। সৃষ্টির মূল রহস্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ রব্বুল ইযযত তাদের বিবেককে জাগাতে চেয়েছেন, এ জন্যে এমন কিছু রহস্য তাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যা যে কোনো মন মগযকে নাড়া দেবে। তবুও তারা বুঝে না, বুঝতে চায় না, এহেন সত্যবিরোধী মনোভাব ও দুষ্কর্ম নিয়ে তারা কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করার আশা করে?

তারা অবশ্যই জানে, কোন সে হীন পদার্থ থেকে তাদের সৃষ্টি, আর তারা আল্লাহর কাছে কোনো মর্যাদা লাভ করা থেকে কতো বেশী দূরে অবস্থানে রয়েছে। একথাটা খুব সহজেই তাদের বুঝা উচিত ছিলো যে, যে আল্লাহকে তারা অস্বীকার করছে তাঁর কাছে জ্বলন্ত আগুন তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাদের হীন ও অপমানজনক অবস্থাকে তুলে ধরা এবং তাদের অহংকারকে দূর করার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, তিনি আরও উন্নত ও সুন্দরতর জীব সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যাকে তারা কিছুতেই শক্তিহীন ও ক্ষমতাহীন করতে পারবে না। পরিশেষে তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে।

**আল্লাহর শপথবাক্য**

'অতএব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থানসমূহের মালিকের শপথ, অবশ্যই আমি সব কিছু করতে সক্ষম, যে কোনো সময়ে ওদের থেকে জীবকে আমি ওদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি, এ ব্যাপারে আমাকে কেউ পেছনে ফেলতে পারবে না।'

এই বিষয়টির ব্যাপারে কসম খাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমাদের কাছে মনে হয় না, তবু যখন আল্লাহ তায়ালা নিজেই কসম খেয়েছেন তখন নিশ্চয়ই আমাদের বুঝতে হবে যে, এর বিশেষ কিছু তাৎপর্য আছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের এটুকু বুঝে আসে যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থানসমূহের কসম খাওয়ার মধ্যে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে। 'মাশরেক ও মাগরেব' সূর্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার স্থানসমূহ বলতে এই বিশাল সৃষ্টিকূলে তারকারাজির উদয় ও অস্তমিত হওয়ার স্থানসমূহকেই বুঝায়।

অবশ্য এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বুকে যে, একাধিক স্থানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সংঘটিত হচ্ছে সেই দিকেও এ কথার ইংগীত হতে পারে। সৌরলোকে পৃথিবীর আবর্তনের সাথে সাথে গ্রহ নক্ষত্রের একটার পর আর একটার আগমন ও নিষ্ক্রিয়মনের ধারা অবিরতভাবেই চলছে। পূর্ব দিগন্তে উদয় ও পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি তো সদা সর্বদাই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এভাবে 'উদয় ও অস্তমিত হওয়ার স্থানসমূহ' কথাটির ব্যাখ্যাও জানা যায়। এ কথা দ্বারা অন্তরের মধ্যে এ সৃষ্টি জগতের বিশালত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি জাগে এবং সকল সৃষ্টির যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর মাহাত্ম সম্বন্ধেও কিছু চেতনা সৃষ্টি হয়। এরপরও কি এ সৃষ্টি জীবের মনে এতোটুকু সন্দেহ থাকতে পারে যে তিনি ইচ্ছা করলে এ সকল সৃষ্টি থেকে অনেক বেশী উন্নত মানের জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম, যার কল্পনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

কেউই এ ব্যাপারে তাঁকে পরাজিত করতে পারে না, তাঁর থেকে কেউ কিছু কেড়েও নিতে পারে না এবং তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ পালিয়েও যেতে পারে না, এ ব্যাপারে কি কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

এ প্রসংগের বর্ণনা এখানে শেষ হচ্ছে। সেই ভয়ানক কেয়ামতের দিনে অপরাধীদেরকে যে কঠিন আযাব দেয়া হবে তার ছবি তুলে ধরা, মোমেনদের মর্যাদা ও নেয়ামতের বর্ণনা পেশ করা ও কাফেরদের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করার পর রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তাদের বিষয় তার চিন্তা না করে তাদেরকে সেদিনের আযাব ভোগ করার জন্যে ছেড়ে দেয়া উচিত। সেদিন হবে তাদের জন্যে বড়ই অপমানজনক ও কষ্টকর! এরশাদ হচ্ছে—

'অতএব ছেড়ে দাও তাদেরকে, তারা শলা পরামর্শ করুক এবং সেই ওয়াদা করা দিনের সাক্ষাত লাভ করার পূর্বে তারা এসব আজে বাজে খেলাধূলায় মেতে থাকুক। সেদিন তারা কবর থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এমনভাবে বেরিয়ে আসবে, যেন তারা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে। তাদের চোখগুলো ভীত সচকিত এবং কলুষ কালিমায় আচ্ছাদিত থাকবে, আর সে কঠিন দিনটি সম্পর্কেই তাদের নিশ্চিত ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।'

তাদের কদর্য অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত এই সম্বোধনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এই সম্বোধনের মাধ্যমে তাদের তিরস্কার করা হচ্ছে। এই সম্বোধনের কারণে তাদের মধ্যে যেমন ভীতির সঞ্চার হচ্ছে তেমনই তারা বুঝতে পারছে যে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি পুরোপুরিই লক্ষ রাখা হচ্ছে। সেদিন তাদের চেহারা ছবি, গোটা অবয়ব ও চাল চলন সবকিছুই ভীতিপ্রদ এবং ভয় উদ্রেককারী হবে। এখানে তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে কটাক্ষই করা হয়েছে। বিদ্রুপাত্মক এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা আসলেই তাদের অবস্থার জন্যে উপযোগী। বলা হচ্ছে–

ওরা কবর থেকে বেরিয়ে এসে এমন দ্রুতগতিতে দৌড়াতে থাকবে, দেখে মনে হবে তারা কোনো গন্তব্য স্থানে জলদী পৌঁছানোর জন্যে দৌড়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতি এমন কটাক্ষ কোনো অমূলক বিষয় নয়, দুনিয়াতেও তো তারা এমনিভাবে পূজামন্ডপের দিকে মূর্তিপূজার উদ্দেশ্যে নির্বোধের মতো দ্রুতগতিতে দৌড়ে যায় এবং তার চতুর্দিকে তারা ভীড় করে মেলা জমায়। সে ভয়ংকর দিনে সে মূর্তিপূজারী মোশরেকরা দিক বেদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে। তবে সে দিনের দৌড়াদৌড়ি এবং আজকের দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আকাশচুম্বী পার্থক্য রয়েছে।

এরপর এই বলে তাদের অবস্থার বর্ণনা সমাপ্ত করা হচ্ছে যে,

'তাদের চোখগুলো সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় অবনমিত থাকবে, যার ওপর কলুষ কালিমা ছেয়ে থাকবে।'

এই বাক্যসমূহের মধ্যে তাদের চেহারার পরিপূর্ণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে। এই বর্ণনায় তাদের কারুণ ও হীন অবস্থার ছবি যেন জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। জীবদ্দশায় তারা সেদিন সম্পর্কে যেভাবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো তারই প্রতিদান হিসাবে এ অপমানজনক অবস্থায় তারা পতিত হবে।

'আর এই দিনের ওয়াদায় তো তারা সন্দিহান ছিলো, তারা রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিলো এবং অনাগত আযাবের জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

এভাবে সূরাটির শুরু ও শেষের আলোচনা সুসমন্বিত হয়েছে, আর এখানে সমাপ্ত হচ্ছে পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসের দীর্ঘ বর্ণনা। জাহেলিয়াতের অর্থহীন জীবন ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সম্মোহনী ধ্যান-ধারণার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান তা এই দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আশা করি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

# সূরা নূহ

আয়াত ২৮ রুকু ২

**মক্কায় অবতীর্ণ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ

وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى

إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّى

دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّى

كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا۟ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا۟

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম (তাকে আমি বলেছিলাম, হে নূহ), তোমার জাতির ওপর এক ভয়াবহ আযাব আসার আগেই তুমি তাদের সে সম্পর্কে সাবধান করে দাও। ২. (আমার আদেশ পেয়ে সে তার জাতিকে বললো,) হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী ব্যক্তি (মাত্র), ৩. তোমরা সবাই আল্লাহর আনুগত্য করো, (সর্বাবস্থায়) তাঁকেই ভয় করো, তোমরা আমার কথা মেনে চলো, ৪. (এতে করে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (আগের) গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন এবং (এ দুনিয়ায়) তিনি তোমাদের এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজেদের শুধরে নেয়ার) সুযোগ দেবেন; হাঁ, আল্লাহর সেই নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে তখন তাকে কেউই পিছিয়ে দিতে পারবে না। কতো ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে পারতে! ৫. (নিরাশ হয়ে আল্লাহকে) সে বললো, হে আমার মালিক, আমি আমার জাতির মানুষগুলোকে দিনে রাতে (সব সময়ই ঈমানের) দাওয়াত দিয়েছি, ৬. কিন্তু আমার এ (দিবানিশি) দাওয়াতের ফলে (সত্য থেকে) পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি হয়নি। ৭. যতোবার আমি তাদের (তোমার পথে) ডেকেছি— (ডেকেছি) যেন তুমি (তাদের অতীত কৃতকর্ম) ক্ষমা করে দাও, তারা (ততোবারই) কানে আংগুল ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের (অজ্ঞতার) আবরণ দিয়ে নিজেদের (মুখমন্ডল) ঢেকে দিয়েছে

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ۝ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

(শুধু তাই নয়), তারা (অন্যায়ের ওপর ক্ষমাহীন) জেদ ও অহমিকা প্রদর্শন করেছে, (হেদায়াতকে অবজ্ঞা করার) ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, ৮. তারপর আমি তাদের কাছে প্রকাশ্যভাবে (দ্বীনের) দাওয়াত পেশ করেছি, ৯. তাদের জন্যে আমি (দ্বীনের) প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছি, আমি চুপে চুপেও তাদের কাছে (দ্বীনের কথা) পেশ করেছি, ১০. পরন্তু (বার বার) আমি তাদের বলেছি, (অহমিকা বাদ দিয়ে) তোমরা তোমাদের মালিকের দুয়ারে (নিজেদের অপরাধের জন্যে) ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ১১. (তদুপরি) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর আকাশ থেকে অঝোর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন, ১২. এবং (পর্যাপ্ত পরিমাণ) ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি দিয়ে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্যে বাগবাগিচা ও উদ্যান স্থাপন করবেন, (বিরান ভূমি আবাদ করার জন্যে) তিনি এখানে নদীনালা প্রবাহিত করবেন; ১৩. এ কি হলো তোমাদের! তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে মানমর্যাদা পাওয়ার মোটেই আশা পোষণ করো না? ১৪. অথচ তিনিই (ক্ষুদ্র একটি শুক্রকীট থেকে) বিভিন্ন পর্যায়ে তোমাদের (মানুষ হিসেবে) সৃষ্টি করেছেন। ১৫. তোমরা কি দেখতে পাও না, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা সাত আসমান বানিয়ে স্তরে স্তরে (সাজিয়ে) রেখেছেন, ১৬. কিভাবে এর মাঝে তিনি চাঁদকে আলো (গ্রহণকারী) ও সূর্যকে (আলোদানকারী) প্রদীপ বানিয়েছেন। ১৭. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাটি থেকে (এক বিশেষ পদ্ধতিতে) উদগত করেছেন (ঠিক একটি তৃণ খন্ডের মতো করে), ১৮. আবার (জীবনের শেষে) তিনি তোমাদের সেই মাটির কোলেই ফিরিয়ে নেবেন এবং তা থেকেই একদিন তিনি তোমাদের সহসা বের (করে এনে নতুন জীবন দান) করবেন। ১৯. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে (এ) যমীনকে বিছানার মতো (সমতল করে) বানিয়েছেন,

لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

২০. যাতে করে তোমরা এর উন্মুক্ত (ও প্রশস্ত) পথ ধরে চলাফেরা করতে পারো।

**রুকু ২**

২১. নূহ বললো, হে আমার মালিক, আমার জাতির লোকেরা আমার কথা অমান্য করেছে, (আমার বদলে) তারা এমন কিছু লোকের অনুসরণ করেছে যাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কেবল তাদের বিনাশ ছাড়া অন্য কিছুই বৃদ্ধি করেনি, ২২. তারা (সত্যের বিরুদ্ধে) সাংঘাতিক ধরনের এক ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, ২৩. তারা বলে, তোমরা তোমাদের (সেসব) দেবতাদের কোনো অবস্থায়ই পরিত্যাগ করো না– 'ওয়াদ' 'সূয়া' (নামক দেবতাদের) উপাসনা কিছুতেই ছেড়ে দিয়ো না, 'ইয়াগুস' 'ইয়াউক' ও 'নাছর' নামের দেব দেবীকেও (ছাড়বে) না, ২৪. (হে মালিক,) এরা বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করেছে, তুমিও আজ এ যালেমদের জন্যে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিয়ো না। ২৫. (অতপর) তাদের নিজেদের অপরাধের জন্যেই তাদের (মহাপ্লাবনে) ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, (পরকালেও) তাদের জাহান্নামের কঠিন অনলে প্রবেশ করানো হবে, এ (অবস্থায়) তারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকেই কখনোই সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না। ২৬. নূহ (আরও) বললো, হে আমার মালিক, এ যমীনের অধিবাসী (যালেমদের) একজন (গৃহবাসী)-কেও তুমি (আজ শাস্তি থেকে) রেহাই দিয়ো না, ২৭. (আজ) যদি তুমি এদের (শাস্তি থেকে) অব্যাহতি দাও, তাহলে এরা (পুনরায়) তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করে দেবে, (শুধু তাই নয়), এরা (ভবিষ্যতেও) দুরাচার পাপী কাফের ছাড়া কাউকেই জন্ম দেবে না। ২৮. হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে– তোমার ওপর ঈমান এনে যারা আমার (সাথে ঈমানের এই) ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, এমন সব ব্যক্তিদের এবং সব ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমা করে দাও, যালেমদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া কিছুই তুমি বৃদ্ধি করো না।

## সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য সূরার সবটুকুর মধ্যেই নূহ আলাইহিস সালামের কেসসা ও তাঁর জাতির করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বুকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে কতো ধরনের অভিজ্ঞতা একজন মানুষের হতে পারে তার বাস্তব ছবি এ সূরার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর বিশেষ একটি সময়ের অবস্থাকে তুলে ধরে স্থায়ীভাবে জাহেলিয়াতরূপী কঠিন রোগটির চিকিৎসা সম্পর্কেও এখানে জানানো হয়েছে। এ বর্ণনার মধ্যে একথাটাও জানানো হয়েছে যে, ভালো ও মন্দের মধ্যে সংঘর্ষ এক চিরন্তন ব্যাপার।

নূহ (আ.)-এর ঘটনা জানার পর মানুষ যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার মধ্যে একটি বড় অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, প্রতিহিংসাপরায়ন, বিপথগামী, অহংকারী এবং ভুল নেতৃত্বাধীনে রসবাসরত ব্যক্তিরা বরাবরই সত্যবিমুখ থাকে। হেদায়াতের যুক্তিপ্রমাণ ও ঈমান উজ্জীবনকারী বিষয়গুলো তারা কিছুতেই বুঝতে চায় না। তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে যেসব বিস্ময়কর জিনিস তারা অনুভব করে এবং আদিগন্ত বলয়ে মনোমুগ্ধকর যা কিছু আছে তা থেকে ওরা মোটেই শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

দৃশ্য ও অদৃশ্য এ সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের নিদর্শন রয়েছে যা মানব মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সেই নেয়ামতগুলোর দিকে একটু ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করলে সেগুলোর আলোকে সঠিক পথপ্রাপ্তি মোটেই কঠিন হয় না। আল্লাহর সেই বিধানসমূহ হিংস্র, বিপথগামী, অসৎ, সত্যবিমুখ ও অহংকারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবক্তাদের মনেও রসূল (স.)-এর আগমনের যথার্থতা ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মায়। এইসব প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে সাথে রয়েছে নবী রসূলদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, ইসলামের ভুবন মোহিনী দাওয়াতকে মানব সাধারণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তাঁদের পূর্ণাংগ আত্মনিবেদন, এ কাজের জন্যে বাঞ্ছনীয় নানা প্রতিকুলতার মোকাবেলায় পর্বত-সম তাঁদের অবিচলতা এবং নিরন্তর অধ্যবসায়, যা ভুলপথে পরিচালিত বিরোধী মনোভাবাপন্ন, পাপপ্রবণ ও উচ্ছৃংখল মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিখুঁত ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে।

কিন্তু আফসোস, ওদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, ওরা বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করার যৌক্তিকতা বুঝতে পারছে না, ওদের কাছে সত্যপথের পথিক যারা হেদায়াতের পথে চলছে, তাদের কোনো মূল্য বা মর্যাদা নেই, তারা ঈমানী যিন্দেগীর মধ্যে উপস্থিত কোনো লাভ দেখতে পায় না! তারা তো মনে করে স্কুল কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কাজ করলে, পড়াশুনা করলে বা পড়ালে যেমন মজুরী বা নানা প্রকারের সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়, ইসলাম গ্রহণ করলেও সে ধরনের কিছু না কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তাদেরকে যখন এরা উপস্থিত ও তার কোনো একটিও পেতে দেখে না, তখন তারা পরবর্তীকালে অবশ্যম্ভাবী সাফল্যের খবরের প্রতি কোনোভাবেই আস্থা আনতে পারে না।

এমনি ধরনের এক পরিবেশের মোকাবেলা করতে হয়েছে নূহ (আ.)-কে। দীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর নিরন্তর চেষ্টা করার পর তিনি তাঁর হতভাগা জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে নালিশ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি বিরোধীদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে দিবারাত্র চেষ্টা করেছেন, এর জন্যে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টা চালানোর সময়ে বিরোধীদের সকল বাধা-বিপত্তি, উপহাস, বিদ্রূপ, অবহেলা ও অবজ্ঞা-নীরবে সহ্য

করেছেন। ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকার বিরোধীদেরকে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ নিয়ে দীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর আহ্বান করার পর তিনি তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর দরবারে পেশ করার প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি এই বলে দোয়া করেন,

'হে আমার রব, অবশ্যই আমি আমার জাতিকে রাত-দিন ডেকেছি, কিন্তু আমার সেই আহবানের ফল তাদের জন্যে পালানো ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করেনি; আর যতবারই আমি তাদেরকে ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে ডেকেছি ততবারই তারা কানে আংগুল দিয়ে থেকেছে ... ।'

এরপর বলেছি, ক্ষমা চাও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে. .... নূহ (আ.) পুনরায় দোয়া করতে গিয়ে বলছেন,

'হে আমার রব, ওরা আমার সাথে নাফরমানী করেছে এবং সেই ব্যক্তির আনুগত্য করেছে যার ধনসম্পদ এবং সন্তান শুধু তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে .... ।'

সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে তৎকালীন সমাজের অবস্থা, আর প্যাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা প্রেরিত নবী (আ.)-এর দায়িত্ব পালন প্রণিধানযোগ্য। তিনি রেসালাতের হক আদায় করতে একটুও কসুর করেননি।

অনুরূপভাবেই সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করার জন্যে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। সমগ্র পৃথিবীর বুকে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের দায়িত্ব ছিলো শেষ যামানার নবীর প্রতি মহাপবিত্র এক আমানত। রসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি অর্পিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে এটাই ছিলো সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনকালে তাকে দেখানো হচ্ছে, তাঁর পূর্বসূরী তারই এক ভাই নূহ (আ.) পৃথিবীতে ঈমানী যিন্দেগী প্রতিষ্ঠার জন্যে কতো কঠিন দায়িত্ব কতো দীর্ঘকাল ধরে পালন করেছেন ।

তাঁকে আরও জানানো হচ্ছে, দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার সময়ে তাঁকে অতীতে কতো সাংঘাতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, দেখানো হয়েছে সত্য-সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতায় বাতিলপন্থী নেতারা কতো কঠিন ও হিংস্র। আরও এটাও দেখানো হয়েছে যে, এতসব বাধা বিঘ্ন ও অসৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্তেও মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষকে সৎ পথে আনার জন্যে এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন-কানুন চালু করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলদের প্রেরণের এক অবিরত ধারা, যার একটি পর্যায় নূহ আলাইহিস সালামের ওপর এসে শেষ হয়েছে।

বিশেষভাবে মক্কার মুসলমানদের সামনে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানের সামনে নূহ (আ.)-এর যামানার সেই মহা সংকট ও সেই চরম বিদ্রোহী জাতির শাস্তির অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে এই মুসলিম জাতিই নবী (স.)-এর ওয়ারেস বা উত্তরাধিকার হিসেবে কাজ করবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে মানুষকে এগিয়ে আনার জন্যে দাওয়াত দানের কাজ তারা করবে, সেই জনপদকে সত্যের দিকে আহবান জানানোর জন্যে কাজ করবে, যারা শেরক বেদ্য়াতে ভরা পরিপূর্ণ জাহেলিয়াতের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে বরাবর হাবুডুবু খেয়েছে তারা হচ্ছে সেই সকল জাহেল যারা দ্বিতীয় মানব সভ্যতার মধ্যে অবস্থিত সৎ কর্মের সকল সীমাকে অস্বীকার করে সবরকম অন্যায় ও অপকর্মের মধ্যে মজবুতভাবে টিকে থাকার জন্যে চূড়ান্ত রকমের চেষ্টা করেছে এবং সেই সময়কার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেছে। সংখ্যায় তারা যদিও ছিলো অতি নগণ্য।

কোরায়শদের সামনে নূহ (আ.)-এর সময়কার সেই দীর্ঘ কাহিনী তুলে ধরা হচ্ছে যাতে করে তারা হৃদয়ের চোখ দিয়ে তাদের পূর্বসূরী সত্যবিরোধী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের পরিণতিকে দেখতে পায়, তাদের কাছে প্রেরিত রসূলের মায়াভরা ব্যবহার যেন দেখতে পায়।

এ অবস্থায় নিশ্চিত তারা অনুভব করবে যে, রসূল (স.) তাদেরকে কোনো ধ্বংসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন না, বরং তারা তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নির্ধারিত দয়ার এক প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখবে—সুনির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে ঢিল দেয়া বা অবকাশ দেয়ার অবস্থাকেও তারা দেখতে পাবে। যেহেতু সত্যকে বুঝার জন্যে সর্বপ্রকার উপায়-উপকরণ ও উদাহরণ তাদের সামনে চূড়ান্তভাবে এসে গেছে, এ জন্যে নূহ (আ.)-এর যামানার মতো এতো দীর্ঘ সময়ের জন্যে দাওয়াত পেশ করার এখন আর প্রয়োজন হবে না। নূহ (আ.)-এর প্রার্থনার ফলে যে কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো সেই কঠিন পরিস্থিতিও এখন আর কোনোদিন আসবে না।

কিন্তু আফসোস 'সেই কোরায়শদের জন্যে, এ সকল যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ কথা তাদের গোমরাহী বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো কাজই করলো না।'

এরশাদ হচ্ছে,

'নূহ দোয়া করতে গিয়ে বললো, হে আমার রব, পৃথিবীতে কাফেরদের একটি ঘরও ধ্বংস না করে তুমি ছেড়ে দিয়ো না। যদি তুমি (ধ্বংস না করে) তাদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে, আর অপরাধপ্রবন ও অস্বীকারকারী কাফের ব্যতীত তারা অন্য কোনো সন্তানই জন্ম দেবে না।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর দিকে মানুষকে বরাবর যে আহ্বান জানানো হয়েছে সেই একই দাওয়াত মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ, (স.) তাঁর দেশবাসীর কাছে পেশ করেছেন, আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র মালিক ও একক শক্তি এই চরম ও পরম সত্য গ্রহণ করার জন্যে আহবান জানানো, এ কথাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, নিজে মেনে নেয়া এবং এর মূলনীতিসমূহকে দৃঢ়ভাবে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো এই দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য।

বিরোধীদের জন্যে এটা কোনো নতুন ও অস্বাভাবিক জিনিস ছিলো না। তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল সৃষ্টিকুলের সব কিছুর মধ্যে প্রতিনিয়ত একই সুর ধ্বনিত হচ্ছে, সব কিছুর মধ্যে পারস্পরিক একটা অবিচ্ছেদ্য গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং সব কিছু একই শক্তির ইচ্ছার অধীনে নিরন্তর গতিশীল কাজ করে যাচ্ছে। সৃষ্টিজগতের সব কিছু আবহমানকাল ধরে এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচী মোতাবেক কাজ করে চলেছে। সৃষ্টিকুলের এ রহস্যসমূহের সবকিছুকেই নূহ (আ.) তাঁর জাতির সামনে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা তুলে ধরেছিলেন।

কেমন করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন তা লক্ষণীয়,

'সে (নূহ) বললো, হে আমার জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী, আমি তোমাদের এ কথাটি গ্রহণ করতে আহবান জানাচ্ছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাঁকেই ভয় কর, আর আনুগত্য করো একমাত্র আমারই, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (অতীতের) সকল অপরাধ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবেন। অবশ্যই সব কিছুর জন্যে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত এক মেয়াদ, সেই নির্দিষ্ট ক্ষণ যখন এসে যাবে তখন আর কাউকে একটুও সময় দেয়া হবে না। হায়, তোমরা যদি একথা জানতে। অর্থাৎ, এ সম্পর্কে যদি তোমাদের সঠিক কোনো জ্ঞান থাকতো এবং সে জ্ঞানকে তোমরা কাজে লাগাতে! তাহলে তোমরা, এইভাবে তোমাদের ধ্বংস ডেকে আনতে না!

অর্থাৎ, কি ব্যাপার, আল্লাহর কোনো মর্যাদা আছে বলেও কি তোমরা মনে করো না, অথচ তিনি তোমাদেরকে একটার পর এক পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন? তোমরা কি দেখছো না কেমন করে তিনি সাতটি আসমানকে সুসামঞ্জস্যভাবে সৃষ্টি করেছেন? তার মধ্যে চাঁদকে স্নিগ্ধ বাতি বানিয়ে দিয়েছেন এবং সূর্যকে মহা সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা-স্বরূপ বানিয়েছেন? আবার তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে অন্যান্য গাছপালার মতো করে উৎপন্ন করেছেন, তারপর এক সময় আসবে যখন এই যমীনের মধ্যেই তোমাদেরকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এবং এরপর একদিন তোমাদেরকে এই যমীন থেকে বের করে নেবেন। এটা তো এক বাস্তব সত্য যা তোমরা দেখছো। আল্লাহ তায়ালা যমীনকে তোমাদের জন্যে বিছানাস্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা তার গিরিসংকটের মধ্য থেকে পথ বের করে নিতে পারো।

মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে বাস্তব সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাদের সামনে নূহ (আ.)-এর কাহিনীকে এখানে পেশ করা হয়েছে। কোরায়শ জনগণের মধ্যে শুরু থেকে যে গভীর গোত্রীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছিলো, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে একাত্মতা, দলীয় সংগঠন ও সংঘবদ্ধতা গড়ে উঠেছে সেই সৌহার্দকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই এই দাওয়াতী কাজের প্রসার প্রয়োজন। মানুষকে দাওয়াতের মাধ্যমে যে জীবন ব্যবস্থা দান করা হয়েছে তার ওপর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এটাই আল্লাহর প্রাচীনতম ও মজবুত পথ, যার ওপর মানুষ দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে পারে।

কিন্তু আল্লাহর রসূলরা যখনই বিরোধী মনোভাবাপন্ন ও পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা বহন করে এনেছেন, তখনই মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। কখনও তাদেরকে অজানা এক ভয় ভীতি পেয়ে বসেছে যে, তারা বাপ-দাদার আমল থেকে যে দেব-দেবীর পূজা করে আসছিলো তাদেরকে পরিত্যাগ করলে তারা রুষ্ট হবে, অকল্যাণ ডেকে আনবে—এমনকি অভিশাপ দিয়ে তাদেরকে ছারখার করে দেবে। এই বিরোধী লোকেরা একের পর এক রসূলদের আগমন সম্পর্কে নানাপ্রকার ভুল চিন্তা-ভাবনা করতো।

মানুষের মনে স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে যে, নূহ (আ.) এতো দীর্ঘকাল ধরে যে দাওয়াতী কাজ করলেন, এতো ত্যাগ স্বীকার করলেন এবং মহা প্লাবনের পর আরও দীর্ঘ বছর ধরে যে মোমেন গোষ্ঠী গড়ে তুললেন তারা মোহাম্মদ (স.) এর যামানা আসতে আসতে কেন গোমরাহ হয়ে গেলো?

এই সূরা ও কোরআনে বর্ণিত আরও কয়েকটি সূরায় নূহ (আ.)-এর ত্যাগ তিতীক্ষার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে এতো দীর্ঘ সময় ধরে আর কেউ ত্যাগ তিতীক্ষার কষ্ট করেছেন বলে কোনো নযীর নেই। এতদসত্ত্বেও কেন তার জাতির বিরোধিতা শেষ হলো না? বরং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস-উপেক্ষা অবিরাম গতিতে চলতে থাকল। এসত্ত্বেও নূহ (আ.) এসব কিছু পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, উত্তম ব্যবহার, অতি সুন্দর ও বিনয় আচরণ এবং স্নিগ্ধ ও মনোরম বাচনভংগীতে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন।

তাঁর প্রাঞ্জল ও মনমোহিনী ভাষায় দাওয়াত দানের সূচনা থেকেই সেই দীর্ঘস্থায়ী বিরোধিতা শুরু হয়ে যায় এবং মহাপ্লাবন না আসা পর্যন্ত একটি দিনের জন্যেও তাঁর কাজ বন্ধ থাকেনি। আরও বহু রসূল দুনিয়ায় এসেছেন, যাঁদের মধ্যে কাউকে উপহাস বিদ্রূপ করা হয়েছে, কাউকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে, কাউকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে, কাউকে পরিবার ও বাড়ী ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর মহান বার্তার আগমন দিবস সমাগত হলো। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগ্রাম সাধনা শুরু হলো। এ সংগ্রাম সমকালীন সবাই দেখেছে এবং জেনেছে। রসূল (স.) নিজেও যেমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁর সাথে তেমনি স্বীকার করেছেন তাঁর সাহাবারাও। তারপর থেকে সকল যামানায় ও সকল দেশে যখন এই দাওয়াত পেশ করা হয়েছে বিরোধীদের মোকাবেলায় যারাই এই সংগ্রাম করেছে তার অব্যাহত ধারা সমান গতিতে চলেছে।

কিন্তু সকল যামানার সকল সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকারকে একত্রিত করলেও কি নূহ (আ.)-এর সাথে তার জাতি যে দুর্ব্যবহার করেছে তার সমান হবে? আবার তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও মনোবল, দুর্ব্যবহার সহ্য করার জন্যে দান করা হয়েছিলো, তাও কি অন্যান্য সবার সম্মিলিত ধৈর্য থেকে কোনো অংশে কম হবে? নিসন্দেহে এখানে নূহ (আ.)-এর ত্যাগ তিতিক্ষা হবে সব কিছুর ওপরে।

একথা সত্য যে, পৃথিবীতে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এই কঠিন সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিলো। এই সহিষ্ণুতা, অবিচলতা, এই দুঃখ-কষ্ট ছিলো সকল যামানার রসূল ও তাঁদের সংগীসাথীদের পক্ষ থেকে এক মহান ত্যাগ।

সম্ভবত পৃথিবীতে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তা অন্যান্য সকল বিষয়ের জন্যে চেষ্টা করা থেকে অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ; বরং সত্য বলতে কি, আল্লাহর ওপর গভীর বিশ্বাস গোটা পৃথিবী এবং এর ওপর অবস্থিত সকল জিনিস থেকে বড় অথবা অন্য অর্থে তোমাদের অনুভূতি ও দৃষ্টিতে যেগুলো ধরা পড়তে পারে সে সব কিছু থেকেও ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা হয়েছিলো তিনি সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ কিছু গুণসম্পন্ন একটি জীবের অস্তিত্ব এই দুনিয়ায় পাঠাবেন, তাই এই গুণাবলী দেয়া হয়েছে তার বুঝ-শক্তির মধ্যে। তার জীবন-পদ্ধতিতে ঠিক সে পরিমাণ দেয়া হয়েছে যা সে আল্লাহর সাহায্য ও নিজ নিজ তৌফিক অনুসারে চেষ্টা করে অর্জন করতে পারে। কিন্তু এ সব গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করে কেন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পয়দা করলেন এটা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি।

তবে বুঝে সুঝে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা সাধনা করার জন্যে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঈমানকে তার নিজের চিন্তা চেতনার মধ্যে এবং জীবনে চলার পথে বাস্তবে যেন সে প্রয়োগ করতে পারে তার জন্যে কোনো চাপ প্রয়োগ না করে তার সুবিবেচনার ওপর এই ভার দেয়া হয়েছে। ঈমান গ্রহণ ও আনুগত্য প্রদর্শনে ফেরেশতাদের মতো তাদেরকে মযবুর করা হয়নি। আবার অন্যায় ও অপরাধজনক কাজ করার জন্যেও তাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি যে, শয়তানের মতো সর্বদা অন্যায় এবং অযৌক্তিক কাজই সে করে যাবে।

এর রহস্য আমাদের বোধগম্য নয়, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি গোটা সৃষ্টিজগতের সাথে সংযোগ রক্ষা করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এ সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমাদেরকে পয়দা করেছেন।

সুতরাং ঈমানদার মানুষের কর্তব্য গোটা মানবমন্ডলীর মধ্যে ঈমানের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই দায়িত্ব দিয়েই তিনি নবী রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের এই চেষ্টা সাধনাকে বরাবরই কবুল করেছেন। তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে যাদেরকে কবুল করেছেন তারা হচ্ছে সত্যবাদী মোমেনদের দল। পৃথিবীর বুকে সত্য প্রতিষ্ঠায়

তারা হচ্ছে নিবেদিতপ্রাণ। যারা জান মালকে নিঃশেষে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর যমীনে আল্লাহর প্রভুত্বকে কায়েম করার প্রচেষ্টায় তাদের সার্বিক ত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

অন্তরের মধ্যে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা সেই অন্তরে আল্লাহর নূরের ঝলক পয়দা করে দেয়। এই কারণেই তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টির বহু রহস্য সম্পর্কে অবগত হন। আর এই কারণেই সৃষ্টির মধ্যে যেসব রহস্য বর্তমান রয়েছে সেগুলোর বহুলাংশকে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে অবহিত করান। এটাই হচ্ছে বাস্তব কথা, এটা কোনো ভাষাভাষা ছবি বা কোনো অলীক অভিব্যক্তি নয়। এটা হচ্ছে সব থেকে বড় সত্য, যা মানুষের মধ্যে, যমীন ও আসমানের মধ্যে এবং সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

এমনি করে কোনো এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঈমানের অস্তিত্ব থাকার অর্থ হচ্ছে পার্থিব জীবনের সাথে আখেরাতের জীবনের সমন্বয় সাধন এবং তার জীবনকে এতটা উন্নীত করা যেন উভয় জীবনের মধ্যে তা সংযোগ স্থাপন করার যোগ্য হয়ে গড়ে উঠে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ক্ষয়িষ্ণু জীবন ও স্থায়ী জীবনের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা। পরিপূর্ণ জীবনের সাথে আংশিক জীবনের যোগাযোগ সৃষ্টি করা, এ হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা বহু চেষ্টা-সাধনা করেই পাওয়া যায়। এর জন্যে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যদি কেউ উভয় জীবনের সমন্বয়ে স্থায়িত্ব লাভ করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে কিছু না কিছু কষ্ট করতেই হবে, কিছু ত্যাগ স্বীকার তাকে করতেই হবে। এই কষ্ট-পরিশ্রম ও ত্যাগই তার জন্যে জীবনের দুর্গম পথ পরিক্রমায় এক উজ্জ্বল আলোক হিসেবে কাজ করবে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে বারবার একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহর ওপর মযবুত ঈমান ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই জীবনে কোনো মহৎ কাজ সম্পাদন করতে পারে না। এই গুণের ধারক ও বাহক হওয়ার কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অতীতে দীর্ঘকাল যাবত এসব মানুষের সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। যাদের অধীনে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সমর্থ হয়েছে। বরং এটা যে কতো বড় সত্য তা মানুষ চিন্তা ভাবনা করে বুঝতে পারে না, আসলে এটাই হচ্ছে সেই অনুপম বিশ্বাস যা মানুষের জীবনকে ঈমানের ধারা সঞ্জীবিত করে।

মানুষের চিন্তা প্রসূত কোনো কাজ, তার রচিত কোনো জীবন-দর্শন, তার গবেষণালব্ধ কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান বা আবিষ্কার, অথবা পৃথিবীতে বিরাজমান কোনো ধর্ম অথবা জীবন পদ্ধতি মানুষকে সেই ভাবে কখনো পথ দেখাতে পারেনি, যেমন করে আল্লাহর ওপরে ঈমানের দৃঢ়তা মানুষের জীবনকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের চরিত্রকে গড়ে তুলতে পেরেছে, তাদের ধ্যান-ধারণাকে উজ্জীবিত করতে সমর্থ হয়েছে এবং তাদের জীবনকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দান করতে পেরেছে—এমনটি দ্বিতীয় নেই। এই সঠিক বিষয় থেকেই পূর্ণাংগ-জীবনের জন্যে সঠিক পথপ্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। ঈমানের সেই উৎস থেকে উৎসারিত জীবন পথের এ দিশা অতীতের নবীদের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে, কিন্তু শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কেতাবে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে সত্য সঠিক জীবন লাভের বিস্তারিত ও বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

এই আকীদা হচ্ছে এমন এক অকাট্য বিষয়, যা স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। এ হচ্ছে সেই সত্য, যা ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। ঈমানী যিন্দেগী

যাপন করে মানুষ যা লাভ করছে তা মানুষের তৈরী কোনো তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা অর্জিত হয়নি। কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান, কোন দর্শন, কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, কোন মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা-কোনটিই ঈমানী যিন্দেগীর মতো অবদান রাখতে পারেনি। একারণে পৃথিবীতে যখনই প্রকৃত মোমেনদের নেতৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তখন তাদের স্থান অন্য কেউ কোনোভাবেই পূরণ করতে পারেনি। বরং তাদের জীবনের মূল্যমান এর ফলে অনেক নীচে নেমে গিয়েছে, মানবতার মর্যাদা এতে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এইভাবে তারা ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতি, চিন্তার নৈরাজ্য এবং দলীয় সংকীর্ণতাসহ নানাপ্রকার ব্যাধির শিকারে পরিণত হয়েছে; যদিও বস্তুগত কিছু কিছু ময়দানে তারা অগ্রসর হয়েছে এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের জিনিস ও আমোদ-প্রমোদের বিষয়াদিতে তারা যদিও বহু উন্নতি করেছে বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সেসব কিছু পাওয়া সত্তেও তারা মানসিক প্রশান্তি ও মানবতাবোধ থেকে অনেক যোজন যোজন দূরে সরে গিয়েছে।

ঈমানের শান্তি ছায়ায় যেমন করে মানুষের জীবনের উন্নতি হয়েছে তেমন উন্নতি আর কোনো অবস্থায় কোনোদিনই হয়নি। ঈমানী জীবন যাপন কালে মানুষ যেমন করে তাদের বিশ্বাসের ফল লাভে সমর্থ হয়েছে, তেমনি করে অন্য কোনো জিনিসের বিনিময়ে তা লাভ করতে দেখা যায়নি। এটা একথার এক অকাট্য দলীল যে, এই দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত সেই মহাসত্য, যার ছোঁয়া পেয়ে মানব জাতির উন্নতিতে এক যুগান্তর সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান তার জীবনকে এমন গরীয়ান মহীয়ান করেছে যা মানবরচিত কোনো পথ বা পদ্ধতির মাধ্যমে কখনও অর্জিত হয়নি।

ঈমানের ছায়াতলে এসে জীবন সম্পর্কে তার চিন্তাধারার যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তাও ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। এই আকীদা বিশ্বাসের কারণে সৃষ্টিজগতের সাথে তার যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা অন্য কোনো জিনিসের মাধ্যমে কখনও গড়ে উঠা সম্ভব নয়। এই ঈমানের বদৌলতে মানুষের মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে উঠেছে তা কখনও অন্য কোনো জিনিসের মাধ্যমে সম্ভব হয়নি। এইভাবে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে ধ্যান-ধারণা পাই তা হচ্ছে এই যে অন্যান্য সকল সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন।

সুতরাং নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, পৃথিবীতে ঈমানী যিন্দেগী প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং আল্লাহর আলোর পরশ পাওয়ার জন্যে যে চূড়ান্ত চেষ্টা সাধনা এবং যে ত্যাগ কোরবানী স্বীকার করা হয় তার মধ্য দিয়েই বাস্তব জীবনের জন্যে আল্লাহর প্রদর্শিত পথ বেরিয়ে আসে, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র উন্নত হয় এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানুষের কাজ ও ব্যবহারেরও ব্যাপক উন্নতি হয়। মানব জীবনের ইতিহাস বরাবর একথার সাক্ষ্য বহন করে এসেছে যে, একমাত্র আল্লাহর ওপর যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তার ভয়ভীতিকে অন্তরে পোষণ করে জীবন যাপন করেছে তারাই মানবজীবনের দীর্ঘস্থায়ী শান্তি সমৃদ্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অতীতের ঘটনাপঞ্জীর নিরীখে আমরা একথা নিসংকোচে বলতে পারি যে, শীঘ্রই মানব জাতি সেসব ঘটনা ও তার পাশাপাশি মানুষের সে কঠিন ব্যবহার প্রত্যক্ষ করবে, যা নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাদের সংগী সাথীদের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়েছিলো। অচিরেই সে দিন আসবে যখন ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে পতিত এক গোমরাহ নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসতে থাকবে, এরা অন্যায় ও গোমরাহীর কাজে পরস্পর সহায়তা করবে। সত্যের দিকে আহ্বানকারীদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করবে এবং বিভিন্নভাবে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করবে।

এভাবেই একদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তারা আগুনে নিক্ষেপ করেছিলো, আবার কাউকে তারা করাত দিয়ে চিরে ফেলেছিলো। আরো কিছু লোক নবী-রসূলদেরকেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস উপেক্ষা করে যে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে, বিশ্বের ইতিহাস আজও তাদের সে নির্যাতনের সাক্ষ্য বহন করছে।

এতদসত্ত্বেও আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর দিকে আহ্বান করার এই কাজ নিজ গতিতে চলতে থাকবে। যেহেতু এ সকল কাজের দাবীই হচ্ছে চূড়ান্ত সংগ্রাম এবং মহান কোরবানী, এজন্যে যত ক্ষুদ্র আকারেই একাজ করা হোক না কেন এ কাজ যখনই সঠিকভাবে শুরু করা হবে–বাতিলপন্থীদের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া আসবেই, আর সেই প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করতে গিয়ে আল্লাহর নূর এবং তাঁর মেহেরবানীর পরশ প্রত্যেক দায়ী ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) ব্যক্তি তার অন্তরের গভীরে অনুভব করবে।

'দায়ী ইলাল্লাহর' এই জনগোষ্ঠী নূহ (আ.)-এর সময় থেকে মোহাম্মদ (স.) -এর যামানা পর্যন্ত যারাই রসূল হয়ে এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ঈমান-এর তাৎপর্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন। তাদের এই দাওয়াতের প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়া সর্বকালে একইরকম থেকেছে। এ ক্ষেত্রে সব থেকে কম যে কাজটি 'দায়ী ইলাল্লাহ্' করতে পারেন তা হচ্ছে যদি অন্য কেউই তাদের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে তারা তাদের নিজেদের অন্তরের মধ্যে আমরণ ঈমানের এই আমানতকে নিজেরা সংরক্ষণ করে যাবে। মৃত্যু থেকে ভয়ংকর কোনো পরিস্থিতিও যদি আসে সেক্ষেত্রেও সত্যের এই আহ্বানকারীরা এ দায়িত্ব থেকে পিছপা হবেন না।

নবী রসূলদের এই বৈশিষ্টের কারণে তাঁদের মর্যাদা হামেশাই দুনিয়ার অন্য সবার ওপরে। দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ বা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাদেরকে গাফেল করতে পারে না–না পারে তাদের কর্তব্যচ্যুৎ করতে। তাদের সেরা মানুষ হওয়ার জন্যে তাদের এই গুণটিই যথেষ্ট। এটাই তাদের চূড়ান্ত সফলতার প্রতীক। নবীদের মতো এটা দাওয়াত দানকারীদেরও এক অমূল্য উপার্জন, যারা এ গুণটি অর্জন করতে পারে তারাও দুনিয়ার মান ইযযত লাভ করা ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যে এই গুণটিকে এক মহান সম্পদ রূপে মনে করতে পারে। এই গুণটির কারণেই আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বহনকারী এই মানুষ আল্লাহর ফেরেশতাদের সেজদা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে, যদিও এই মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ছড়ানো ও রক্তক্ষয়ী বিবাদ-বিসম্বাদ করার প্রবণতাও বিদ্যমান ছিলো।

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান জানানোর দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, এজন্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রাম করে, এর জন্যে সবরকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় এবং দুর্বল ও অক্ষম হওয়া সত্তেও এই সকল কাজের বিনিময়ে আল্লাহর যমীনে তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে তার কাছেই সে সাহায্য-প্রার্থী। সেই হচ্ছে সফল ব্যক্তি, কেননা তারা চায় আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান আল্লাহর যমীনে কায়েম হোক।

এই উদ্দেশ্যেই সে প্রাঞ্জল ভাষায় মানুষদের দাওয়াত দেয়, সে মনে প্রাণে চায় আল্লাহর দ্বীনের সংস্পর্শে এসে মানুষের জীবন উদ্ভাসিত হোক। এতে সে সবরকম কষ্ট, দুঃখ এমনকি মৃত্যু যন্ত্রণা অথবা এর থেকেও কষ্টকর কিছুকে হযম করতে প্রস্তুত। বিশ্বাসের দৃঢ়তার কারণেই এই দুঃখ কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে, যেহেতু তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এর বিনিময়ে সে আখেরাতে

মুক্তি পাবে। আখেরাতের বিশ্বাসের কারণেই সে কর্তব্য সচেতন হয়, আর যে ব্যক্তি কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

মানুষের অন্তরের মধ্যে আখেরাতের মুক্তির প্রেরণা যখন একবার স্থান লাভ করে তখন তার কাছে দুনিয়ার চেষ্টা সাধনাজনিত কাজের কষ্ট লাঘব হয়ে যায়, কষ্টের অনুভূতি কমে যায় এবং যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করা তার জন্যে তখন মোটেই আর কঠিন থাকে না। এগুলো তার আমলনামায় যোগ হয়ে তার সৎকর্মের পাল্লাকে ভারী করে দেয়, এটাই হয় তার সব পাওয়ার বড় পাওয়া।

**তাফসীর**

এখন আমরা নূহ (আ.) এর ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে পেশ করতে চাই, যা এই সূরার মধ্যে পেশ করা হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে যে মূল সত্যটি এ সূরার মধ্যে নিহিত রয়েছে—তাও ইন্‌শাআল্লাহ ফুটে উঠবে।

'অবশ্যই আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, নির্দেশ দিয়েছিলাম ....আফসোস যদি এ অবস্থাটি তোমরা জানতে পারতে!'

সূরাটি শুরু হচ্ছে রেসালাত ও ঈমান আক্বীদার উৎসের বর্ণনা এবং এর সমধিক গুরুত্বের আলোচনা দিয়ে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি নূহ-কে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম।'

যিনি পাঠিয়েছেন তিনিই হচ্ছেন এখানে মূল উৎস, তার থেকে গোটা সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাঁর কাছ থেকেই রসূলরা রেসালাত-এর নিয়োগ পেয়েছেন তাঁরা একথা জেনেছেন যে, তাঁর ওপর গভীর বিশ্বাসই হচ্ছে সকল কাজের মূল প্রাণ শক্তি। তিনিই জীবন-দাতা; আর তিনিই মহান আল্লাহ তায়ালা যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, সর্বোপরি তিনি 'তাঁকে' চেনার এবং তাঁর আনুগত্য করার তাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন।

এরপর যখনই তারা আল্লাহ তায়ালা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে এবং সঠিক পথকে বাদ দিয়ে বাঁকা পথ ধরেছে তখনই তাদেরকে সঠিক পথে চালানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে করে সে ভ্রান্ত মানবগোষ্ঠী আবার তাঁর দিকে ফিরে আসতে পারে। আদম (আ.)-এর পর নূহ (আ.)ই ছিলেন প্রথম সেই রসূল যিনি সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়া মানুষকে আবার সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আদম (আ.)-এর এই দুনিয়ায় আগমন ও এখানে মানব জাতির আবাদী স্থাপনের পর কোনো রেসালাত (আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত বার্তা) পেয়েছিলেন বলে সরাসরি উল্লেখ না পাওয়া গেলেও এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি যে জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন সেই জ্ঞানের আলোকে তিনি তাঁর সন্তানদের জন্যে শিক্ষাদাতার ভূমিকায় কাজ করেছিলেন।

তাঁর অন্তর্ধানের পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে মানুষ এক আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করার নীতি থেকে অনেক দূরে সরে চলে যায় এবং তাদের নিজ হাতে তৈরী মূর্তিকে তারা সর্বময় ক্ষমতার মালিক বানিয়ে নেয়। প্রথম প্রথম তারা কিছু মূর্তি তৈরী করে তাদেরকে শক্তি-ক্ষমতার প্রতীক মনে করতে থাকে এবং আল্লাহর অদৃশ্যমান শক্তি ক্ষমতাকে দৃশ্যমান কোনো জিনিসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে মনের সান্ত্বনা খুঁজতে থাকে।

পরবর্তীকালে এই 'প্রতীক বা কল্পনা'র কথা ভুলে গিয়ে তারা স্বয়ং সে মূর্তিগুলোরই পূজা শুরু করে দেয়। তারা সে পাঁচটি জিনিসের কথা প্রচার করতে থাকে যার বিবরণ এই সূরার মধ্যেই পরবর্তীতে আসছে। এই সময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের কাছে নূহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন যাতে করে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ও সৃষ্টির তত্ত্ব সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাকে সংশোধন করতে পারেন।

## নূহ (আ.)-এর দাওয়াত

কোরআনের পূর্ববর্তী অবতীর্ণ কেতাবসমূহে নূহ (আ.)-এর আগমনের উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেই সকল কেতাবের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা অনেক কিছু মুছে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের কাছে সেই সকল কেতাবের সকল কথা এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়।

কোরআনে করীমে নূহ (আ.)-এর যে বিবরণ এসেছে তা খেয়াল করলে যে কোনো ব্যক্তিই বুঝবে যে, মানুষ জাতির প্রসারের সূচনালগ্নেই নূহ (আ.) এর আগমন ঘটেছিলো। তাঁর বয়সের সাড়ে ন'শ বছর তিনি তাঁর জাতিকে সত্যের দিকে দাওয়াত দান করার কাজে লাগিয়েছিলেন। এই কারণেই মনে হয়, সে সময়কার মানুষেরা এ রকম দীর্ঘজীবিই ছিলো। তাঁর ও তাঁর সময়কার মানুষের এ প্রকার দীর্ঘজীবী হওয়া এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, পরবর্তী মানুষের প্রসার যেভাবে ঘটেছে সেই সময় মানুষ সংখ্যায় সে রকম বেশী ছিলো না।

আমাদের এই ধারণার আরেকটি কারণ হচ্ছে এই যে, সংখ্যায় কম হলে তাদের দীর্ঘজীবন দান করা এটাই মনে হয় আল্লাহর নিয়ম যাতে করে সৃষ্টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য বিরাজ করে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু ভালো জানেন, আমরা আল্লাহর নিয়ম যা কিছু নিজেরা প্রত্যক্ষ করি তারই ওপর একটা ধারণা গড়ে তুলি মাত্র।

আলোচ্য সূরাটি শুরু হয়েছে রেসালাত -এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব-সম্পর্কিত আলোচনা দিয়ে, তারপর রেসালাত-এর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, আর সংক্ষেপে বলতে গেলে এর গোটা তাৎপর্যই হচ্ছে ভীতি-প্রদর্শন এবং সতর্কীকরণ। এরশাদ হচ্ছে,

'বেদনাদায়ক একটা শাস্তি আসার পূর্বেই তোমার জাতিকে সতর্ক করো।'

নূহ (আ.)-এর জাতি যে কঠিন শেরক-এর অবস্থায় ছিলো তাতে তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিলো। নবীর প্রতি তাদের প্রত্যাখ্যানজনিত মানসিকতা, অহংকার, হিংসা এবং গোমরাহী দীর্ঘ সময় ধরে চলছিলো, যার কারণে নূহ (আ.) রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করতে বাধ্য হলেন। দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা ও দুনিয়া, আখেরাতে ও বেদনাদায়ক আযাবের কথাগুলোকে উপেক্ষা করার কারণেই অবশেষে তাদের ওপর সর্বগ্রাসী সেই আযাব নাযিল হলো যা তাদের কোনো এক ব্যক্তিকেও রেহাই দিলো না।

শাস্তির এই দৃশ্যের অবতারণা শেষে দর্শকের দৃষ্টি সরাসরি আকৃষ্ট করা হচ্ছে 'তাবলীগে দ্বীনের' সংক্ষিপ্ত আলোচনার দিকে, কিন্তু সেখানেও সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের দিকটিই প্রধান। অবশ্য সাথে সাথে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুনাহ খাতা যা কিছু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঘটেছে সেগুলোর প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের হিসাব গ্রহণকে আখেরাতে বিচার দিন আসার পূর্ব পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্তভাবে এটাই তাদের প্রতি দাওয়াত দানের মূল কথা। এরশাদ হচ্ছে,

'নূহ (আ.) দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে বললো, হে আমার জাতি অবশ্যই .... আফসোস যদি তারা জানতো।'

'হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্টভাবে সতর্ককারী।'

এখানে যে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করা হচ্ছে তা প্রত্যেক শ্রোতার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নূহ (আ.)-এর দেয়া যুক্তি প্রমাণ এতো স্পষ্ট যে, সব কিছু বুঝার ব্যাপারে মানুষের মনকে তা সন্দেহমুক্ত করে দেয়, যে কথাগুলোর দিকে তিনি আহবান জানিয়েছেন সে ব্যাপারে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব, অজানার অস্পষ্টতা বা কোনো সন্দেহই শ্রোতাকে বিচলিত করে না। যে সত্যের প্রতি নবী আহবান জানান তার সত্যতা কোনো গোপন বা অবোধ্য জিনিস নয় যে, অস্বীকারকারীরা এব্যাপারে কোন অজুহাত পেশ করতে পারে।

নবী নূহ (আ.) যে সঠিক কথার প্রতি আহবান জানাচ্ছেন, তা যেমন ব্যাপক, তেমনি স্পষ্ট এবং মজবুত ভিত্তির ওপর স্থাপিত, আল্লাহর দাসত্ব করার কথা বলেছেন যার কোনো অংশীদার নেই, সেই আল্লাহকে ভয় করা মানুষের বুঝ শক্তি ও বাস্তব ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য কোনো বস্তু নয়। তাঁর রসূলকে আনুগত্য দানের মাধ্যমেই তাঁর সেই নির্দেশ পালন করা যায় যার থেকে গোটা জীবনকে পরিচালনা করা এবং এর ব্যবহার পদ্ধতি জানা সম্ভব হয়।

এই পদ্ধতির মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা জ্ঞান ও নির্দেশাবলী পাই এবং একে বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি বুঝতে পারি। পৃথক পৃথকভাবে কিংবা বিস্তারিতভাবে মহান আল্লাহর বিশাল এই সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করার জন্যেও তা প্রয়োজন। সর্বোপরি গোটা মানব জাতির বৈচিত্রময় ও বিস্ময়কর অবস্থা বুঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করাই হচ্ছে জীবনের একমাত্র পথ। এই দ্বিধাহীন আনুগত্যই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দার মধ্যে সম্পর্কের তাৎপর্যকে তুলে ধরে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে জানায়। শক্তি, শক্তির মালিক এবং এই নিরংকুশ আনুগত্য সারা জগতের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর শক্তির নিদর্শনকে ফুটিয়ে তোলে।

এই আনুগত্যবোধের ওপরই মানুষের জীবনে শান্তি-সুখের প্রাসাদ গড়ে উঠে। যারা তাদের মালিকের আনুগত্য সঠিকভাবে করে তাদের জীবন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়, আল্লাহর অনুমোদিত সে পথে চলতে গিয়েই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ও তার অনুগত বান্দার মধ্যে একটা নিবিড় ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। বান্দা সেই মজবুত ও সোজা পথটি লাভ করে যা আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণী ও প্রাণহীন বস্তুর জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহর ভয় বা তাক্বওয়াই এ সত্য সঠিক পথে টিকিয়ে রাখার জন্যে মানুষকে যাবতীয় নিশ্চয়তা দান করে। এ জীবন ও এর পরের জীবনে আল্লাহবিমুখিতা থেকে তাকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করার প্রচেষ্টার কোনো হিলা-বাহানা তালাশ করা থেকেও তাকে বাঁচায়। এইভাবে আল্লাহভীরু প্রত্যেক ব্যক্তিই এমনভাবে নিজ দায়িত্বের অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করতে থাকে, যেন তাদেরকে খোদ আল্লাহ তায়ালা সরাসরি দায়িত্ব দিয়েছেন। এতে তাদের নিজেদের মাতব্বরী ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কোনো প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না।

রসূল (স.)-এর আনুগত্য হচ্ছে সঠিক পথে টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম, কারণ রসূলের মাধ্যমেই মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায়। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহর কাছ থেকে আগত সঠিক পথের দিশা (হেদায়াত) বান্দার কাছে পৌছান হয়, আর এইভাবে আল্লাহর হেদায়াত বান্দা পর্যন্ত সরাসরি আসার পথে রসূল একটি জীবন্ত ষ্টেশন হিসেবে কাজ করেন।

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার জন্যে নির্মিত এই প্রশস্ত পথসমূহের দিকেই মানব জাতির প্রসারলগ্নে নূহ (আ.) আহবান জানিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাই প্রত্যেক যামানার নবীরা

বলেছেন। তিনি তাদেরকে সেই সমস্ত ওয়াদা দিয়েছেন যা আল্লাহর প্রতিটি যামানার তাওবাকারী এবং আল্লাহমুখী লোকদের তিনি দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

'তোমাদেরকে তিনি সকল গুনাহ্ থেকে মুক্ত করে মাফ করে দেবেন, আর তোমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি হায়াত দান করবেন।'

আল্লাহর এবাদাত করার আহ্বানে যারা সাড়া দেবে এবং রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহর কাছ থেকে তাদের প্রতিদান হচ্ছে সার্বিক ক্ষমা তথা আগের অপরাধ থেকে অব্যাহতি দান। উপরন্ত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের হিসাব নেয়ার ক্ষণটিকে বিলম্বিত করা হবে, আর সেই ক্ষণটি হবে শেষ বিচারের দিন। আল্লাহর মেহেরবানীর আরও বড় দিক হচ্ছে, মানুষের অতীতের অপরাধ (যা তার ধ্বংস হওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিলো) ক্ষমা করে দিয়ে তাকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রেহাই দেয়া। যে হিসাব নেয়ার ব্যাপারে নূহ (আ.) আল্লাহর দরবারে আরজী পেশ করেছিলেন, তার থেকেও নিকৃষ্ট হিসাব এই দুনিয়ার জীবনেই নেয়া হবে, যদি সকল জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ কথা এসে যাওয়ার পরও মানুষ সত্য সঠিক পথ থেকে দূরে সরে থাকে।

এরপর তাদেরকে আল্লহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেই ওয়াদা করা একদিনে হঠাৎ করেই পূর্ব নির্দিষ্ট এবং পূর্ব নির্ধারিত আযাব এসে যাবে। দুনিয়ার কষ্ট যেমন এড়ানো যায় বা বিলম্বিত করার কোনো না কোনো উপায় বের হয়েও যায় তেমন করে সেই আযাবকে কিন্তু বিলম্বিত করা যাবে না। সেটিই হচ্ছে সব থেকে বড় এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র ব্যবস্থা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহর সে সুনির্দিষ্ট সময়টি যখন এসে যাবে, তখন তাকে মোটেই বিলম্বিত করা হবে না, আফসোস! যদি তোমরা জানতে! তোমাদের জ্ঞান যদি কাজে লাগতো!'

আলোচ্য আয়াতগুলোতে যে কথা বলা হয়েছে তাতে প্রতিটি ঘটনা তার নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে একটা ইংগীত পাওয়া যায়, যাতে সাধারণভাবে মানুষ অনুষ্ঠিতব্য প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সময় থাকতেই সজাগ হয়ে যায়। বলা হয়েছে,

'যদি তারা আনুগত্য করে এবং ফিরে আসে, তাহলে তাদেরকে হিসাব দিবস পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে।'

**নূহ-এর জাতির উন্নাষিকতা**

নূহ (আ.) যিন্দেগী ভর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর জাতিকে হেদায়াতের জন্যে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যতীত, সামগ্রিকভাবে কোনো সংস্কার বা সংশোধনীকে তাঁর জাতি গ্রহণ করেনি। এ পথে তাঁকে দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর ধরে দুঃখ কষ্ট এবং বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে। দাওয়াতী কাজের কারণেই তাকে এই ঠাট্টা বিদ্রুপ, অহংকার ও অস্বীকার ও অস্বীকৃতির মোকাবেলা করতে হয়েছে।

এতো দীর্ঘ সময় ধরে তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানোর ফলে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কিন্তু কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায়নি, বরং তাদের ভ্রান্তি ও গোমরাহী উপর্যুপরি বেড়েই চলেছিলো। অবশেষে তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে আরজি দাখিল করেছেন–যিনি তাঁকে যে মহান কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। যদিও তাঁর রব সব কিছু সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল, তিনি নিজে কি কি কাজ করেছেন এবং তাঁকে কোন কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা এখানে করতে হয়েছে, সব কিছুর বিবরণ তিনি পেশ করেছেন।

অবশ্য নূহ (আ.) নিজেও জানতেন যে, তাঁর রবের কাছে আসলে অজানা কিছুই নাই, তবুও শ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয়ের এ ছিলো আকুল নিবেদন। যেভাবে অন্যান্য সকল নবী রসূল ও ঈমানদাররা আল্লাহর কাছে শেকায়েত করেছেন, সেইভাবে তিনিও আল্লাহর দরবারে নালিশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভাংগা হৃদয়ের কথা এখানে উদ্ধৃত করছেন,

'সে বললো, হে আমার মালিক, অবশ্যই আমি আমার জাতিকে রাত দিন ধরে ডেকেছি। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার ডাক তাদের জন্যে আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। আমি যতবার তাদেরকে তোমার ক্ষমা লাভ করার জন্যে ডেকেছি, ততবারই তারা কানে আংগুল দিয়েছে, তাদের কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে ফেলেছে, জিদ করেছে এবং ভীষণ অহংকার করেছে। তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ডেকেছি, কখনও ঘোষণা দিয়ে ডেকেছি, আবার কখনও সংগোপনে বুঝিয়েছি, বলেছি তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি মাফ করবেন, এ কি হলো তোমাদের, আল্লাহর প্রতি তোমরা একটুও শ্রদ্ধাবোধ করো না?' আল্লাহ তায়ালা যমীন থেকে বিভিন্ন প্রকারের শাক-সজি উৎপন্ন করেছেন, তারপর তার মধ্যেই তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে তোমাদেরকে সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করবেন। আবার বলছি, তোমাদের জন্যে যমীনকে তিনি বিছানার মতো করে বানিয়েছেন যাতে করে তার গিরিপথগুলোকে তোমরা তোমাদের চলার পথ হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।'

এই হচ্ছে সেইসব জিনিস যা নূহ (আ.) তাদের সামনে পেশ করেছেন। অবশেষে তিনি তাঁর রবের কাছে তাঁর আরজী দাখিল করলেন এবং দীর্ঘকালের দাওয়াতী কাজ শেষে তাঁর কাজের হিসাব পেশ করলেন। এমনভাবে তিনি তাঁর অবিরাম ও অসমাপ্ত কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরছেন; যা কোনোদিন থেমে যায়নি,

'আমার আহ্বান তাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।'

এই পালানো ছিলো আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী নবী থেকে। আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী থেকে পালানো প্রকারান্তরে আল্লাহ তায়ালা থেকে পালানোকেই বুঝায়। এই নবী ছিলেন সকল সৃষ্টি ও সকল জীবন্ত জিনিস এর মূল প্রকাশক, সকল নেয়ামত ও আরাম-আয়েশের সন্ধানদাতা তিনি, সকল হেদায়াত ও সকল আঁধারের আলো দানকারীও তিনি।

তিনি তাঁর এই পরিশ্রমের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাননি, তাঁর কথা শোনানোর জন্যে কোনো মজুরী, পথ প্রদর্শনের জন্যে কারো কাছ থেকে কোনো ট্যাক্সের দাবীও করেননি! তাঁর থেকে পালানোর অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি থেকে পালানো যিনি আল্লাহর দিকে ডাকছেন যাতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের গুনাহ খাতাও মাফ করে দেন!

তারপরও যখন পালানো সম্ভব হলো না, কারণ দাওয়াত দানকারী তাদেরকে সর্বদাই সম্বোধন করতে থেকেছেন, তাদের কানে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে নূহ (আ.) সকল সুযোগ গ্রহণ করেছেন। যদিও তারা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পছন্দ করেনি, যদিও তারা তাঁর দিকে তাকাতেও চায়নি! তারা জিদ ধরে গোমরাহীর মধ্যে পড়ে থেকেছে এবং সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থার আওয়ায ও দাওয়াত কবুল করার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করতে থেকেছে। তাঁর কথার উদ্ধৃতি পেশ করতে গিয়েই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আর আমি যতবারই তাদেরকে তুমি ক্ষমা করবে বলে ডেকেছি ততবারই তারা তাদের কানে আংগুল দিয়েছে, তাদের কাপড় দিয়ে তারা নিজেদেরকে ঢেকে ফেলেছে, তারা হঠকারিতা করেছে এবং চরম অহংকার প্রদর্শন করেছে।'

একথার দ্বারা পরোক্ষভাবে এটাও বুঝায় যে, যে কোনো প্রকার বিরতি না দিয়ে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ নূহ (আ.) নিরন্তর গতিতে চালিয়ে গেছেন।

অপরদিকে গোমরাহীর ওপর হঠকারিতার সাথে টিকে থাকার অর্থ হচ্ছে অহংকারী ও জেদী এবং অবুঝ বাচ্চাদের মতো কোনো কিছুর ওপর আড় হয়ে বসে থাকা। কানে আংগুল দেয়া এবং কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়ার অর্থ দাঁড়ায় চরম উচ্ছৃঙ্খল ও বাচাল ছেলে মেয়েদের মতো বিরোধী হয়ে যাওয়া।

তাঁর ভাষায় তারা 'তাদের কানে আংগুল দিলো।' এখানে আংগুলগুলোর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সব আংগুল তো আর কানে একত্রে দেয়া যায় না। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে তাদের আংগুলের পাশগুলো দিয়ে তারা কান বন্ধ করে দিতো। অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিনভাবে তারা তাদের কানগুলো বন্ধ করে দিতো যাতে কোনো কথাই কানে প্রবেশ করতে না পারে। জেদী ও হঠকারী বাচ্চাদের মতো ছিলো তাদের এই বিরোধিতা।

দাওয়াত দিতে থাকার সাথে কোনো সময়ই বিরতি না দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় সকল বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় তিনি অবিরত কর্মতৎপর থেকেছেন এটা বুঝানো। দাওয়াত-দানের যতপ্রকার পদ্ধতি হতে পারে কোনোটাই তিনি বাদ দেননি। কখনও প্রকাশ্যে ডেকেছেন, কখনও বা পর্যায়ক্রমে ঘোষণা দিয়ে ডেকেছেন আবার কখনও ডেকেছেন গোপনে। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর আমি তাদের ডেকেছি প্রকাশ্যে, কখনও ঘোষণা দিয়ে বলেছি, আবার গোপনেও তাদের কাছে কথা পেশ করেছি।'

এইভাবে কাজ করার সকল পর্যায়েই নূহ (আ.) তাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখেরাতের সাফল্যের আশ্বাস দান করেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন তাদেরকে ক্ষমাপ্রাপ্তির সম্ভাবনার। যখনই তারা পরওয়ারদেগারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবে, আল্লাহ তায়ালাকে তখনই তারা পাবে তাদের সকল গুনাহর ক্ষমাকারী হিসেবে। হযরত নূহ (আ.)-এর কথার উদ্ধৃতি,

'তখন আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রব-এর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।'

তাদেরকে নূহ (আ.) আরও আশ্বাস দিয়েছেন, তারা যদি গোমরাহীর পথ ত্যাগ করে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় তাহলে সর্বপ্রকার জীবন ধারণ সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তাদেরকে দেয়া হবে, তাদের জানা ও আকাঙ্খিত সকল উপায় উপকরণকে তাদের জন্যে সহজলভ্য করে দেয়া হবে; আর তা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত, যার দ্বারা নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন হবে এবং নদ-নদী প্রবাহিত হয়ে তাদেরকে স্বচ্ছলতা ও স্বস্তি দান করে। আরো তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছিলো যে, তাদেরকে সন্তান-সন্ততি ও ধন-দৌলত পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করা হবে।

ক্ষমা ও এসব রেযেকের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন। কোরআনে করীমের বহুস্থানে সত্য সুন্দর হৃদয় ও হেদায়াতের পথে মযবুত হয়ে টিকে থাকার মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান রয়েছে, সম্পর্ক রয়েছে জীবন ধারণের বিভিন্ন সামগ্রীর সহজলভ্য হওয়ার সাথে এই এবাদাতেরও।

এক জায়গায় কাথাটা এইভাবে এসেছে, 'যদি সেই এলাকবাসী ঈমান আনতো এবং তাকওয়া পরহেযগারীর জীবন যাপন করতো তাহলে আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী থেকে বহু বরকত (অযাচিত দান) এর দরজা তাদের জন্যে খুলে দিতাম। কিন্তু তারা অস্বীকার করলো। যার কারণে আমি তাদের কৃতকর্মের ফল হিসেবে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।'

অন্য এক স্থানে এসেছে,

'যদি আহলে কেতাবের লোকেরা ঈমান আনতো এবং ভয় করে চলতো, তাহলে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে আমি মুছে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করতাম। আর যদি তারা তাওরাত, ইনজিল এবং তাদের রব-এর কাছ থেকে অবতীর্ণ অন্যসব কিছুর ওপর কায়েম থাকতো তাহলে তারা তাদের ওপর থেকে বর্ষিত এবং নীচে থেকে উদ্গত জিনিস থেকে খাবার গ্রহণ করতো।'

অন্য আর এক স্থানে এসেছে,

**মুসলিমদের জন্যে সুসংবাদ**

'আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করো না। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। তোমাদের পরোয়ারদেগারের কাছে তোমরা ক্ষমা চাও এবং তার কাছে তাওবা করো। তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তোমাদের সুন্দর ভোগ-বিলাসের বস্তু দান করবেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সমমানের মর্যাদা দান করবেন।'

এই মূলনীতিটি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। সেই সঠিক মূলনীতিটি হচ্ছে, আল্লাহর ওয়াদা কিন্তু শর্তবিহীন নয়। আর জীবনের নিয়মসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম হচ্ছে মানুষের বাস্তব কর্মকান্ডের কারণেই পুরস্কার বা শাস্তি পেয়েছে। বিভিন্ন জাতির অভিশপ্ত ব্যক্তিরা কিসের কারণে অভিশপ্ত হলো? অথচ যারা অভিশপ্ত হয়েছে তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়ত (চলার পথ) দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারা তা অমান্য করেছে। আর যেসব ব্যক্তি আল্লাহর প্রদত্ত-সঠিক পথ বেছে নিয়েছে, ভালো কাজ করেছে। আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ পেয়ে যারা তাওবা-ইস্তেগফার করেছে তাদের পথ ভিন্ন। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, সঠিকভাবে তার আনুগত্য করে চলেছে, আল্লাহর শরীয়তকে চালু করতে গিয়ে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে সুবিচার ও নিরাপত্তার বিধান চালু করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর রহমতের বারিধারা অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর পৃথিবীতে নতুন কিছু গড়ে তোলার ব্যাপারে, তাঁর প্রতিনিধিত্বের সম্মান দান করেছেন।

অবশ্য অনেক জায়গায়ই আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বহু জাতি ও জনপদ এমন আছে যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলছে না এবং আল্লাহর বিধানকেও চালু করছে না, তবুও তাদের ওপর প্রাচুর্যের প্রবাহ চলছে, পৃথিবীতে তারা ক্ষমতাও দখল করে রেখেছে। এগুলো আসলেই একপ্রকার পরীক্ষা। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'আমি তোমাদেরকে দুরবস্থা ও স্বচ্ছলতা দান করে পরীক্ষা করবো।'

তারপর ধীরে ধীরে তাদের ওপর অবনতি নেমে আসবে। সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সহ অবস্থান এবং নৈতিক অবক্ষয় তাদেরকে এমন মসীবতে ফেলে দেবে যা তাদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করবে। তারা যুলুম ও বিদ্রোহাত্মক কাজ দ্বারা মানুষের মর্যাদাকে খতম করে দেবে। আজ আমাদের সামনে দুটি বড়ো শক্তি রয়েছে যারা অর্থ সম্পদে বলীয়ান এবং তারা পৃথিবীর বিরাট বিরাট দুটি এলাকা জুড়ে ক্ষমতার মসনদেও সমাসীন। একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং অপরটি সামজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এদের মধ্যে প্রথমটির নেতা হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যারা নৈতিক অবক্ষয়ের এমন পর্যায়ে এসেছে সর্বপ্রকার হিংস্র জীবজন্তুকেও তারা এখন হার মানিয়েছে এবং জীবন সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা এখন ডলার দিয়েই পরিমাপ করা হয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের নেতা রাশিয়া, এরা মানুষকে দাসত্বের স্তর থেকেও নীচে নামিয়ে দিয়েছে এবং ঘরে ঘরে একের বিরুদ্ধে অপরকে গোয়েন্দা বানিয়ে দিয়েছে, প্রতি মুহূর্তে মানুষের মনে ভয় বিরাজ করছে যেন সে কষাইখানার দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক মানুষই ভাবতো যে সকালে তার কাঁধে মাথা থাকবে না। এটা কোনো মনুষত্বের মর্যাদা সম্পন্ন অবস্থা নয়। ধীরে ধীরে মানুষ সেখানে ধ্বংসযজ্ঞের দিকে এগিয়ে চলেছে।(১)

আসুন এবারে আমরা নূহ (আ.)-এর সাথে তার দীর্ঘকালের মহান জেহাদের সাথে শরীকদার হয়ে এগিয়ে যাই, দেখবো তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবলোকন করাচ্ছেন তদের নিজেদের মধ্য থেকেই। সৃষ্টিজগতের মধ্যেও যে সকল নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এবং তাদের আশপাশের সব কিছুর মধ্যে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার যেসব নিদর্শন বিরাজ করছে সে দিকে তাদের দৃষ্টি এগিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বিস্মিত হচ্ছেন তাদের ঔদ্ধত্য দেখে, বোকামীপূর্ণ উক্তি শুনে।

তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছেন আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কী নিদারুণ ও কঠিন বেয়াদবী তারা করে চলেছে! এ বোকামীপূর্ণ ব্যবহার তাদের নিজেদের কাছেও ভালো লাগছে না। তাই তাদের বিবেককে আকর্ষণ করার জন্যে বলা হচ্ছে,

‘কি হলো তোমাদের, তোমরা আল্লাহর কোনো সম্মান আছে বলেও মনে করো না? অথচ তিনি তোমাদেরকে কতো সুন্দর সুন্দর আকৃতি ও কতো বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।’

বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করার কথা যে যামানায় বলা হয়েছে তখনকার মানুষরা অবশ্যই তা বুঝতো, বুঝতো বলেই তো এতসব রহস্যপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। এই জ্ঞানগর্ভ ও সূক্ষ্ম কথা তাদের সামনে তুলে ধরাতে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যাচ্ছিলো যে, তারা নূহ (আ.)-এর কথায় কান দেবে, তিনি যে দাওয়াত দিচ্ছেন তার যৌক্তিকতা বুঝার চেষ্টা করবে।

‘আতওয়ার’ শব্দটির অর্থ বুঝতে গিয়ে অধিকাংশ মোফাসসের এই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে শুক্রবিন্দু থেকে রক্তপিন্ড এবং রক্তপিন্ড থেকে মাংসপিন্ড গঠন হয়, তারপর পূর্ণাংগ আকৃতি দিয়ে মাতৃগর্ভে মানবশিশুকে গড়ে তোলা হয়। এ কথাগুলো তাদের সামনে যখন পেশ করা হচ্ছিলো তখন তাদের পক্ষে এর সত্যতা গ্রহণ করা স্বাভাবিক ছিলো যেহেতু পূর্নাংগ আকৃতি লাভ করার পূর্বেই যে সকল ভ্রুণ-এর পতন ঘটে। সেগুলো দেখে নূহ (আ.)-এর কথার সত্যতা তাদের বুঝার জন্যে সহজ ছিলো। মানব আকৃতি ধারণ করার পূর্বে ভ্রুণটি বিভিন্ন রূপ নেয়, সেগুলো দেখে তখন বুঝাই যায় না অবশেষে কি পয়দা হবে।

ভ্রুণগুলো যখন পানি, পোকা, ব্যংগাচির মতো আকৃতি ধারণ করে তখন কার পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব যে অবশেষে সে এমন সুন্দর এক মানব শিশুতে পরিণত হবে? এ সব কিছু নূহ (আ.)-এর উদ্ধৃত আল্লাহর কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য বহন করছে। এরশাদ হচ্ছে—

‘তারপর তাকে অপর আর একটি সৃষ্টির রূপ দিয়েছি, কতো বরকতময় আল্লাহ তায়ালা, কতো চমৎকার ও সুন্দরতম সৃষ্টিকর্তা তিনি।’

(১) এ তাফসীর যখন প্রকাশিত হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্যমনি ছিল তার মধ্যাকাশে। কিন্তু ১৯৯১ সালের দিকে এসে তাদের মধ্যে ভাংগন শুরু হয় এবং এক বছরের মধ্যেই রাশিয়ার মূল ভুখন্ডটি বাদে বাকী প্রায় সবগুলো অংগরাজ্যই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যে সমাজতন্ত্র পৃথিবীর তিনভাগের দুই ভাগ এলাকর ওপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল তা তাসের ঘরের মতো ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল। আজ এ বিভীষিকা থেকে মানুষ মুক্ত। সেখানে আল্লাহর দ্বীনের ঝান্ডা বুলন্দ হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেদিনও হয়তো দূরে নয় যেদিন আল্লাহর প্রভুত্ব সেখানে কায়েম হবে এবং মানুষ মানুষের গোলামী থেকে নাজাত পাবে।—সম্পাদক

এই আয়াতটির সাথে ইতিপূর্বে যে আয়াতটি বলা হয়েছে তার আরও অনেক তাৎপর্য হতে পারে, যেগুলো এখনও আমাদের জ্ঞান-গবেষণায় ধরা পড়েনি। আর কোনো আয়াতের তাৎপর্য আমরা চূড়ান্তভাবে বুঝেছি, এর বাইরে এ আয়াতের অন্য কোনো অর্থই হতে পারে না–এ দাবীও আমরা করতে পারি না।

নূহ (আ.) মানুষের নিজেদের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা এ একইভাবে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রমের পর বর্তমান পর্যায়ে এনেছেন; একথাগুলো তাদের কাছে অপ্রিয় হলেও তা এক অমোঘ সত্য। তারপরও সেই মহান স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা দিতে তারা নারাজ। এটা কোনো সৃষ্ট জীব-এর জন্যে বড়ই লজ্জাকর বই কি?

## সৃষ্টি দেখে স্রষ্টাকে চেনা

এইভাবে এই উন্মুক্ত আকাশ ও পৃথিবীনামক মহাগ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্যে নূহ (আ.) তাদেরকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছেন; এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা কি দেখনি কি চমৎকারভাবে তিনি সাতটি আকাশকে পরস্পর সম্পৃক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, বানিয়েছেন স্নিগ্ধ জোতির্ময় চাঁদকে, আরও বানিয়েছেন আলো দানকারী সূর্যকে?'

প্রকৃতির এই বস্তুসমূহের ওপর আজ পর্যন্ত যত জ্ঞান গবেষণা চালানো হয়ে থাকুক না কেন, আর জোতির্বিদ্যা যতই উৎকর্ষতা লাভ করুক না কেন, সাতটি আসমান বলতে আল্লাহ তায়ালা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। এ ব্যাপারে কারো আন্দাজ অনুমান বা গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে কোনো অবস্থায় চূড়ান্তও মনে করা যাবে না। মহাশূন্যের বুকে এগুলো সবই তাত্ত্বিক ও অনুমানভিত্তিক জিনিস। নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদেরকে সেইভাবেই এই তত্ত্বগুলো জানিয়েছেন যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে শিখিয়েছেন। এগুলো একটি আর একটি সদৃশ সাতটি তালা বা সাতটি স্তরে সজ্জিত আসমান।

এগুলোর মধ্যেই স্নিগ্ধ বাতিরূপে রয়েছে চাঁদ আর রয়েছে মহাজোতির্ময় আলোকবর্তিকারূপে দেদীপ্যমান একটি সূর্য। ওরা চাঁদ সূর্য উভয়কে তেমন করেই দেখছে–যেমন করে দেখছে আসমান নামক জিনিসটিকে। কিন্তু আসমান নামক সে বস্তুটিও সুদূর নীলাভ মহাশূন্যতা বই আর কিছুই নয়, তাহলে যে আসমানের কথা বলা হচ্ছে সেটা কি? ওদের কাছে এর জওয়াব পাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আজ পর্যন্ত এর জওয়াব অন্য কেউই দিতে পারেনি। তাদেরকে সেই নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে চারিদিকে যা কিছু আছে সেই দিকে তাকিয়ে তারা দেখুক এবং চিন্তা করুক এগুলো আসলে কি।

একটু চিন্তা করা দরকার–কিভাবে এগুলো পয়দা হলো, কিভাবে এগুলো চলছে এবং কার ইচ্ছানুযায়ী সব কিছুর মধ্যে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য বিরাজ করছে। এ সকল বিষয় থেকে তিনি তার জাতির দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর অন্যান্য জিনিসের দিকে। তিনি তাদের দেখাচ্ছেন যে, সব কিছু এই পৃথিবী থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং এই পৃথিবীর মধ্যেই মৃত্যুর পরে সব কিছুকে ফিরে যেতে হবে। আবার একদিন আসবে যখন এই পৃথিবী থেকেই তাদের সবাইকে উঠে আসতে হবে।

## মানব সৃষ্টির কিছু বিস্ময়কর তথ্য

এরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালা (ঠিক গাছপালার মতোই) তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে উৎপন্ন করেছেন, তারপর এর মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন এবং একদিন আসবে যখন সবাইকে তিনি এর মধ্য থেকেই বের করে আনবেন।'

মানুষকে গাছপালার মতো পৃথিবী থেকে পয়দা করার ব্যখ্যা আসলেই বড়ো বিস্ময়কর। বিভিন্নভাবে কোরআনে করীমে একথাগুলোর বিবরণ এসেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'পবিত্র সে শহর, যা তার রব-এর অনুমতিক্রমে তার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বের করে, আর যেটা নষ্ট হয়ে যায় তা অপ্রীতিকর জিনিস ছাড়া আর কিছুই হয় না।' এখানে শাকসজির মতোই মানুষ উৎপন্ন হওয়ার দিকে ইংগীত করা হয়েছে। কোরআনের আরও কিছু স্থানেও শাকসজির মতো মানুষ উৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরায়ে 'হজ্জ' এ একটি আয়াতের মধ্যে দুটি জিনিসের বর্ণনা একত্রে এসেছে, যার মধ্যে পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে প্রামাণ্য দলীল পেশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কোরআন বলছে, 'হে মানুষরা, পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা কোনো সন্দেহের মধ্যে থেকে থাকো তাহলে জেনে রাখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, এর পর রক্ত-পিন্ড থেকে, তারপর আকৃতি সম্পন্ন ও আকৃতিবিহীন মাংসপিন্ড থেকে, যাতে করে আমি তোমাদেরকে (তোমাদেরকে সৃষ্টির রহস্য) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে পারি। তারপর যাকে ইচ্ছা তাকে আমি জরায়ুর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখি; এরপর তোমাদেরকে শিশু-আকারে বের করে নিয়ে আসি। তারপর এমনভাবে তোমাদের লালন পালনের ব্যবস্থা করি যে, তোমরা শক্তিসম্পন্ন হয়ে যাও, আবার তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ আছে তাকে এই যুবক বয়সেই মৃত্যু দান করা হয়, আবার কেউ আছে যাকে দুর্বলতার বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়, যখন তারা ভুলে যায় জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু জিনিস যা যুবক বয়সে তারা শিখেছিলো। আবার খেয়াল করে দেখো, পৃথিবীকে তোমরা স্থির দেখছো, কিন্তু যখন আমি এর ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন এই স্থির পৃথিবী নড়ে চড়ে উঠে, ভিজে যায় এবং তা বিভিন্নরকমের মনোরম ও মনোমুগ্ধকর গাছপালা উৎপন্ন করে।'

সূরায়ে 'মোমেনূন'-এ যে কথা বলা হয়েছে তাতে ভ্রূণ এর প্রবৃদ্ধির পর্যায়গুলোর আলোচনা ঠিক সূরায়ে 'হজ্জ' এর অনুরূপই এসেছে। এরপর বলা হয়েছে, 'আমি তোমাদের জন্যে খেজুর ও আংগুরের বাগ-বাগিচা তৈরী করেছি।' কোরআনের আরও বহুস্থানে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ সব কিছু এতো পরিস্কার যে এগুলো বুঝতে কারোই অসুবিধা হয় না। শুধু চাই সদিচ্ছা নিয়ে ভালো করে তার প্রতি খেয়াল করে দেখা, একবার ভালো করে দেখলেই সকল সন্দেহ ঘুচে যাবে। সৃষ্টির সব কিছু একটি কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে তা একই নিয়মে চলছে এবং অবশ্যই এসব কিছুর স্রষ্টা হচ্ছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। পৃথিবীর অন্যান্য সকল সৃষ্টির ন্যায় মানুষের সৃষ্টি ও প্রবৃদ্ধি সব কিছুই এই পৃথিবী থেকেই হচ্ছে; যা কিছু মানুষ খায় তার থেকে যেমন তার অস্তিত্ব টিকে আছে, তেমনি তার শরীরে উৎপন্ন যে বীজ দিয়ে মানুষ তৈরীর সূচনা হয় তাও পার্থিব বিভিন্ন উপাদান থেকে গঠিত হয়। মায়ের বুকে যে দুধ আসে তাও এই পৃথিবীর উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্য উপাদান থেকেই গঠিত; সুতরাং একথা স্পষ্ট যে শাক-সজি ও গাছপালার মতো মানুষও পৃথিবী থেকেই সৃষ্ট। এই মাটির বুক থেকে সবাই তাদের খাদ্য পায়।

এমনি করেই মোমেনের মধ্যে ঈমান সৃষ্টি হয়। ঈমান একটি কাল্পনিক অবস্থা যা ধরে দেখানো যায় না। তবে অন্তরে ঈমান থাকলে বাস্তব কাজ ও ব্যবহারের মাধ্যমে তার বহিপ্রকাশ ঘটে। এবং পৃথিবীর জীব ও নির্জীব জিনিস এর ব্যবহারের সাথে ঈমানের সম্পর্ক টের পাওয়া যায়। এ এমন এক কাল্পনিক বস্তু যার মাধ্যমে বুঝ শক্তিরও প্রকাশ ঘটে। এর কারণ হচ্ছে একটি জীবন্ত সত্তা অর্থাৎ মানুষের বিবেকের মধ্যেই থাকে ঈমানের অবস্থান। আর কোরআনকে সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করার জন্যে এই ঈমানই হচ্ছে একমাত্র অপরিহার্য্য গুণ।

মাটি থেকে সৃষ্ট মানুষ সেই মাটিতেই ফিরে যাবে। আল্লাহ তায়ালা মাটি থেকেই তাদের একবার বের করেছিলেন সেই মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে নেবেন। তার দেহের ভগ্নাবশেষ এক সময় মাটির সাথেই মিশে যাবে। তাদের শরীরের অণু পরমাণুও মাটির অণু পরমাণুর সাথেমিশে একাকার হয়ে যাবে, যেমন করে সে মানুষ পয়দা হওয়ার পূর্বে এগুলো মাটির সাথেই মিশেছিলো। তারপর একদিন আসবে যখন সেই মহান সত্তা সেই মাটি থেকেই তাকে আবার বের করবেন–ঠিক সেখান থেকে তিনি তাদেরকে প্রথমবার বের করেছিলেন। এটা একটা সহজ ব্যাপার যা বুঝার জন্যে এক মুহূর্তও বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। মানুষ যখন কোরআনের বর্ণনা অনুসারে বুঝার চেষ্টা করে তখন তা বুঝা তার জন্যে খুবই সহজ হয়ে যায়।

এই পরম সত্যের দিকেই মূসা (আ.) তাঁর জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করছেন যাতে করে তারা আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার কথা অন্তরে অনুভব করে, অনুভব করতে পারে তাঁর কথা–যিনি তাদেরকে এই মাটি থেকে পয়দা করেছেন। তিনি সেই যমীনের মধ্যেই তাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন। তারপর আর একবার সেই যমীন থেকে বের করবেন ও হিসাব গ্রহণ করার জন্যে সেই মহা বিচার দিনে তাদের একত্রিত করবেন। এ ঘটনা অতি সহজভাবেই সংঘটিত হবে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী এই পুনরুত্থান কাজটি একত্রে সংঘটিত হবে। মানুষের প্রশস্ত বুঝশক্তি দ্বারা এই ব্যাপারটা বুঝা মোটেই কঠিন নয়। কোনো প্রশস্ত হৃদয়ের লোক এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক তোলে না।

**বিছানার মতো আমাদের এই যমীন**

পরিশেষে নূহ (আ.) তাঁর জাতির লোকদের অন্তরগুলোকে তাদের ওপর বর্ষিত আল্লাহর নেয়ামতের দিকে ফেরাতে আহবান জানাচ্ছেন। যে নেয়ামতের কারণে তিনি পৃথিবীতে তাদের জীবনকে সহজ করে দিয়েছেন, এই যমীনকেও তাদের সফর করার উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। তাদের জীবন যাপনের জন্যেও একস্থান থেকে অন্যস্থানে তাদের পণ্য দ্রব্য নিয়ে যাওয়ার জন্যে সর্বপ্রকার পথ তিনি বের করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে (বিছানার মতো) বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তার গিরিপথসমূহ থেকে যাতায়াতের পথ বের করে নিতে পারো।'

তাদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও দৃষ্টির সম্মুখে এ সত্যটি অতি সহজেই ধরা পড়ে। নূহ (আ.)-এর আহ্বানকে উপেক্ষা করে এবং তাঁর সতর্কীকরণকে প্রত্যাখ্যান করে যেভাবে তারা তার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু এই যমীন থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা কোনো পথ পাবে না।

কল্পনার চোখ দিয়ে দেখতে চাইলে তারা দেখতে পাবে এই যমীন সত্যিই তাদের জন্যে বিছানা এবং আরামদায়ক দোলনার মতো সুখকর। এমনকি পাহাড় পর্বতগুলোর চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার জন্যেও সেখানে তিনি বহু পথ বের করে দিয়েছেন, গিরিপথগুলোর মাধ্যমে সুউচ্চ পর্বতমালার অপর প্রান্তে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সমতল ভূমিতে সফর করা তো এমনিই সহজ করেছেন। একইভাবে তারা আল্লাহর রহমত পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্গমগিরি কান্তার মরু পার হয়ে বহু বহু দূরে চলে যায়। দূর দেশে বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে গিয়ে এর বিনিময়ে জীবন ধারণ সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তারা আহরণ করে এবং বিভিন্নভাবে লাভবান হয়।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করা ছাড়াই চোখে দেখা এসকল সত্যকে তারা বাস্তবে অনুভব করতো। আদিগন্ত বিস্তৃত এই গ্রন্থরাজি থেকে তারা এই পাঠ গ্রহণ করতো যে, সবখানেই একজন নিয়ামক আছেন। যিনি সবার জীবনকে পৃথিবীর বুকে নিয়ন্ত্রিত করছেন এবং এর মধ্যে তাদের জীবনকে সবদিক থেকেই সহজ করে দিচ্ছেন।

মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে এই সত্যকে আরও ব্যাপকভাবে জানার নুতন নুতন পথ খুলে যাচ্ছে। নতুন দিগন্ত তাদের কাছে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। এমনি করেই নূহ (আ.) তাঁর দাওয়াতী জীবনের কঠিন পথে পাড়ি দিয়েছেন, তাঁর জাতির বিবেকের কাছে সত্য পথের দিশা তুলে ধরার জন্যে বিভিন্ন কায়দায় এবং বিভিন্ন উপায়ে দীর্ঘকাল ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অতি সুন্দর সবর, ধৈর্য, অবিচলতা ও অত্যন্ত ভদ্রজনোচিত ব্যবহার দ্বারা তিনি সাড়ে নয়শত বছর ধরে তাদের মধ্যে কাজ করেছেন। সব কিছু ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর রব-এর কাছে ব্যথিত মন ও ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনিই আল্লাহ তায়ালা, তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই তাঁকে সেই হতভাগা জাতির কাছে পাঠিয়েছেন।

তিনি তার মালিকের কাছে বিগত বছরগুলোর কাজের হিসাব পেশ করছেন, তাঁর হৃদয় ভরা দুঃখের কথা জানাচ্ছেন। কি নিদারুণ তাঁর কষ্টভরা বিবৃতি ও কি হৃদয় নাড়ানো তাঁর কণ্ঠস্বর। এই বিবৃতি থেকেই আমরা সেই মহান নবীর সবর, প্রচেষ্টা এবং কষ্টকর সংগ্রামের কথা বুঝাতে পারি। আসলে আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন একজন মর্যাদাবান রসূল। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ যামানার ভ্রান্ত, গোমরাহ্ ও হঠকারী লোকদের কাছে সত্যের আহ্বান নিয়ে এসেছেন। নূহ (আ.)-এর এই সকল বিবরণের পর সেই কঠিন অবস্থাকে বুঝানোর মতো দ্বিতীয় কোনো ভাষা আর নেই।

**আল্লাহ তায়ালার দরবারে নূহ (আ.)-এর নালিশ**

এবার আল্লাহর দরবারে নূহের নালিশ জানানোর প্রসংগ,

'নূহ বললো, হে আমার রব, ওরা আমাকে অস্বীকার করেছে, তারা অনুসরণ করেছে এমন ব্যক্তির যার ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি শুধু তার ক্ষতিই করেছে। তারা ভয়ানক রকমের ষড়যন্ত্র করেছে, আর বলছে, খবরদার! তোমাদের দেব-দেবীদের তোমরা পরিত্যাগ করো না, ত্যাগ করো না 'ওয়াদ', 'সূয়া', 'ইয়াউক' ও 'নসর'-কে। এইভাবে তারা অনেককেই পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, যালেমদের গোমরাহী তুমি আরও বাড়িয়ে দাও।'

হে আমার পালনকর্তা ওরা আমার সাথে নাফরমানী করেছে। এই সংগ্রাম, এতো কষ্ট তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার এতো প্রচেষ্টা, আলোর পথে তাদেরকে এগিয়ে আনার এতো চেষ্টা সাধনা, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন, ক্ষমার আশ্বাস দান, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি এবং সহজ জীবনের ওয়াদা আমি বারবার দিয়েছি, এতদ্সত্ত্বেও তারা আমকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সর্বক্ষণ তাদের গতি ভুল পথের পথিক ও ভুল পথে পরিচালনাকারী নেতৃবৃন্দের দিকেই নিবদ্ধ থেকেছে, তারা তাদের অনুসারীদেরকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রাপ্তির ভুল প্রলোভন দিয়ে বরাবর ধোঁকা দিয়েছে। জাঁকজমকপূর্ণ জীবন ও ক্ষমতার লোভ দিয়ে ওদেরকে সেইসব ধোঁকাবাজ নেতারা বশীভূত করে রাখতে চেয়েছে।

তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে 'যার সম্পদ ও সন্তান তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বাড়ায়নি।'

সেই বিশেষ ব্যক্তি ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির কথা বলে তাদেরকে শুধু ধোঁকাই দিয়েছে। নিজেও ভুল পথে চলেছে, অপরকেও ভুল পথে চালিয়েছে। অথচ এ দুটির কিছুই তার বাড়েনি, বেড়েছে শুধু তাদের দুর্ভাগ্য ও আর্থিক ক্ষতি।

## ভন্ড ও ভ্রান্ত নেতৃত্বের কুফল

সেই গোমরাহ নেতারা মানুষকে ভুলপথে পরিচালনা করেই ক্ষান্ত হয়নি,

'তারা ভয়ানক রকমের চক্রান্ত করেছে, সে ষড়যন্ত্রের মধ্যে চূড়ান্ত প্রকারের অহংকার রয়েছে।'

অর্থাৎ সে নেতারা ওদেরকে ছলেবলে কৌশলে বশীভূত করে নিজেদের প্রাধান্য কায়েমের চেষ্টাতেই লিপ্ত ছিলো। এজন্যেই তারা নবীর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে এবং মানুষের অন্তরে দাওয়াতী কাজের প্রতি মনোযোগ আসার সকল পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। তারা তাদের কুফরী কাজকে সুন্দর করে দেখানোর জন্যে ষড়যন্ত্র করেছে। তাদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে এটাও একটা দিক ছিলো যে, তারা মানুষকে সেই সকল মূর্তির পূজা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতো যাদেরকে তারা ক্ষমতাবান মনে করতো। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা বললো তোমাদের মাবুদ (দেবতা)-দেরকে তোমরা কখনও পরিত্যাগ করো না।'

এখানে 'আলেহাতাকুম' শব্দটি দ্বারা 'তোমাদের শক্তি সাহস বৃদ্ধির উৎস' বলে সেই মিথ্যা মূর্তিগুলোকে বুঝানো হয়েছে যা তাদের মনে এক অপরাধজনক প্রভাব বিস্তার করতো (অর্থাৎ আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার পাশাপাশি ওদেরও কিছু শক্তি ক্ষমতা আছে বলে তারা বিশ্বাস করতো, যেগুলোকে উপেক্ষা করলে তারা মনে করতো তাদের বুঝি সমূহ কোনো অকল্যাণ ঘটবে সেই সকল দেবতাদের তারা ডাকতো যারা ছিলো (তাদের ধারণায়) মান সম্ভ্রমের দিক থেকে সবার ওপরে।

এই জন্যে তাদের নাম ধরে বলা হয়েছে খবারদার! ওদেরকে কখনও ছেড়ে দিও না। এর আর একটি উদ্দেশ্য এটাও ছিলো যেন মানুষের মনের মধ্যে সেই দেবতাদের মর্যাদা বদ্ধমূল হয়ে থাকে। সেজন্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

'খবরদার ওয়াদ্, সুয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসর-কে ছেড়ে যেয়োনা।'

সেইসব মূর্খ নাদানদের কাছে এইসব নামের দেবতারা ছিলো শক্তি ক্ষমতার উৎস। মোহাম্মদ (স.)-এর যামানা পর্যন্ত বরাবর এদের বিশেষভাবে পূজা করা হতো।

আর এভাবে সে সকল নেতা যারা নিজেরা ছিলো ভুলপথের পথিক এবং মানুষকেও ভুলপথে পরিচালনা করতো, তারা নিজেরা সেইসব মূর্তি রাখতো এবং রীতিমত তাদের পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করতো। বিভিন্ন সময়ে এদের বিভিন্ন নাম থেকেছে এবং প্রত্যেক জাহেলী যামানার চাহিদা অনুসারে এদের আকৃতিও বিভিন্নভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সেইসব মূর্তির চতুর্দিকে এদের ভক্তরা জড় হতো এবং সেই সকল মূর্তির সাহসিকতাপূর্ণ কীর্তিগাঁথা গেয়ে ভক্তদের হৃদয়কে আন্দোলিত করা হতো, এতে ভক্তদের মনেও সাহসের সঞ্চার হতো।

এইভাবে জনগণের গলায় জাহেলিয়াতের লাগাম পরিয়ে দিয়ে নেতারা তাদেরকে নিজেদের দিকে টানতো এবং তাদের দ্বারা যা খুশী তাই তারা করাতো। বলা হচ্ছে,

'তারা বহু লোককে ভুলপথে চালিয়েছে।'

এইভাবে প্রত্যেক নেতা ব্যক্তির সাথে একদল লোক থাকতো যারা সেইসব মূর্তির চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হতো। সেই সময় ইট পাথরের মূর্তির পাশাপাশি কোনো ব্যক্তিকে দেবতা হিসেবে পূজা করা হতো। তাদের চিন্তারাজ্যেও কিছু মূর্তির প্রভাব ছিলো, আর এসবগুলোই সমানভাবে আল্লাহর পথে আহবান জানানোর পথে বাধা সৃষ্টি করতো এবং 'দায়ী ইলাল্লাহ' (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) থেকে তাদের মনকে বহু দূরে সরিয়ে রাখতো। এটা ছিলো সকল ষড়যন্ত্রের বড়ো ষড়যন্ত্র।

এই পর্যায়ে এসেই সম্মানিত নবী নূহ (আ.)-এর অন্তরে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করার কথা জাগলো। সেসব যালেম, গোমরাহ, ষড়যন্ত্রকারীদের ধ্বংস কামনায় যে কথাগুলো তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বেরিয়ে এলো তা হচ্ছে,

'আয় আল্লাহ, যালেমদের গোমরাহীকে আরও বাড়িয়ে দাও।'

বহু বছর ধরে সংগ্রাম ও চেষ্টা সাধনার পর এবং বহু কষ্ট স্বীকার করার পর ছিলো তার এই দোয়া। সকল প্রকার ব্যবস্থা জ্ঞানগর্ভ কথা এবং হেকমত অবলম্বনের পর কোনো সুফল না পাওয়ায় এই যালেমদের সম্পর্কে এই ছিলো তার সেই হতাশাব্যঞ্জক উক্তি। নূহ (আ.) নির্ঘাত বুঝেছিলেন যে যালেম, হঠকারী ও অহংকারী জাতির পক্ষে কল্যাণ পাওয়ার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের হেদায়াত এবং নাজাত লাভের আর কোনো উপায় নেই। এই জন্যেই তাঁর অন্তর থেকে এ বদদোয়া বেরিয়ে এলো।

**অপরাধী যালেমদের কঠিন পরিণতি**

নূহ (আ.)-এর দোয়ার শেষ অংশ সামনে আসার পূর্বেই অপরাধী যালেমেদের দুনিয়া ও আখেরাতে যে কঠিন পরিণতি হবে তার বিবরণ এসে গেছে। আল্লাহ তায়ালা তার জ্ঞান ভান্ডারে দুনিয়ার শাস্তির সাথে সাথে আখেরাতে যে কি শাস্তি হবে তা সবই বর্তমান রয়েছে। সে শাস্তি আসবেই এ ধারণার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে না কেননা এটা স্বয়ং আল্লাহরই ফায়সালা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হলো এবং তাদেরকে দোযখে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো।'

তাদের গুনাহ, তাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ, তাদের অহংকার ও নাফরমানীর কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হলো এবং জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। আরবী ভাষায় 'ফা' অর্থ হচ্ছে সুতরাং বা অতপর, এখানে এই 'ফা' ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানানো যে, ডুবিয়ে মারার সাথে তাদের জাহান্নামে প্রবেশ কারানোও অবধারিত, জাহান্নামে প্রবেশ করানো পর্যন্ত যেটুকু বিলম্ব তা খুবই অল্প সময়, এতো অল্প যেন তা কোনো সময়ই নয়; এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহর বিচারদন্ডে এতটুকু সময়ের কোনো হিসাবই নেই।

একটার পর একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কবর আযাব ভোগ করার একটা সময় যদিও আছে, কিন্তু মহাকালের তুলনায় আল্লাহর বিবেচনায় তা ডুবিয়ে মারার খুবই কাছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকেই সাহায্যকারী হিসেবে তারা পেলো না, কোনো সন্তান-সন্ততি, ধন সম্পদ, ক্ষমতাবান রাজা বাদশাহ বা যে সকল দেবতাদের তারা পূজা করতো ক্ষমতাধর বলে সাহায্যের জন্যে ডাকতো-তাদের কেউই তাদের কোনো কাজে আসলো না।

শেষের ছোট্ট আয়াত দুটোতে সেই অহংকারী, সীমালংঘনকারী, নাফরমান, হঠকারী ও অপরাধ প্রবণ জাতির চরম পরিণতি সম্পর্কে ইতি টানা হয়েছে। তাদের স্মরণও মানুষের স্মৃতিপট থেকে আজ মুছে গেছে। নূহ (আ.)-এর দোয়া ও তাঁর জাতির ধ্বংস সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখিত হওয়ার বহু পূর্বেই সে ইতিহাস মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। তাদের ডুবে মরার ঘটনা এখানে খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি এবং যে তুফান ও প্লাবনের কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো তারও বিশেষ কোনো বর্ণনা আসেনি।

এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এ প্রসংগে এতটুকু জানাতে চান যে, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ঝড় প্লাবন বা অন্য কোনো ঘটনার মাধ্যমেও শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তারপর আখেরাতে এর যে কষ্ট

অবধারিত রয়েছে তার তো কোনো পরিসমাপ্তি নেই। 'ফা' বা 'অতপর' ব্যবহার করে অবিলম্বে দোযখের আগুনের স্থায়ী আযাব আসবে বলে ভয় দেখানো হয়েছে। মানুষের হঠকারিতা ও যুক্তিহীন কাজের পরিণতি যে স্থায়ী আযাব সেটাই এখানকার মুখ্য আলোচ্য বিষয়। অতএব ডুবিয়ে মারা বা আগুনে পোড়ানোর বিস্তারিত ফিরিস্তি পেশ করার কোনো প্রয়োজন এখানে হয়নি।

তারপর নূহ (আ.)-এর শেষ দোয়ার বিবরণ আসছে। তিনি তাঁর জীবনের শেষের দিকে আল্লাহর দরবারে এই দোয়া পেশ করেছিলেন। এরশাদ হচ্ছে–

'নূহ বললো, হে আমার রব, কাফেরদের একটি ঘরও যেন পৃথিবীর বুকে ধ্বংস থেকে রেহাই না পায়। হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করো, আমার বাবা মাকেও ক্ষমা করো, ক্ষমা করো তাকেও যে আমার ঘরে প্রবেশ করবে। অন্যত্র ঈমানদার পুরুষ বা নারী যারা আছে তাদেরকেও ক্ষমা করো এবং ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই দাও। বাদ বাকি অন্য যেসব যালেম আছে তাদের কাউকে ধ্বংস না করে ছেড়ে দিয়ো না।'

অবশ্যই নূহ (আ.)-এর অন্তরে একথার এলহাম হয়েছিলো যে, এ যমীন তার পুঞ্জীভূত অন্যায় ও পাপ পংকীলতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়ার জন্যে একটি পূর্ণাংগ 'গোসল' চাচ্ছিলো। তাঁর সময় পর্যন্ত আল্লাহর যমীনে যত প্রকার অন্যায় অবিচার, যুলুম নির্যাতন, শোষণ দুঃশাসন চলছিলো এবং সর্বোপরি আল্লাহর নাফরমানীর কারণে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো তারও একটি স্থায়ী চিকিৎসার প্রয়োজন ছিলো।

দীর্ঘ সাড়ে ন'শ বছরের প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার পর সার্বিক শুদ্ধির প্রয়োজনে অন্যায়ের সব বাহন ও সব কয়টি প্রকাশ্য ও গোপন শাখা প্রশাখা নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো, কারণ তাদের কোনো একটি ঘরও যদি অবশিষ্ট থেকে যায় এমন একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর কাজ কিছুতেই চূড়ান্ত রূপ নিতে পারবে না। শেরকরূপী সংক্রামক ব্যাধি তাদের কাছ থেকে আবার অন্যদের মধ্যে প্রবেশ করবে।

এ সত্যটি নূহ (আ.) স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন বলেই তিনি চাচ্ছিলেন চূড়ান্ত এক আঘাত দিয়ে সেই যালেমদের সমূলে উৎখাত করা হোক, যাতে করে তাদের একটি ঘরও অবশিষ্ট না থাকে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি বললেন,

'তুমি যদি ওদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমার অনুগত বান্দাদেরকে গোমরাহ করে দেবে।'

এখানে 'এবাদুকা' শব্দটি দ্বারা মোমেনদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কোরআনে অনুরূপ শব্দ যেখানেই ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এর দ্বারা মোমেনদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এ শব্দটি এই জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে যে, যালেমদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও নির্যাতন সত্তেও যারা নিজেদেরকে শেরক থেকে বাঁচাতে পেরেছে এবং বরাবর আল্লাহর অভিমুখী জীবন যাপন করতে পেরেছে; তারা সেইসব লোক থেকে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র, যারা যালেম কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকার কারণে তাদের মনের পরিচ্ছন্নতাটুকুও বজায় রাখতে পারেনি।

তারপর কোনো ঘরকে যদি ধ্বংস থেকে রেহাই দেয়া হয় তাহলে সেখানে এমন পরিবেশ পরিস্থিতি গড়ে উঠবে যে, সেখানে আবার কাফেরই জন্ম নেবে। এখানে কুফ্র অর্থে সেই বিদ্রোহাত্মক প্রবণতাকে বুঝানো হয়েছে যা সেই যালেমদের সন্তানদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠবে। এভাবেই মাঝারি বয়সে এসে মানুষেরা সেই প্রবণতার অনুসারী হয়ে অবশেষে কুফরীর মধ্যেই পড়ে যায়।

এমতাবস্থায় মানুষ সত্যের আলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ হারিয়ে ফেলে; কারণ মানুষের ওপর অন্যায় ও খারাপ পরিবেশের প্রভাবই বেশী বেশী পড়ে। এই কথার দিকেই নূহ (আ.) ইংগিত দিয়েছেন, কোরআন তাঁর সেই কথাটাই তুলে ধরেছে,

'তারা দুষ্কৃতকারী অপরাধপ্রবণ কাফের ব্যতীত আর কিছুই জন্ম দেবে না।'

এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে অপরাধপ্রবণ সেই সমাজে অন্যায়কারী ও গোমরাহ লোকদের সংখ্যাই ছিলো বেশী, তারা বিভিন্ন রকমের বদ অভ্যাস নীচুতা, মনের সংকীর্ণতা এবং অন্ধ অনুকরণজনিত দোষে দুষ্ট ছিলো। এরই ফলে তাদের সন্তানরা যমীন থেকে অপরাধপ্রবণ ও কাফের হয়েই গড়ে উঠতো।

এসব বিভিন্ন কারণকে সামনে রেখেই নূহ (আ.) তার মালিকের কাছে দোয়া করেছিলেন। তাঁর মূল্যায়ন সঠিক ছিলো বলেই মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সেই সকল অন্যায় ও অপবিত্র অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্যে গোটা পৃথিবীকে 'গোসল' করিয়ে দিলেন এবং যমীন থেকে সমস্ত যুলুম নির্যাতন ও শেরেকের আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিলেন। তৎকালীন পৃথিবীকে পুঞ্জীভূত আবর্জনা থেকে মুক্ত করার এ কাজটি একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব ছিলো। কোনো সময়ই এতোবড়ো একটা ধ্বংস আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কেউই করতে পারে না।

নূহ (আ.) সম্পূর্ণভাবে শেরেক মুক্ত ও অন্যায় যুলুম ও অবিচারের জঞ্জাল থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক পৃথিবীই দেখতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সন্তুষ্টির আশায় তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সাধনা ব্যর্থ হতে দেখে তিনি মনে প্রাণে চেয়েছিলেন শেরেক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠুক, আর সেই জন্যেই ছিলো তাঁর এই শেষ প্রার্থনা,

'হে আল্লাহ তায়ালা তুমি যালেমদেরকে ধ্বংস না করে কিছুতেই ছেড়ে দিয়ো না'।

সর্বগ্রাসী এই শুদ্ধি অভিযানের জন্যেই ছিলো তাঁর কাতর প্রার্থনা। অপরদিকে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনাও ছিলো তাদের জন্যে, যারা ঈমানের কারণে তাঁর নৈকট্যলাভে ধন্য ছিলো। তিনি বলছেন,

'হে আমার মালিক, আমাকে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমার পিতা মাতাকে, উপরন্তু যে কোনো ব্যক্তি মোমেন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করবে তাকে এবং অন্যান্য সকল মোমেন-পুরুষ-নারী যে যেখানে আছে সবাইকে ক্ষমা করো।'

আল্লাহর নবী নূহ (আ.) তাঁর পালনকর্তার কাছে আরজী পেশ করছেন যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এটা ছিলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দরবারে সম্মানিত নবীর অতি পরিচ্ছন্ন এক শিষ্টাচার। মনীবের দরবারে বিনয়াবনত ভক্ত বান্দার এই হচ্ছে নিবেদন। এমন বান্দা যিনি তাঁর নিজের 'মানুষ' হওয়া ও মানুষ হিসেবে তার ভুল হওয়ার সম্পর্কে সচেতন। তিনি কখনও ভুলে যান না যে তাঁর ভুল বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে। গুনাহ খাতার উর্ধে তিনি নন।

এটাও তিনি জানেন যে, আল্লাহর দয়া মেহেরবানী ছাড়া তাঁর কোনো কাজের কারণে তিনি জান্নাত লাভ করতে পারবেন না। তাঁর ভাই মহান নবী মোহাম্মদও (স.) তাই বলেছেন। তিনি তাঁর নাফরমান জাতিকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন কিন্তু, এস্তেগফার করা তো দূরের কথা, তারা তাঁর কথায় উল্টো অহংকার প্রদর্শন করেছে। তিনি সেই মহান নবী, যিনি প্রতিটি কঠিন প্রচেষ্টা এবং কঠিন পরিশ্রমের পর ক্ষমা চাইছেন এবং প্রতিবারেই তিনি আল্লাহর কাছে নিজ কাজের হিসাব দিচ্ছেন!

তাঁর পিতা-মাতার জন্যে তাঁর প্রার্থনার ধরণও লক্ষণীয়। তিনি মোমেন পিতা-মাতার সুযোগ্য পুত্র এবং নবী, যেমন করে আমরা তাঁর এই দোয়া থেকেই বুঝতে পারছি। তারা মোমেন না হলে তাঁদের জন্যে করা প্রার্থনাকে তেমনিভাবে ফিরিয়ে দেয়া হতো যেমন করে কাফের পুত্রের জন্যে করা তার প্রার্থনাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

তাঁর খাস দোয়া ছিলো সকল ব্যক্তির জন্যে যারা মোমেন হিসেবে তার ঘরে প্রবেশ করেছিলো। এর দ্বারা মোমেন ভাই এর প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ ফুটে উঠেছে। নবী মোহাম্মদ (স.)-এর ভাষায় 'ভাইয়ের জন্যে তাই পছন্দ করো যা তুমি নিজের জন্যে পছন্দ করো।' তাই নূহ (আ.) যে প্রার্থনা নিজের জন্যে, নিজ পরিবার ও পিতা-মাতার জন্যে করছেন, সেই একই প্রার্থনা তিনি তাঁর মোমেন ভাইদের জন্যেও করছেন। তাদের কথা তিনি এভাবে বলেছেন যে, তারা ছিলো তার ঘরে প্রবেশকারী, কারণ এই ঘরে প্রবেশ করাতেই তারা যে নাজাত পাবে তার লক্ষণ তখন প্রকাশ পেয়েছিলো। আর যে সকল মোমেন ব্যক্তি তাঁর সাথে জাহাজে আরোহন করেছিলো তাদেরও জাহাজে আরোহন করার সাথে সাথে তাদের নাজাত লাভ করা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো।

এরপর তাঁর দোয়া ছিলো সকল পুরুষ নারী মোমেন সাধারণের জন্যে। তিনি সর্বদা এবং সবখানে মোমেনের জন্যে ছিলেন ঘনিষ্ট বন্ধু। তাঁর চেতনাও ছিলো সকল আত্মীয় স্বজনের জন্যে দয়ামায়ায় ভরা। তাঁর সাহাবাদের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা ও আমানতদারী গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি অতি উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিলেন। তাদের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যে একটা প্রগাঢ় আগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন, এমন এক গভীর মন মানসিকতা, যা সময় দূরত্বের ব্যবধান থাকা সত্তেও ম্লান হয়ে যায়নি।

এ এমন এক রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক যা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তির অন্তরে তার ঈমানের দৃঢ়তা অনুসারে দান করেছেন। এ ছিলো ঈমানী সম্পর্কের কারণে সৃষ্ট এক বিশেষ অবস্থা। এর বিপরীত যারা যুলুম করেছে, সেইসব যালেমদের জন্যে রয়েছে প্রচন্ড ঘৃণা। তাই তাদের জন্যে তাঁর বদদোয়া ছিলো,

'যালেমদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস না করে ছেড়ে দিয়ো না'

সূরাটির আলোচনা শেষ হয়ে এসেছে, এ প্রসংগে একদিকে যেমন মহান নবী নূহ (আ.)-এর জেহাদ এর বিবরণ অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে পেশ করা হয়েছে, অপরদিকে হঠকারী ও যালেম জাতি কি ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো তার বিবরণও দেয়া হয়েছে। আমি এখন এ মহান অধ্যায়টি শেষ করছি। শ্রদ্ধাভাজন নূহ (আ.)-এর প্রতি ও তাঁর মহান জেহাদের প্রতি আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা পেশ করে সেই কঠিন ঘটনারও ইতি টানছি।

নবী নূহ (আ.)-এর জীবন পরিক্রমার বর্ণনা আমরা শেষ করছি। কামনা করি, এতে আমাদের জীবন পথের জন্যে কিছু প্রাপ্তি ঘটুক–সে প্রাপ্তি যতো কষ্টকর ও ক্লান্তিজনকই হোক না কেন, হোক না সে চলার পথ বহু কোরবানী ও ব্যথা বেদনায় ভরা! আসলে এ পৃথিবীতে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্যে এ কষ্টের পথই হচ্ছে একমাত্র পথ, কেননা এ পথ হচ্ছে বিশ্ব পালক, মহান করুণাময় আল্লাহর কাছে পৌছানোর একমাত্র পথ।

# সূরা আল জ্বিন

আয়াত ২৮ রুকু ২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَّهْدِيْٓ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿٢﴾ وَّأَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَّأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَّأَنَّا ظَنَنَّآ أَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَّأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَّأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَّأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ﴿٨﴾

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. (হে নবী,) তুমি বলো, আমার কাছে এ মর্মে ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল (কোরআন) শুনেছে, অতপর তারা (নিজেদের লোকদের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনে এসেছি, ২. যা (তার শ্রোতাকে) সঠিক (ও নির্ভুল) পথ প্রদর্শন করে, তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের মালিকের সাথে কাউকে শরীক করবো না, ৩. আর (আমরা বিশ্বাস করি,) আমাদের মালিকের মানমর্যাদা সকল কিছুর উর্ধ্বে, তিনি কাউকে স্ত্রী কিংবা পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, ৪. (আমরা আরো জানি,) আমাদের (কতিপয়) নির্বোধ আল্লাহ তায়ালার ওপর অসত্য ও বাড়াবাড়িমূলক কথাবার্তা আরোপ করে, ৫. (অথচ) আমরা মনে করেছিলাম, মানুষ ও জ্বিন (এ দুই জাতি তো) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করতেই পারে না, ৬. মানুষদের মাঝে কতিপয় (মূর্খ) লোক (বিপদে আপদে) জ্বিনদের কিছু সদস্যের কাছে আশ্রয় চাইতো, (এতে করে) অতপর (যারা মানুষ) তারা তাদের গুনাহ আরো বাড়িয়ে দিতো, ৭. এ জ্বিনরা মনে করতো— যেমনি মনে করতে তোমরা মানুষরা যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ তায়ালা কখনো কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না, ৮. (জ্বিনরা আরো বললো,) আমরা আকাশমন্ডল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি, আমরা একে কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা ভরা পেয়েছি,

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ، فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا

رَّصَدًا ۝ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ

رَشَدًا ۝ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ، كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝ وَّاَنَّا

لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ، فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا

رَهَقًا ۝ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ، فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ

تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ وَّاَنْ

لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۝

৯. আমরা আগে তার বিভিন্ন ঘাটিতে কিছু (একটা) শোনার প্রত্যাশায় বসে থাকতাম; কিন্তু এখন আমাদের কেউ যদি (এসব ঘাটিতে বসে) কিছু শোনার চেষ্টা করে, তাহলে সে প্রতিটি জায়গায় আগে থেকেই তার জন্যে (পেতে রাখা এক) একটি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড (দেখতে) পায়, ১০. আমরা বুঝতে পারছিলাম না, পৃথিবীর মানুষদের কোনো অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশেই কি এসব (উল্কাপিন্ড বসিয়ে রাখা) হয়েছে?– না (এর মাধ্যমে) তাদের মালিক (মূলত) তাদের সঠিক (কোনো) পথ দেখাতে চান, ১১. (মানুষদের মতো) আমাদের মধ্যেও কিছু আছে সৎকর্মশীল আর কিছু আছে এর ব্যতিক্রম; (পাপ পুণ্যের দিক থেকে) আমরা ছিলাম দ্বিধাবিভক্ত, ১২. আমরা বুঝে নিয়েছি, এ ধরার বুকে (কোথাও) আমরা আল্লাহ তায়ালাকে (কোনো অবস্থায়ই) অক্ষম করতে পারবো না– না আমরা (কখনো তাঁর রাজ্য থেকে) পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পরাভূত করে দিতে পারবো, ১৩. আমরা যখন হেদায়াতের বাণী (সম্বলিত কোরআন) শোনলাম, তখন আমরা তার ওপর ঈমান আনলাম; কেননা যে ব্যক্তি তার মালিকের ওপর ঈমান আনে, তার নিজের পাওনা কম পাওয়ার আশংকা থাকে না, (পরকালেও) তাকে লাঞ্ছনা (ও অপমান) পেতে হবে না, ১৪. আমাদের মধ্যে কিছু আছে যারা (আল্লাহর অনুগত) মুসলিম, আবার কিছু আছে যারা সত্যবিমুখ (কাফের); যারা (আল্লাহর) আনুগত্যের পথ বেছে নিয়েছে তারা মুক্তি ও সৎপথই বাছাই করে নিয়েছে। ১৫. যারা সত্যবিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামের ইন্ধন (হবে), ১৬. (আসলে) লোকেরা যদি সত্য (ও নির্ভুল) পথের ওপর সুদৃঢ় থাকতো, তাহলে আমি তাদের (আসমান থেকে) প্রচুর পানি পান করাতাম,

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ
الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ
أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي لَن
يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ
اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا
وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

১৭. যেন আমি এর দ্বারা তাদের (ঈমানের) পরীক্ষা নিতে পারি; যদি কোনো মানুষ তার মালিকের স্মরণ (ঈমান ও আনুগত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার মালিক তাকে অবশ্যই কঠোর আযাবে প্রবেশ করাবেন, ১৮. (হে রসূল, আমার ওপর এ মর্মে ওহী পাঠানো হয়েছে যে,) মাসজিদসমূহ (একান্তভাবে) আল্লাহ তায়ালার এবাদাতের জন্যে (নির্দিষ্ট), অতএব তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না, ১৯. যখন আল্লাহর এক বান্দা তাকে ডাকার জন্যে দাঁড়ালো, তখন (মানুষ কিংবা জ্বিনের) অনেক সদস্যই তার আশেপাশে ভীড় জমাতে লাগলো;

**রুকু ২**

২০. (এদের) তুমি বলো, আমি শুধু আমার মনিবকেই ডাকি, আর আমি তো (কখনো) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। ২১. তুমি বলো, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতিসাধনের যেমন ক্ষমতা রাখি না, তেমনি আমি তোমাদের কোনো ভালো করার ক্ষমতাও রাখি না। ২২. তুমি (তাদের) বলো, (কোনো সংকট দেখা দিলে) আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না? তিনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থলও তো আমি (খুঁজে) পাবো না, ২৩. (আমার কাজ) এ ছাড়া আর কি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর বাণী ও হেদায়াত পৌঁছে দেবো, (পৌঁছে দেয়ার পর) তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠিন) আগুন, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; ২৪. এভাবে সত্যি সত্যিই যখন (সে দিনটি চোখের সামনে) দেখতে পাবে যার প্রতিশ্রুতি (তাদের) বার বার দেয়া হচ্ছে, তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে কার সাহায্যকারী কতো দুর্বল এবং কার বাহিনী সংখ্যায় কতো নগণ্য!

قُلْ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْۤ اَمَدًا ﴿٢٥﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

২৫. তুমি (এদের) বলো, আমি (নিজেই) জানি না, তোমাদের (কেয়ামত দিবসের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা কি (আসলেই) সন্নিকটে, না আমার প্রতিপালক তার (আগমনের) জন্যে কোনো (দীর্ঘ) মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন। ২৬. তিনি (সমগ্র) অদৃশ্য জগতের (জ্ঞানের একক) জ্ঞানী, তাঁর সে অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না, ২৭. অবশ্য তাঁর রসূল ছাড়া– যাকে তিনি (এ কাজের জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন, কিন্তু তার আগে-পিছেও তিনি (অতন্দ্র) প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন, ২৮. এ (প্রহরা) দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এ কথাটা জেনে নিতে চান, তাঁর নবী রসূলরা (মানুষের কাছে) তাদের মালিকের পক্ষ থেকে হেদায়াতের বাণী (ঠিক ঠিক) পৌঁছে দিয়েছে কিনা, অথচ আল্লাহ তায়ালা এমনিই তাদের সব কিছু পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং (এ সৃষ্টি জগতের) সবকিছুর গুনতি একমাত্র তিনিই অবগত রয়েছেন।

**সংক্ষিপ্ত আলোচনা**

এই সূরাটির আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু, তত্ত্ব ও তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়ার আগেই পাঠকের অনুভূতিতে এর ভিন্ন একটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত আকস্মিক অথচ স্বতস্ফূর্তভাবে রেখাপাত করে। সে বৈশিষ্ট্যটি এই যে, এ সূরাটি পড়া শুরু করতেই মানুষের মনে সর্বাগ্রে মন মাতানো একটি ধ্বনির মূর্ছনা ও জোরালো শব্দের একটি ঝংকার বেঝে উঠে। সেই সাথে এর ছন্দায়িত শব্দে রয়েছে কিছুটা বেদনার ছাপ, এর সুরে বুলানো রয়েছে সহানুভূতির বিভিন্ন পরশ। রয়েছে এর প্রতিধ্বনিতে কিছুটা আবেগময় সুর। সূরার ভাষায় যে দৃশ্য ও ছবি অংকিত হয়েছে এবং উদ্দীপনার যে প্রাণশক্তি এতে নিহিত রয়েছে, বিশেষত সূরার শেষাংশে জ্বিনদের বক্তব্যের যে উদ্বৃতি রয়েছে তা এর আংগিক বৈশিষ্ট্যকে সমর্থন করে এবং তা তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূরার শেষাংশে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা এই সূরার প্রতিটি পাঠকের মনকে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট ও তাকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। আর খোদ্ রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন দুটো বিষয় জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন,

প্রথমত, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনে তার ভূমিকা এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেবেন।

দ্বিতীয়ত, যতোক্ষণ তিনি এই প্রচারের কাজে লিপ্ত থাকবেন ততক্ষণ তার ওপর আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রহরা ও তত্ত্বাবধান সক্রিয় থাকবে। সূরার দ্বিতীয় রুকুটি পড়লে এ কথার যথার্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে!

'হে নবী! তুমি বলো, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না .....এবং তিনি সকল জিনিসকে গুনে গুনে রেখেছেন।'

এর পাশাপাশি রয়েছে জ্বিনদের বক্তব্যের সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি এবং এর মধ্য দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে তার বিবরণ। এই সকল তত্ত্ব ও তথ্যকে গ্রহণ করে নিলে তা মানুষের মনমানস ও চেতনায় এক গভীর চিন্তা ভাবনার জন্ম দেয়। মনমগযে এই চিন্তাভাবনার জন্ম সূরার সুরেলা ছন্দ, আবেগময় ধ্বনি ও বেদনা বিধুর করুণ সূরের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। সূরাটিকে একটু ধীরে ধীরে থেমে থেমে পড়লে তা মানুষের চিন্তা চেতনায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলোকে আরো গভীরভাবে বদ্ধমূল করে।

সূরার এই বাহ্যিক ও আংগিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার পর আমরা যদি সূরার আলোচ্য বিষয়, তাৎপর্য ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমরা তাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান পাই।

প্রথমত, এতে ইসলামের কয়েকটি মৌলিক আকীদার ওপর ভিন্ন একটা জগতের জ্বিন জগতের সাক্ষ্য হাযির করা হয়েছে। এসব আকীদাকে মোশরেকরা সরাসরি অস্বীকার করতো, এ নিয়ে তীব্র বিতর্কে লিপ্ত হতো এবং এগুলো নিয়ে সময় সময় একেবারে যুক্তিহীন ভিত্তিহীন অলীক কল্পনার জাল বুনতো। কখনো তারা দাবী করতো যে, মোহাম্মদ (স.) তাদের কাছে অদৃশ্য আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত যেসব কথা বলে থাকেন, তা তিনি জ্বিনদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এর জবাবে স্বয়ং জ্বিনদের সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে যে, জ্বিনদের থেকে মোহাম্মদ (স.)-এর কোনো তথ্য লাভকরা সংক্রান্ত মোশরেকদের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। জ্বিনরা মোহাম্মদ (স.)-এর কাছ থেকে কোরআনের সম্পর্কে কিছুই জানতো না। এ কারণে যখনই রসূল (স.) এর কাছ থেকে কোরআনের আবৃত্তি শুনলো, তখনি তারা ভয়ে ও আতংকে এতো অধীর হয়ে পড়লো যে, তারা কিছুতেই চুপ থাকতে পারলো না। তারা সর্বত্র এ কথা প্রচার করে বেড়াতে লাগলো। আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, জ্বিন , মানুষ ও ফেরেশতা সকলে মিলে যে মহাসত্যকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে এবং সমগ্র প্রকৃতি যার দ্বারা প্রভাবিত, তার কথা তারা জ্বিন জগতে প্রচার করলো। বলা বাহুল্য, মানুষের মনে জ্বিন জগতের এ সাক্ষ্যের যথেষ্ট প্রভাব ও মূল্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই সূরা দ্বারা পাঠকদের মনে জ্বিনদের ব্যাপারে বিরাজমান অনেক ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করা হয়েছে। এসব ভুল ধারণা কোরআন নাযিল হওয়ার সময়কার শ্রোতাদের মনেও ছিলো, তাদের আগের ও পরের লোকদের মনেও ছিলো। কোরআন এই অদৃশ্য সৃষ্টির প্রকৃত তথ্য কোনো অতিরঞ্জন ও রাখঢাক ছাড়াই প্রকাশ করে দিয়েছে। কোরআনের প্রাথমিক শ্রোতা আরবরা ভাবতো যে, পৃথিবীর ওপর জ্বিনদের একটা আধিপত্য রয়েছে, সে জন্যেই একজন আরব পৌত্তলিক যখন কোনো মাঠ বা মরুভূমির ভেতর দিয়ে চলতো, তখন তারা সেই ভূখন্ডের শাসক জ্বিনের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতো। তারা বলতো, এই উপত্যকা বা প্রান্তরের সরদারের কাছে এখানকার বখাটে অধিবাসীদের উৎপাত থেকে আমরা নিরাপত্তা চাই .... এরপরই সে সেই এলাকায় নিজের রাত্রি যাপনকে নিরাপদ মনে করতো। তারা এ ধারণাও পোষণ করতো যে,

জ্বিনরা অদৃশ্যের খবরাখবর জানে এবং তা দুনিয়ার জ্যোতিষীদেরকে জানিয়ে দেয়। এর ফলেই তারা ভবিষ্যবাণী করতে সক্ষম হয়। তাদের অনেকে জ্বিনের পূজাও করতো এবং আল্লাহর সাথে জ্বিনদের সম্পর্কও কল্পনা করতো। কেউ কেউ বলতো যে, জ্বিনদের মধ্যে থেকেই আল্লাহর একজন স্ত্রী আছেন, যার পেট থেকে ফেরেশতারা জন্মগ্রহণ করেন। (নাউযুবিল্লাহ)

জ্বিন সম্পর্কে এ ধরনের আকিদা-বিশ্বাস সকল যুগের জাহেলী সমাজে চালু ছিলো। এ ধরনের অলীক কল্পকাহিনী এ যুগেও অনেক সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে।

প্রাচীন যুগের মনগড়া কল্পকাহিনী দ্বারা যেমন মানুষের মনের ওপর জ্বিনদের আধিপত্য বিস্তার করে রাখা হতো এখনও তেমনটি হয়। অপরদিকে এ যুগেও এমন লোকদের সাক্ষাত পাওয়া যায়, যারা আদৌ জ্বিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই সৃষ্টি সম্পর্কে যে কোনো বক্তব্যকে তারা কুসংস্কার মনে করা, অপরদিকে জ্বিনদের নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত তথ্য প্রচার করা এই দুই প্রান্তিক ধারণার মাঝে কোরআন জ্বিনদের সম্পর্কে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে তাদের সংক্রান্ত ধারণা সংশোধন করে দিয়েছে এবং তাদের ভয় ও কল্পিত কর্তৃত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করেছে। বস্তুত জ্বিনদের অস্তিত্ব আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সূরায় তারা যেমন নিজেদের সম্পর্কে বলেছে যে,

'আমাদের ভেতরে সৎ লোকও আছে, আছে অসৎ কিছু লোকও...... ।'

আসলেও তারা তেমনি। তাদের ভেতরে এমন লোকও আছে যারা নিজেরাও বিভ্রান্ত, অন্যকেও বিভ্রান্ত করে, আবার অনেক সহজ সরল ও ধোঁকা খাওয়া লোকও সেখানে আছে।

'আমাদের মধ্যে কোনো কোনো মূর্খ ও বোকা লোক আছে যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলে .....

তারা গোমরাহী থেকে শুদ্ধি ও হেদায়াত লাভের যোগ্য এবং তারা কোরআন শুনতে, বুঝতে ও তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে প্রস্তুত।

'তুমি বলো, আমার কাছে ওহী এসেছে যে, একদল জ্বিন (কোরআন) শ্রবণ করেছে তারপর তারা বলেছে যে, আমরা এক আশ্চর্যজনক কোরআন শুনেছি, যা সততা ও ন্যায়ের পথ দেখায়। আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমাদের প্রভুর সাথে কখনো কাউকে শরীক করবো না।'

তারা জন্মগতভাবে কর্মফল ভোগ করার যোগ্য এবং ঈমান ও কুফরের ফলাফল তাদের প্রাপ্য।

'আমরা যখন হেদায়াতের কথা শুনলাম অমনি তার ওপর ঈমান আনলাম ... ।'

মানুষ যখন জ্বিনদের কাছে নিরাপত্তা চাইবে, তখন জ্বিনরা তাদের কোনো উপকার তো করতেই পারবে না বরং আরো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবে।.... তারা কোনো অদৃশ্য তথ্য জানে না এবং আকাশের সাথে তাদের কোনো সংযোগও নেই।

'আমরা আকাশকে স্পর্শ করতেই দেখলাম তা কঠোর প্রহরা ও আগুনে ভেতরে পরিপূর্ণ .....

জ্বিনদের সাথে আল্লাহর কোনো আত্মীয়তা বা বংশীয় সম্পর্ক নেই।

'আল্লাহর কোনো স্ত্রী বা সন্তান নেই।'

আর আল্লাহর শক্তির সামনে জ্বিনদের কোনো শক্তিও নেই, কোনো চালাকিও তাদের চলে না।

'আমরা জানতাম যে, আল্লাহকে আমরা কখনো হারাতে পারবো না ....।'

আলোচ্য সূরায় জ্বিন জাতি সম্পর্কে যা কিছু আলোচিত হয়েছে, ওপরে তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো। এ ছাড়া কোরাআনে আরো কিছু কিছু বিবরণ আছে। যেমন জ্বিন বংশোদ্ভুত একদল শয়তানকে হযরত সোলায়মানের অনুগত করে দেয়া, জ্বিনেরা হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর অনেক পরে টের পেয়েছিলো যে, তিনি মারা গেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা গায়েব বা অদৃশ্য জানে না।

'যখন আমি সোলায়মানের ওপর মৃত্যুর ফায়সালা কার্যকর করলাম, তখন শুধুমাত্র একটি উই পোকাই তাঁর লাঠি খেয়ে দিয়ে তার মৃত্যুর খবর জানিয়েছিলো। সোলায়মানের লাশ যখন পড়ে গেলো তখনি জ্বিনেরা বুঝতে পারলো তারা যদি গায়ব জানতো তাহলে এতো দীর্ঘসময় অপমানজনক শাস্তি তারা ভুগতো না'।(সূরা সাবা-১৪)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইবলিস ও তার সহযোগীদের একটি খাসলাত তুলে ধরেছেন। ইবলিস জ্বিনের বংশোদ্ভুত, যাবতীয় অপকর্ম, অন্যায় ও বিপর্যয়ের সে হোতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নিশ্চয়ই ইবলিস ও তার সাথী তোমাদেরকে দেখতে পায়, অথচ তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা।'

সূরা 'আর রহমান'-এ জ্বিন কিসের তৈরী এবং মানুষ কিসের তৈরী তা জানানো হয়েছে। যথা,

'তিনি মানুষকে শুকনো মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করছেন আগুন থেকে।'

এ আয়াতে উক্ত অদৃশ্য জীবের আকৃতির একটা ধারণা পাওয়া যায়, তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং তার অনেকগুলো স্বভাব বা খাসলাত সম্পর্কে জানা যায়। একই সাথে এ আয়াত জ্বিন সম্পর্কে অনেক অমূলক ধারণা দূর করে, তার সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাসকে সকল কদর্য ও আবিলতা থেকে মুক্ত করে এবং তাকে অস্বীকার করার প্রবণতা রোধ করে।

আরবের মোশরেকরা জ্বিনের ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক জগতে তাদের বিচরণ ও ভূমিকা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতো, এ সূরা সে ধারণা শুধরে দেয়। তবে যারা এর অস্তিত্বই পুরোপুরি অস্বীকার করে, আমি জানিনা তারা কিসের ভিত্তিতে জোর দিয়ে অস্বীকার করে, কিসের ভিত্তিতে তার অস্তিত্বের বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করে এবং কুসংস্কার নামে আখ্যায়িত করে। তারা কি মহাবিশ্বে কোথায় কি আছে সব জেনে ফেলেছে, সেখানে জ্বিন নামের কাউকে তারা পায়নি আর এ জন্যেই কি তাদের এই অস্বীকৃতি? বিজ্ঞানীদের ভেতরে আজ পর্যন্ত কেউই এমন দাবী করেনি। মহাবিশ্বে তো দূরের কথা, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতেও এখনো এমন বহু প্রাণী রয়েছে, যাদের অস্তিত্ব এখনো অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে এবং কেউ এ কথা বলার সাহস পায়নি যে, পৃথিবীতে জীবন্ত প্রাণী আবিষ্কারের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট দিনে তা বন্ধ হয়ে যাবে।

তারা কি দেখেছে যে, এ বিশ্বজাহানে লুকায়িত সকল শক্তির গতিপথ বন্ধ হয়ে গেছে, তার ভেতরে কেবল জ্বিনেরই কোনো সন্ধান মেলেনি? কেউ এমন দাবী করেনি। প্রতিদিনই বহু সুপ্ত শক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে, যা গতকালও অজানা ছিলো। বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক শক্তি ও উপকরণসমূহের অনুসন্ধানে একনিষ্ঠভাবে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপকতাই তাদেরকে বিনয়ের সাথে এ কথা বলতে বাধ্য করছে যে, আমরা প্রাকৃতিক জগতে এখনো অজ্ঞতার স্তরেই রয়ে গেছি এবং এখনো জানা শুরুই করিনি।

তারা কি এ বিশ্বজাহানের সকল শক্তি ও উপকরণ দেখে এসেছে এবং তা ব্যবহারও করে ফেলেছে এবং তার ভেতরে জ্বিনকে দেখেনি বলেই তাদের এই অস্বীকৃতি? এটাও ঠিক নয়। এটমকে ভাংগার পর থেকে তারা ইলেকট্রোনকে একটি বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা বলে প্রচার করে আসছেন। অথচ কেউই আজ পর্যন্ত ইলেকট্রোনকে দেখেননি। যে ইলেকট্রোনের কথা এতো জোরেশোরে প্রচার করে চলেছে, তাকে আলাদা করে দেখানোর কোনো হাতিয়ার কোনো পরীক্ষাগারেও নেই।

তাহলে জ্বিনের অস্তিত্ব অস্বীকারে এতো জিদ কেন? অথচ প্রকৃতি এবং তার উপায় উপকরণ উপাদান ও অধিবাসী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এতো কম যে, নিজের বিবেক বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখে এমন কেউ কোনো ব্যাপারেই অনমনীয় মতো পোষণ করতে পারে না। যদি বলা হয় যে, জ্বিনের সাথে অনেক ভিত্তিহীন ও অতিরঞ্জিত কথাবার্তা জড়িত হয়ে গেছে বলেই তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার এই প্রবণতা, তাহলে বলবো, এমতাবস্থায় আমাদের কর্মপন্থা হবে কুসংস্কার ও অলীক কল্পনা প্রত্যাখ্যান করা, যেমন কোরআন তা আমাদের জন্যে করে দিয়েছে। কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়া একটি সৃষ্টির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। এ ধরনের অদৃশ্য বিষয়ের কোনো তথ্য মেনে নেয়ার জন্যে পূর্বশর্ত এই যে, তাকে ওহীর নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে উৎসারিত না হয়ে এই উৎসের বিরোধী হয়, তাহলে তা অস্বীকার করতে হবে। কেননা ওহীর উৎস থেকে আগত সত্যই একমাত্র চূড়ান্ত ও অকাট্য সত্য।

পূর্ববর্তী সূরাগুলোর মতো আলোচ্য সূরাও স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, বিভিন্ন সৃষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং খোদ স্রষ্টা ও সৃষ্টির ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও দৃষ্টিভংগী নির্ণয়ে এক বিরাট অবদান রাখে।

সূরার যে অংশে জ্বিনদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেখানে আল্লাহর একত্ব ছাড়াও আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান না থাকা এবং আখেরাতের কর্মফলের সত্যতার বিষয়টি দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া খুবই জোরের সাথে যে কথাটি বলা হয়েছে তা হলো এই যে, আল্লাহর কোনো সৃষ্টি কর্তৃক আল্লাহকে হারিয়ে দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরঞ্চ আল্লাহর হাত থেকেই তো সে নিরাপদ নয়। আর আল্লাহর ন্যায়বিচারকেও সে ফাঁকি দিতে সক্ষম নয়। রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে যে কথাগুলো এ সূরার দ্বিতীয় রুকুতে বলা হয়েছে, তাতে উপরোক্ত বক্তব্য একাধিকবার প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন,

'হে নবী, তুমি বলো আমি শুধু আমার মনিবকেই ডাকি এবং তার সাথে আর কাউকে শরীক করি না।'

এ সত্য সম্পর্কে জ্বিনরা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে সাক্ষ্য দেয়ার পরই এ কথাটি বলা হয়েছে।

জ্বিনদের সাক্ষ্য থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাই এবাদাত ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। এ সত্যটি ব্যক্ত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকতে দাঁড়ায়, অমনি তারা (কাফেররা) তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে যায়।'

পরবর্তী আয়াতেও রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে এই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে,

'তুমি বলো, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম নই।'

এ সূরায় এ সত্যটিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে যে, অদৃশ্যজ্ঞান এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহরই করায়ত্ত্ব। জ্বিনরা তা মোটেই জানে না। যেমন বলা হয়েছে,

'আমরা জানি না পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে কোনো অকল্যাণ কামনা করা হয়েছে, না তাদের প্রতিপালক তাদের সুপথ প্রাপ্তি কামনা করেছেন।'

এমনকি রসূলও (স.) শুধু ততটুকুই অদৃশ্য তথ্য অবগত হন যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা তাঁর জানা কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে তাকে অবহিত করেন।

'হে নবী! তুমি বলো, তোমাদেরকে যে কর্মফল দিবসের প্রতিশ্রুত দেয়া হয়েছে তা খুব নিকটবর্তী–না আমার প্রতিপালক তাকে কিছু বিলম্বিত করবেন, তা আমার মোটেই জানা নেই। তিনিই অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তার অদৃশ্য তথ্য কাউকেই অবহিত করেন না। অবশ্য কোনো রসূলকে তিনি কিছু জানাতে সম্মত হলে সেটা ভিন্ন কথা। সে রকম সিদ্ধান্ত নিলে সেই রসূলের আগে পেছনে তিনি প্রহরা লাগিয়ে দেন।'

পক্ষান্তরে আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে এই সূরা আমাদেরকে যে তথ্য জানায় তা হচ্ছে এই যে, জন্মগত ও প্রকৃতিগতভাবে পরস্পরের মধ্যে যতো পার্থক্যই থাকুক না কেন, সকল ধরনের সৃষ্টির মধ্যেই পারস্পরিক অংশীদারিত্ব ও সংযোগ রয়েছে। যেমন জ্বিন ও মানুষের মধ্যে সংযোগ ও অংশীদারিত্বের কথা এই সূরাতে ও কোরআনের অন্যান্য জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ এই পৃথিবীতে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। কোনো না কোনো পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে। ব্যক্তিগত, গোত্রীয় ও জাতিগত পর্যায়ে তো দূরের কথা, মানুষ হিসাবে সে যে বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ব অনুভব করে। প্রকৃতির স্বভাবে কিংবা বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বললে এ রকম দাঁড়ায় যে, মানুষ প্রকৃতি সম্পর্কে এবং প্রকৃতিতে অবস্থানরত অজস্র আত্মা, শক্তি ও রহস্য সম্পর্কে সচেতন। এইসব আত্মা, শক্তি ও রহস্যের অবস্থান সম্পর্কে সে যদিও সুনিশ্চিতভাবে কিছুই জানে না, তথাপি তা তার চারপাশে বাস্তবিক পক্ষেই বিরাজমান রয়েছে। বস্তুত, সে যে একাকী এই বিশ্বের অধিবাসী নয়, সে কথা অবশ্যই অনুভব করে।

বিভিন্ন সৃষ্টির আল্লাহর প্রদর্শিত ও নির্ধারিত সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে অবস্থান এই প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন উদ্যোগ আয়োজন এবং বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা, আবার এসব কয়টির ভেতরে সম্পর্ক ও সংযোগ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা যদি সঠিকপথে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করতো তাহলে আমি তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দান করতাম.....।'

বস্তুত এ তত্ত্বটির মধ্যেই মানুষ, প্রকৃতি ও বিভিন্ন সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনার সমন্বয় ও সংযোগ সম্পর্কে কিছুটা ইসলামী ধারণা ও দৃষ্টিভংগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এ সব বিবেচনা করলে মনে হয় সূরাটির মর্ম ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, যদিও এর আয়াত সংখ্যা মাত্র আটাশ এবং এটি একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা উপলক্ষেই নাযিল হয়েছিলো।

ঘটানাটি ছিলো জ্বিনের একটি দল কর্তৃক কোরআন শ্রবণ। এই সূরায় ঘটনাটির কেবল আভাস ইংগিতই বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এর যে বিবরণ এসেছে তাতে সামান্য কিছু মতভেদ রয়েছে।

'দালায়েলুন নবুওত' নামক গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, 'রসূল (স.) জ্বিনদের দেখেনওনি, তাদেরকে লক্ষ্য করেও কোরআন পড়েননি। রসূল (স.) কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে উকাযের মেলায় গিয়েছিলেন। এই সময় শয়তানদের আকাশ থেকে খবরাখবর সংগ্রহের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা তাদের ওপর উল্কাপাত হচ্ছিল। ফলে শয়তানরা তাদের স্বজাতির কাছে ফিরে গেলো। তারা বললো, 'আমাদের আকাশ থেকে খবর সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের ওপর উল্কা নিক্ষেপ করা হয়েছে।' স্বজাতির লোকেরা বললো, তোমাদের আকাশ থেকে খবর সংগ্রহ যদি বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই কোনো নবাগত জিনিসের কারণেই হয়েছে। অতএব, যাও সমগ্র পূর্ব পশ্চিমে একটা টহল দিয়ে এসো এবং কিসের কারণে তোমরা বাধা পাচ্ছ তা খুঁজে দেখে এসো।'

এ কথা শুনে শয়তানরা পূর্ব ও পশ্চিমের ভ্রমণে চলে গেলো এবং তাদের আকাশ ভ্রমণ বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলো। শয়তানদের এই দলটি 'তাহামা' অঞ্চলের দিকে চলে গেলো। সেখানে রসূল (স.) উকাযের মেলায় যাওয়ার পথে নাখলায় যাত্রাবিরতি করছিলেন। জ্বিনরা যখন ওখানে উপস্থিত হলো, তখন রসূল (স.)-এর কোরআন পাঠ শুনে তারা পরস্পরকে বললো, এটাই হচ্ছে সেই জিনিস, যা আমাদের আকাশ থেকে খবর সংগ্রহকে অবরুদ্ধ করেছে।

তৎক্ষণাৎ তারা আপন জাতির লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, 'নিশ্চয় আমরা এক আজব কোরআন শুনেছি; যা সততা ও ন্যায়ের পথ দেখায়। আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আর কখনো আমদের প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আর আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-এর কাছে ওহী নাযিল করলেন যে, তুমি বলো আমাকে ওহীযোগে জানানো হয়েছে যে, জ্বিনের একটি দল কোরআন শুনেছে।'

........আসলে তাঁর কাছে জ্বিনদের কথাটাই ওহীযোগে জানানো হয়েছিলো। (বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাও এর কাছাকাছি।)

সহীহ মুসলিমে আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, এই রেওয়ায়াতের বর্ণনাকারী আমের বলেন, আমি আলকামাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইবনে মাসউদ কি রসূল (স.) এর সাথে সেই রাত্রে অবস্থান করছিলেন, যখন জ্বিনরা সেখানে এসেছিলো।

আলকামা বললেন, আমি ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনাদের কেউ কি সেইরাতে রসূল (স.)-এর সাথে ছিলেন যখন জ্বিনরা এসেছিলো?

ইবনে মাসউদ বললেন, না, তবে আমরা অন্য কোনো এক রাতে রসূল (স.)-এর সাথে ছিলাম, হঠাৎ আমরা তাকে হারিয়ে ফেললাম। আমরা পাহাড়ে ও সমতল প্রান্তরে সর্বত্র তাঁকে খুঁজলাম। আমাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো যে, 'রসূল (স.)-কে কি কেউ উঠিয়ে নিয়ে গেলো, নাকি কেউ তাকে মেরে ফেললো? এভাবে আমরা একটি ভয়ংকর রাত কাটালাম। সকালে রসূল (স.)-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি 'হেরার' দিক থেকে এলেন। আমরা বললাম, হে রসূলুল্লাহ! আমরা আপনাকে হারিয়ে অনেক খোঁজাখুজি করেছি, কিন্তু পাইনি। রাতটি আমাদের অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্য দিয়ে কেটেছে।'

রসূল (স.) বললেন, 'আমার কাছে জ্বিনদের দূত এসেছিলো। আমি তাদের সাথে গিয়েছিলাম। তাদের কাছে গিয়ে কোরআন পড়েছি।'

এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে জ্বিনদের আগমনের লক্ষণসমূহ এবং তাদের আগমনের আলামত দেখালেন। সাথীরা তার কাছে রসদ চাইলো।

তিনি বললেন, তোমাদের হাতে যে কোনো হাড্ডি আসুক, তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেই তা গোশতে পরিণত হবে। আর জন্তুর পায়খানার প্রতিটি টুকরো তোমাদের জন্তুসমূহের খাদ্য হবে, অতএব তোমরা হাড্ডি ও জন্তুর পায়খানা দ্বারা পেশাব পায়খানার পর কুলুখ করো না। কেননা সেই জিনিস দুটো তোমাদের (অন্য) ভাইদের খাদ্য।'

ইবনে মাসউদের আরেকটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি সেই রাতে রসূল (স.)-এর সাথে ছিলেন। তবে প্রথমোক্ত রেওয়ায়াতের সনদ অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তাই আমরা অন্য রেওয়ায়েতকে তেমন আমল দিতে চাই না।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েত দুটি থেকে বুঝা যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাসের মতে রসূল (স.) জ্বিনদের উপস্থিতি টের পাননি। আর ইবনে মাসউদ বলেন যে, তারা তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। বায়হাকীর ব্যাখ্যা এই যে, উভয় রেওয়ায়েত আসলে আলাদা দুটো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় আরেকটি রেওয়ায়েত ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আবু তালেব মারা যাওয়ার পর কোরায়শদের পক্ষ থেকে রসূল (স.) এতো কষ্ট পেতে লাগলেন, যা আবু তালেবের জীবদ্দশায় পাননি। ফলে রসূল (স.) তায়েফে চলে গেলেন। বনু সাকীফ থেকে তিনি সাহায্য পাওয়ার আশা করছিলেন এবং তার গোত্রের অত্যাচার থেকে তাকে তারা রক্ষা করবে ভেবেছিলেন। তাই তিনি তায়েফে গিয়েছিলেন। তিনি যখন তায়েফে পৌঁছলেন, তখন বনু সাকিফের প্রধান তিন ব্যক্তির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এরা ছিলো তিন ভাই। এই তিন ভাই এর নাম ছিলো ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব। এরা সবাই ছিলো অমর বিন উমাইয়ের পুত্র। তাদের একজন কোরায়শের মেয়ে বিয়ে করেছিলো।

রসূল (স.) তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান জানালেন এবং তাঁকে তার গোত্রের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার অনুরোধ জানালেন। তাদের একজন বললো, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাকে সত্যিই পাঠিয়ে থাকে, তাহলে আমি কাবার গেলাফকে ছিঁড়ে ফেলবো। অপরজন বললো, আল্লাহ তায়ালা রসূল বানাতে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বুঝি পেলেন না! তৃতীয় জন বললো, আমি তোমার সাথে কোনো কথাই বলবো না। তুমি যদি সত্যিই রসূল হয়ে থাকো, তাহলে তোমার কথার জবাব দেয়া খুবই বিপদজনক। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তোমার সাথে আমার কথা বলাই সাজে না।'

এরপর রসূল (স.) তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বনু সাকীফের কাছ থেকে তাঁর আর কোনো কল্যাণের আশা রইল না। বিদায় নেয়ার সময় বললেন, 'তোমরা যখন আমার দাওয়াত মানলেই না, তখন আমার ব্যাপারটা গোপন রাখো।'

সাকীফের লোকেরা তার আগমনের খবর জানুক, এটা তিনি পছন্দ করলেন না। কেননা তাতে বখাটে লোকদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়া হতে পারে।

সাকীফের নেতারা রসূল (স.)-এর শেষ অনুরোধটিও রক্ষা করলো না। তারা তাঁদের বখাটে তরুণদেরকে ও চাকর-বাকরদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিলো। তারা তাকে গালিগালাজ করতে লাগলো এবং চিৎকার করতে করতে তার পিছু নিলো। শেষপর্যন্ত বিপুলসংখ্যক লোকের ভিড় জমে উঠলো এবং রসূল (স.) ওৎবা ও শায়বার বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

তখন বখাটে তরুণগুলো ফিরে গেলো। একটি আংগুরের ঝোপের আড়ালে তিনি বসে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। রবীয়ার ছেলে ওৎবা ও শায়বা বখাটে তরুণদের অত্যাচারে তাঁর কি হাল হয়েছে সে দৃশ্য উপভোগ করলো।

একটু বিশ্রাম নিয়ে রসূল (স.) আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন! 'হে আল্লাহ তায়ালা, তোমার কাছে আমি নিজের শারীরিক অক্ষমতা, কৌশলগত দুর্বলতা এবং মানুষের চোখে মর্যাদাহীন হওয়ার কথা স্বীকার করছি। হে শ্রেষ্ঠ দয়ালু! তুমি দুর্বলদের প্রভু! তুমি আমার প্রভু। আমাকে তুমি এ কার গলগ্রহ বানাচ্ছো? এমন কোনো দূরবর্তী আত্মীয়ের কাছে, আমাকে সোপর্দ করছো, যে আমাকে অপর মনে করে? অথবা, এমন কোনো নিকটাত্মীয়ের কাছে আমাকে সঁপে দিচ্ছো যে আমার মনিব হয়ে বসবে? তুমি যদি আমার ওপর রুষ্ট না হয়ে থাক, তাহলে আমার কোনোই পরোয়া নেই। তবে তুমি শান্তি ও নিরাপত্তা দিলে সেটা আমার জন্যে প্রশস্ততর। তোমার নূরের আশ্রয় চাই যার আলোতে সকল অন্ধকার বিদূরিত হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়। আমার ওপর তোমার গযব যেন না আসে, তোমার কাছেই ধর্ণা দিয়ে থাকি যতোক্ষণ না তুমি খুশী হও। তোমার শক্তি ছাড়া আর কারো শক্তি আমার কাজে লাগবে না।'

তাঁর এই অবস্থা দেখে ওৎবা ও শায়বার মনে করুণার উদ্রেক করলো। তারা তাদের খৃস্টান ভৃত্য আব্বাসকে দিয়ে একটি প্লেটে করে এক থলে আংগুর রসূল (স.)-এর খাওয়ার জন্যে পাঠালো, আব্বাস আংগুর নিয়ে রসূল (স.) কে খেতে বললো। তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে আংগুর খেলেন।

আব্বাস তা শুনে রসূল (স.)-এর মুখের দিকে তাকালো এবং বললো, এই দেশের লোকেরা এ ধরনের কথা বলে না।

রসূল (স.) বললেন, তুমি কোন দেশের মানুষ এবং তোমার ধর্ম কি?

সে বললো, আমি একজন খৃস্টান এবং নিনোয়ার অধিবাসী।

রসূল (স.) বললেন, পুণ্যবান মহাপুরুষ ইউনুস বিন মাত্তার শহরের অধিবাসী?

আব্বাস বললো, ইউনুস বিন মাত্তা কে, তা আপনি কি করে জানলেন?

রসূল (স.) বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী।'

সংগে সংগে আব্বাস মাথা নুইয়ে রসূল (স.)-এর কপালে, হাতে ও পায়ে চুমু খেলো।

দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে ওৎবা ও শায়বা পরস্পরকে বললো, ভৃত্যটিকে বুঝি সে নষ্টই করে দিলো।'

আব্বাস এলেই তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, কিরে আব্বাস! তুই সেই আগন্তুকের হাত পা ও কপালে চুমু খেলি কেন?

সে বললো, হে আমার মনিব! পৃথিবীতে এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কেউ নেই। তিনি আমাকে এমন একটা জিনিস শিখিয়েছেন যা নবী ছাড়া আর কেউ শেখায় না।

ওৎবা ও শায়বা ধমক দিয়ে বললো, তুই কিন্তু সেই লোকটির প্ররোচনায় নিজের ধর্ম ছাড়িসনে। তোর ধর্ম ওর ধর্মের চেয়ে ভালো।

অতপর, রসূল (স.) তায়েফ থেকে মক্কার দিকে ফিরে চললেন। বনু সাকীফের দিক থেকে তিনি এক বুক হতাশা নিয়ে ফিরলেন। রাত দুপুরের দিকে নাখলায় পৌঁছে নামায পড়তে লাগলেন। এসময়ে তার কাছ দিয়ে এক দল জ্বিন অতিক্রম করে। আল্লাহ তায়ালা এদের কথাই এই সূরায় বলেছেন। তারা ছিলো নাসিবীনদের মধ্য থেকে সাতজন জ্বিন। তারা তাঁর কোরআন পড়া শুনলো। অতপর স্বগোত্রীয় জ্বিনদের কাছে গিয়ে ইসলাম প্রচার শুরু করে দিলো। তারা আগেই ঈমান এনেছিলো।

আল্লাহ তায়ালা এই জ্বিনদের খবর রসূল (স.) কে দিয়েছেন এই বলে,

'আমি একদল জ্বিনকে তোমার দিকে চালিত করলাম যেন তারা কোরআন শুনতে পায়। তারা সেখানে পৌঁছে পরস্পরকে বললো, নীরবে শোনো।........(সূরা 'আল আহকাফ')

অতপর এই সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করলেন।

বিশিষ্ট মোফাসসের ইবনে কাসীর ইবনে ইসহাকের উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, 'ঘটনা তো ঠিকই। তবে সেই রাত্রেই যে জ্বিনরা প্রথম কোরআন শুনেছে, এ কথা বিচার বিবেচনা সাপেক্ষ। কারণ ইবনে আব্বাসের হাদীস থেকে জানা যায় যে, জ্বিনরা ওহীর সূচনাকালেই কোরআন শুনেছে। আর রসূল (স.)-এর তায়েফ যাত্রা ছিলো তাঁর চাচার মৃত্যুর পরের ঘটনা। হিজরতের মাত্র দুই বা এক বছর আগে এ ঘটনাটি ঘটে।

ইবনে ইসহাকের এই বর্ণনাকে যদি সত্য ধরে নেয়া হয় যে, ঘটনাটা তাঁর তায়েফ থেকে নির্যাতিত ও মর্মাহত হয়ে এবং সাকীফ গোত্রের নেতাদের নির্মম নিষ্ঠুর ও অমানুষিক ব্যবহারে মনোক্ষুন্ন হয় ফেরার পথেই ঘটেছিলো, তাহলে এ দিক থেকে ঘটনাটা সত্যিই চমকপ্রদ মনে হয়। তায়েফবাসীর অত্যাচারে ব্যথিত হৃদয়ে তিনি যে দোয়া আল্লাহর কাছে করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যদি এই জ্বিনের দলটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে থাকেন এবং জ্বিনেরা যা যা করেছিলো এবং স্বজাতির কাছে গিয়ে যা যা বলেছিলো, তা যথাযথ অবহিত করে থাকেন, তবে এই ঘটনা ও তার এই বর্ণনা খুবই তাৎপর্যবহ মনে হয়। ঘটনার সময় যখনই হোক না কেন, এটি নিসন্দেহে অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা। বিশেষত ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে জ্বিনদের বক্তব্য এখানে খুবই আকর্ষণীয়।

**তাফসীর**

এবারে আমি সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করবো। সূরার প্রথম সাতটি আয়াত পড়ে যান। এখানে জ্বিনের যে দলটির কথা বলা হয়েছে তা তিন থেকে নয়জন হতে পারে। কারো কারো মতে তারা ছিলো সাতজন।

সূরার প্রারম্ভিক ভাষা থেকেই বুঝা যায় যে, জ্বিনেরা যে রসূল (স.)-এর কোরআন পাঠ শুনেছিলো এবং শোনার পর তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো, তা রসূল (স.) ওহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলেন। ঘটনা রসূল (স.) ইতিপূর্বে জানতে পারেননি, তা আল্লাহই তাকে জানিয়েছেন। জ্বিনদের কোরআন শ্রবণজনিত এই ঘটনা হয়তো এটাই প্রথম ছিলো। এরপর হয়তো এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকবে। রসূল (স.) হয়তো স্বেচ্ছায় তাদেরকে কোরআন পড়ে শুনিয়ে থাকবেন। রসূল (স.) কর্তৃক সূরা 'আর রাহমান' পড়ার যে ঘটনা তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও এরূপ মনে হয়।

সেই হাদীসে হযরত জাবের (রা.) বলেন, রসূল (স.) একবার তাঁর সাহাবীদের কাছে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ সূরা আর রাহমান পাঠ করলেন। শুনে সাহাবীরা কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না।

তখন রসূল (স.) বললেন, আমি এই সূরা জ্বিনদের সামনে পড়েছি। তারা এটি শুনে তোমাদের চেয়ে ভালো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। যখনই আমি পড়েছি 'তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোনো অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?' তখনি তারা বলে উঠেছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার কোনো অনুগ্রহই অস্বীকার করি না, তোমার প্রতি বরং আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।' ইতিপূর্বে বর্ণিত ইবনে মাসউদের হাদীসও এ হাদীসের সমর্থন করে।

এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই সূরায় জ্বিনদের যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা হুবহু সূরা আহকাফে বর্ণিত ঘটনা। সেখানে বলা হয়েছে,

'আমি একদল জ্বিনকে তোমার দিকে পাঠিয়ে দিলাম যে কোরআন শুনে আসুক। তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে পরস্পরকে বললো, নীরবে শুনতে থাকো। তারপর শোনা শেষ হলে তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সাবধান করতে লাগলো। তারা বললো, হে আমাদের জনগণ! আমরা এক কেতাব শুনে এসেছি। মূসার পরে নাযিল হওয়া এ কেতাব তাঁর কেতাবের সমর্থন করে এবং সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়। হে আমাদের জাতি! তোমরা আল্লাহর আহবানকারীর দাওয়াত গ্রহণ করো এবং তার ওপর ঈমান আনো তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আহ্বায়কের দাওয়াত গ্রহণ করে না, সে পৃথিবীতে অজেয় নয় এবং আল্লাহর মোকাবেলায় তার কোনো বন্ধুও নেই। তারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।'

সূরা জ্বিনের মতো এ আয়াতগুলো থেকেও মনে হয়, জ্বিনেরা আকস্মিকভাবেই কোরআনের আয়াত শোনার সুযোগ পেয়েছিলো। এই আকস্মিকতা তাদেরকে অস্থির করে তুলেছিলো, তাদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো, তাদের চেতনায় ও স্নায়ুতে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিলো, তাদের সমগ্র সত্তায় প্রচন্ড আবেগের সৃষ্টি করেছিলো এবং সে আবেগে তাদের সত্তা কানায় কানায় বলে উপচে পড়েছিলো। এরপর সেই ভাবাবেগে মত্ত মন নিয়েই তারা তাদের জাতির কাছে চলে গেলো।

এখন তাদের আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ যোগ্য ছিলো না এবং তাদের মোটেই বিলম্ব সইছিলো না। তারা যে আবেগ উদ্বেলিত, তা অন্যদের মধ্যেও একই গতিতে প্রবাহিত না করা পর্যন্ত তারা শান্ত হতে পারছিলো না। আকস্মিকভাবে প্রথমবারের মতো কোনো প্রচন্ড অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রত্যেকেরই এমন অবস্থা হয়। নিজের আবেগ অনুভূতিকে অন্যের ভেতরে সংক্রামিত করার জন্যে সে অধীর হয়ে ওঠে।

'আমরা এক আশ্চর্য কোরআন শুনতে পেলাম।'

এ ছিলো কোরআন সম্পর্কে তাদের স্বতস্ফূর্ত প্রথম অনুভূতি। তাদের মনে হয়েছিলো, এ এক বিস্ময়কর কোরআন,যা সচরাচর দেখা যায় না ও শোনা যায় না। হৃদয়ে তা প্রচন্ড বিস্ময় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। খোলা মন, সচকিত অনুভূতি, সুস্থ ও অবিকৃত রুচি ও নির্মল ভাবাবেগ নিয়ে যে ব্যক্তিই কোরআন পড়ে বা শোনে, তার মনে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক।

কোরআনকে 'বিস্ময়কর' বলা হয়েছে তার প্রতি শ্রোতার স্বতস্ফূর্ত দুর্ণিবার আকর্ষণ, শ্রোতার ওপর কোরআনের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব এবং শ্রোতার মন ও আবেগ-অনুভূতিতে শিহরণ সৃষ্টিকারী শ্রুতিমধুর ও ছন্দময় শব্দের জন্যে। কোরআনের আয়াত শুনে জ্বিনের দলটি তার স্বাদে যেভাবে মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিলো, তাতেও প্রমাণিত হয় যে, কোরআন বাস্তবিক পক্ষেই বিস্ময়কর।

'সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়।'

এ হচ্ছে কোরআনের দ্বিতীয় বিশিষ্ট গুণ, যা জ্বিনের দলটি অনুভব করেছিলো। এ গুণটির বাস্তবতা তারা তাদের অন্তরের অন্তস্থল দিয়ে হৃদয়ংগম করেছিলো। 'রুশ্‌দ' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ দাঁড়ায়, কোরআন সত্য, ন্যায় ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়। কিন্তু 'রুশদ' শব্দটি শুধু সত্য ন্যায় ও সঠিক পথ পাওয়াকেই বুঝায় না, বরং আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে সত্য,

ন্যায় ও হেদায়াতের পথে স্থীতিশীলতা, পরিপক্কতা ও দৃঢ়তাকেও বুঝায়। ব্যক্তিগতভাবে যখন কেউ দ্বীনের জ্ঞান ও তার তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিষয়ে এতটা পারদর্শী হয় যে, তার ভেতরে আপনা-আপনি ও স্বতপ্রবৃত হয়ে ন্যায়পরায়ণ, কল্যাণকামী ও সত্যনিষ্ঠ হওয়ার যোগ্যতা ও প্রবণতা জন্মে, তখন সেই অবস্থাটাকেই 'রুশদ' বলা হয়।

এখানে প্রশ্ন হলো কোরআন কিভাবে 'রুশদ' বা হেদায়াত ও ন্যায়নিষ্ঠতার দিকে মানুষকে চালিত করে বা তার সন্ধান দেয়? এর জবাব এই যে, এ কাজটি সে মানুষের মনে ন্যায় ও অন্যায়ের ব্যাপারে তীব্র সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা জন্ম দেয় জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা, হেদায়াতের উৎসের সাথে সংযুক্ততা এবং আল্লাহর শরীয়তের প্রধান প্রধান আইন ও মূলনীতির সাথে তার স্বভাব চরিত্র ও মানসিকতার সমন্বয় গড়ে তোলে।

তাছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের জন্যে কোরআন যে নীতি, আদর্শ ও বিধান দেয় তার মাধ্যমেও সে এ কাজটি সম্পন্ন করে। কোরআনের দেয়া এই নীতি ও বিধান এতো উঁচু ও উৎকৃষ্ট মানের যে, এর অধীনে মানব জাতি নিজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে, নৈতিকতা, আচার ব্যবহারে ও লেনদেনে এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিলো। এতখানি উন্নতি, উৎকর্ষ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলো যে, সমগ্র মানবেতিহাসে কোনো সভ্যতা এবং কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে তা ততোটা সুখ সমৃদ্ধি ও উন্নতি কখনো অর্জন করতে পারেনি।

'তাই আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি।'

### জ্বিনদের ঈমান আনা

বস্তুত এটি হচ্ছে কোরআন শ্রবণের ফলে একটি বিকার মুক্ত, সুস্থ ও স্বাভাবিক বিবেক কর্তৃক তার দাওয়াতকে গ্রহণের শামিল। কোরআনের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা দিয়ে জ্বিনরা তাদের বিবেকের এই ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেছিলো। তারা কোরআনের স্বাভাবিক দাবী এবং তার অন্তর্নিহিত সত্যকে মেনে নিয়েছিলো।

ওহীর মাধ্যমে এই দাবী কোরআনের শ্রোতা মোশরেকদের সামনে পেশ করা হচ্ছিল, অথচ তারা ঈমান আনছিলো না। বরঞ্চ তারা কোরআনকে জ্বিনদের অবদান বলে আখ্যায়িত করছিলো। তারা রসূল (স.)-কে জ্যোতিষী, কবি অথবা যাদুকর আখ্যায়িত করতো। এই সব কটিই জ্বিনের প্রভাব থেকে উদ্ভুত। অথচ জ্বিনরা কোরআন শুনে এতো মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে গেলো যে, তারা ঈমানের ঘোষণা না দিয়ে স্থির থাকতে পারলো না, শুধু তাই নয়। তারা এ কথাও ঘোষণা করেছে যে,

'আমরা আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে কখনো শরীক করবো না।'

অর্থাৎ আমরা খালেছ ও নির্ভেজাল ঈমান এনেছি। এ ঈমান কোরআনের দাওয়াতের যথার্থ উপলব্ধির ফল। কোরআন যে তাওহীদের আহবান জানিয়েছে, সেই তাওহীদ ভিত্তিক ঈমানে। যেখানে শেরেকের লেশমাত্রও নেই।

'তিনি আমাদের অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিপালক। তিনি কোনো সন্তান বা স্ত্রী গ্রহণ করেননি।'

'জাদ্দ' শব্দটির অর্থ ভাগ্য, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাক্রম। এগুলো নিছক শব্দের রকমফের মাত্র। আয়াতে এ শব্দ দ্বারা মোটামুটি এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা এতো উচ্চ

মর্যাদাসম্পন্ন যে, তাঁর স্ত্রী বা সন্তান থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আরবরা মনে করতো যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। জ্বিন বংশোদ্ভুত স্ত্রীর গর্ভ থেকে আল্লাহ তায়ালা এই কন্যা সন্তান পেয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ) কিন্তু জ্বিনরা ঈমান এনে এই অলীক ও ভিত্তিহীন কুসংস্কার থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করলো এবং উক্ত ধারণার প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার দিলো।

যদি এ ধারণায় সত্যতার লেশমাত্রও থাকতো, তাহলে আল্লাহর শ্বশুর কুলের আত্মীয় হবার গৌরব তারা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ করতো। তার পরিবর্তে জ্বিনদের এই ঘোষণা মোশরেকদের অলীক ধ্যানধারণার ওপর একটি ভয়াবহ বোমার বিস্ফোরণ ঘটানোর সমতুল্য। যারা আল্লাহর সন্তান থাকার ধারণা বা তার সমপর্যায়ের কোনো ধারণা না কোনো উপায়ে লালন করে থাকে, তাদের সেই বাতিল ধারণার ওপর এ ঘোষণা এক প্রচন্ড মরণাঘাতস্বরূপ।

'আমাদের মধ্যকার মূর্খ ও বখাটে লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতো। আর আমরা ভাবতাম জ্বিন ও মানুষ কখনো আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করবে না।'

**অজ্ঞ ও মূর্খ জ্বিনদের শেরেকী আচরণ**

অজ্ঞ ও মূর্খ জ্বিনেরা আল্লাহর সাথে শেরেক করতো এবং তার স্ত্রী, সন্তান ও শরীক আছে বলে দাবী করতো। তাদের সেই আচরণ সম্পর্ক ঈমান আনয়নকারী জ্বিনরা এই মন্তব্য করে। কেননা কোরআন শ্রবণের পর তারা জানতে পারে যে, সেই দাবী ও ধারণা ভ্রান্ত। বরঞ্চ যারা এসব বলে তারা মূর্খ ও বোকা। কিন্তু এই মোমেন জ্বিনরা ইতিপূর্বে তাদের এইসব বখাটে মূর্খদেরকে সমর্থন করতো।

কেননা তারা তখন ভাবতো যে, কোনো জ্বিন বা মানুষ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করাকে তারা অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ধৃষ্টতা মনে করতো। অসভ্য জ্বিনরা যখন প্রচার করলো যে, আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান আছে, তখন তারা তাদের কথা বিশ্বাস করেছিলো। কেননা তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলতে পারে তা ভাবতে পারেনি। আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপের ব্যাপারটাকে এতো অবিশ্বাস্য ও ঘৃণ্য মনে করা জ্বিনদের এই দলটির একটি অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এ বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে ঈমান আনার যোগ্যতা সৃষ্টি করেছিলো। কেননা এ দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা অত্যন্ত বিশুদ্ধ, নির্মল, অবিকৃত ও সুস্থ-স্বাভাবিক বিবেকের অধিকারী ছিলো। নিছক সরলতা ও নিরীহ স্বভাবের কারণেই তারা বিপথগামী হয়েছিলো। কিন্তু কোরআনের বাণী শোনার পর তাদের ভেতরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এলো, তারা ভালো মন্দ বুঝতে ও বাছাই করতে শিখলো, তাদের মধ্যে সঠিক রুচি ও জ্ঞানের স্ফূরণ ঘটলো। তাই তারা ঘোষণা দিলো,

'আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি, যা সত্য ও সততার পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমাদের প্রভু অত্যন্ত উঁচু মর্যাদ সম্পন্ন। তিনি কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি।'

সত্য সম্পর্কে জ্বিনদের মধ্যে সৃষ্ট এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সেইসব বিভ্রান্ত শীর্ষস্থানীয় কোরায়শ নেতাদের মনেও সম্বিত ফিরিয়ে আনতে পারতো। তাদের হৃদয়ে সতর্কতা ও সচেতনতার সৃষ্টি করতে পারতো। মোহাম্মদ (স.) যা বলেন এবং কোরায়শ নেতারা যা বলে, তার মধ্যে কোনটি সঠিক, সে ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে পারতো। কোরায়শদের বড় বড় নেতারা যা বলে, তার ওপর স্থাপিত অন্ধ বিশ্বাসকে তা বিচলিত করে দিতে পারতো।

সূরা জ্বিনে এই সত্যটিকে এভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যও ছিলো তাই। তাই বলা যেতে পারে যে, সূরার এ অংশটি আসলে কোরআন ও বিদ্রোহী কোরায়শের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের একটি

স্তর বিশেষ এবং জাহেলিয়াতের সৃষ্টি করা ধ্যান-ধারণা ও অনাচারের পর্যায়ক্রমিক প্রতিকারের একটি ধাপ মাত্র। এ সব ধ্যান-ধারণায় আক্রান্তদের অনেকেই ছিলো নিরীহ কিন্তু বিভ্রান্ত অজ্ঞ ও মূর্খ নেতাদের অন্ধ অনুসারী হওয়ার কারণে তাদের অনেকেই অনুসৃত বিভ্রান্তি কুসংস্কার ও অলীক ধ্যান ধারণার শিকার ছিলো।

**জ্বিনদের কাছে আশ্রয় চাওয়া বাতুলতা মাত্র!**

'মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জ্বিনদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতো, কিন্তু তারা তাদের দুর্দশা আরো বাড়িয়ে দিতো।'

এ উক্তিটির মধ্য দিয়ে জ্বিনরা এমন একটি প্রথার দিকে ইংগিত দিয়েছে, যা জাহেলী যুগেও প্রচলিত ছিলো এবং আজও অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। সেই প্রথাটি হলো, পৃথিবীর ওপর ও মানুষের ওপর জ্বিনদের এক ধরনের আধিপত্য রয়েছে বলে ধারণা করা। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও তাদের আছে এবং পৃথিবীর স্থল ভাগ, সমুদ্র ও মহাশূন্যের অনেক জায়গায় তাদের কর্তৃত্ব চলে বলেও ধারণা করা হয়।

এ সব ধারণার দরুন লোকেরা কোনো জনমানবহীন প্রান্তরে বা অজানা স্থানে রাত হয়ে গেলে সেখানকার অদৃশ্য সরদারের কাছে তার অসভ্য ও উচ্ছৃংখল প্রজাদের কবল থেকে নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করতে বাধ্য হতো। তারপর তারা নিজ নিজ ধারণা ও বিশ্বাস মোতাবেক নিরাপদে রাত কাটাতে সক্ষম হতো।

আল্লাহ তায়ালা যাকে বিশেষ অনুগ্রহ বলে রক্ষা করেছেন ও নিরাপত্তা দিয়েছেন, তার কথা স্বতন্ত্র। নচেত প্রত্যেক আদম সন্তানের হৃদয়ের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। যে ব্যক্তি শয়তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে শয়তান তার কোনো উপকার করে না, সে বরং তার দুশমন। সে কেবল তাকে কষ্ট দেয় ও দুর্দশাগ্রস্ত করে। উপরোক্ত ভ্রান্ত জাহেলী প্রথাটির কথাই জ্বিনরা এ আয়াতে উল্লেখ করেছে। যে দুর্দশার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, তা দ্বারা সম্ভবত, গোমরাহী, মানসিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও হয়রানীকে বুঝানো হয়েছে। শয়তানের ঘনিষ্ঠতা অর্জনকারীরা এ সব বিপর্যয়ের শিকার হয়ে থাকে।

কেননা যিনি যথার্থই এ সব আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন তার আশ্রয় তারা চায় না। অথচ আদি পিতা আদম (আ.)-এর আমল থেকেই মানুষকে শয়তান থেকে এবং সব রকমের আপদ বিপদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সেই সময় থেকেই মানুষ ও ইবলিসের মধ্যে যে শক্রতার সৃষ্টি হয়েছে, তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

মানুষ যখন কোনো উপকারের আশায় কিংবা কোনো ক্ষতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো আশ্রয় চায়, তখন সে হয়রানী ও উদ্বেগ ছাড়া আর কিছুই পায় না। কোনো শান্তি ও স্থীতি তার কপালে জোটে না। এটাই তার চরম দুর্দশা ও বিপর্যয়।

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সব কিছুই পরিবর্তনশীল ও স্থীতিহীন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যার সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা হবে তার কাছ থেকে স্থীতিহীনতা, অস্থিরতা ও নিত্য পরিবর্তনশীলতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। ভয় ও আশার দোলায় সর্বদা দোদুল্যমান থাকতে হবে। যার ওপর কেউ নিজের আশা-আকাংখাকে নির্ভরশীল করবে, সে সরে যাওয়ার সাথে সাথেই তার আশা-ভরসাস্থলও পাল্টে যাবে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এর ব্যতিক্রম। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তার ভেতরে কখনো পরিবর্তন আসে না। যে ব্যক্তি তার দিকে মুখ ফেরায় এবং তার ওপর নির্ভরশীল হয় সে অপরিবর্তনীয়, স্থীতিশীল ও অচল অটল কেন্দ্রের সাথে নিজেকে যুক্ত করে।

'তোমরা যেমন ভেবেছিলে যে আল্লাহ তায়ালা কোনো নবী কখনো পাঠাবেন না, তারাও তেমনি ভাবে।'

অর্থাৎ এই জ্বিনের দলটি নিজেদের লোকদের সাথে আলোচনা প্রসংগে বলে যে, মানুষের মধ্যে যারা জ্বিনদের আশ্রয় প্রার্থনা করতো তারা তোমাদের মতোই মনে করতো যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো রসূল পাঠাবেন না। কিন্তু এই তো তিনি রসূল পাঠিয়েছেন। তার সাথে এই সত্য ও ন্যায়ের দিকনির্দেশনা সম্বলিত কোরআনও পাঠিয়েছেন। কিংবা এর মর্ম এই যে, তারাও তোমাদের মতোই ভাবতো যে, আখেরাত এবং হিসাব নিকাশ বলতে কিছুই নেই। তাই আখেরাতের জন্যে তারা কোনো কাজও করেনি। আখেরাতে যা যা হবে বলে রসূল (স.) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাকেও তারা মিথ্যা মনে করেছিলো। কেননা ইতপূর্বে তারা এ সব কথায় বিশ্বাস করতো না।

উপরোক্ত দুটো ধারণার যেটিই গৃহীত হোক না কেন, বাস্তবের সাথে তার কোনোই মিল নেই। এ ধারণা নিরেট অজ্ঞতাপ্রসূত। মানুষকে সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহর যে মহৎ ও সুগভীর উদ্দেশ্য রয়েছে, তা উপলব্ধি না করার কারণেই এ ধারণার জন্ম হয়েছে। তিনি মানুষকে ভালো মন্দ এবং সততা ও অসততা উভয়ের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

এই সূরা থেকে আমরা জানতে পারি যে, জিনদেরও এরূপ দ্বৈত যোগ্যতা রয়েছে। তবে ইবলিস এর ব্যতিক্রম। সে শুধু অন্যায় ও অসৎ কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করেছে এবং আল্লাহর প্রত্যক্ষ নাফরমানীর কারণে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে নিজেকে নিরেট খারাপ কাজের যোগ্য করে তুলেছে। অন্যদের মতো ভালো ও মন্দ কাজের দ্বৈত যোগ্যতা তার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই।

এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহের বশে সেই সব মানুষকে নবী দ্বারা সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। নবীরা তাদের মনে ভালো কাজের যোগ্যতাকে জোরদার করবেন এবং তাদের ভেতরে জন্মগতভাবে যে সৎকাজের প্রবণতা ও যোগ্যতা নিহিত রয়েছে তাকে সংরক্ষণ করবেন। সুতরাং তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালা কখনো নবী পাঠাবেন না এমন কথা বিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই।

এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে কেবল তখনই, যখন 'ব'াস' শব্দের অর্থ হবে 'নবী প্রেরণ।' কিন্তু যদি এর অর্থ ধরা হয় আখেরাতের পুনরুজ্জীবন বা পুনরুত্থান, তাহলে সেটিও অনিবার্য ও অবধারিত মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির কাছ থেকে তার পূর্ণ হিসাব নিকাশ ইহলৌকিক জীবনে গ্রহণ করেন না। এর পেছনে অবশ্য আল্লাহর কি মহৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে, তা তিনিই ভালো জানেন। সৃষ্টির সমন্বয় ও শৃংখলা বিধানের স্বার্থেই হয়তো তিনি এরূপ ব্যবস্থা করেছেন, যা তিনিই জানেন, আমরা জানি না।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সৃষ্টির কাছ থেকে পরিপূর্ণ হিসাব নেয়ার জন্যে আখেরাতে তাদের পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে প্রত্যেক সৃষ্টি তার পার্থিব জীবনের কাজকর্মের উপযোগী ফল পাবে। সুতরাং এই অর্থের দিক থেকে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, আল্লাহ তায়ালা কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না এরূপ ধারণা করার অবকাশ নেই। কেননা এরূপ ধারণা আল্লাহর সর্বোচ্চ বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতায় বিশ্বাস স্থাপনের পরিপন্থী।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জ্বিনের এই দলটি তাদের স্বজাতির ভ্রান্ত ধারণা সংশোধনের চেষ্টা চালিয়েছিলো। আর কোরআন তাদের উক্তি উদ্ধৃত করে এ দ্বারা মোশরেকদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করতে চেয়েছে।

**জ্বিনদের উর্দ্ধজগতের খবর শোনা প্রসংগ**

এরপর জ্বিনরা বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন স্থানে রসূল (স.)-এর রেসালাতের যে সব লক্ষণ দেখেছে, তার বিবরণ দেয়া অব্যাহত রেখেছে। কেননা তারা এই রেসালাত সংক্রান্ত আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় এমন যে কোনো চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে চায়। তারা কোনো অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী যেমন করতে চায় না, তেমনি ওহীর কার্যক্রমে তাদের কোনো হাত বা ক্ষমতা থাকার দাবী করা থেকেও বিরত থাকতে চায়।

'আমরা আকাশকে স্পর্শ করেছি.........।'

এখানে পরপর তিনটি আয়াতে কোরআন জ্বিনদের উক্তি থেকে যে তথ্যগুলো তুলে ধরেছে তা থেকে মনে হয় যে, জ্বিনেরা সম্ভবত হযরত ঈসা (আ.) ও মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের মধ্যবর্তী সময়ে উর্ধজগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতো। এই যোগাযোগের মাধ্যমে তারা ফেরেশতাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বসমূহ নিয়ে তাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা চলতো তা আড়ি পেতে শুনতো।

পৃথিবীতে অবস্থানরত আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়ে ফেরেশতারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করতেন। জ্বিনরা সেগুলো আড়ি পেতে শুনে পৃথিবীতে তাদের যেসব অভিভাবক রয়েছে, সেসব জ্যোতিষী ও ভবিষ্যৎ বক্তাদেরকে তা জানাতো। আসলে তারা প্রকৃত সত্যের অতি সামান্য অংশই পেতো এবং তার সাথে বিপুল পরিমাণে মিথ্যা মিশিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচার করতো।

উল্লিখিত দুই রেসালাতের মধ্যবর্তী যুগে যখন পৃথিবীতে কোনো নবী রসূল ছিলেন না-এই জঘন্য কারসাজি তারা বিস্তার করে রেখেছিলো। কিভাবে এই আড়ি পাতা ও তথ্য পাচারের অপচেষ্টা চলতো, কোরআন সে বিষয়ে আমাদেরকে কোনো বিস্তারিত তথ্য দেয়নি এবং আমাদের তার প্রয়োজনও নেই। এর মোদ্দাকথা এটাই এবং সার্বিক তথ্য এতোটুকুই। আর এই জ্বিন দলটি জানাচ্ছে যে, সেই আড়ি পেতে শোনার কাজটি এখন আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যখনই তারা এই চেষ্টা করতে চেয়েছে, অর্থাৎ তাদের ভাষায় 'আকাশকে স্পর্শ করতে' গেছে, দেখেছে যে, আকাশের দিকে যাওয়ার পথ সম্পূর্ণরূপে প্রহরীদের দখলে। যে কেউ আকাশের কাছে কাছে যায়, অমনি জ্বলন্ত উল্কার তীর মারা শুরু হয় এবং তা কাছে ঘেঁষা জ্বিনকে হত্যা করে। তাই এখন আর জ্বিনদের পক্ষে মানুষের জন্যে কি ভাগ্য নির্ধারিত আছে, তা জানার কোনো উপায় নেই। অদৃশ্যের কোনো কিছুই তাদের জানা সম্ভব নয়।

'আমরা জানি না পৃথিবীবাসীর জন্যে কোনো অকল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, না তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের জন্যে কোনো শুভ কামনা করা হয়েছে।'

বস্তুত এই অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ তায়ালার সম্পূর্ণ একচেটিয়া। তিনি ছাড়া আর কেউই তা জানেন না। আল্লাহ তার বান্দাদের জন্যে কি ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন তা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। তিনি কি তাদের জন্যে অকল্যাণ নির্ধারণ করেছেন এবং তাদেরকে তাদের গোমরাহীতে চিরদিনের জন্যে রেখে দিতে চেয়েছেন, না তাদের জন্যে হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য নির্ধারণ

করেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এ আয়াতে অকল্যাণের মোকাবেলায় রাখা হয়েছে হেদায়াত তথা ন্যায় ও সত্যের পথ প্রাপ্তিকে, কেননা এটিই প্রকৃত কল্যাণ, এর পরিণামও শুভ।

যেহেতু জ্বিনরাই ছিলো জ্যোতিষীদের স্বকথিত অদৃশ্য জ্ঞানের উৎস, তাই জ্বিনরা যখন স্বীকার করলো যে তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তখন তাদের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী এবং কোনো দাবীর আর কোনো ভিত্তি রইলো না। সবই বাতিল ও মিথ্যা বলে পরিগণিত হলো, এরপর মূলত জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোনো অস্তিত্বই থাকা উচিত নয়। অদৃশ্য জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর আয়ত্তাধীন। এ সম্পর্কে আর কারো কিছু জানার দাবী করা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোরআন এ ধরনের যাবতীয় আন্দায অনুমান ভিত্তিক ধ্যান ধারণা ও কথাবার্তা থেকে মানুষের বিবেককে মুক্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। মানুষকে যাবতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে সত্য ও ন্যায় পথের সন্ধান দিয়েছে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আকাশের কোথায় কোথায় পাহারা বসানো হয়েছে, কারা পাহারা দিচ্ছে, শয়তান ও জ্বিনদেরকে কিভাবে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড দিয়ে আঘাত করে বিতাড়িত করা হচ্ছে, তাহলে এসব প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারবো না। কেননা কোরআন ও হাদীস এ ব্যাপারে নীরব। অথচ কোরআন ও হাদীস ছাড়া এই অদৃশ্য তথ্য আর কোনো সূত্র থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি এ তথ্যটুকু জানাতে আমাদের কোনো উপকার হবে জানতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই তা আমাদেরকে জানাতেন। তা যখন তিনি জানাননি, তখন এই পথে আমাদের সকল চেষ্টা বৃথা যেতে বাধ্য। সে চেষ্টা আমাদের জ্ঞানও বাড়াবে না, আমাদের জীবনেরও কোনো কল্যাণ বা উপকার সাধন করবে না।

জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষেপের ব্যাপারেও আপত্তি বা তর্ক তোলার অবকাশ নেই। প্রাকৃতিক নিয়মের এ প্রক্রিয়া ওহী আগমনের আগেও চলতো, পরেও চলবে। এর পেছনে কি কি কার্যকরণ রয়েছে, তা বিশ্লেষণের চেষ্টায় মহাশূন্য বিজ্ঞানীরা এখনো ব্যস্ত রয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন, যার ভেতরে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উভয় রকমের তথ্যই আছে। এ সব বৈজ্ঞানিক মতবাদকে যদি নির্ভুলও ধরে নেয়া যায়, তবুও এ বিষয়টি আমাদের আলোচনার আওতায় আসে না। এসব উল্কাপিন্ড আল্লাহর ইচ্ছায় এমনভাবেও পড়তে পারে যে, তাতে শয়তানরা বিতাড়িত হয়, আবার এমনভাবেও পড়তে পারে যাতে তাদের কোনো ক্ষতি হয় না।

যারা মনে করে যে, এ সকল বর্ণনা নিছক রূপক ও প্রতীকী এবং আল্লাহর ওহীকে সব প্রকারের বাতিলের স্পর্শ মুক্ত রাখা হয়েছিলো এটা বুঝানোর জন্যেই এসব বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এখানে এর বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়-তাদের এ ধরনের অভিমতের কারণ এই যে, তারা কোরআনের শরনাপন্ন হয় নিজেদের পূর্ব নির্ধারিত মতামত নিয়ে, যেসব মতামত তারা কোরআন ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে গ্রহণ করেছে। তারপর সেই সব পূর্ব নির্ধারিত মতামতের আলোকে তারা কোরআনের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। এজন্যে তারা ফেরেশতাকে নিছক কল্যাণের প্রতীক এবং শয়তানকে অকল্যাণের প্রতীক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করে আর উল্কা নিক্ষেপ করে শয়তান বিতাড়নের অর্থ দ্বারা ওহীর হেফাযত বুঝে। কেননা কোরআনের মুখোমুখি হওয়ার আগে তাদের মন-মগযে শয়তান, জ্বিন , ফেরেশতা ইত্যাদি সম্পর্কে এরূপ কিছু ধারণাই বদ্ধমূল ছিলো যে, এ সবের আসলে কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব নেই এবং এগুলোর এ ধরনের কোনো অনুভবযোগ্য তৎপরতা বা প্রভাবও নেই।

তারা এসব ধ্যান ধারণা ও মতামত কোথায় পেলো এবং এর আলোকে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করার স্পর্ধাই বা তাদের কেমন করে হয়, উৎসুক মনের তা সত্যিই জানতে ইচ্ছা করে।

**কোরআন বুঝার সর্বোত্তম পন্থা**

মানুষের জন্যে কোরআন, তার তাফসীর এবং ইসলামী আকীদা, আদর্শ ও বিধানকে বুঝবার সর্বোত্তম পন্থা এই যে, মানুষকে তার মন-মগযে চেপে থাকা আগের সকল ধ্যান-ধারণা ঝেড়ে মুছে ফেলতে হবে। তাকে কোরআনের মুখোমুখি হতে হবে পূর্ববর্তী সকল ধ্যান ধারণা, চিন্তাধারা, মতবাদ, মতাদর্শ ও আবেগ তাড়িত কিংবা বুদ্ধিনির্ভর মতামত ও সিদ্ধান্তকে বাদ দিয়ে তথা সম্পূর্ণভাবে তার প্রভাব মুক্ত হয়ে। কোরআন বিশ্বজগত সংক্রান্ত যে তথ্যাবলী পেশ করেছে অবিকল তারই অনুরূপ করে তাকে তার যাবতীয় মতামত ও সিদ্ধান্তকে গড়ে নিতে হবে।

তাই কোরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কোরআন ও হাদীসকে বিচার করা যাবে না। আবার কোরআন যে সকল জিনিসের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে বা যাকে বাতিল ঘোষণা করেছে, তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যাবে না এবং তাকে ন্যায়সংগত মনে করা যাবে না। বিবেক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করা যাবে শুধু সেই বিষয়ে, যার পক্ষে বা বিপক্ষে কোরআন কোনো বক্তব্য দেয়নি।

স্বভাবতই আমাদের এ বক্তব্য শুধু তাদের জন্যে, যারা কোরআনে বিশ্বাসী হয়েও কোরআনের বক্তব্যকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ও ইনিয়ে বিনিয়ে এমনভাবে ব্যাখ্যা করে, যাতে কোরআন তাদের মন-মগযে আগে থেকে বিরাজিত স্থিরীকৃত মতামত ও ধ্যান ধারণার অনুকূল হয়ে যায়। সেই ধ্যান ধারণায় বিশ্বজাহান ও তার বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য যেমন হওয়া উচিত বলে তারা মনে করে, কোরআনকে তারা তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চায়।(১)

কিন্তু যারা কোরআনে বিশ্বাসী নয় এবং কোরআনের উপস্থাপিত তথ্য ও ধারণা বিশ্বাসকে এমনিই অস্বীকার করে তাদের ক্ষেত্রে একথা প্রজোয্য নয়। তাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, এসব তত্ত্ব ও তথ্য নাকি বিজ্ঞানের ধরা ছোঁয়ার আওতার মধ্যেই রয়েছে এবং যাকে সে তার পরীক্ষাগারে ব্যবহারও করে চলেছে, সে সব বস্তু ও পদার্থের গুপ্ত রহস্য সে জানে না। কিন্তু তাই বলে সে সব বস্তু ও পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই। উপরন্তু আজকাল অধিকাংশ বিজ্ঞানী ধার্মিক লোকদের মতোই অজানা বিষয়গুলোকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। অন্ততপক্ষে 'যা জানিনা তা মানিনা' এই নীতি তারা এখন আর অনুসরণ করছে না।

কারণ তারা বিজ্ঞানের চিরাচরিত নিয়মেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের চারপাশে এমন সব বস্তুর সমাবেশ দেখতে পায়, যা তাদের একেবারেই অজানা। অথচ ইতিপূর্বে তাদের ধারণা ছিলো যে ওসব জিনিস সম্পর্কে তাদের সব কিছুই জানা হয়ে গেছে। এ কারণে তারা অত্যন্ত ভদ্রজনোচিত ভাবে 'বিজ্ঞান সম্মত' বিনয় প্রকাশে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের ভেতরে কোনো ব্যাপারেই জোর গলায় কিছু দাবী করার প্রবণতা যেমন নেই, তেমনি অজানা বিষয়ে মন্তব্য করার ধৃষ্টতাও নেই। অথচ বিজ্ঞানের পান্ডিত্য এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা গবেষণার দাবীদাররা তাদের অজানা তত্ত্ব ও ধর্মীয় বিষয়কে অস্বীকার করার ঔদ্ধত্য দেখায়।

---

(১) আমি নিজেও এ পর্যায়ে পুরোপুরি দোষমুক্ত নই। আমার একাধিক রচনায় ইতিপূর্বে আমি নিজেও এ ধরনের পদস্খলনের শিকার হয়েছি। সে সব বই-এর পরবর্তী সংস্করণে আমি এসব ভুল শুধরে নেয়ার আশা রাখি। এখানে আমি যে বক্তব্য পেশ করছি, তা আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে সত্য হেদায়াতের উৎস থেকে উৎসারিত। (গ্রন্থকার)

আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক জগত অগণিত অজানা রহস্যে পরিপূর্ণ। এখানে রয়েছে অসংখ্য আত্মা ও শক্তির সমাবেশ। অন্যান্য সূরার মতো কোরআনের এ সূরাটিও আমাদের সামনে এই বিশাল প্রাকৃতিক জগতের বহু অজানা রহস্য উন্মোচন ও তথ্য উদঘাটন করে। সেসব তথ্য আমাদেরকে বিশ্বজগত, তার অভ্যন্তরে বিরাজিত জীবন, আত্মা ও শক্তিসমূহ সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এসব জীবন আত্মা ও শক্তি ব্যবহারিক দিক থেকে আমাদের জীবন ও সত্তার সহায়ক, সহযোগী ও পরিপূরক। প্রকৃতি সম্পর্কে কোরআনের দেয়া এসব তথ্য ও ধারণা-বিশ্বাস একজন মুসলমানকে আরেক জন অমুসলিম থেকে পৃথক করে।

## আন্দাজ অনুমান নয় কোরআন ও সুন্নাহই জ্ঞানের উৎস

কোরআন জানায় যে, আন্দায অনুমান ও অলীক ধ্যান-ধারণায় অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন এবং বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে যে কোনো অজানা জিনিসকে অবিশ্বাস করার ধৃষ্টতা–এই দুই চরমপন্থার ঠিক মাঝখানে মুসলমানের অবস্থান। মুসলমানের সকল জ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের উৎস কোরআন ও সুন্নাহ। এই দুই দিগদর্শনের আলোকেই তাকে সকল চিন্তা, বক্তব্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিচার করতে হবে।

এ কথা সত্য যে, অজানা রহস্যের অনুসন্ধানের ব্যাপারে মানবীয় বিবেক বুদ্ধির একটা ভূমিকা ও বিচরণ ক্ষেত্র রয়েছে। ইসলাম মানুষকে এই বিচরণ ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে উৎসাহিতও করে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাইরে এতো বিশাল ও বিস্তীর্ণ জগত রয়েছে, যা বিচরণ ও পরিভ্রমণ করা তার বিবেক বুদ্ধির সাধ্যাতীত। সেটা তার প্রয়োজন নেই বলেই তাকে তার সাধ্যাতীত রাখা হয়েছে।

পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে যে কাজের প্রয়োজন নেই, সে কাজের তাকে ক্ষমতাও দেয়া হয়নি, তাকে এসব কিছুর ব্যাপারে সাহায্যও করা হবে না। কেননা এ ব্যাপারে সাহায্য করার কোনো যুক্তিই নেই। এটা তার দায়িত্বের আওতাভুক্তও নয়। মানুষ তার আশপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশী এবং জীবজগত ও জড়জগতের বিচারে কোনো পর্যায়ে আছে, তা জানার জন্যে যতোটুকু অদৃশ্য জ্ঞান অপরিহার্য, তা তাকে অবহিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন।

জ্ঞান অর্জন করা তার নিজের শক্তি সামর্থের বাইরে। এই জ্ঞান যে পরিমাণে দিলে মানুষের শক্তি সামর্থের আওতায় থাকবে, সেই পরিমাণেই তাকে দিয়ে থাকেন। সেই অত্যাবশ্যকীয় পরিমাণ অদৃশ্য জ্ঞান হচ্ছে ফেরেশতা, শয়তান, আত্মা এবং জীবনের উৎস ও পরিণতি সংক্রান্ত জ্ঞান।

যারা আল্লাহর হেদায়াত দ্বারা চালিত হন, তারা অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ঠিক ততোটুকু জেনেই ক্ষান্ত থাকেন, যতোটুকু আল্লাহ তাঁর কেতাবের মাধ্যমে ও রসূলের মুখ দিয়ে জানিয়েছেন। এই জ্ঞান দ্বারা তারা স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব তার সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য এবং পৃথিবীতে বিরাজমান বিভিন্ন জীবজগত ও জড়জগতের মোকাবেলায় মানুষের যথার্থ স্থান ও মর্যাদা নির্ণয়ে সক্ষম হন। এই জ্ঞান দ্বারা তারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধনে ও আবিস্কার উদ্ভাবনে সাধ্যমত প্রয়োগ করেন, চাই তা পৃথিবীর চৌহদ্দীর ভেতরেই হোক অথবা পৃথিবীর চারপাশের মহাশূন্যে বিরাজমান বিভিন্ন বস্তু ও জ্যোতিস্কে হোক। সর্বোপরি এই গুণকে তারা পৃথিবীতে নানারকম উন্নয়ন, উৎপাদক ও গঠনমূলক কর্মকান্ডে এবং আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনে প্রয়োগ করেন। আর এ সব কিছুই তারা আল্লাহর নির্দেশে ও আল্লাহরই অনুগত বান্দা হিসাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকেন এবং এভাবেই তারা এক সময় সমগ্র সৃষ্টিজগতের শীর্ষে উন্নীত হন।

## গোমরাহী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর হেদায়াত দ্বারা চালিত হয় না, তারা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, একটি শ্রেণী তার সীমিত বিবেক বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর সীমাহীন সত্তা সম্পর্কে এবং অদৃশ্য তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে আল্লাহর ওহীর জ্ঞান বহির্ভূত পন্থায় জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে কিছুসংখ্যক দার্শনিক রয়েছেন, যারা প্রাকৃতিক জগতের ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তু ও শক্তির ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন! তারা আকাশচুম্বী পর্বত শৃংগে আরোহনরত শিশুর মতো অনবরত পদস্খলনেরই শিকার হয়েছেন। সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করে তারা প্রাথমিক সাফল্যও লাভ করতে পারেনি। বড় বড় দিকপাল দার্শনিক হয়েও তারা এমন হাস্যোদ্দীপক মতবাদ পেশ করেছেন যে, তা ভাবতেও লজ্জা লাগে।

জগত ও জীবন সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ও চিন্তাধারাকে যখন কোরআনের দেয়া সুস্পষ্ট, সহজ সরল ও নির্মল নিখুঁত ধারণার সাথে তুলনা করা হয়, তখন বাস্তবিকই তাকে হাস্যকর মনে হয়। বিশেষত, যে বিশাল বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে তারা সেসব মতবাদের সাহায্য নিয়েছেন ও তা উদ্ভাবন করেছেন, সেই মহাবিশ্বের বিশালতার সামনে সেই মতবাদগুলোর সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও অসংগতি দেখে একজন সাধারণ পাঠকেরও হাসি পায়। আমি এই দার্শনিকদেরকে ব্যতিক্রমী মনে করছি না। প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা ও ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে যখন তুলনা করা হয়, তখন এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

অপর শ্রেণীটি জ্ঞান সাধনার এই পথটির সাফল্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে নিজেকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে এবং নানা অজানা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেননা তারা বুঝতে পেরেছে যে, বিজ্ঞানের হাতে অজানা বিষয়কে জানার কোনো উপায় নেই। তারা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর পথনির্দেশনা থেকে কোনো সাহায্য নেবে না বলে স্থির করেছে। কেননা তারা জানে যে, বিজ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীটি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করেছিলো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তারা তাদের বৈজ্ঞানিক একগুয়েমি থেকে মুক্ত হয়ে এরূপ মতবাদও প্রচার করতে শুরু করে যে, পদার্থ অদৃশ্য হয়ে এমন এক আলোক রশ্মীতে পরিণত হয় 'যার নিগুঢ় পরিচয় অজ্ঞাত' এবং যার নিয়মবিধিও প্রায় অজ্ঞাত থেকে যায়। চূড়ান্ত বিচারে ইসলামই একমাত্র সুনিশ্চিত ও সংশয়মুক্ত আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অজ্ঞাত বিষয় থেকে সে মানুষকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পরিমাণে জ্ঞান দান করে এবং নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান চর্চায় বিবেক বুদ্ধির অপচয় করার পরিবর্তে তাকে পৃথিবীতে খেলাফাতের দায়িত্ব পালনের কাজে ব্যবহারের জন্যে সংরক্ষণ করে। সে মানুষের বিবেককে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করে এবং জানা ও অজানা উভয় ক্ষেত্রেই তা সবচেয়ে মজবুত নীতি অনুসরণ করে।

## জ্বিনদের আকিদা বিশ্বাস

পরবর্তী আয়াত এগুচ্ছে জ্বিন দলটি আল্লাহর বিধান সম্পর্কে তাদের নীতি ও অবস্থান বিশ্লেষণ করেছে। এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের মতোই তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে হেদায়াত ও গোমরাহী বা সততা ও অসততা উভয়ের যোগ্যতা বিদ্যমান। তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের আকীদা বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে এবং হেদায়াত গ্রহণকারী ও বিপথগামী উভয়ের পরিণতি ব্যাখ্যা করেছে!

'আমাদের মধ্যে সৎ লোকও আছে অসৎ লোকও আছে।....... গোমরাহ লোকেরা হবে জাহান্নামের জ্বালানী।'

একমাত্র ইবলীস ও তার সহযোগী, যারা অসৎ কর্ম ও পাপাচারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো, তারা ছাড়া সমগ্র জ্বিন জাতিই যে মানুষের মতো সৎ ও অসৎ এবং মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ই হতে পারে, সে কথাই এই আয়াত কয়টিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ বিবরণ জ্বিনদের সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধনের একান্ত সহায়ক। আমাদের ভেতরে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত মনে করে জ্বিনরা শুধু দুষ্কর্মেই লিপ্ত থাকে এবং একমাত্র মানুষই সততা ও অসততা উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রকৃতি, তার বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণী সম্পর্কে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত মতামত থেকেই এই ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। কোরআন আগমনের পর এই ধারণাকে কোরআনের বিশুদ্ধ চিন্তাধারার আলোকে পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্গঠন করা আমদের অবশ্য কর্তব্য।

'আমাদের মধ্যে সৎ লোকও আছে, অসৎ লোকও আছে'

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জ্বিনরা তাদের একটা সাধারণ বর্ণনা পেশ করেছে।

'আমরা বিভিন্ন পথের অনুসারী ছিলাম।'

অর্থাৎ আমাদের ভেতরে বহু দল, শ্রেণী ও ফের্কা ছিলো এবং প্রত্যেক দল-উপদলের রীতিনীতি ও কর্মপন্থা অন্যদল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

**জ্বিনদের নানামুখী অক্ষমতা**

পরবর্তী আয়াতে জ্বিনেরা ঈমান আনার পর তাদের পরিবর্তিত চিন্তাধারার বর্ণনা দিয়েছে যে,

'আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহকে আমরা কখনো পর্যুদস্ত করতে পারবো না এবং তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে আমরা তাঁকে অসহায়ও করে দিতে পারবো না।'

অর্থাৎ তারা স্বীকার করছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত ও অজেয়। আর তারা আল্লাহর আধিপত্যের বাইরে পালিয়ে যেতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে অবস্থান করেও আল্লাহকে দুর্বল ও অক্ষম করতে পারে না, পৃথিবী থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েও নয়। বিশ্ব প্রভুর সামনে তার বান্দা ও সৃষ্টি জ্বিনের এই অক্ষমতা এবং আল্লাহর সর্বাত্মক আধিপত্য ও পরাক্রমের এই অনুভূতিই এ আয়াতটির সারকথা।

মজার ব্যাপার এই যে, এহেন অক্ষম ও হীনবল জ্বিনের কাছে এক শ্রেণীর মানুষরা নিরাপত্তা চাইতো ও নিজেদের অভাব ও দারিদ্র থেকে মুক্তি চাইতো। আর এদের সাথেই কিনা মোশরেকরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর বৈবাহিক সম্পর্ক কল্পনা করতো! অথচ জ্বিনরা নিজেদেরকে অক্ষম ও আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলে জানে ও স্বীকার করে। এদ্বারা তারা শুধু স্বগোত্রীয় জ্বিনদের নয় বরং মানুষের ভেতরে যারা মোশরেক ও কাফের তাদেরও আকিদা বিশ্বাস শুধরাতে সাহায্য করে।

পরবর্তী আয়াতে জ্বিনরা হেদায়াতের আহ্বান শোনার পর তাদের তা মেনে নেয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে,

'আমরা যখন হেদায়াতের বাণী শুনলাম তখন তার প্রতি ঈমান আনলাম।'

বস্তুত কোরআন শুনার পর প্রত্যেক মানুষেরই তার ওপর ঈমান আনা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। জ্বিনরা এখানে তাদের ভাষায় কোরআনকে 'হুদা' তথা পথনির্দেশনা–অন্যকথায় হেদায়াতের বাণী বলেছে। কোরআনের প্রকৃত পরিচয় এটাই। এটা কোরআনের আহবানের ফলও।

এরপর তারা আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা ও এ বিশ্বাসের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে,

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তার কোনো ক্ষতি ও দুর্দশার আশংকা নেই।'

আল্লাহর ন্যায়বিচার, তার সীমাহীন শক্তি ও প্রতাপ এবং ঈমানের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে ব্যক্তি নিশ্চিত, তার এরূপ আস্থা হওয়াই স্বাভাবিক। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারক, তাই তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীর এ অধিকার তিনি নষ্ট করবেন না এবং তার ওপর তিনি তার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝাও চাপাবেন না। আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, তাই অচিরেই তিনি তার মোমেন বান্দাকে সকল রকমের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন এবং সাধ্যাতীত দায়িত্বের বোঝা থেকেও তিনি তাদের রক্ষা করবেন। আর মোমেন যখন আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ও প্রহরায় আছে, তখন কে তাকে ঠকাবে? কে তার ক্ষতি সাধন করবে এবং কে তার ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে যুলুম করবে?

এ কথা সত্য যে, মোমেনকে কখনো কখনো দুনিয়ার কোনো কোনো স্বার্থ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু এটা আসলে তার কোনো ক্ষতি নয়। কেননা যে জিনিস থেকে সে বঞ্চিত হয় তার এমন বদলা সে পায় যে সেই বঞ্চনা আর তার বঞ্চনা থাকে না। মোমেন কখনো কখনো দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসিবতেও ভোগে সত্য, কিন্তু এ বিপদ শেষ পর্যন্ত তার বিপদ-মুসিবত বা দুঃখ কষ্ট থাকে না।

কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দান করেন যে, তা দ্বারা সে আরো উপকৃত হয় ও বৃহত্তর মর্যাদা লাভ করে। তাছাড়া আল্লাহর সাথে তার গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার কষ্টকে সহজ করে দেয় এবং সেই মুসিবতকে তার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের উৎসে পরিণত করে।

বস্তুত মোমেন ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদ মসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে মানসিক নিরাপত্তা লাভ করে।

'তার কোনো ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদ মসিবতের আশংকা থাকে না।'

এই নিরাপত্তাবোধ তাকে পরম মানসিক শান্তি ও স্বস্তি এনে দেয় এবং তা স্বাভাবিক শান্ত পরিস্থিতি যতোক্ষণ বিরাজ করে ততোক্ষণ অব্যাহত থাকে। সে কখনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবন যাপন করে না। তাই যখন বিপদাপদ আসে তখন অস্থির ও বেসামাল হয়ে যায় না, ভয় পায় না এবং হতাশাগ্রস্ত হয় না। বিপদ মসিবতকে সে পরীক্ষা মনে করে, যাতে ধৈর্য ধারণ করলে পুরস্কার পাওয়া যায়। আবার আল্লাহর কাছে বিপদ থেকে মুক্তি চাইলে তাতেও পুরস্কার পাওয়া যায়। এই দুই অবস্থার কোনোটিতেই সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং নিজেকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত মনে করে না। বস্তুত মোমেন জ্বিনরা অত্যন্ত সত্য কথাই বলেছে।

### মানুষদের মতো তারাও ভালো মন্দে মেশানো

'অতপর জ্বিনের মধ্যে মুসলমানও আছে, যালেমও আছে। যারা মুসলমান হয়েছে, তারা সুপথ খুঁজে নিয়েছে। আর যারা যালেম তারা জাহান্নামের জ্বালানী হবে।'

'কাসেতুন' শব্দের অর্থ যারা যুলুম নিপীড়নকারী এবং ইনসাফ ও সততার পথ থেকে যারা বিচ্যুত। ঈমান আনয়নকারী জ্বিন দলটি এখানে যালেম ও অত্যাচারী জ্বিনদেরকে মুসলিম জ্বিনদের প্রতিপক্ষ হিসাবে উল্লেখ করেছে। এ বক্তব্য এই মর্মে সূক্ষ্ম ইংগিত বহন করছে যে, মুসলমান ন্যায়বিচারক ও সংস্কার প্রয়াসী হয়ে থাকে আর অত্যাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা হয় মুসলমানের বিপরীত পক্ষের লোক।

'তাহাররাউ' অর্থ 'খুঁজে পেয়েছে।' এ শব্দটির প্রয়োগ থেকে এই মর্মে ইংগিত পাওয়া যায় যে, ইসলামের সন্ধান লাভের অর্থই হচ্ছে সততা ও ন্যায়ের পথ অন্বেষণে নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রয়োগ করা। গোমরাহীর পথ হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। ওটা খুঁজে পেতে তেমন নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির

প্রয়োজন হয় না। কেননা গোমরাহী সহজলভ্য। বস্তুত, ইসলাম গ্রহণের অর্থই হলো জীবন যাপনের বিশুদ্ধ ও নির্ভুল পথ অনুসন্ধান করা এবং সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার পর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা। চোখ কান বুজে, না বুঝে, না শুনে কোনো কিছু গ্রহণ করা নয়। জ্বিন দলটি বুঝাতে চেয়েছে যে, যারা স্বেচ্ছায় ইসলামকে গ্রহণ করেছে, তারাই সঠিক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল পথ লাভ করেছে।

'যালেমরা জাহান্নামের জ্বালানী হবে' কথাটার তাৎপর্য এই যে, তাদের ব্যাপারে এটা চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামের জ্বালানী হবে। জ্বালানী পেয়ে আগুন যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে, জাহান্নাম তাদেরকে পেয়ে তেমনি জ্বলে উঠবে।

এ আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, জ্বিনরা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। আর এ কথা থেকে অনিবার্যভাবে এটাও বুঝা যায় যে, তারা বেহেস্তের নেয়ামতও উপভোগ করবে। এটা কোরআনের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন উক্তি। কোরআন থেকেই আমরা আমাদের চিন্তাধারা ও মতামত গ্রহণ করি। কাজেই এরপর কোরআন বহির্ভূত কোনো দর্শনের ধুয়া তুলে জ্বিনের প্রকৃতি, আগুনের প্রকৃতি ও বেহেস্তের প্রকৃতি নিয়ে কোনো কথা বলার অধিকার কারো নেই। আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন, তা অবিসংবাদিত ও অকাট্য সত্য। আর জ্বিনদের বেলায় যা প্রযোজ্য, মানুষের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার নবীর মুখ দিয়েই এসব উক্তি করিয়েছেন।

ওহীর মাধ্যমে জ্বিনদের উক্তি হুবহু ও প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধৃত করার পালা এখানে শেষ হয়েছে। এরপর জ্বিনদের বক্তব্যের হুবহু উদ্ধৃতি দেয়ার বদলে তার সার সংক্ষেপে দেয়ার পর্ব শুরু হয়েছে। যারা আল্লাহর দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করে তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কিরূপ আচরণ করে থাকেন, সে সম্পর্কে জ্বিনদের উক্তির এ সার সংক্ষেপ দেয়া হচ্ছে। এখানে জ্বিনদের ভাষা নয়–বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

'তারা যদি আল্লাহর পথে অবিচল থাকতো তাহলে আমি তাদেরকে পর্যাপ্ত পানি পান করাতাম..........'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, মোমেন জ্বিনদের এই দলটি আমার সম্পর্কে এই মর্মে মন্তব্য করেছিলো যে, সাধারণ মানুষ কিংবা উল্লেখিত যুলুমবাজ লোকেরা যদি সত্য ও সততার পথে অবিচল থাকতো এবং যুলুম ও অসদাচরণে লিপ্ত না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিতাম, ফলে তাদের প্রচুর জীবিকা ও সমৃদ্ধি লাভ হতো। আর এই সমৃদ্ধি দিতাম এ জন্যে যেন তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি যে, তারা আল্লাহর নেয়ামতে শোকর করে, না নাশোকরী করে।

প্রথমে জ্বিনদের কথার হুবহু উদ্বৃতি এবং তারপর সেই ধারা পরিবর্তন করে তাদের বক্তব্যের সংক্ষেপ তুলে দেয়া অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যে পর্যায়ে এসে কথার পালাবদল হয়েছে, তাতে একটি অংগীকারকে সরাসরি আল্লাহর অংগীকার হিসাবে দেখানো সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে এ বিষয়ে এই পরিবর্তিত বাকরীতি অধিকতর স্বার্থক ও তাৎপর্যবহ হয়েছে। কোরআনের বাচনভংগীতে এ ধরনের পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। বক্তব্যকে অধিকতর জীবন্ত ও জোরদার করা এবং কঠোরতর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা এর অন্যতম লক্ষ্য হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে মোমেনের আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারাকে বিরাজমান পরিবেশ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের আলোকে গঠন করার জন্যে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে পয়লা তথ্য এই যে, জীবন যাপনের যে নির্ভুল, বিশুদ্ধ পথ ও পদ্ধতি মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে তথা তাঁর সন্তোষ নিশ্চিত করে দিতে সক্ষম, সেই পথ ও পদ্ধতি অবিচলভাবে ও অব্যাহতভাবে জাতিসমূহ ও মানব গোষ্ঠীসমূহ কর্তৃক অনুসরণ এবং পার্থিব প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি লাভ এ দুটি জিনিসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও এরা উভয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচুর্য সমৃদ্ধির উপকরণসমূহের সাথেও জীবন যাপনের সঠিক পথ অনুসরণের অনুরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সমৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপকরণ হচ্ছে পানির প্রবাহ ও প্রাচুর্য।

পৃথিবীর সকল এলাকাতেই পানির ওপর সব কিছুর জীবন নির্ভরশীল। আজকের যুগেও যখন শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং জীবিকা ও সমৃদ্ধির জন্যে কৃষি আর একমাত্র উৎস হিসাবে বহাল নেই, এখনো পানির প্রবাহের ওপর সুখ ও সমৃদ্ধি পুরোমাত্রায় নির্ভর করছে। বলতে গেলে, পানি আজও মানব সভ্যতা ও মানববসতির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

সত্য ও ন্যায়ের নির্ভুল পথে অবিচল থাকা ও পার্থিব জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির মাঝে এই অবিচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোত সম্পর্ক একটা চিরন্তন সত্য ও শাশ্বত বাস্তবতা। আরবরা মরুভূমির মধ্যে কষ্টকর জীবন যাপন করতো। যখনই তারা সত্য ও ন্যায়ের সোজা ও নির্ভুল পথে প্রতিষ্ঠিত হলো, অমনি পৃথিবীতে তাদের জন্যে পানির প্রবাহ ও খাদ্যের প্রাচুর্যের অবারিত দুয়ার খুলে গেলো। তারপর পুনরায় যেই তারা বিপথগামী হলো, অমনি তাদের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য কেড়ে নেয়া হলো। যতোদিন তারা সেই সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আসবে না, ততোদিন তাদের এই দুঃখ দুর্যোগ অব্যাহত থাকবে। সৎপথে ফিরে আসা মাত্রই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পালিত হবে এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা ঘুচে যাবে।

এ কথা সত্য বটে যে, কিছু কিছু জাতি এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে বহাল নেই, তথাপি তাদের বিত্ত বৈভব ও প্রাচূর্য রয়েছে। কিন্তু সেই জাতিগুলো তাদের মনুষ্যত্বে, নিরাপত্তায়, মানবীয় মান মর্যাদায় ও মূল্যবোধে নানা রকমের দুর্যোগের শিকার হয়ে চলেছে। এ সব দুর্যোগের কারণে তাদের প্রাচুর্য অর্থহীন হয়ে পড়েছে এবং তা তাদের কাংখিত সুখ শান্তি দিতে পারেনি। সে সব দেশে মানুষের জীবন মানবতার জন্যে, নৈতিকতার জন্যে, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে এবং মানব সুলভ মর্যাদার জন্যে ভয়াবহ অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। (সূরা নূহ্-এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।)

এ আয়াতটি থেকে দ্বিতীয় যে তথ্যটি পরিস্ফুট হচ্ছে, তা এই যে, সুখ সমৃদ্ধিও আলাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে সুখ ও দুঃখ উভয়টি দিয়েই পরীক্ষা করে থাকি।' সত্য বলতে কি, বিপদ মসিবতে ধৈর্য ধারণের চেয়ে সুখ ও প্রাচুর্যে ধৈর্য ধারণ এবং আল্লাহর শোকর আদায় করা ও আল্লাহর নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করা অনেক বেশী কঠিন ও দুর্লভ। অথচ আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, বিপদে ধৈর্য ধারণই কঠিনতর। এমন লোক অনেক রয়েছে যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ দেয়। চেতনা ও প্রেরণা সক্রিয় থাকে এবং আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার যে ধারা চলতে থাকে, তারই কল্যাণে বিপদ আপদে সকল সহায় টুটে গেলে আল্লাহর সহায়তার আশার ওপর ভর করে মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। কিন্তু সুখ ও সমৃদ্ধি মানুষকে একেবারে আত্মহারা ও আত্মভোলা করে দেয়। স্নায়ুমন্ডলকে শিথিল করে দেয় ও হৃদয়ে বিদ্যমান প্রতিরোধের শক্তিগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে নিস্তেজ করে দেয়। সুখ সর্বদাই মানুষের সুযোগ ও অবসরকে সম্পদের বড়াই করা ও শয়তানের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করে।

সুখ সাচ্ছন্দ্য ও প্রাচূর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরী। একমাত্র এভাবেই বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। সম্পদের প্রাচূর্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষকে অকৃতজ্ঞ ও অহংকারী বানানোর পাশাপাশি তাকে অপব্যয়ী অথবা কৃপণও বানিয়ে ছাড়ে। শেষোক্ত এই দুটো দোষই মানুষের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আবার সম্পদের প্রাচূর্য মানুষকে অকৃতজ্ঞ ও অহংকারী বানানোর পাশাপাশি অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, গায়ের জোরে অন্যায়ভাবে মানুষের অধিকার গ্রাসকারী এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর ওপর আক্রমণ ও আগ্রাসন পরিচালনাকারীতে পরিণত করে। সৌন্দর্যও একটি নেয়ামত। অনেক সময় এই নেয়ামত মানুষকে অতিমাত্রায় আত্মাভিমানী ও বিপথগামী বানিয়ে দেয় এবং পাপের ভাগাড়ে নিক্ষেপ করে। আর মেধার নেয়ামত প্রায়ই মানুষকে অহংকারী বানিয়ে দেয় এবং অন্যদেরকে ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে তাচ্ছিল্য করতে প্ররোচিত করে। এককথায় বলা যায়, আল্লাহর প্রত্যেক নেয়ামতেই কোনো না কোনো বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। কেবলমাত্র যে ব্যক্তি সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে তাকেই আল্লাহ তায়ালা এ সব বিপদাশংকা থেকে রক্ষা করেন।

তৃতীয় তথ্য হচ্ছে এই যে, সুখ ও সমৃদ্ধিজনিত অহংকারের দরুণ মানুষের স্মরণে শৈথিল্য ও উপেক্ষা প্রদর্শন অনিবার্যভাবে আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনে। আয়াতে আযাবের বিশেষণ হিসাবে 'সায়াদান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ ঊর্ধে আরোহন। কিন্তু এখানে এর অর্থ 'কষ্টকর'। ঊর্ধে আরোহন কষ্টকর বিধায় এ শব্দটি দ্বারা প্রতীকি অর্থে কষ্টকর বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআনে 'সায়াদা' ধাতু থেকে কষ্টকর ও দুরূহ অর্থ বুঝানো একটি সাধারণ বাকরীতি। যেমন সূরা আরাফের একটি আয়াতে রয়েছে, 'আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান ইসলামের জন্যে তার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে বিপথগামী করতে চান তার বক্ষকে এতো সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেন যে, সে যেন আকাশে আরোহন করছে।'(আয়াত ১২৫)

সূরা মোদ্দাসসেরের ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি তাকে ঊর্ধে আরোহন করতে বাধ্য করবো।'

অর্থাৎ আযাব ভোগ করাবো। বস্তুত ঊর্ধে আরোহন কেমন কষ্টকর কাজ, তা সহজেই বোধগম্য। আর সুখ সমৃদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করা কষ্টকর আযাব ভোগ করানোর মধ্যে যে বৈপরীত্য বিদ্যমান তাও অত্যন্ত স্পষ্ট।

### মাথা নত হবে শুধু আল্লাহর সামনে

পরবর্তী আয়াতটি জ্বিনদের উক্তির উদ্ধৃতিও হতে পারে, আবার মৌলিকভাবে আল্লাহর উক্তিও হতে পারে।

'মসজিদগুলো আল্লাহর, কাজেই আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না।'

উক্তিটা আল্লাহর হোক আর জ্বিনেরই হোক, উভয় অবস্থাতেই এর মর্ম এই যে, সাজদা অথবা সেজদার স্থান মসজিদ একমাত্র আল্লাহর। কেননা সাজদার অবস্থায় এবং মসজিদে নির্ভেজাল তাওহীদ বিরাজ করে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো কিছুর ছায়াও সেখানে দেখা যায় না। সেখানকার পরিবেশ শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদাতের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যকে ডাকার অর্থ অন্যের এবাদাত করা, অন্যের আশ্রয় বা নিরাপত্তা চাওয়া অথবা অন্যের জন্যে হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করা।

আয়াতটিকে যদি জ্বিনদের উক্তি ধরা হয় তাহলে তা হবে তাদের পূর্ববর্তী উক্তি 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করবো না' এর সমার্থক। অর্থাৎ আমরা এবাদাত ও

সাজদার স্থানে কাউকে শরীক করবো না। আর যদি মৌলিকভাবে আল্লাহর উক্তি হয়, তাহলে তা হবে জ্বিনদের তাওহীদবাদী উক্তির সমর্থনে উচ্চারিত বাক্য। আল্লাহর এ ধরনের সমার্থক উচ্চারণ কোরআনের একটি সাধারণ রীতি।

অনুরূপভাবে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'যখন আল্লাহর বান্দাহ আল্লাহকে ডাকতে উদ্যত হয়, তখন কাফেররা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করে।'

অর্থাৎ যখন সে নামায পড়ার উদ্যোগ নেয়, তখন কাফেররা সবাই একযোগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়, আর নামায মূলত দোয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপরোক্ত আয়াতটি যদি জ্বিনদের উক্তি হয়ে থাকে, তাহলে তা হবে তাদের পক্ষ থেকে দেয়া আরবের পৌত্তলিকদের আচরণের একটি বিবরণ। কেননা রসূল (স.) যখন নামায পড়তেন, কিংবা কোরআন অধ্যয়ন করতেন, তখন কাফেররা দলে দলে এসে তার চারপাশে সমবেত হতো এবং তাকে বিব্রত করতো। সূরা মায়ারেজে এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কাফেররা কি পেয়েছে যে, তোমার দিকে ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দলে দলে ধেয়ে আসছে?

অর্থাৎ তারা গ্রহণ করার জন্যে নয় বরং নিছক কৌতুহল বশে শোনার ভান করে এবং উত্যক্ত ও বিরক্ত করার জন্যে সমবেত হয়। অতপর আল্লাহ তাঁকে তাদের উৎপাত থেকে রক্ষা করেন। এ ধরনের ঘটনা বহুবার সংঘটিত হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতটি জ্বিনদের উক্তি হয়ে থাকলে প্রশ্ন জাগে যে, স্ব-জাতিকে দাওয়াত দেয়ার সময় জ্বিনেরা এ কথা তাহলে কি উদ্দেশ্যে বলেছে? এর জবাব এই যে, এ কথা তারা মোশরেকদের এই আচরণের প্রতি যুগপৎ বিস্ময় ও নিন্দা প্রকাশের জন্যেই বলে থাকবে।

পক্ষান্তরে এটি যদি মৌলিকভাবে আল্লাহর উক্তি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ইসলাম গ্রহণকারী জ্বিন দলটির কর্মকান্ডের বিবরণ বলে ধরে নিতে হবে। তারা এই বিস্ময়কর কোরআন শুনে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলো এবং রসূল (স.)-এর কাছে তারা একে অপরের গায়ে গায়ে লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। যেহেতু জ্বিনদের কথাগুলো সামগ্রিকভাবে বিস্ময়বিমূঢ় অভিভূত হওয়ার একটা চিত্র তুলে ধরে, তাই উক্ত প্রেক্ষাপটে আয়াতটির এই ব্যাখ্যাই সম্ভবত অধিকতর সমীচীন।

জ্বিনদের উক্তি উদ্ধৃত করার পালা শেষে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে কথা বলা শুরু হয়েছে। জ্বিনদের বক্তব্য ছিলো কোরআন সম্পর্কে ও ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে। ইসলামের এই দাওয়াত ছিলো তাদের কাছে অভিনব। এ দাওয়াত তাদের স্নায়ুতে শিহরণ তুলেছিলো। তাদেরকে জানিয়েছিলো যে, সমগ্র আকাশ, পৃথিবী, ফেরেশতা ও নক্ষত্ররাজি এই দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে। তাদেরকে জানিয়েছিলো যে, সমগ্র বিশ্ব জাহানের বিধি ব্যবস্থা আল্লাহর এই বিধান অনুসারেই চলে।

### রসূল (স.)-এর প্রতি আল্লাহর আদেশ

রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে যে বক্তব্য দেয়া শুরু হয়েছে তা প্রধানত, তাবলীগ ও দাওয়াত সংক্রান্ত, তাকে বলা হয়েছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগ ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই, কোনো অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী তুলে মানুষের ভাগ্য বেচাকেনার পসরা সাজানো তার কাজ নয়। সূরার দ্বিতীয় রুকুর শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত নব পর্যায়ের এই ভাষণ বিস্তৃত রয়েছে।

এর প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মোহাম্মদ, তুমি বলো, আমি শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না।'

লক্ষণীয় যে, ইতিপূর্বে জ্বিনদের যে ঘোষণাটি উদ্ধৃত হয়েছে তাও ছিলো এই,

'আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করবো না।'

বস্তুত এ ঘোষণার স্বাদ এবং প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কেননা এটা জ্বিন ও মানুষের সম্মিলিত ঘোষণা। পৌত্তলিকরা বা অন্য কেউ এ ঘোষণায় একমত না হলে তাদেরকে গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে।

পরবর্তী আয়াতে রসূল (স.)-কে পুনরায় আদেশ দেয়া হচ্ছে যে,

'তুমি বলো, আমি তোমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ঘটানো বা সুপথ দেখানোর ক্ষমতা রাখি না।'

অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগ ছাড়া আর সব কিছু থেকে তুমি নিজেকে গুটিয়ে নাও। যেসব বিষয় একমাত্র আল্লাহর আয়ত্তাধীন, তার সবকিছু থেকে তুমি তোমার হাতকে গুটিয়ে নাও। কেননা একমাত্র আল্লাহই সকল কল্যাণ-অকল্যাণ, শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ ও লাভ-ক্ষতির মালিক। আল্লাহ তায়ালাই এখানে ক্ষয়ক্ষতির বিপক্ষে 'রুশদ' শব্দটি রেখেছেন। এর অর্থ হেদায়াত বা সুপথ প্রাপ্তি। ইতিপূর্বে জ্বিনদের একটি উক্তিতেও একইভাবে 'রুশদ' বা 'রাশাদ' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

'আমরা জানি না, বিশ্ববাসীর জন্যে কোনো অকল্যাণ কামনা করা হয়েছে না সুপথ প্রাপ্তি।'

তাই দেখা যাচ্ছে, দুটো উক্তিই ভাব ও ভাষা উভয় দিক দিয়ে পরস্পরের সাথে সংগতিপূর্ণ। ঘটনায় ও ঘটনা সংক্রান্ত মন্তব্যে এ ধরনের ভাষা ও ভাবের মিল কোরআনের একটি বহুল প্রচলিত রীতি।

এই উক্তি ও পূর্বোক্ত মর্ম অনুযায়ী সুস্পষ্টভাবে জ্বিনকে ও রসূল (স.) -কে লাভক্ষতি ও শুভাশুভের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। বিশেষত জ্বিনদের ব্যাপারে এ বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাদের এ জাতীয় ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করা হতো। এ আয়াতে এতোদসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। আর এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট অটল ও অনড় বিশ্বাস রাখার ওপর ঈমানের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তুমি বলো আমাকে আল্লাহ তায়ালা থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে আমি নিরাপদ আশ্রয় পাবো না। তবে আল্লাহর বাণী যদি আমি পৌছাতে থাকি তবে...।'

এই উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কথাটা দ্বারা যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, আল্লাহর এই দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগ কতখানি গুরুত্ববহ কাজ। রসূল (স.)-কে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর হাত থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং আমি তার কাছে ছাড়া আর কোথাও নিরাপত্তা পাবো না, তবে যদি এই দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করি এবং এই আমানতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। বস্তুত এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজই একমাত্র রক্ষাকবচ ও রক্ষাবহ। এটাই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজটি আমার কাজ নয়। আমার কাজ শুধু তা প্রচার করা। এ আদেশ পালন না করলে আল্লাহর হাত থেকে আমাকেও কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং দাওয়াত ও প্রচারের কাজ না করলে আমি কোনো নিরাপত্তা ও আশ্রয় পাবো না।

এ উক্তির ভেতরে যে কি সাংঘাতিক ধরনের হুশিয়ারী সংকেত দেয়া হয়েছে তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। এটা দাওয়াতকারীর জন্যে কোনো ঐচ্ছিক বা নফল কাজ নয়। এটা তার জন্যে অত্যন্ত কঠোর বাধ্যতামূলক কাজ। এ কাজ না করে তার পালাবার উপায় নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার তদারকী ও প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছেন।

মানুষের কাছে হেদায়াত ও কল্যাণের বাণী পৌঁছানো কোনো ব্যক্তিগত অভিরুচি ও স্বাদ আহলাদের ব্যাপার নয়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত একটি গুরু দায়িত্ব। এতে ইতস্তত করা বা একে উপেক্ষা করার কারো অবকাশ নেই। সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের গুরুত্ব তাই আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের নাফরমানী করবে, তার জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন। অবশেষে যখন তারা প্রতিশ্রুত কর্মফল দিবস দেখবে, তখন জানা যাবে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে কে বেশী দুর্বল এবং কার জনবলের সংখ্যা অল্প।'

বস্তুত, দাওয়াত ও তাবলীগের এই আদেশ জানার পরও যে ব্যক্তি নাফরমানী করে, তার জন্যে এ আয়াতে রয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি ও হুশিয়ারী।

যেহেতু মোশরেকরা বস্তুগত শক্তি ও সংখ্যার ব্যাপারটাকে বেশী গুরুত্ব দিতো এবং তাদের শক্তির সাথে মোহাম্মদ (স.)-এর ক্ষুদ্র ঈমানদার জনশক্তির তুলনা করতো, তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, দুনিয়াতেই হোক বা আখেরাতেই হোক, প্রতিশ্রুত হিসাব নিকাশের আয়োজন যখন দেখবে তখন টের পাবে কে সাহায্যকারী হিসেবে বেশী দুর্বল এবং কার জনসংখ্যা কম। তখন বুঝতে পারবে, দুই পক্ষের কে বেশী দুর্বল ও অক্ষম।

এই পর্যায়ে এসে জ্বিনদের উক্তিগুলোর দিকে নযর বুলালে দেখা যায় সেখানেও এ ধরনের একটি উক্তি রয়েছে,

'আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে, পৃথিবীতে আমরা কখনো আল্লাহকে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করতে পারবো না এবং কখনো পালিয়ে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারবো না।'

এখানেও দেখতে পাই ঘটনার সাথে ঘটনার পর্যালোচনার ভাষাগত মিল ও সমন্বয় রয়েছে। আমরা এও দেখতে পাই যে, ঘটনাটা পর্যালোচনার ভূমিকা রচনা করেছে এবং পর্যালোচনাটাও ঠিক উপযুক্ত ও নির্ধারিত সময়ে এসেছে।

এরপর রসূল (স.)-কে পুনরায় আদেশ দেয়া হচ্ছে, যেন তিনি অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয় থেকে নিজের হাত গুটিয়ে আনেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে নবী! তুমি বলো, তোমাদেরকে যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, তা কি আসন্ন হয়ে পড়েছে, না তার জন্যে আমার প্রভু সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।'

এখানে যে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে তা এই যে, তিনি ইসলামের দাওয়াত ও আন্দোলনের মালিক-মোক্তার নন এবং এতে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থও নেই। শুধুমাত্র অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে এবং নিজের জন্যে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিশ্চিত করার খাতিরে তা জনগণের কাছে পৌঁছানো ও প্রচার করা তার পবিত্র কর্তব্য। এই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভ করা তাগলীগের কাজ করা ছাড়া সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে কাফেররা তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার দরুণ যে আযাবের হুমকির সম্মুখীন সেটাও আল্লাহর দেখার বিষয়, রসূল (স.)-এর এতে কোনো হাত নেই, আর তিনি এর কোনো নির্দিষ্ট সময়ও জানেন না, চাই সেটা দুনিয়ার আযাব হোক কিংবা আখেরাতের আযাব। গোটা ব্যাপারটা অদৃশ্য জ্ঞানের আওতাভুক্ত। এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। রসূল (স.)-এর এ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই এবং এ ব্যাপারে তাঁর কোনো হাতও নেই।

## গায়ব জানেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই

'তিনিই অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। তার অদৃশ্য জ্ঞান তিনি কাউকে জানান না।'

রসূল (স.) আল্লাহর বান্দা হওয়া ছাড়া আর কোনো গুণ বৈশিষ্ট্যর অধিকারী নন। তার প্রধানতম পরিচয় হচ্ছে তিনি আল্লাহর বান্দা। ইসলামী চিন্তাধারায় কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। তাকে শুধু দ্বীন প্রচারের আদেশ দেয়া হয়েছে বলেই তিনি প্রচার করেন। এই আদেশই আলোচ্য আয়াতে এভাবে দেয়া হয়েছে,

'তুমি বলো, আমি জানি না যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা আসন্ন, না আমার প্রভু তার জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যিনি অদৃশ্য জ্ঞানের সর্বময় অধিকারী এবং এই জ্ঞান তিনি কাউকে দেন না।'

অবশ্য এখানে একটি মাত্র ব্যতিক্রমের উল্লেখ আছে। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তার অদৃশ্য ভান্ডার থেকে কোনো তথ্য প্রকাশ করার অনুমতি দেন এবং তা তাঁর নবী রসূলদেরকে তাঁদের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সুবিধার জন্যে যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকু অবহিত করেন, তবে এই সীমিত পরিমাণের অদৃশ্য জ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে বা জ্বিনের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে।

এভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর ওহীযোগে যে তথ্যই নবীদের কাছে পাঠানো হয় তা আল্লাহর গায়েবী তথ্য ভান্ডারেরই একটি তথ্য হয়ে থাকে। যে মুহূর্তে প্রয়োজন এবং যে মুহূর্তে যতোটুকু তা নাযিল করা হবে বলে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন ঠিক সে মুহূর্তে ততোটুকুই নাযিল করেন। এই জ্ঞান নবীরা যখন তার উম্মাতের কাছে বিতরণ করেন তখনও আল্লাহ তায়ালাই তা বিতরণ করেন, তখনও আল্লাহ তায়ালা সেই বিতরণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে তার এই নীতি অত্যন্ত কড়াকড়ি ভাষায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেন,

'তবে যদি কোনো রসূলকে আল্লাহ তায়ালা মনোনীত করেন, তবে সে ক্ষেত্রে তিনি উক্ত রসূলের সামনে ও পেছনে প্রহরা নিয়োজিত করেন। যাতে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত হতে পারেন যে, রসূলরা তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, আর তাঁদের কাছে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আছে এবং সব কিছুকে তিনি গুনে গুনে রাখেন।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তার দাওয়াতকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌছানোর জন্যে যে সব নবী ও রসূলকে নির্বাচিত করেন তাদেরকে তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের ভান্ডারের একটা অংশ তো অবশ্যই জানান। তা হচ্ছে এই ওহী। ওহীর বিষয়বস্তু, ওহী নাযিল হওয়ার প্রক্রিয়া, যে ফেরেশতা তা বহন করে আনেন তিনি, ওহীর উৎস এবং 'লাওহে মাহফুযে' তার সংরক্ষণ ইত্যাকার যা কিছু তাদের রেসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা গায়েবের গোপন ভান্ডারে লুকানো ছিলো এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউই তার বিন্দুবিসর্গও জানতো না, তার সবই অদৃশ্য ও গায়েবী বিষয়।

## রসূলকে হেফাযত করার দায়িত্ব আল্লাহর

রসূলদের কাছে এই ওহী নাযিল করার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠোর প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখেন। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্যে তাঁদের ওপর নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করেন। এই সব রক্ষী রসূলদের শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকা থেকে, তাদের নিজেদের প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা বাসনা থেকে, রেসালাতের দায়িত্বের ব্যাপারে মানবীয় দুর্বলতায় আক্রান্ত হওয়া থেকে, ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে এবং মানুষ যতো রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতায় আক্রান্ত হতে পারে, তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।

আয়াতের শেষাংশ থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, রসূলদের ওপর আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রহরা ও পর্যবেক্ষণ চালু থাকে। কেননা তারা সর্বক্ষণ রেসালাতের মহান দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকেন।

'যাতে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চিত হতে পারেন যে, রসূলরা তাঁদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন' আল্লাহ তায়ালা এটা নিশ্চিতভাবেই জানেন বটে। তবে এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে রসূলরা যেন কার্যত নিয়োজিত হন এবং আল্লাহ তায়ালা বাস্তবিকপক্ষে তা জানেন।

'তাদের কাছে যা কিছু আছে তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আছে' আয়াতের এ উক্তিটির অর্থ এই যে, নবীদের মনমগযে, তাঁদের জীবনে এবং তাদের পার্শ্ববর্তী সকলের মধ্যে যা কিছুই থাক না কেন, তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তার চোখের আড়ালে কিছুই নেই।

'আর সব কিছুই তিনি গুণে গুণে রেখেছেন।'

অর্থাৎ শুধু রসূলের কাছে যা কিছু আছে তা নয় বরং অন্য জিনিসও তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তিনি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে সেগুলোর খবর জানেন ও গুণে গুণে সেগুলোর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করেন।

অবস্থাটা সত্যিই ভেবে দেখার মতো। রসূল (স.) স্বয়ং প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে অবরুদ্ধ। আর তাঁর কাছে এবং তার চারপাশে বিরাজমান সব কিছুই আল্লাহর নখদর্পণে। তার ওপর একটা দায়িত্ব রয়েছে, যা তার পালন না করে উপায় নেই। তিনি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর প্রকৃতির কাছে,তার মানবীয় দুর্বলতার কাছে, তাঁর ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার কাছে এবং তার নিজের পছন্দ অপছন্দ ও রুচি-অরুচির কাছে তাকে অসহায় ছেড়ে দেয়া হয়নি। তাকে রাখা হয়েছে সুক্ষ্মতম ও সতর্কতম পর্যবেক্ষণের আওতায়। তিনি এ সব জানেন এবং নিজের পথে সঠিকভাবে চলতে থাকেন। চলার পথে একটুও এদিক সেদিক তাকান না। কেননা তার চারপাশে বিদ্যমান সার্বক্ষণিক প্রহরা ও পর্যবেক্ষণের কথা তিনি অবগত।

এটি এমন একটি অবস্থা যা রসূলের (স.) প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। আর এই ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে শংকার সৃষ্টি করে। এই ভয়াল ও আতংকজনক অনুভূতির মধ্য দিয়েই সূরা শেষ হয়ে যাচ্ছে। সূরাটির শুরুও হয়েছিলো জ্বিনদের দীর্ঘ বক্তব্য উদ্ধৃত করে একটি ভীতিসংকুল পরিবেশ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে।

সর্বমোট আটাশ আয়াতে সীমাবদ্ধ এই সূরা মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসের গঠন এবং নির্ভুল, সুস্পষ্ট ও ভারসাম্যপূর্ণ ধ্যান ধারণা ও চিন্তা চেতনা সৃষ্টিকারী বেশ কিছু মৌলিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছে। এসব তত্ত্ব মানুষকে যেমন সব রকমের গোঁড়ামী, একগুঁয়েমী ও উগ্রতা থেকে মুক্তি দেয়, তেমনি তাকে রক্ষা করে শৈথিল্য ও উদাসীনতা থেকে। তার চারপাশে জ্ঞানার্জনের মুক্ত বাতায়নকে রুদ্ধ করে না, তেমনি তাকে অযৌক্তিক প্রাচীন কু-সংস্কারের বদ্ধ খাঁচায়ও আবদ্ধ করে না।

বস্তুত মোমেন জ্বিনরা কোরআন শোনার পর যখন বলেছিলো, 'সত্য ও ন্যায়ের পথের সন্ধানদাতা এক বিস্ময়কর কোরআন আমরা শুনেছি এবং তার প্রতি ঈমান এনেছি' তখন তারা চরম ও অকাট্য একটি সত্যকথাই বলেছিলো।

# সূরা আল মোযযাম্মেল

আয়াত ২০ রুকু ২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝٣ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝٤ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝٥ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝٦ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٧ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٨ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝٩ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝١٠ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝١١

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (মোহাম্মদ,) ২. রাতে (নামাযের জন্যে) ওঠে দাঁড়াও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে, ৩. তার অর্ধেক (পরিমাণ) অংশ (নামাযের জন্যে দাঁড়াও), অথবা তার চাইতে আরো কিছু কম, ৪. কিংবা (চাইলে) তার ওপর (কিছু সময়) তুমি বাড়িয়েও দিতে পারো, আর তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো থেমে থেমে; ৫. (মনে রেখো,) অচিরেই আমি তোমার ওপর একটি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ বাণী সদৃশ) কিছু রাখতে যাচ্ছি। ৬. (অবশ্যই) রাতে বিছানা ত্যাগ! তা আত্মসংযমের জন্যে বেশী কার্যকর (পন্থা, তা ছাড়া এ সময়) কোরআন পাঠেরও যথার্থ সুবিধা থাকে বেশী; ৭. নিসন্দেহে দিনের বেলায় তোমার থাকে প্রচুর কর্মব্যস্ততা; ৮. তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করো; ৯. আল্লাহ তায়ালা পূর্ব পশ্চিমের একক মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব তাঁকেই তুমি অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করো। ১০. এ (নির্বোধ) লোকেরা (তোমার সম্পর্কে) যেসব কথাবার্তা বলে তাতে (কান না দিয়ে বরং) তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং সৌজন্য সহকারে তাদের পরিহার করো। ১১. আর সহায় সম্পদের অধিকারী এ মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের (সাথে ফয়সালার) ব্যাপারটা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও এবং কিছুদিনের জন্যে তুমি তাদের অবকাশ দিয়ে রাখো।

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا (১২) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (১৩) يَوْمَ

تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا (১৪) إِنَّآ أَرْسَلْنَآ

إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (১৫) فَعَصَىٰ

فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (১৬) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ

يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (১৭) السَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ ۚ كَانَ وَعْدُهُۥ مَفْعُولًا (১৮)

إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا (১৯) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ

أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ

مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

১২. অবশ্যই আমার কাছে (এ পাপীদের পাকড়াও করার জন্যে) শেকল আছে, আছে (আযাব দেয়ার জন্যে) জাহান্নাম, ১৩. (তাদের জন্যে আরো রয়েছে) গলায় আটকে যাবে এমন (ধরনের) খাবার ও যন্ত্রণা দেবে এমন ধরনের আযাব, ১৪. (এ ঘটনা সেদিন ঘটবে) যেদিন পৃথিবী ও (তার ওপর অবস্থিত) পাহাড়সমূহ সব প্রকম্পিত হতে থাকবে এবং পাহাড়সমূহের অবস্থা হবে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কতিপয় বালুকা স্তূপের ন্যায়। ১৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে (তোমাদের কাজকর্মের) সাক্ষ্যদাতা হিসেবে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যেমনি করে ফেরাউনের কাছেও আমি একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম; ১৬. অতপর ফেরাউন (আমার পাঠানো) রসূলকে অমান্য করলো, (এ অমান্য করার শাস্তি হিসেবে) আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম। ১৭. (আজ) যদি তোমরাও সেদিনকে অস্বীকার করো তাহলে আল্লাহর আযাব থেকে (বলো) কিভাবে তোমরা বাঁচতে পারবে, যেদিন (অবস্থার ভয়াবহতা অল্প বয়স্ক) কিশোর বালকদেরও বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে; ১৮. যেদিন তার সাথে আসমান ফেটে ফেটে পড়বে, (এ) হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, আর তা সংঘটিত হবেই। ১৯. এ (বাণী) হচ্ছে একটি উপদেশমাত্র, কোনো ব্যক্তি চাইলে (এর মাধ্যমে সহজেই) নিজের মালিকের দিকে যাওয়ার একটা রাস্তা গ্রহণ করে নিতে পারে।

## রুকু ২

২০. (হে নবী,) তোমার মালিক (একথা) জানেন, তুমি এবং তোমার সাথে তোমার সাথীদের এক দল (এবাদাতের জন্যে কখনো) রাতের দুই তৃতীয়াংশ, (কখনো) অর্ধেক অংশ, আবার (কখনো) এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকো; (মূলত) রাত দিনের এ হিসাব তো আল্লাহ তায়ালাই ঠিক করে রাখেন; তিনি (এও) জানেন, তোমরা এর সঠিক হিসাব করতে সক্ষম হবে না, তাই আল্লাহ তায়ালা (এ ব্যাপারে) তোমাদের ওপর ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন,

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

অতএব (এখন থেকে) কোরআনের যে পরিমাণ অংশ তেলাওয়াত করা তোমাদের জন্যে সহজ, ততোটুকুই তোমরা তেলাওয়াত করো; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবস্থা জানেন, তোমাদের ভেতর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, আবার পরবর্তী কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধানের উদ্দেশে সফরে বের হতে পারে, আবার একদল লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধে নিয়োজিত হবে, তাই (এ পরিপ্রেক্ষিতে) তা থেকে যেটুকু অংশ পড়া তোমাদের জন্যে সহজ ততোটুকুই তোমরা পড়ো; তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, (মাল সম্পদের) যাকাত আদায় করো এবং (দান করার মাধ্যমে) আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো; (মনে রাখবে,) যা কিছু ভালো ও উত্তম কাজ তোমরা আগেভাগেই নিজেদের জন্যে আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে রাখবে, তাই তোমরা আল্লাহর কাছে (সংরক্ষিত দেখতে) পাবে, পুরস্কার ও এর বর্ধিত পরিমাণ হিসেবে তা হবে অতি উত্তম, তারপর (নিজেদের গুনাহ খাতার জন্যে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অতীব দয়ালু ও অধিক ক্ষমাশীল।

**সংক্ষিপ্ত আলোচনা**

এই সূরা নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, একবার কোরায়শ নেতারা তাদের 'দারুণ নাদওয়াহ' নামে পরিচিত পরামর্শ গৃহে সমবেত হয়ে রসূল (স.) ও তাঁর দাওয়াতী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। এ খবর জানতে পেরে রসূল (স.) অত্যাধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কাপড় চোপড় দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে ও কম্বল মুড়ি দিয়ে বেদনা ভারাক্রান্ত অবস্থায় শুয়ে পড়েন। এই সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর কাছে এই সূরার প্রথম রুকু নিয়ে এলেন।

এর দ্বিতীয় রুকু দীর্ঘ এক বছর পর নাযিল হয়। রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদের একটি দল তখন রাতের বেলায় এতো বেশী নামায পড়তেন যে, তাদের পা ফুলে যেতো। এ জন্যে বারো মাস পর তাদেরকে আরো কম নামায পড়ার নির্দেশ দিয়ে এই সূরার দ্বিতীয় রুকু নাযিল হয়।

এ প্রসংগে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে। সেই বর্ণনাটি সূরা আল মোযযাম্মেল প্রসংগেও বর্ণিত হয়েছে। সূরা আল মোদ্দাসসের নাযিলের কারণ প্রসংগে তা আগামীতে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার এই যে, রসূল (স.) নবুওত লাভের তিন বছর পূর্ব থেকে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন বাস করতেন। অর্থাৎ পাক পবিত্র অবস্থায় একাকী এবাদাত করতেন। প্রতি বছর তিনি এক মাস এভাবে নির্জনে কাটাতেন। এটি থাকতো রমযান মাস। মক্কা থেকে প্রায় দুই মাইল দূরবর্তী হেরা গুহায় এই নির্জন বাস কালে তার পরিবার তার কাছাকাছিই থাকতো। পুরো এক মাস তিনি এখানে কাটাতেন। এ সময়ে তাঁর কাছে কোনো গরীব দুঃখী এলে তাকে খাবার দিতেন এবং এবাদত ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর ধ্যান ও চিন্তা-গবেষণার বিষয় ছিলো তার চারপাশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং তার অন্তরালে অবস্থানরত মহা শক্তিধর স্রষ্টা। তাঁর দেশবাসী যে অযৌক্তিক ও অসার পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিলো, তাতে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এমন কোনো সুস্পষ্ট বিকল্প পথ, কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা এবং কোনো ভারসাম্যপূর্ণ নীতি তাঁর জানা ছিলো না যা তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে ও পছন্দ করতে পারেন।

রসূল (স.)-এর এই নির্জন বাসের কর্মসূচী তাঁর জন্যে আল্লাহর গৃহীত সুপরিকল্পিত কৌশলের একটি অংশ ছিলো। আগামী দিনে যে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর অপেক্ষায় ছিলো, তার জন্যে তাঁকে তৈরী করাই ছিলো এই কৌশলের উদ্দেশ্য। এই সময় তিনি একান্তভাবে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন ও আপন মনে চিন্তাভাবনায় মশগুল থাকতেন। সংসারে যাবতীয় ঝামেলা ও খুটিনাটি ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে নিভৃতে বসে নিঝুম প্রকৃতির অস্ফুট ভাষা ও আকুতি বুঝতে চেষ্টা করতেন। জানতে চেষ্টা করতেন কিভাবে এই নির্বাক মহাবিশ্ব নিজেই তার নিপুন স্রষ্টার অস্তিত্বের অকাট্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। পর্বতগুহার সেই মর্মবিদারী নিস্তব্ধতায় থেকে থেকে তাঁর আত্মা গোটা সৃষ্টি জগতের আত্মার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে স্রষ্টার গুণগানে সোচ্চার হয়ে উঠতো। সৃষ্টির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও নিষ্কলুষ পরিপক্কতাকে তাঁর সত্ত্বা সানন্দে আলিংগন করতো এবং তিনি আপন মনে পরম সত্যকে গড়ে তুলতেন।

যে ব্যক্তিকে মানব জাতির বাস্তব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তার আমূল পরিবর্তন সাধন ও নিভৃতে অবস্থান এবং পৃথিবীর নিত্যকার ব্যস্ততা, হৈ, চৈ, সংসারের শোরগোল ও ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে কিছু সময় কাটানো একান্ত প্রয়োজন।

বিশাল মহাবিশ্ব ও তার অগণিত তথ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা, তার ব্যাপারে নীতি ও দৃষ্টি ভংগী নির্ণয়ের জন্যে কিছুটা আলাদা সময় অপরিহার্য। কেননা কর্মচঞ্চল সাংসারিক জীবনের সাথে সর্বাত্মক, সার্বক্ষণিক ও নিবিড়ভাবে মেলামেশা করতে করতে মানুষের মন-মেযাজ তার সাথে এতো অভ্যস্ত ও পরিচিত হয়ে যায় যে, তাতে পরিবর্তন সাধনের জন্যে আর কোনো চেষ্টা করতে চায় না। ক্ষণিকের জন্যে এই সব ছোটখাট ব্যস্ততা থেকে দুরে চলে যাওয়া, ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়া এবং সংসার জীবনের বন্দীদশা থেকে অব্যহতি পেয়ে সাময়িকভাবে হলেও পূর্ণ মুক্ত জীবন যাপন মানুষের আত্মা ও বিবেককে প্রশস্ততা ও তীক্ষ্ণতা দান করে। তাকে পৃথিবীর চেয়ে বৃহত্তর

জিনিস দেখার ও বুঝার যোগ্য বানায় এবং মানুষের সমাজ ও সামাজিক রীতি প্রথার মুখাপেক্ষী না হয়ে আপন সত্তার পূর্ণতা ও পরিপক্কতা অর্জনের জন্যে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি সাহায্য গ্রহণ এবং স্বনির্ভর হতে অভ্যস্ত বানায়।

বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মাদ (স.)-কে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন, পৃথিবীর জীবন ধারাকে ও চেহরাকে আমূল পাল্টে দেয়া এবং ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে এ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন। নবুওতের তিন বছর আগে তাকে এই নির্জন বাসে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই নির্জনবাস বিরতিহীনভাবে একমাস স্থায়ী হতো। এ সময় একমাত্র মুক্ত প্রকৃতিই হতো তাঁর সাথী। প্রকৃতির অন্তরালে অদৃশ্য জগতের সাথে তার সংযোগ স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত এই নির্জনবাসের কর্মসূচী অব্যাহত থাকলো।

অবশেষে যখন আল্লাহর মর্জি হলো এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিশ্ববাসীর ওপর তার এই করুণাধারা বর্ষণ অর্থাৎ ওহী নাযিল করবেন, তখন জিবরাঈল (আ.) রসূল (স.)-এর কাছে এলেন। তিনি তখনো হেরার গুহায় অবস্থান করছিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক রসূল (স.) তাঁর এ ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন,

'আমি তখন নিদ্রিত। সেই অবস্থায় জিবরাঈল এলেন রেশমী রুমাল নিয়ে। তাতে কি একটা কথা লেখা ছিলো।

জিবরাঈল আমাকে সেই লেখাটি দেখিয়ে বললেন, পড়ুন তো!

আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না।

জিবরাঈল আমাকে এমন জোরে আলিংগন করলেন যে, মনে হলো আমি মরে যাচ্ছি। তারপর ছেড়ে দিলেন।

তারপর পুনরায় বললেন, পড়ুন!

আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না।

তারপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি এমন চাপ দিলেন যে, মনে হলো আমার মৃত্যু এসে গেছে।

তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন!

আমি বললাম, কী পড়বো? এ কথাটা আমি শুধু এই আলিংগনের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বলেছিলাম।

জিবরাঈল বললেন, 'পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, আর তোমার মহান প্রভু, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।'

রসূল (স.) বলেন, আমি এগুলো পড়লাম। অতপর পড়ার পালা শেষ হলো এবং তিনি চলে গেলেন। আমি ঘুম থেকে যখন জাগলাম তখন মনে হলো, আমার মানসপটে কথাগুলো লিখে নিয়েছি।

এরপর আমি গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এসে শুনলাম, আকাশ থেকে আওয়ায আসছে, 'হে মোহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি জিবরাঈল।'

আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, জিবরাঈল একজন বিশালকায় মানুষের বেশে দাঁড়িয়ে। আকাশের এক প্রান্তে তার এক পা।

তিনি বলছেন, ' হে মোহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল, আর আমি জিবরাঈল।'

আমি তার দিকে তাকিয়েই রইলাম। আগে পিছে একটুও না সরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অথচ আকাশের যে প্রান্তেই তাকাই দেখি তিনি সেখানে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আগে পিছে এক চুলও সরছি না।

এমতাবস্থায় খাদিজা আমার সন্ধানে লোকজন পাঠালো। তারা মক্কার উচ্চতম প্রান্তে গিয়ে ঘুরে ফিরে আবার খাদিজার কাছে ফিরে গেলো। আমি তখনো আমার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এরপর এক সময় জিবরাঈল চলে গেলেন। আমিও আমার পরিবারের কাছে ফিরে গেলাম। গিয়ে খাদিজার একবারে কোলের কাছে ঘনিষ্ট হয়ে বসলাম।

তিনি বললেন, 'ওহে কাসেমের বাবা! আপনি কোথায় ছিলেন? আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা মক্কায় গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।'

অতপর আমি তাঁকে যা যা দেখেছি বললাম।

খাদিজা বললো, 'হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি এটিকে শুভ সংবাদ হিসাবে গ্রহণ করুন এবং স্থির থাকুন। খাদিজার প্রাণ যার হাতে, তার শপথ করে আমি বলছি যে, আমি মনে করি আপনি এ যুগের মানব জাতির নবী।'

এরপর রসূল (স.) পুনরায় পাহাড়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওহী স্থগিত থাকলো। যেদিন পুনরায় সেখানে গেলেন, চোখ মেলে তাকাতেই জিবরাঈলকে দেখলেন। দেখে এবার তিনি ভয়ে কেঁপে উঠলেন। ভয়ে তিনি সংকুচিত হয়ে মাটির কাছাকাছি ঝুঁকে পড়লেন। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে গিয়ে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।'

সবাই তাঁকে ঢেকে দিলো। তবু তাঁর কাঁপুনি বন্ধ হলো না। এই সময় জিবরাঈল তাকে ডেকে বললেন, 'ইয়া আইয়ুহাল মোদ্দাসসের' (হে কম্বল মুড়ি দেয়া ব্যক্তি) কেউ কেউ বলেন, জিবরাঈল বললেন, ইয়া আইয়ুহাল মোয্যাম্মেল' (হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি) প্রকৃত পক্ষে এ সময় কোন সূরা নাযিল হয়েছিলো, তা আল্লাহই ভালো জানেন। চাই পূর্ববর্তী বর্ণনাই সঠিক হোক, কিংবা শেষোক্ত বর্ণনাই সঠিক হোক, এ কথা সত্য যে, রসূল (স.) ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর আর ঘুম পাড়ার অবকাশ নেই, তাঁর ঘাড়ে বিরাট দায়িত্বের বোঝা চেপেছে। তাঁর সামনে রয়েছে এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। জিবরাঈল-এর সেই ডাক শোনার পর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে শুধুই জাগরণ, কাঠোর প্ররিশ্রম ও অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা। সেই ডাক তাঁকে আর ঘুমাতে দেবে না।

রসূল (স.)-কে বলা হলো, 'ওঠো, তিনি উঠলেন। তারপর বিশ বছরেরও বেশী কাল ধরে তিনি উত্থিতই রইলেন।' অর্থাৎ কোনো বিশ্রাম নিতে পারলেন না, স্থির হতে পারলেন না। নিজের জন্যে বা নিজের পরিবারে জন্যে এক মুহূর্ত শান্তভাবে জীবন উপভোগ করতে পারলেন না।

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে তিনি সেই যে উঠলেন– আর বসলেন না, আর থামলেন না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ভারী দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুললেন। সমগ্র মানব জাতির দায়িত্ব, গোটা দ্বীনের দায়িত্ব এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দায়িত্ব ঘাড়ে তুললেন।

তাঁর এ সংগ্রাম ছিলো জাহেলিয়াতের সৃষ্ট মতবাদ ও ধ্যান ধারণায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ভোগ লালসার ভারে ভারাক্রান্ত ও তার প্রলোভনে আকৃষ্ট এবং প্রবৃত্তির গোলামীর যিঞ্জীরে আবদ্ধ মানবীয় বিবেককে মুক্ত করার সংগ্রাম। যখন তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবীর বিবেককে এই জাহেলিয়াতের আবর্জনার ভারমুক্ত এবং ইহলৌকিক জীবনের কলুষমুক্ত করতে সক্ষম হলেন, তখন আরেক রণাংগনে শুরু করলেন অপর এক যুদ্ধ।

এটি যুদ্ধ তো নয়, বরং বলতে গেলে যুদ্ধের এক অন্তহীন ধারা। ইসলামী আন্দোলনের যেসব দুশমন আন্দোলন ও আন্দোলনের সহযোগী মোমেনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো, ইসলামের এই সদ্য গজানো নিস্পাপ চারা গাছটিকে অংকুরেই যারা বিনষ্ট করতে চেয়েছিলো, এবং মাটিতে তার শেকড় ও আকাশে ডালপালা বিস্তার করার আগেই তাকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলো, সেই ভয়ংকর আগ্রাসী দুশমনদের বিরুদ্ধে ছিলো তাঁর এ যুদ্ধ, আর আরব উপদ্বীপের ভেতরকার যুদ্ধগুলো শেষ করতে না করতেই রোম সাম্রাজ্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো এই নতুন জাতিকে তার উত্তর সীমান্ত দিয়ে আঘাত হানতে।

এই রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালেও প্রথমোক্ত বিবেকের যুদ্ধ থামেনি। কারণ, ওটা এক শাশ্বত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের হোতা হচ্ছে শয়তান। মানুষের বিবেকের গভীরতম প্রকোষ্ঠে আপন তাৎপরতা চালিয়ে যাওয়া থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত হয় না।

পক্ষান্তরে রসূল (স.)ও আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ একইভাবে অব্যাহত রাখলেন। দাওয়াতের পাশাপাশি চালিয়ে গেলেন বহুমুখী সংগ্রাম। দুনিয়ার যাবতীয় সুখ সম্ভোগের সুযোগ তার জন্যে অবারিত ছিলো, তথাপি তিনি কষ্টকর জীবন যাপন করতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেন, মোমেনরা তাঁর চারপাশে থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। তারা সেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে প্রশমিত করতেন।

রাত জেগে তারা নামায পড়তেন, আল্লাহর বন্দেগী করতেন, ধীরে ধীরে বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর প্রতি একান্তভাবে মনোনিবেশ করতেন।

আল্লাহ তায়ালা সূরার প্রথম দশ আয়াতে তাকে এভাবেই জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন,

'হে কম্বলাচ্ছাদিত! ওঠো, রাত্রি জাগরণ কর, তবে অল্প কিছু অংশ বাদে ....।'

এভাবে রসূল (স.) ২০টি বছর কাটিয়ে দিলেন। এ সময়ের ভেতরে কোনো ক্ষেত্রেই এবং কোনো অবস্থাতেই তিনি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখাননি। ওহীর প্রথম দিন থেকেই তিনি তাঁর এই অক্লান্ত সাধনা অব্যাহত রাখেন।

সূরার প্রথম রুকু একটি বিশেষ ধরনের ছন্দবদ্ধ গদ্যের সমাহার। এটি অত্যন্ত কোমল অথচ ভাবগম্ভীর ছন্দ। যে গুরুগম্ভীর দায়িত্ব ও কড়া নির্দেশাবলী এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার সাথে এ ছন্দ বেশ মানানসই। যে দুর্বহ বক্তব্য নাযিল করার প্রতিশ্রুতির বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, তার ভয়াবহতা এবং 'আমাকে ও রসূলের আহবান প্রত্যাখ্যানকারী বিত্তশালীদেরকে ছেড়ে দাও, তাদেরকে সামান্য অবকাশ দাও, আমার কাছে শাস্তি ও দোযখ রয়েছে এবং কাঁটাযুক্ত খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' এ উক্তির ভয়াবহাতার সাথে এই গুরুগম্ভীর ছন্দবদ্ধ গদ্য যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ।

প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যে এবং হৃদয়ের গভীরে যে ভীতিপ্রদ নিদর্শনাবলী প্রতিফলিত হয়েছে, তার সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথা,

'যেদিন পাহাড় ও পৃথিবী কাঁপতে থাকবে.... যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে, যেদিন আকাশ ফেটে যাবে। ....'

দ্বিতীয় রুকু যে দীর্ঘ আয়াতটি নিয়ে গঠিত, তা নাযিল হয়েছে রাত জেগে নামায পড়তে পড়তে রসূল (স.) ও তাঁর সহচরদের পা ফুলে যাওয়ার ঘটনার এক বছর পর। যে মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এই রাত্রি জাগরণের উদ্দেশ্যও ছিলো তাই।

এ আয়াতে তাদের রাত্রি জাগরণের সময় কমানো হয়েছে। সেই সাথে এ আশ্বাসও দেয়া হয়েছে যে, সময় কমানোর এই সিদ্ধান্তে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাঁদের পরবর্তী কালের দায়দায়িত্বের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় জ্ঞান ও দূরদর্শিতা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, এ আয়াতটির ছন্দ ও ভাষাগত কাঠামো প্রথম রুকু থেকে ভিন্ন ধরনের। এটি দীর্ঘ আয়াত এবং এতে স্থীতি ও প্রশান্তির প্রতিফলন ঘটেছে।

সূরাটি তার উভয় অংশের সম্মিলিত রূপ নিয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে তুলে ধরেছে। এর শুরু হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক স্নেহময় সম্বোধন ও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমর্পণের মধ্য দিয়ে। তারপর রাত জেগে নামায পড়া. কোরআন তেলাওয়াত করা, একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করা, একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা, দুঃখ কষ্ট ও নিপীড়নের ওপর ধৈর্য অবলম্বন, প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভালোভাবে পরিত্যাগ করা এবং তাদেরকেও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে একা ছেড়ে দেয়া, যাতে তিনি তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন এই সব বিষয় সূরায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অবশেষে সূরার উপসংহার টানা হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল' এই প্রশান্ত ও করুণাসিক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

এ সূরার উভয় রুকুতে রসূল (স.)-এর প্রিয় ও আল্লাহর মনোনীত সেই আদর্শ মোমেনদের দলটির মহৎ গুনাবলী চেষ্টা সাধনার ও প্রশংসা করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা, দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পার্থিব স্বার্থের মোহমুক্ত থাকা, প্রভৃতি মহৎ গুণাবলীতে তারা ভূষিত ছিলেন।

এবার সূরাটির তাফসীর আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

**তাফসীর**

'হে কম্বলাচ্ছাদিত! ওঠো।'

মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, 'ওঠো।' অর্থাৎ যে গুরুদায়িত্ব তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তা পালনের জন্যে জাগ্রত হও। অক্লান্ত চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করার জন্যে ওঠো। ঘুম ও বিশ্রামের সময় আর নেই। ওঠো, এই দায়িত্বের জন্যে প্রস্তুতি নাও। এটি একটি গুরুতর উক্তি। এ উক্তি দ্বারা রসূল (স.)-কে তাঁর আয়েশী বিছানা থেকে তুলে নিয়ে কষ্টকর সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ রাজপথে নিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সমান ভাবে সংগ্রাম পরিচালানার জন্যে তাঁকে তাঁর সুখের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্যে জীবন ধারণ করে, তার পক্ষে সুখ-শান্তির মধ্যে জীবন কাটানো সম্ভব হতেও পারে, সে নগন্য তুচ্ছ মানুষ হিসেবেই বাঁচে এবং নগন্য অবস্থাতেই মারা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে যে ব্যক্তি বড় ও মহৎ হয় এবং বড় দায়িত্ব গ্রহণ করে তার ঘুম আসে কি করে? তার বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? আরামদায়ক বিছানার সাথে তার কিসের সম্পর্ক? আয়েশী জীবন যাপন তার কিভাবে সম্ভব? বিলাসী ও আয়েশী আসবাবপত্র সে পাবে কোথায়? এই বাস্তবতা রসূল (স.) বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হযরত খাদীজা (রা.) যখন তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে বললেন, তখন বললেন, 'ঘুমের যুগ আমার শেষ হয়ে গেছে খাদীজা।'

বাস্তবিকই তাঁর ঘুমের যুগ শেষে হয়ে গিয়েছিলো এবং জাগরণ, কষ্ট ও দীর্ঘ সংগ্রাম ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ফিরে আসেনি।

## রাত জেগে এবাদাতের গুরুত্ব

'হে কম্বলাচ্ছাদিত! রাত জাগো। তবে কিছু সময় বাদ দিয়ে। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী। আর 'তারতীল' সহকারে কোরআন পড়ো।'

এ হচ্ছে রেসালাতের বৃহত্তম দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতিপর্ব। আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় এ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এর ভেতরে রয়েছে রাত্রি জাগরণ। এর সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো অর্ধেকের বেশী ও দুই তৃতীয়াংশের কম। আর ন্যুনতম হচ্ছে এক তৃতীয়াংশ। নামায ও তারতীলসহ ধীরে ধীরে কোরআন পাঠের মধ্য দিয়ে এই রাত জেগে কাটাতে হবে। আরো অবতীর্ণ হচ্ছে কোরআনকে টেনে টেনে ধীরে সুস্থে ও বিশুদ্ধভাবে কোনো কৃত্রিম সূর ছাড়া পড়ো।

বিশুদ্ধ রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রসূল (স.) এগারো রাকাতের বেশী নামায পড়তেন না। তবে এ কয় রাকাতেই তাঁর রাতের দুই তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে সামান্য কিছু কম কেটে যেতো। কেননা তিনি নামাযে 'তারতীল' সহকারে কোরআন পড়তেন।

মোসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, সাঈদ বিন হিশাম ইবনে আব্বাসের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, রসূল (স.) কিভাবে বেজোড় সংখ্যক নামায পড়তেন?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.) সবচেয়ে ভালো জানেন, তার কাছে জিজ্ঞাসা করো। তিনি কি জবাব দেন আমাকে জানিও।

সাঈদ ইবনে হিশাম বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে বললাম, হে উম্মুল মোমেনীন, আমাকে জানান রসূল (স.) এর চরিত্র কেমন ছিলো।

তিনি বললেন, তুমি কি কোরআন পড়োনা?

আমি বললাম, হাঁ, পড়ি।

তিনি বললেন, কোরআনই ছিলো রসূল (স.) এর চরিত্র।

এ কথা শোনার পর আমি চলে আসতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে পড়লো, রসূল (স.) রাত্রি জেগে নামায পড়ার বিষয়।

আমি বললাম, হে উম্মুল মোমেনীন! রসূল (স.) কি রকম রাত জেগে নামায পড়তেন তা আমাকে বলুন।

তিনি বললেন, তুমি সূরা আল মোযযাম্মেল পড়ো না?

আমি বললাম, হাঁ, পড়ি।

তিনি বললেন, এ সূরার প্রথমাংশে রাত জেগে নামায পড়াকে ফরয করা হয়েছিলো। ফলে রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীরা রাত জেগে নামায পড়তে লাগলেন। পুরো এক বছর এভাবে রাত জেগে নামায পড়ায় তাদের পা ফুলে গেলো। এ সূরার শেষাংশকে আল্লাহ তায়ালা বারো মাস আকাশে আটকে রাখলেন। তারপর সূরার শেষভাগে আংশিক অব্যাহতির বিধান নাযিল করলেন। তখন থেকে রাত জাগা নফল হয়ে গেলো। অথচ ইতিপূর্বে তা ফরয ছিলো।

এরপর আমি বিদায় নেয়ার উদ্যোগ নিলাম সহসা মনে পড়লো রসূল (স.) এর বেজোড় সংখ্যক নামায পড়ার বিষয়।

আমি বললাম, হে উম্মুল মোমেনীন! রসূল (স.)-এর বেজোড় সংখ্যক নামায পড়ার বিষয়টি আমাকে জানান।

তিনি বললেন, আমরা রসূল (স.)-এর মেসওয়াক ও ওযুর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা যেভাবে তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতে চাইতেন জাগাতেন। তিনি জেগে

মেসওয়াক করতেন, ওযু করতেন অতপর আট রাকাত নামায পড়তেন। এই আট রাকাতের একেবারে শেষে ছাড়া বসতেন না। অষ্টম রাকাতে বসে আল্লাহর যেকের করতেন, দোয়া করতেন; কিন্তু সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একই নিয়মে নবম রাকাত শেষ করে সালাম করতেন। এরপর দু'রাকাত বসে বসে পড়তেন। এই হচ্ছে এগারো রাকাত। রসূল (স.) যখন বয়োবৃদ্ধ হলেন, তখন সাত রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে আরো দু'রাকাত পড়তেন। এভাবে নয় রাকাতও পড়তেন। আর রসূল (স.) যখন কোনো নামায পড়তেন, তা অব্যাহত রাখা পছন্দ করতেন। কোনো অসুখ, কিংবা ঘুমের কারণে রাতে জাগতে না পারলে তিনি দিনের বেলায় বারো রাকাত পড়তেন। রসূল (স.) কখনো একই রাতে সকাল পর্যন্ত পুরো কোরআন পড়েছেন বলে আমার জানা নেই। রমযান ছাড়া তিনি এক নাগাড়ে একমাস কখনো রোযা রাখতেন না। (যাদুল মা'য়াদ)।

**কঠোর সংগ্রামের প্রস্তুতি**

এতসব চেষ্টা সাধনার মূল উদ্দেশ্য ছিলো অচিরেই তার ওপর যে দুর্বহ বাণী নাযিল হবে, তার জন্যে তাঁকে প্রস্তুত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় আমি অচিরেই তোমার ওপর ভারী বাণী নাযিল করবো।'

বস্তুত, সেই ভারী বাণী কোরআন এবং কোরআন সংক্রান্ত অন্যান্য দায়দায়িত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও কোরআন তার আংগিক ও ভাষাগত কাঠামোর দিক দিয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য এবং উচ্চারণে তা একেবারেই হালকা, কিন্তু সত্যের দাঁড়িপাল্লায় তা খুবই ভারী এবং মানুষের মন-মগযে প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়েও তা গুরুভার। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আমি যদি এই কোরআনকে পর্বতের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে যেতে দেখতে।'

এ থেকে স্বভাবতই বুঝা যায় যে, যে হৃদয়ের ওপর আল্লাহ তায়ালা কোরআন নাযিল করেছেন, তা পর্বতের চেয়েও শক্ত ও মযবুত।

আল্লাহর এই জ্যোতির্ময় ওহী ও অদৃশ্য জগতের জ্ঞানকে অর্জন করা খুবই কঠিন তাই এ কাজের যোগ্যতা অর্জনে দীর্ঘ প্রস্তুতি ও অনুশীলনের প্রয়োজন। মহাবিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যাবলীকে ধারণ করাও খুবই কঠিন ব্যাপার এবং এ কাজও দীর্ঘ প্রস্তুতি সাপেক্ষ। আল্লাহর ঘনিষ্টতম ফেরেশতাদের সাথে এবং সৃষ্টি জগতের জীব ও জড়ের প্রাণ শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপনও কঠিন কাজ আর এ কাজের জন্যে ও দীর্ঘ প্রস্তুতি অপরিহার্য। আর কোনো রকমের সংকোচ ও দোদুল্যমানতা ছাড়া এবং হাজারো রকমের বাধা বিঘ্ন ও প্রলোভন উপেক্ষা করে দৃঢ়ভাবে ও একাগ্র চিত্তে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজে নিয়োজিত থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং তা দীর্ঘ প্রস্তুতি ছাড়া সম্ভব নয়।

সকল মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন রাত জেগে নামায পড়া, নিত্যদিনের খুটিনাটি ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং তাঁর আলোকে আলোকিত হওয়া, আল্লাহর সাথে নিভৃতে ও নিরিবিলিতে মিলিত হওয়া, সমগ্র প্রকৃতি যখন নিঝুম নিস্তব্ধ, তখন 'তারতীলের' সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা, যাতে মনে হয় কোরআন বুঝি এখনই ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল হচ্ছে এবং আশপাশের প্রকৃতিতে যেন তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে কোরআন অধ্যয়নের সুফলগুলো আহরণ করা এই সব কাজই হচ্ছে আল্লাহর এই দুর্বহ ও গুরুগম্ভীর বাণীকে গ্রহণের প্রস্তুতি ও অনুশীলন।

এই প্রস্তুতি এবং কঠিন ও প্রাণান্তকর সাধনা প্রত্যেক নবীর এবং প্রত্যেক প্রজন্মের ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যেই অপরিহার্য। তাদের কঠিন সাধনার পথে চলার জন্যে এটা প্রয়োজনীয় মনোবল যোগায়, শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে তাদের রক্ষা করে এবং অন্ধকারে পথ হারানোর ঝুঁকি থেকে তাদের নিরাপত্তা দেয়।

**সংযমের মাধ্যমে সংগ্রামের প্রস্তুতি**

'রাতে বিছানা থেকে ওঠা আত্ম সংযমের জন্যে অত্যন্ত কার্যকর এবং আবৃত্তির জন্যে অধিকতর উপযোগী।'

'নাশেআতুল্লাইল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে এশার পরবর্তী রাত্রি ভাগে জাগ্রত হওয়া। মোজাহেদের মতে, আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, রাত্রের এই অংশে ঘুম থেকে জেগে এবাদত করা শরীরের পক্ষে অধিকতর কষ্টকর এবং অধিকতর স্থায়ী কল্যাণের নিশ্চয়তাদায়ক। কেননা সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ঘুমের প্রবল আহবান ও বিছানার দুর্ণিবার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে আল্লাহর এবাদাত করা নিসন্দেহে কঠোরতর দৈহিক সাধনা। শুধু তাই নয়, এটা আত্মার আধিপত্যের ঘোষণা, আল্লাহর আহবানে সাড়া দান এবং আল্লাহর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তার ত্যাগ স্বীকারের শামিল। এজন্যে যথার্থভাবেই বলা হয়েছে, 'এটা আবৃত্তির জন্যে অধিকতর উপযোগী।'

কেননা গভীর রাতের যেকের বড়ই মযাদার, নামায খুবই একাগ্রতা সৃষ্টিকারী এবং মোনাজাত হৃদয়ে খুবই স্বচ্ছতা আনয়নকারী। গভীর রজনী মানুষের হৃদয়ে প্রেম, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য এনে দেয়। দিনের বেলার নামায বা যেকেরে তা নাও পাওয়া যেতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা হৃদয়ের স্রষ্টা তাই হৃদয়ের প্রবেশদ্বার ও তার সংযোগকাল তিনিই ভালো চেনেন, তিনিই ভালো জানেন হৃদয়ে কি প্রবেশ করে ও তার ওপর কোন জিনিসের কেমন প্রভাব হয়। কোন কোন সময়ে হৃদয় কিছু গ্রহণের জন্যে অধিকতর প্রস্তুত বা যোগ্য হয় এবং কোন জিনিস হৃদয়কে অধিকতর আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা মোহাম্মদ (স.)-কে এই গুরুভার বাণী গ্রহণের যোগ্য বানানোর উদ্দেশ্যে এবং এর জন্যে প্রয়োজনীয় বিরাট ও কষ্টকর সাধনা ও সংগ্রামের উপযুক্ত বানানোর উদেশ্যে তাঁর জন্যে রাত জেগে এবাদাত করার কর্মসূচী মনোনীত করেছেন। কেননা রাত জাগা এ ব্যাপারে অধিকতর উপকারী। তাছাড়া দিনের বেলায় যেহেতু তার অনেক কাজ ও ব্যস্ততা রয়েছে এবং তাতে অনেক সময়, শ্রম ও মনোযোগ খাটাতে হয়, তাই এ জন্যে রাতের এই অংশকে বেছে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'দিনের বেলায় তোমার অনেক ব্যস্ততা রয়েছে।' কাজেই এইসব তৎপরতায় দিনের সময় ব্যয় করা উচিত আর রাত্রিকালকে আল্লাহর জন্যে তথা নামায ও যেকেরের কাজে ব্যয় করা উচিত। 'আর তোমার প্রভুর যেকের করো এবং তাঁর দিকে ঘনিষ্ট হও।'

আল্লাহ তায়ালা যেকের কেবল একশত দানা বা হাজার দানা তাসবীহ গণনা করা, মুখে আল্লাহর নাম জপ করার নামই নয়। যেকের হচ্ছে সদা সচেতন হৃদয় দিয়ে স্মরণ করা এবং একই সাথে জিহবা দিয়ে উচ্চারণ বা জপ করা। অথবা নামায় পড়া ও নামাযে কোরআন পড়া। আর 'তাবাত্তুল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং এবাদাত ও যেকের দ্বারা তার দিকে সর্বতোভাবে মনোযোগী হওয়া। যাবতীয় পার্থিব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত আবেগ অনুভুতি নিয়ে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া।

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার (তাবাত্তুল) উল্লেখ করার পরপরই জানানো হয়েছে যে, বাস্তবিক পক্ষেও আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ এমন নেই, যার দিকে মনোনিবেশ করা যেতে পারে।

'পূর্ব ও পশ্চিমের অধিপতি তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, কাজেই তাঁকেই সহায় হিসাবে গ্রহণ করো।'

বস্তুত, তিনি যখন পূর্ব ও পশ্চিম সর্ব দিকের প্রভু, একক ও অদ্বিতীয় প্রভু এবং তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করার অর্থ হলো এ বিশ্ব জগতের একমাত্র সত্যের দিকে মনোনিবেশ করা, আর তার ওপর নির্ভর করার অর্থ বিশ্ব জগতের একমাত্র শক্তির ওপর নির্ভর করা।

বস্তুত একমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভর করা, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসেরই প্রত্যক্ষ ও স্বতস্ফূর্ত ফল। তাঁর পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু হওয়ার অর্থ সমগ্র মহাবিশ্বের প্রভু হওয়া। রসূল (স.)-কে তাঁর দুর্বহ দায়িত্ব বহন করার জন্যে রাত্র জাগরনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এতে করে বুঝা যায় শুরু থেকেই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সব কিছুকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়া। কেননা একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই তিনি এই ভারী দায়িত্ব বহন করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার শক্তি ও পাথেয় যোগাড় করতে পারেন।

### দাওয়াতের কাজে ধৈর্য অপরিহার্য

অতপর আল্লাহ তায়ালা তার রসূলকে সর্বাত্মক ধৈর্যধারনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর জাতির পক্ষ থেকে ক্রমাগত যে উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অপবাদ, অবরোধ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন তিনি হয়ে আসছেন, তার জন্যে সবরের উপদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে আরো বলেছেন যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যাতে আমি উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি সে জন্যে তাঁর ও প্রত্যাখ্যানকারীদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াও, একটু সময় দাও ও অপেক্ষা করো। কেননা আমার কাছে তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা যে সব কথা বলে, তার ওপর ধৈর্যধারণ করো এবং তাদেরকে পুরোপুরিভাবে বর্জন করো।' (১০ থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত)

সূরার প্রথমাংশ নবুওতের সূচনাকালে নাযিল হয়েছে এ বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার এই আটটি আয়াত একটু বিলম্বে প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়ার পর্ব শুরু হওয়ার পর নাযিল হয়ে থাকতে পারে। এই পর্বে দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান, তার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং রসূল (স.) ও মোমেনদের ওপর যুলুম নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু অপর বর্ণনাটি শুদ্ধ হয়ে থাকলে সূরার প্রথম রুকুর পুরোটাই রসূল (স.) মোশরেকদের অত্যাচার ও বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার পর নাযিল হয়ে থাকবে।

যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাতের বেলা নামায ও যেকেরের আদেশ দেয়ার পরই সবরের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ দুটো কাজকে প্রায়ই এক সাথে করতে নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, যাতে দাওয়াতের দীর্ঘ কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মনোবল বহাল থাকে। এই কষ্টকর পথের মাঝে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ইসলামের পথ রোধকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই এই উভয় লড়াই একাকার হয়ে গেছে। এই দুটোই কঠিন লড়াই। আর যেহেতু ধৈর্যের আদেশ অনেক সময় ক্রোধ ও আক্রোশ বৃদ্ধি করে, তাই তার পরেই আদেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে সম্পূর্ণ বর্জন

করার। কেননা বর্জনে আর কোনো ক্রোধ ও আক্রোশ থাকে না। মক্কার প্রথম দিককার দাওয়াতের কর্মসূচী এভাবেই প্রণয়ন করা হয়েছিলো। সাধারণত, কেবলমাত্র হৃদয় ও বিবেককেই আবেদন জানানো হতো এবং আবেদনটা হতো নিরেট উপদেশ ও পথনির্দেশনামূলক।

চরম ঔদ্ধত্য সহকারে দাওয়াতের বিরোধীতা ও রসূলকে মিথ্যাবাদী ঠাওরানোর মতো আচরণের পর পুরোপুরি বর্জন করা যেকেরের পর ধৈর্যেরও দাবী জানায়। ধৈর্যের উপদেশ আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল নবীকেই একাধিকাবার দিয়েছেন। সাধারণ মোমেনদেরকেও দিয়েছেন। বস্তুত, ধৈর্য ছাড়া আর যাই করা যাক, দাওয়াতের কাজ করা যায় না। সবরই এ কাজের ঢাল ও অস্ত্র। ধৈর্যই এ কাজের পাথেয়। ধৈর্যই দাওয়াতী কাজের কর্মীর আশ্রয়স্থল।

ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে আসলে এক সর্বাত্মক জেহাদ। এখানে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করতে হয়। প্রবৃত্তির কূ-প্ররোচনা, অসৎ কামনা-বাসনা, বিপথগামিতা, অবাধ্যত হতাশা, দুর্বলতা ও একগুয়েমীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। আবার দাওয়াতের শত্রুদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয়। লড়াই করতে হয় তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, তাদের উপায় উপকরণের বিরুদ্ধে এবং তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে। আবার সাধারণ মানুষের সাথেও এক ধরনের লড়াই চলতে থাকে।

কেননা তারা এই দাওয়াতের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায়না, তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। নানা রকমের ওযর আপত্তি তুলে তার বিরোধীতা করে তারা কোনো অবস্থার ওপরই স্থীতিশীল থাকে না। দাওয়াত দাতার এই সব পরিস্থিতিতেই ধৈর্য ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আর যেকের প্রায় ক্ষেত্রেই ধৈর্যের সহযোগী ও সহায়ক।

আল্লাহ তায়ালা প্রচন্ড হুমকি দিয়ে বলেন, 'আমার ও দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী বিত্তশালীদের মাঝখান থেকে সরে যাও এবং তাদেরকে একটু অবকাশ দাও।' ভাববার বিষয় যে, মহাশক্তিধর মহাপরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী আল্লাহ তায়ালা এই হুমকি দিচ্ছেন ইসলামের শত্রুকে, যে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। আর হুমকিদাতা হচ্ছেন তিনি, যিনি তাদেরকে এবং এই প্রকান্ড বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, তাও শুধুমাত্র একটি 'কুন্' (হও) শব্দ দ্বারা, এর বেশী নয়।

### দায়ী'র কাজ শুধু দাওয়াত পৌঁছে দেয়া

আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমাকে ছেড়ে দাও, ওদেরকে আমিই দেখে নেবো। এ দাওয়াত তো আমারই দাওয়াত। তোমার তো এটা পৌঁছানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। ওরা এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে তো করতে দাও। ওদেরকে তুমি ত্যাগ কর। ওদেরকে কিভাবে জব্দ ও শায়েস্তা করতে হয়, তা আমি দেখবো। সে দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও। তাদের চিন্তা তোমার করার দরকার নেই। তুমি শান্ত ও স্থির থাকো।

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তায়ালা যখন এই সকল নগন্য ও দুর্বল সৃষ্টিকে হুমকি দেন, তাদেরকে শায়েস্তা করার চরমপত্র দেন, তখন বুঝতে হবে তাদের মহা দুর্যোগ ও সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। তারা যত বড় বিত্তশালী ও প্রতাপশালীই হোক না কেন, তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই। বলা হয়েছে, 'তাদেরকে সামান্য সময় দাও।'

গোটা পার্থিব জীবন পরিমাণ সময়ও যদি তাদের দেয়া হয়, তাও সামান্য মাত্র। কারণ দুনিয়ার জীবন আল্লাহর হিসাবে এক দিন বা তারও কম সময়ের সমান। এমনকি কেয়ামতের দিন

খোদ মানুষের কাছেও দুনিয়ার জীবনকে এক ঘন্টার মত মনে হবে। আর তারা যদি পৃথিবীর গোটা জীবনেও কোনো শাস্তি বা প্রতিশোধের সম্মুখীন না হয়, তবে পরবর্তী জীবনে কঠোরতর শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত।

'আমার কাছে শাস্তি রয়েছে, দোযখ রয়েছে এবং কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।'

বস্তুত যারা বিপুল সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েও সেই সম্পদের কদর করেনি ও শোকর করেনি এই সব কষ্টদায়ক আযাবই তাদের জন্যে উপযুক্ত। অতএব, হে মোহাম্মদ! তুমি সবর করো এবং ধৈর্যধারণ কর। এদের উপযুক্ত শাস্তি আমার কাছে রয়েছে। তারা জাহান্নামে দগ্ধ হবে, কয়েদখানায় আবদ্ধ হবে, গলায় কাঁটা ফুটে যাওয়া খাদ্য গ্রহণ করবে এবং নানা রকম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

**কেয়ামতের ভীতিকর দৃশ্য**

অতপর কেয়ামতের দিনের দৃশ্য অংকন করা হচ্ছে, 'যেদিন পৃথিবী ও পাহাড় প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।'

এত বড় বড় পাহাড় পর্বত যখন ভয়ে কাঁপবে ও চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস হবে তখন ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষের কি অবস্থা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এরপর বিত্তশালী ইসলাম বিরোধীদেরকে প্রতাপশালী ফেরাউনের করুণ পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের ওপর সাক্ষী, যেমন ফেরাউনের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম। ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করলো, ফলে আমি তাকে শক্তভাবে পাকড়াও করলাম। কেয়ামতের দিন পৃথিবী ও পাহাড়ের কম্পন ও ধ্বংসের দৃশ্য দেখানোর পর ফেরাউনের করুণ পরিণতি সংক্ষেপে বর্ণনা করে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবী ও পাহাড়ের যে পরিণতি সেটা আখেরাতের পরিণতি, আর ফেরাউনের যে পরিণতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে দুনিয়ার পরিণতি। কাজেই ইসলামের দুশমনদের এই পরিণতি থেকে রেহাই নেই।

'কিভাবে তোমরা রক্ষা পাবে যদি কুফরি করো, যেদিন শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, আকাশ ফেটে যাবে .....

কেয়ামতের সেই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের চিত্রটি মোটামুটি এরূপ দাঁড়াচ্ছে যে, পৃথিবী ও পাহাড় প্রকম্পিত হবে, ভেংগে চুরমার হবে, তারপর আকাশও ফেটে যাবে এবং শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কোরআন এভাবে এ দৃশ্যটিকে শ্রোতাদের অনুভূতিতে একটি বাস্তব ঘটনার আকারে পেশ করেছে। এরপর পুনরায় জোর দিয়ে বলছে, 'আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হবে।' অর্থাৎ সে ওয়াদার কোনো ব্যতিক্রম হবে না। আর আল্লাহ তায়ালা যা চান করেন, যা ইচ্ছা করেন তাই হয়।

এই ভীতি সৃষ্টি করার পর মানুষকে এই বলে সচেতন করে তুলছেন যে, তারা যেন শান্তি ও নিরাপত্তার যে পথ আল্লাহ তায়ালা দেখিয়েছেন তা গ্রহণ করে।

'এ হচ্ছে স্মরণিকা– যার ইচ্ছা হয়, সে যেন তার প্রতিপালকের অভিমুখে যাত্রা করে।'

বস্তুত আল্লাহর অভিমুখী পথ সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ। সন্দেহ সংশয় ও ভীতি শংকা মুক্ত পথ। এ আয়াতগুলো একদিকে যেমন দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের মনোবল ভেংগে দিয়েছে,

অপরদিকে তেমনি রসূল (স.) ও মুষ্টিমেয় সংখ্যক দুর্বল মোমেনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস, আস্থা ও আশার আলো প্রজ্জলিত করেছে। তাদেরকে এই মর্মে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা তাদেরই সাথে আছেন। তাদের শত্রুকে হত্যা করবেন, আটক করবেন এবং ক্ষুদ্র একটি মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে সময় দেয়া হবে। তারপরই ফয়সালা চুকিয়ে দেয়া হবে। তখন তাদেরকে জাহান্নামে ঢোকানো হবে এবং কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুশমনদেরকে যদিও সময় দেন, কিন্তু তাঁর বন্ধুদেরকে তাঁর শত্রুদের আগ্রাসন ও অত্যাচারের মুখে তাদের চিরদিন অসহায় ছেড়ে দেন না।

এরপর আসছে সূরার দ্বিতীয় অংশ তথা দ্বিতীয় রুকু। মাত্র একটি আয়াতের মাধ্যমে রসূল (স.) ও মোমেনদের রাত জেগে নামায পড়ার পরিশ্রমকে অপেক্ষাকৃত সহজ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের নিষ্ঠার ও আনুগত্যের কথা জানতেন। রাতে দীর্ঘ সময় কোরআন পড়ার কারণে তাদের পা ফুলে গিয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে কোরআন পাঠ ও নামায পড়ার জন্যে এতো কষ্ট দিতে চাননি। মূলত আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরবর্তী জীবনে যে বিরাট দায়িত্বের মুখোমুখী হতে হবে তার জন্যে তৈরী করতে চেয়েছিলেন।

আয়াতটির ভাষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এতে আদর, স্নেহ ও আশ্বাস দানের ভংগী রয়েছে। 'তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি ও তোমার সহকর্মী দলটি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কম, রাতের অর্ধেক ও এক তৃতীয়াংশ নামায পড়ে কাটাও।'

অর্থাৎ তিনি তোমাকে দেখেছেন এবং তোমার নামায তাঁর দাঁড়িপাল্লায় গৃহীত হয়েছে। ....... তিনি জানেন যে তুমি ও তোমার সংগীরা শয্যা ত্যাগ করেছো, রাতে বিছানার আরাম ভোগ করার আহবানে সাড়া না দিয়ে আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়েছো। আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর সহানুভুতিশীল হয়েছেন এবং তোমার ও তোমার সংগীদের জন্যে রাতের কাজ কিছুটা কমিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'রাত ও দিনকে (ছোট বড়ো করার) পরিকল্পনা আল্লাহ তায়ালাই করেন।'

এ জন্যে কতক রাতকে বড় ও কতক রাতকে ছোট করেন। কিছু রাত ছোট কিছু রাত বড় হয়। তুমি ও তোমার সাথীরা সবসময় রাতের এক তৃতীয়াংশ, অর্ধেক কিংবা দুই তৃতীয়াংশ জেগে কাটাও। এটা অব্যাহত রাখার মতো সবল, তোমরা নও, তা তিনি জানেন। তিনি তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না। তিনি চেয়েছিলেন তোমাদেরকে প্রস্তুত করতে। তোমরা এখন প্রস্তুত হয়ে গেছো। কাজেই এখন রাত জেগে এবাদাতের পরিমাণ কমাও। এখন জিনিসটাকে সহজ করে নাও।

'কোরআনের যতটুকু সহজে পড়া যায় ততটুকু পড়ো।'

অর্থাৎ রাতের নামাযে যতোটুকু পড়লে কষ্ট না হয় ততেটুকু পড়ো। আল্লাহ তায়ালা এটাও জানেন যে, তোমাদের আরো অনেক করণীয় কাজ আছে। সেসব কাজেও শক্তি ও শ্রম ব্যয় হবে। সেসব কাজ করতে হলে এখন দীর্ঘ সময় রাত জাগা খুবই কষ্টকর হবে।' আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, তোমাদের অনেকে রুগ্ন হয়ে পড়বে।' ফলে এভাবে লম্বা সময় ধরে রাত জেগে নামায পড়া তাদের পক্ষে কঠিন হবে।

'অন্যরা পৃথিবী সফর করবে আল্লাহর অনুগ্রহ আহরণের জন্যে।'

অর্থাৎ জীবিকা উপার্জনের জন্যে পরিশ্রম করবে। এটা জীবনের অপরিহার্য কাজ। আল্লাহ তায়ালা চান না, তোমরা তোমাদের জীবনের জরুরী প্রয়োজনকে উপেক্ষা করো এবং সন্যাসীদের মত শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক এবাদাতের জন্যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। 'আরেক দল আল্লাহর পথে লড়াই করবে।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা অচিরেই লড়াই-এর মাধ্যমে তোমাদের ওপর যুলুমের প্রতিশোধ নেয়ায় অনুমতি দেবেন এবং পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা ওড়ানোর জন্যে জেহাদ করতে বলবেন, তা তিনি জানেন। অথচ ইসলাম বিরোধীরা এর খুবই ভয় করে। অতএব, নিজেদেরকে এই কড়াকড়ি থেকে কিছুটা অব্যাহতি দাও।

'কোরআন যতোটা সহজে পড়তে পার তাই পড়।' অর্থাৎ বিনা কষ্টে যা পারা যায় তাই পড়ো এবং ইসলামের ফরয কাজগুলোর ওপর অবিচল থাকো।

'নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও।' 'তারপর আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দাও, যার শুভ ফল তোমরা পাবে।'

আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হও। কেননা মানুষ যতোই ভালো ও সৎ কাজ করতে চেষ্টা করুক, তার ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

প্রথমে রাত জেগে নামায পড়ার আহবান জানানো হয়েছিলো। তার এক বছর পর এই আদেশটি আসে। এতে রয়েছে স্নেহ, দয়া, ভালোবাসা ও সহজীকরণের উদার মনোভাবের প্রতিফলন। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে রাত জেগে নামায পড়াকে (এশা বাদে) ফরয নয় নফল বলে ঘোষণা করলেন। তবে রসূল (স.) তার আগের নিয়ম অব্যাহত রাখলেন। রাতের এক তৃতীয়াংশের কম নামায পড়তেননা। গভীর রাতে তিনি মোনাজাত করতেন। আর এ থেকে জীবনের ও জেহাদের পাথেয় ও বল আহরণ করতেন। অবশ্য তিনি এ ছাড়াও সর্বক্ষণ যেকেরে লিপ্ত থাকতেন এবং তার চোখে ঘুম আসলেও তাঁর মন কখনো ঘুমাতো না।

# সূরা আল মোদ্দাসৃসের

আয়াত ৫৬ রুকু ২

**মক্কায় অবতীর্ণ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ

فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾ فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ﴿٨﴾

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِىْ وَمَنْ

خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿١١﴾ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ﴿١٢﴾ وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ﴿١٣﴾ وَّمَهَّدْتُّ

لَهٗ تَمْهِيْدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ﴿١٦﴾

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ﴿١٧﴾

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. হে কম্বল আবৃত (মোহাম্মদ), ২. (কম্বল ছেড়ে) ওঠো এবং মানুষদের (পরকালের আযাব সম্পর্কে) সাবধান করো, ৩. তোমার মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো, ৪. আর তোমার পোশাক আশাক পবিত্র করো, ৫. এবং (যাবতীয়) মলিনতা ও অপবিত্রতা পরিহার করো, ৬. কখনো বেশী পাওয়ার লোভে কাউকে কিছু দান করো না, ৭. তোমার মালিকের (খুশীর) উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ করো; ৮. যেদিন (সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, ৯. সেদিনটি (হবে) সত্যিই বড়ো সাংঘাতিক, ১০. (বিশেষ করে এ দিনকে) যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে এ (দিন)-টি মোটেই সহজ (বিষয়) হবে না। ১১. (তার সাথে বুঝাপড়া করার জন্যে) তুমি আমাকেই ছেড়ে দাও, যাকে আমি অনন্য ধরনের (করে) পয়দা করেছি, ১২. তাকে আমি বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ দান করেছি, ১৩. (তাকে দান করেছি) সদা সংগী (এক দল) পুত্র সন্তান, ১৪. আমি তার জন্যে (যাবতীয় সচ্ছলতার উপকরণ) সুগম করে দিয়েছি, ১৫. (তারপরও) যে লোভ করে, তাকে আমি আরো অধিক দিতে থাকবো, ১৬. না, তা কখনো হবে না; কেননা সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর; ১৭. অচিরেই আমি তাকে (শাস্তির) চূড়ায় আরোহণ করাবো;

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ

১৮. সে তো (সত্য গ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা) চিন্তা-ভাবনাও করেছিলো, তারপর (আবার নিজের গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত থাকার) একটা সিদ্ধান্ত করলো, ১৯. তার ওপর অভিশাপ, (সত্য চেনার পরও) কেমন করে সে (পুনরায় বিরোধিতার) সিদ্ধান্ত করলো! ২০. আবারও তার ওপর অভিশাপ (নাযিল হোক), কিভাবে সে এমন সিদ্ধান্ত করতে পারলো, ২১. সে একবার (উপস্থিত লোকদের প্রতি) চেয়ে দেখলো, ২২. (অহংকার ও দম্ভভরে) সে তার ভ্রুকুঞ্চিত করলো, (অবজ্ঞাভরে নিজের) মুখটা বিকৃত করে ফেললো,

### রুকু ২

২৩. অতপর সে (একটু-) পিছিয়ে গেলো এবং সে অহংকার করলো, ২৪. সে (আরো) বললো, এ তো (আসলে) আগের লোকদের থেকে প্রাপ্ত যাদু (-বিদ্যার খেল) ছাড়া আর কিছুই নয়, ২৫. এ তো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়; ২৬. অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। ২৭. তুমি কি জানো জাহান্নাম (-এর আগুন) কি ধরনের? ২৮. (এটা এমন ভয়াবহ আযাব) যা (এর অধিবাসীদের জ্বালিয়ে অক্ষত অবস্থায়ও) ফেলে রাখবে না, আবার (শাস্তি থেকে) রেহাইও দেবে না, ২৯. বরং তা মানুষদের গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে দেবে, ৩০. তার ওপর (আছে) উনিশ; ৩১. আমি ফেরেশতাদের ছাড়া দোযখের প্রহরী হিসেবে (অন্য কাউকেই) নিযুক্ত করিনি এবং তাদের সংখ্যাকে আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে একটি পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি, যেন এর মাধ্যমে যাদের ওপর আমার কেতাব নাযিল হয়েছে তারা (আমার কথায়) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং যারা (আগে থেকেই আমার ওপর) ঈমান এনেছে তাদের ঈমানও এতে করে বৃদ্ধি পেতে পারে, (সর্বোপরি) এর ফলে আহলে কেতাব এবং মোমেনরাও যেন কোনোরকম সন্দেহে নিমজ্জিত না হতে পারে, (অবশ্য) যাদের মনে সন্দেহের ব্যাধি রয়েছে এর ফলে তারা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তিরা বলবে, এ (অভিনব) উক্তি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কী বুঝাতে চান? (মূলত) এভাবেই

اللّٰهُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ
وَمَا هِىَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ
اِذَآ اَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَاۤءَ
مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾ اِلَّآ
اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾ فِىْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَاۤءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ مَا
سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَاۤئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ
الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾ حَتّٰىٓ اَتٰنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾

আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, (আবার একইভাবে) তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন; তোমার মালিকের (বিশাল) বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না, (আর দোযখের বর্ণনা–) এ তো শুধু মানুষদের উপদেশের জন্যেই। ৩২. না, তা কখনো নয়, (আমি) চাঁদের শপথ (করে বলছি), ৩৩. (আরো) শপথ (করছি) রাতের, যখন তা অবসান হতে থাকে, ৩৪. শপথ (করছি) প্রভাতকালের যখন তা (দিনের) আলোয় উদ্ভাসিত হয়, ৩৫. নিসন্দেহে তা হবে (মানুষের জন্যে) কঠিনতম বিপদসমূহের মধ্যে একটি (বিপদ), ৩৬. মানুষের জন্যে (তা হবে) ভয় প্রদর্শনকারী, ৩৭. তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তির জন্যে, যে (কল্যাণের পথে) অগ্রসর হতে চায় এবং (অকল্যাণের পথ থেকে) পিছু হটতে মনস্থ করে; ৩৮. (এখানে) প্রত্যেক মানুষই নিজের কর্মফলের হাতে বন্দী হয়ে আছে, ৩৯. অবশ্য ডান দিকে অবস্থানকারী (নেক) লোকগুলো ছাড়া; ৪০. তারা অবস্থান করবে (চিরস্থায়ী) জান্নাতে। (সেদিন) তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, ৪১. (জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত) পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে, ৪২. (তারা বলবে, হে জাহান্নামের অধিবাসীরা,) তোমাদের আজ কিসে এ ভয়াবহ আযাবে উপনীত করেছে? ৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাযীদের দলে শামিল ছিলাম না, ৪৪. (ক্ষুধার্ত ও) অভাবী ব্যক্তিদের আমরা খাবার দিতাম না, ৪৫. (সত্যের বিরুদ্ধে) যারা অন্যায় অমূলক আলোচনায় উদ্যত হতো আমরা তাদের সাথে যোগ দিতাম, ৪৬. (সর্বোপরি) আমরা আখেরাতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম, ৪৭. এমনকি চূড়ান্ত সত্য মৃত্যু (একদিন) আমাদের কাছে হাযির হয়ে গেলো। ৪৮. তাই (আজ) কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশই তাদের কোনো উপকারে আসবে না;

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

৪৯. (বলতে পারো) এদের কি হয়েছে, এরা এ (সত্য) বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন? ৫০. (অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়) এরা যেন বনের কতিপয় পলায়নপর (ভীত সন্ত্রস্ত) গাধা, ৫১. যা গর্জনকারী বাঘের আক্রমণ থেকে পালাতেই ব্যস্ত; ৫২. কিন্তু তাদের প্রতিটি ব্যক্তিই চায়, (স্বতন্ত্রভাবে) উন্মুক্ত গ্রন্থ তাকে দেয়া হোক, ৫৩. এটা কখনো সম্ভব নয়, (আসলে) এ লোকেরা শেষ বিচারের দিনক্ষণকে মোটেই ভয় করে না; ৫৪. না, কখনো তা (অবজ্ঞার বিষয়) নয়, এটি একটি নসীহত মাত্র, ৫৫. অতএব (এক্ষণে) যার ইচ্ছা সে যেন (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে; ৫৬. (সত্যি কথা হচ্ছে,) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা কখনো (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে না; একমাত্র তিনিই ভয় করার যোগ্য এবং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন ক্ষমার মালিক।

## সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই সূরাটি নাযিল হওয়ার কারণ ও সময় প্রসংগে পূর্ববর্তী সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এ যা কিছু আলোচিত হয়েছে, এই সূরাটির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সেখানে এই মর্মে একাধিক বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এটি সূরা 'আল আলাক'-এর পরে নাযিল হওয়া প্রথম ওহী। অপর একটি বর্ণনা এই মর্মেও উদ্বৃত হয়েছে যে, প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার এবং রসূল (স.)-এর ওপর মোশরেকদের নির্যাতন শুরু হওয়ার পর এটা নাযিল হয়েছে।

ইমাম বোখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, ইয়াহিয়া ইবনে কাসীর বলেন, আমি আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমানকে কোরআনের প্রথম নাযিল হওয়া অংশ কোনটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেন, সূরা আল 'মোদ্দাসসের'।

আমি বললাম, লোকেরা তো বলে সূরা 'আল আলাক্ব।'

আবু সালমা বললেন, আমিও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তুমি আজ আমাকে যা বললে, সে কথা আমিও তাকে বলেছিলাম।

কিন্তু জাবের আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা বলছি তা খোদ রসূল (স.) আমাকে বলেছেন।

তিনি বলেছেন, 'আমি হেরায় কিছুকাল অবস্থান করেছিলাম। সেই অবস্থান শেষ হওয়ার পর নেমে আসতেই শুনলাম কে যেন আমাকে ডাকছে। আমি ডান দিকে তাকালাম। কিছুই দেখলাম

না। অবশেষে ওপরের দিকে তাকাতেই একটা কিছু দেখে সংগে সংগেই আমি খাদীজার কাছে এসে বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও এবং আমার ওপর ঠান্ডা পানি ঢালো। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো এবং আমার ওপর ঠান্ডা পানি ঢালা হলো। এরপরই সূরা 'মোদ্দাসসের' নাযিল হলো।'

মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুসারে রসূল (স.) বলেন, 'আমি চলার সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম। আমি তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে আছেন সেই ফেরেশতা, যিনি হেরার গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন। আমি হাঁটু গেড়ে প্রায় মাটির সাথে মিশে বসে পড়লাম। তারপর আমার পরিবারের কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে ঢেকে দেয়া হলো। এই সময় সূরা 'আল মোদ্দাসসের' নাযিল হলো। এরপর ক্রমাগত ওহী আসতে লাগলো। উল্লেখ্য যে, বোখারীতেও এ হাদীসটি অবিকল একই ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে।

ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে এই হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই বিবরণটিই মনে হয় সংরক্ষিত। আর এ বিবরণ থেকে মনে হয়, এর আগেও ওহী নাযিল হয়েছিলো। কেননা রসূল (স.) বলেছেন, 'দেখলাম যে ফেরেশতা আমার কাছে হেরা গুহায় এসেছিলেন তিনিই ....।'

আসলে তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল। তিনি ইতিপূর্বে সূরা 'আল আলাক্ব' নিয়ে এসেছিলেন। এরপর ওহীর বিরতি ঘটে। তারপর পুনরায় ফেরেশতা নাযিল হয়। সুতরাং দুই বর্ণনার সমন্বয়ের উপায় এই যে, এই সূরা (সূরা মোদ্দাসসের) একেবারে প্রথম নাযিল হওয়া সূরা নয়, বরং বিরতির পর নাযিল হওয়া প্রথম সূরা।

তাবরানীতে অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন ওলীদ ইবনে মুগীরা কোরায়শ বংশের লোকদেরকে দাওয়াত করে বললো, এই লোকটি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?

তখন কেউ বললো, জাদুকর।

কেউ বললো, না, জাদুকর নয়।

আবার কেউ বললো, জ্যেতিষী।

কেউ বললো, না, জ্যেতিষী নয়।

কেউ বললো, কবি।

আবার কেউ বললো, না কবি নয়।

কেউ বললো, বরঞ্চ প্রাচীনকাল থেকে বংশানুক্রমে চলে আসা এটা একটা জাদুমন্ত্র।

অতপর সবাই একমত হলো যে, মোহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রচারিত বাণী বংশানুক্রমে প্রাপ্ত একটা জাদুমন্ত্র।

কাফেরদের এই সমাবেশ ও তাদের অভিব্যক্তি এই মতামতের কথা জানতে পেরে রসূল (স.) ভীষণ মর্মাহত হলেন এবং বিমর্ষ অবস্থায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। এমতাবস্থায় সূরার এই প্রাথমিক আয়াত কয়টি নাযিল হলো!

'হে কম্বলাচ্ছাদিত! ওঠো। সতর্ক করো। তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক পবিত্র করো। অপবিত্রতাকে বর্জন করো। অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। নিজের প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।'

সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এ নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, অবিকল সেটা আলোচ্য সূরা সংক্রান্ত বর্ণনাও হতে পারে। এই অনিশ্চয়তার কারণে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে, এই দুই সূরার মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে এবং কোনটি কোন উপলক্ষে নাযিল হয়েছে।

এ আয়াত কয়টির উদ্দেশ্যে রসূল (স.)-কে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা। অতপর প্রকাশ্যভাবে ও পরিপূর্ণরূপে ইসলামের দাওয়াতদানের মাধ্যমে কোরায়শদের মোকাবেলা করা। এ কাজ করতে গিয়ে স্বভাবতই তাকে নানা রকম নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হবে, আর তার সম্মুখীন হতে হলে তাকে পূর্বাহ্নে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। উভয় সূরার এই প্রথম আয়াত কয়টির পরবর্তী অংশ সম্ভবত কিছুকাল পরে নাযিল হয়েছে, যখন কোরায়শরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, একগুঁয়েমী প্রদর্শন করেছে এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যা অপবাদ ও হীন চক্রান্ত দ্বারা কষ্ট দিয়েছে। তবে উল্লেখিত দুটি সম্ভাবনার যেটিই বাস্তব হোক–এটা মোটেই বিচিত্র নয় যে, উভয় সূরার প্রথমাংশ ও পরবর্তী অংশ এক সাথে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। কেননা উভয়াংশের একটা অভিন্ন প্রেক্ষাপট ও উপলক্ষ্য রয়েছে।

মোট কথা হচ্ছে, রসূল (স.)-কে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং কোরায়শ নেতাদের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির জন্যে রসূল (স.)-এর প্রচন্ডভাবে মর্মাহত হওয়া। এটা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে উভয় সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সূরা 'আল কলাম'-এর মতো হবে। সেই প্রেক্ষাপট আমরা সূরা 'আল কলাম'-এর শুরুতে আলোচনা করেছি।

সূরার নাযিল হওয়ার প্রকৃত কারণ ও উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন, এর প্রথমেই যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীদের সম্বোধন করে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন এবং তাঁকে তাঁর ঘুম, ভীরুতা ও জড়তা কাটিয়ে উঠে জেহাদ, সংগ্রাম ও কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রথম দুটি আয়াতেই এই সম্বোধন ও নির্দেশনা সুস্পষ্ট হয়ে আছে। যথা,

'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো, সতর্ক করো।'

তারপর পরবর্তী ৫টি আয়াতে তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা এবং আল্লাহর নির্দেশিত কার্যক্রমের মাধ্যমে শক্তি আহরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যথা,

'তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষাণা করো, তোমার পোশাক পবিত্র করো, অপবিত্রতাকে বর্জন করো, অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। আর তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।' সূরা মোযযাম্মেলের মতো এখানেও সূরার প্রথমাংশের নির্দেশাবলীর শেষে স্থান পেয়েছে ধৈর্যের আদেশ।

এরপরই সূরায় অংগীভূত হয়েছে আখেরাতকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হুমকি, হুঁশিয়ারী ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ঘোষণা। এ ক্ষেত্রেও সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এর সাথে এ সূরার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিনটি হবে এক কঠিন দিন। ........ অচিরেই আমি তাকে দুরূহ জায়গায় আরোহন করাবো।' (আয়াত ৮-১৭)

'হে কম্বলাচ্ছাদিত! ওঠো। সতর্ক করো। তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক পবিত্র করো। অপবিত্রতাকে বর্জন করো। অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। নিজের প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।'

সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এ নাযিল হওয়ার কারণ প্রসংগে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, অবিকল সেটা আলোচ্য সূরা সংক্রান্ত বর্ণনাও হতে পারে। এই অনিশ্চয়তার কারণে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না যে, এই দুই সূরার মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে এবং কোনটি কোন উপলক্ষে নাযিল হয়েছে।

এ আয়াত কয়টির উদ্দেশ্যে রসূল (স.)-কে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা। অতপর প্রকাশ্যভাবে ও পরিপূর্ণরূপে ইসলামের দাওয়াতদানের মাধ্যমে কোরায়শদের মোকাবেলা করা। এ কাজ করতে গিয়ে স্বভাবতই তাকে নানা রকম নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হবে, আর তার সম্মুখীন হতে হলে তাকে পূর্বাহ্নে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। উভয় সূরার এই প্রথম আয়াত কয়টির পরবর্তী অংশ সম্ভবত কিছুকাল পরে নাযিল হয়েছে, যখন কোরায়শরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, একগুঁয়েমী প্রদর্শন করেছে এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যা অপবাদ ও হীন চক্রান্ত দ্বারা কষ্ট দিয়েছে। তবে উল্লেখিত দুটি সম্ভাবনার যেটিই বাস্তব হোক—এটা মোটেই বিচিত্র নয় যে, উভয় সূরার প্রথমাংশ ও পরবর্তী অংশ এক সাথে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। কেননা উভয়াংশের একটা অভিন্ন প্রেক্ষাপট ও উপলক্ষ্য রয়েছে।

মোট কথা হচ্ছে, রসূল (স.)-কে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা, প্রত্যাখ্যান করা এবং কোরায়শ নেতাদের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির জন্যে রসূল (স.)-এর প্রচন্ডভাবে মর্মাহত হওয়া। এটা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে উভয় সূরার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট সূরা 'আল কলাম'-এর মতো হবে। সেই প্রেক্ষাপট আমরা সূরা 'আল কলাম'-এর শুরুতে আলোচনা করেছি।

সূরার নাযিল হওয়ার প্রকৃত কারণ ও উপলক্ষ্য যাই হোক না কেন, এর প্রথমেই যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবীদের সম্বোধন করে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন এবং তাঁকে তাঁর ঘুম, ভীরুতা ও জড়তা কাটিয়ে উঠে জেহাদ, সংগ্রাম ও কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রথম দুটি আয়াতেই এই সম্বোধন ও নির্দেশনা সুস্পষ্ট হয়ে আছে। যথা,

'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো, সতর্ক করো।'

তারপর পরবর্তী ৫টি আয়াতে তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা এবং আল্লাহর নির্দেশিত কার্যক্রমের মাধ্যমে শক্তি আহরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যথা,

'তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষাণা করো, তোমার পোশাক পবিত্র করো, অপবিত্রতাকে বর্জন করো, অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করো না। আর তোমার প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো।' সূরা মোযযাম্মেলের মতো এখানেও সূরার প্রথমাংশের নির্দেশাবলীর শেষে স্থান পেয়েছে ধৈর্যের আদেশ।

এরপরই সূরায় অংগীভূত হয়েছে আখেরাতকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর হুমকি, হুঁশিয়ারী ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের ঘোষণা। এ ক্ষেত্রেও সূরা 'আল মোযযাম্মেল'-এর সাথে এ সূরার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিনটি হবে এক কঠিন দিন। ........ অচিরেই আমি তাকে দুরূহ জায়গায় আরোহন করাবো।' (আয়াত ৮-১৭)

সূরা আল কলাম-এর মতো সূরা মোদ্দাসসেরও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের মধ্য থেকে একজনকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত করেছে এবং তার অসংখ্য দুরভিসন্ধির মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটির দৃশ্য অংকিত করেছে। সম্ভবত উভয় ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। অনেকের মতে এই ব্যক্তিটি হচ্ছে ওলীদ ইবনে মুগীরা। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আগামীতে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হবে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে-কি কি কারণে আল্লাহ তায়ালা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

'সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং কিছু কথাবার্তা রচনা করার চেষ্টা চালিয়েছে। পুনরায় আল্লাহর অভিশাপ হোক তার ওপর! ....... শেষ পর্যন্ত সে বললো, এতো আর কিছু নয়, আগে থেকে চলে আসা জাদুমন্ত্র মাত্র। এতো মানুষের কথা ছাড়া আর কিছু নয়।' (আয়াত ১৮-২৫)

পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে, 'দোযখে নিক্ষেপ করবো। আর তুমি কি জানো, সে দোযখটা কেমন? তা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, কাউকে ছাড়েও না। চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। তার ওপর উনিশ জন কর্মচারী নিয়োজিত।'

অতপর দোযখের দৃশ্য, দোযখের দায়িত্বশীল উনিশ জন ফেরেশতার উল্লেখ এবং এই উনিশ সংখ্যাটির কথা শুনে মোশরেক ও দুর্বল মোমেনদের মধ্যে হৈ চৈ, সন্দেহ সংশয় বিভ্রান্তি, কুটিল প্রশ্ন ও বিদ্রুপের যে হিড়িক চলেছিলো, সেই প্রসংগে এই সূরার পরবর্তী আয়াতে এই সংখ্যা উল্লেখের পেছনে আল্লাহর কি গভীর ও মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞানের খানিকটা অজানা রহস্য উন্মোচন করে প্রসংগত এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, গায়েব বা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। উন্মোচিত এই অজানা রহস্য গায়েবের প্রতি ঈমানের একটি জরুরী তথ্যের ওপর আলোকপাত করে। আয়াতটির বক্তব্য,

'আমি কিছু সংখ্যক ফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে দোযখের দায়িত্বশীল বানাইনি, আর তাদের সংখ্যা শুধু এ জন্যে উল্লেখ করেছি যেন কাফেররা বিভ্রাটে পড়ে। ....... আর তোমার প্রভুর সৈন্য সামন্তের সংখ্যা কতো, তা কেবল তিনিই জানেন। এই দোযখের উল্লেখ মানুষের জন্যে স্মরণিকা ছাড়া আর কিছু নয়।' (আয়াত ৩১)

অতপর আখেরাত, দোযখ এবং দোযখের দায়িত্বশীলদের বিষয়টির সাথে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মনে চেতনা ও সতর্কতা সৃষ্টির জন্যে উক্ত উভয় প্রকারের নিদর্শনের সাহায্য নেয়া হবে। বলা হয়েছে, 'কখনো নয়, চাঁদের শপথ, পশ্চাদপসরনরত রাতের শপথ এবং বিকাশমান প্রভাতের শপথ। নিশ্চয় দোযখ বড় বড় নিদর্শনসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্যে ভীতি প্রদর্শনকারী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এগিয়ে যেতে যায় অথবা যে ব্যক্তি পিছিয়ে থাকতে চায় তার জন্যে ভীতিপ্রদ।'

অতপর অপরাধীদের ও সৎকর্মশীলদের অবস্থানস্থল বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, অপরাধীরা দীর্ঘ যবানবন্দীতে তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি দেবে এবং যে যে কারণে তারা কেয়ামতের দিন আটকাবস্থায় ও যিম্মী হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, তা খুলে বলবে। তারপর তাদের ব্যাপারে কারো সুপারিশেও যে কাজ হবে না, সে কথাও লক্ষণীয়,

'প্রত্যেক প্রাণী স্বীয় কৃতকর্মের বিনিময়ে যিম্মী হবে। কেবল দক্ষিণ বাহু ওয়ালারা (অর্থাৎ সৎকর্মশীলরা) বাদে। এরা বেহেশতে অবস্থান করে অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করবে, কি কি কারণে তোমরা দোযখে গিয়েছো? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, দরিদ্রদেরকে খাবার

খাওয়াতাম না, আর সত্যের বিরুদ্ধে বাজে কথা রটনাকারীদের সাথে যোগ দিয়ে আমরাও তা রটনা করতাম, আর কর্মফল দেয়ার দিনটিকে অস্বীকার করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই অকাট্য সত্যের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। এই সময় সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।'

কেয়ামতের এই অবমাননাকর দৃশ্য ও অপমানজনক স্বীকারোক্তির প্রেক্ষাপটে কোরআন তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের বর্তমান অভিমত কি জানতে চাইছে। সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়ার ও সময় থাকতে সদুপদেশ গ্রহণের এই আহবান সম্পর্কে তাদের বিবেচনা কি তা জানতে চাইছে। আর সেই সাথে এই দাওয়াত থেকে তাদের বন্য পশুর মতো ছুটে পালানোর একটা হাস্যকর ও বিদ্রুপাত্মক দৃশ্য তুলে ধরেছে। যথা,

'ওদের কি হলো যে, এই স্মরণিকাকে উপেক্ষা করছে, যেন ওরা বাঘ থেকে ছুটে পালানো বন্য গাধা।'

অতপর তাদের সেই মতিভ্রমের রহস্য উম্মোচন করা হচ্ছে, যা তাদেরকে ঘেরাও করে রাখছে এবং পরম হিতাকাংখী উপদেশদাতার দাওয়াত কবুল করতে বাধা দিচ্ছে,

'আসলে তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা যেন তাকে প্রকাশ্য গ্রন্থসমূহ দেয়া হয়।'

বস্তুত এরূপ ইচ্ছার পেছনে রয়েছে রসূল (স.)-এর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ। প্রত্যেকের কাছে আসমানী কিতাব নাযিল করা হোক এই তাদের বাসনা। আর অপর সুপ্ত কারণ হলো তাদের ভীতির অভাব,

'কখনো নয়, আসল কথা হলো, তারা আখেরাতকে ভয় পায় না।'

উপসংহারে এক আপোষহীন ঘোষণার মাধ্যমে সব কিছুকে আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে 'কখনো নয়; নিশ্চয়ই এ এক স্মরণিকা। যার ইচ্ছা, সে এসে স্মরণ করুক। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কেউ স্মরণ করবে না। তিনিই তাকওয়ার উপযুক্ত এবং তিনিই ক্ষমা করার মালিক।'

এভাবে এ সূরা কোরআনের সেই জেহাদের একটি অংশ রূপে বিবেচ্য, যা কোরায়শদের অন্তরে বদ্ধমূল জাহেলিয়াত ও জাহেলী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কোরআন পেশ করেছে। অনুরূপভাবে ইসলামী দাওয়াতের প্রতি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে যে উপেক্ষা প্রদর্শন ও প্রচন্ড শত্রুতার মনোভাব পোষণ করেছিলো এবং নানা চক্রান্ত এসেছিলো, কোরআন তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়েছে।

এদিক দিয়ে সূরা মোযযাম্মেল, সূরা মোদ্দাসসের ও সূরা কলাম-এর বিষয়বস্তুতে এতো সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে, তা দেখলে মনে হয়, এই তিনটি সূরাই কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছিলো। অবশ্য সূরা মোযযাম্মেল-এর শেষাংশ এর ব্যাতিক্রম। কেননা আমরা আগেই বলেছি যে, এ অংশটি রসূল (স.) ও তাঁর সাথীদের একটি গোষ্ঠির বিশেষ রুহানী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিলো।

শব্দগত ও ধ্বনিগত কাঠামো ও আংগিক সৌষ্ঠবের দিক থেকে সূরাটির বিন্যাস চমকপ্রদ। একটি মাত্র আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা ছোট ছোট আয়াতে বিন্যস্ত। অত্যন্ত দ্রুত পড়ে যাওয়া যায়। প্রত্যেক আয়াতের শেষের শব্দগুলো মিত্রাক্ষর। আয়াতগুলো কখনো গুরু কখনো লঘু ছন্দে ছন্দায়িত। বিশেষত, এই কট্টর কাফেরটির চিন্তা পরিকল্পনা, কপাল সংকুচিত করা ও মুখ বাঁকা করার দৃশ্য যেখানে অংকন করা হয়েছে, আর দোযখের দৃশ্য যেখানে এই বলে অংকন করা হয়েছে যে, তা কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখে না ও কাউকে ছাড়ে না। যেখানে তাদের পালানোর চিত্র অংকন করা হয়েছে এই বলে যে, তারা যেন বাঘ দেখে পালানো কতিপয় বন্য গাধা।

এভাবে মর্মগত ও বিষয়গত বিভিন্নতার সাথে সাথে আয়াতের আংগিক বিন্যাস তথা ছন্দগত ও মিত্রাক্ষরজনিত বিভিন্নতা সূরায় সামগ্রিকভাবে একটা বিশেষ ধরনের স্বাদ সৃষ্টি করে। তাছাড়া স্থান বিশেষে এই বিভিন্নতার বিশেষ উদ্দেশ্যও রয়েছে। কোথাও তার উদ্দেশ্য নানা প্রশ্ন ও ধিক্কার তুলে ধরা, কোথাও কাফেরদের দৃষ্কর্মের প্রতি বিদ্রুপ ও উপহাস করা।

**তাফসীর**

এবার সূরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করার প্রয়াস পাবো,

'ওহে কম্বলাচ্ছাদিত! ওঠো, সতর্ক করো...... এবং তোমার প্রভুর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরো।

সূরার এই প্রথম সাতটি আয়াতের প্রথমটিতেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল (স.) কে সম্বোধন করে তাঁকে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, মানব জাতিকে সতর্ক করা, জাগ্রত করা, পার্থিব জীবনের যাবতীয় দুর্দশা ও দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত ও রক্ষা করা, তাকে আখেরাতে দোযখ থেকে মুক্ত করা এবং তাকে সময় থাকতে মুক্তির পথে পরিচালিত করা। এ দায়িত্ব যখন একজন ব্যক্তির ওপর অর্পিত হয়, চাই তিনি নবী বা রসূল যেই হোন না কেন, তখন তা যথার্থই একটা গুরুদায়িত্ব বটে। কেননা মানব জাতি সামগ্রিকভাবে এই দাওয়াতের প্রতি এত বিদ্রোহী, এতো একগুঁয়ে, এতো বিভ্রান্ত এবং এতো বিমুখ যে, যে কোনো মানুষের পক্ষে এই দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। 'তাদের সতর্ক করো।'

**দাওয়াতের দায়িত্ব ও দায়ীর গুণ**

এই সতর্ক করার কাজটি হচ্ছে রেসালাতের প্রধান কাজ, গোমরাহীতে লিপ্ত অচেতন ও উদাসীন লোকদের জন্যে যে আসন্ন ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে, তার সম্পর্কে সাবধান করা। আল্লাহ তায়ালা এই সতর্কীকরণের ব্যবস্থাটি করে তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম করুণাই প্রদর্শন করেছেন। কারণ তারা গোমরাহ হয়ে গেলে বা গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকলে আল্লাহর রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। আর তারা সুপথপ্রাপ্ত হলে আল্লাহর রাজ্যে কোনোই বৃদ্ধি ঘটেনা। তবে তাঁর দয়া ও করুণা তাদেরকে আখেরাতের আযাব থেকে বাচানোর জন্যে এবং দুনিয়ার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্যে হেদায়াতের ও সতর্কীকরণের এই ব্যবস্থা করেছেন। করুণার বশবর্তী হয়েই তিনি মানব জাতিকে আল্লাহর ক্ষমা ও বেহেশত লাভ করার জন্যে নবী ও রসূলদের প্রেরণ করেন, যারা মানবজাতিকে আল্লাহর বিধানের দিকে দাওয়াত দেন।

অন্যদেরকে সতর্ক করার দায়িত্ব অর্পনের পরই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে ব্যক্তিগত গুণাগুণের দিকে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেন, 'তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো।'

এখানে স্বীয় প্রভুর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা ও বর্ণনা করার জন্যে রসূলকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই সাথে এর বর্ণনাভংগীর ভেতরে এই ভাবধারাও সুপ্ত রয়েছে যে, একমাত্র তোমার প্রভুরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। কেননা একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠতম এবং তারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা সমীচীন, অন্য করো নয়। এ নির্দেশটি আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত আকীদার একটি দিকের ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

বস্তুত এ বিশ্ব জগতে যত প্রাণী, বস্তু ও তত্ত্ব আছে, তার সবই ছোট, সবই নগণ্য। একমাত্র আল্লাহই বড়, শ্রেষ্ঠ ও মহান। সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববৃহৎ, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম আল্লাহর সামনে সকল সত্ত্বা, শক্তি, বস্তু, ঘটনা, তত্ত্ব, ইত্যাদি অদৃশ্য ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই ঈমানী আকীদা-বিশ্বাস প্রত্যয় ও চেতনা নিয়ে মানবজাতিকে সতর্ক করা ও তাদেরকে তাদের অশুভ

পরিণতি ও দুর্দশা থেকে নিস্কৃতি দেয়ার দায়িত্ব পালনের জন্যে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। উক্ত চেতনা ও প্রত্যয় নিয়ে যদি তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে তাঁর কাছে সকল ষড়যন্ত্র, সকল বাধা এবং সকল প্রতিকূল শক্তিকে তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মনে হবে, আর একমাত্র আল্লাহই তার কাছে বড় মনে হবে, যিনি তাঁকে এই সতর্কীকরণের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন।

বস্তুত দাওয়াতের কাজে যে কঠিন বাধাবিঘ্ন ও বিপদ মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়, তার মোকাবেলায় টিকে থাকার জন্যে এই চেতনা সর্বক্ষণ হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা প্রয়োজন। সবসময় তার এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, দুনিয়ার সকল শক্তি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, একমাত্র আল্লাহই অজেয় ও পরাক্রান্ত।

এরপর তাঁকে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে, 'তোমার পোশাক পবিত্র করো।'

আরবী ভাষায় পোশাকের পবিত্রতা দ্বারা মনের পবিত্রতা ও কর্মের পবিত্রতা এককথায় গোটা সত্ত্বা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর পবিত্রতা বুঝানো হয়। আর পবিত্রতা হলো এমন একটি অবস্থার নাম, যা মানুষকে আল্লাহর ঘনিষ্টতম ফেরেশতাদের কাছ থেকে বাণী গ্রহণের যোগ্য বানায়। এই অবস্থাটা রেসালাতের প্রকৃতির সাথেও সামঞ্জস্যশীল। সতর্কীকরণ ও ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালনের এটি হচ্ছে অপরিহার্য গুণ। নানা প্রতিকূল অবস্থা ও নোংরা পরিবেশে ইসলামী দাওয়াত ও প্রচারের কাজ চালাতে হলে, বিশেষত নিজে নোংরামী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে নোংরা মানুষদেরকে পবিত্র করতে হলে তাকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করতেই হবে। নানা রকমের ও পরিস্থিতিতে নানা রকমের মানসিকতাসম্পন্ন জনতার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে এটি একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও লক্ষণীয় বিষয়।

এরপর রসূল (স.)-কে শেরেক পরিত্যাগ করা এবং আযাবের কারণ হতে পারে এমন যাবতীয় দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার আদেশ দেয়া হচ্ছে, 'মলিনতা পরিহার করো।'

রসূল (স.) নবুয়তের আগেও শেরেক এবং অন্য সকল দুষণীয় কাজ পরিহার করে চলতেন। এই বিকৃতি, অন্যায় ও অসত্য আকীদা-বিশ্বাস এবং চরিত্র ও অভ্যাসের মলিনতা ও নোংরামী থেকে তাঁর পবিত্র স্বভাব সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলো। জাহেলিয়াতের যমানায়ও কোনো দুষ্কর্মে তিনি কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও জড়িত হয়েছেন বলে জানা যায়নি। তবে এখানে যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তা হচ্ছে শেরেক থেকে চূড়ান্তভাবে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আপোষহীনভাবে কুফরী পরিহার করার ঘোষণা সম্বলিত। এটি এবং স্বভাবসুলভ শেরেক ও জাহেলিয়াতের দোষমুক্ত থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এর দ্বারা শেরেকজনিত যাবতীয় নোংরা স্বভাব থেকে মুক্ত থাকাও বুঝানো হয়েছে।'রুজ্‌ঝ' শব্দটির অর্থ আযাব, কিন্তু এখানে এ দ্বারা আযাবের কারণ বুঝানো হয়েছে। মোদ্দাকথা হচ্ছে শেরকের মলিনতা ও নোংরামী যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে সে ব্যাপারে সাবধান থাকো।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি নিজের কোনো চেষ্টা সাধনাকে বড় বা বেশী করে না দেখান এবং নিজে যেন তার কৃতিত্ব দাবী না করেন।

'অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দান করো না।'

কেননা তাকে ভবিষ্যতে আরো অনেক অনুগ্রহ ও অনেক দান করতে হবে এবং অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চান তিনি যেন নিজের কোনো কাজ বা দানকে বড় করে না দেখেন, যেন তার বিনিময়ে আরো বেশী পাওয়া ও খোটা দেয়া না হয়। এই দাওয়াত এমন কোনো ব্যক্তি চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় না যে নিজের দান ও চেষ্টা সাধনাকে বড় বলে

অনুভব করে। কোনো দান বা সৎকর্ম করলে তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, এটা করতে পারাও আল্লাহর দান। এ কাজটি করার সুযোগ ও ক্ষমতা যে আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়েছেন, সে জন্যে বড়াই নয় বরং আল্লাহর শোকর করা উচিত।

পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিচ্ছেন। এই দাওয়াতের দায়িত্ব যখনই অর্পন করা হয়, তখনই তার প্রতি এই আদেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়। আসলে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের এই কঠিন সংগ্রামে ধৈর্যই হচ্ছে আসল রসদ। এ সংগ্রাম একই সাথে পরিচালনা করতে হয় নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নিজের কামনা বাসনার বিরুদ্ধে এবং শয়তানের নেতৃত্ব ও প্ররোচনায় পরিচালিত ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধেও। এটি এমন একটি সর্বাত্মক ও প্রাণান্তকর সংগ্রাম, যার ধৈর্য ছাড়া আর কোনো রসদ নেই, আর তাও এমন ধৈর্য যার উদ্দেশ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

**ইসলাম বিরোধীদের প্রতি সতর্কবাণী**

রসূল (স.)-কে দেয়া এই নির্দেশের পর পরবর্তী আয়াতে অন্যদেরকে সতর্ক ও সচেতন করা হয়েছে,

'যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সেটি হবে বড়ই কঠিন দিন, কাফেরদের জন্যে মোটেই সহজ নয়।'

বস্তুত তার আগাগোড়াই কঠিন। তার মাঝে কোথাও এক মুহূর্তের জন্যে আরামদায়ক কোনো অবস্থার সৃষ্টি হবে না। দিনটি কত কঠিন ও কষ্টদায়ক হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি এবং সংক্ষিপ্তভাবে শুধু কঠিন ও কষ্টকর দিন বলে সেখানকার সার্বিক দুঃখ কষ্টের ও দুর্দশার প্রচন্ডতা আরো তীব্রভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সুতরাং শিংগায় ফুঁক দেয়া ও সেই কঠিন দিনের মুখোমুখী হওয়ার আগেই সতর্ককারীর সতর্কবাণী শুনে সাবধানতা অবলম্বন করা কাফেরদের জন্যে একান্তই বাঞ্ছনীয়।

এই সাধারণ হুশিয়ারী ও হুমকির পর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্য থেকে এক বিশেষ ব্যক্তির মোকাবেলা করা হয়েছে। মনে হয়, দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানোর কাজে এই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ভূমিকা ছিলো। এ জন্যে তাকে লক্ষ্য করে কঠোরতম হুমকি উচ্চারণ করা হয়েছে। তাঁর এমন একটি বিভৎস চিত্র অংকন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত কুটিল ও বিদ্রুপাত্মক এবং তাকে একটি জীবন্ত ও চলন্ত বিষধর সাপের আকারে চিত্রিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমাকে এবং আমি যাকে একলা সৃষ্টি করেছি তাকে একলা ছেড়ে দাও .... তুমি কি জানো এ দোযখ কি বস্তু, তা কোনো জিনিসকে অবিশিষ্ট রাখেনা এবং কাউকে ছেড়ে দেয় না। তার দায়িত্বে আছে উনিশ জন।'

একাধিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই আয়াতগুলোতে যে নরাধমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে সে হচ্ছে ওলীদ ইবনুল মুগীরা। ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, একবার ওলীদ ইবনুল মুগীরা রসূল (স.)-এর কাছে এলো। রসূল (স.) তাকে কোরআন পড়ে শোনালেন। এতে তার ভেতরে কিছুটা ভাবান্তর ঘটলো বলে মনে হলো। আবু জেহেল একথা জানতে পেরে তার কাছে এসে বললো, চাচা আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার জন্যে টাকা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক। ওলীদ বললো, কেন? আবু জেহেল বললো, আপনাকে দেবে। কারণ আপনি মোহাম্মাদের কাছে এসেছেন এবং তার কাছে যে ধর্ম রয়েছে তা দ্বারা আপনি প্রভাবিত হয়েছেন। (অত্যন্ত নোংরা পন্থায় আবু জেহেল ওলীদের অহমবোধ উস্কে দিতে চাইছিলো এবং যে দিকটায় ওলীদের আত্মসম্মানবোধ বেশী টনটনে

সেদিকটাতেই সে আঘাত করছিলো।) ওলীদ বললো, কোরায়শরা তো জানে যে, আমি কোরায়শ বংশের সবেচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

আবু জেহেল বললো, তাহলে আপনি মোহাম্মদ সম্পর্কে এমন কিছু বলুন যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, আপনি তার ঘোর বিরোধী।

সে বললো, তাহলে আমি তার সম্পর্কে কী বলবো? আল্লাহর কসম, তোমরা কেউ কবিতা সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী জানো না। এমন কি জ্বিনদের কবিতাও আমি জানি। অথচ মোহাম্মাদের আনীত বাণীর সাথে সেসব কবিতার মোটেই মিল নেই। তার কথায় এক অদ্ভুত স্বাদ আছে। তা তার নীচের সব কিছুকে কাবু করে দেয়। সেই বাণী সবকিছুর ওপরে থাকে–কোনো কিছুর নিচে নয়।

আবু জেহেল বললো, ওর সম্পর্কে কিছু না বললে আপনার গোত্রের লোকেরা আপনার ওপর খুশী হবে না।

ওলীদ বললো, ঠিক আছে। আমাকে একটু ভাবতে দাও। কিছু সময় চিন্তাভাবনার পর সে বললো, এটা অন্যদের কাছ থেকে শেখা জাদুমন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এই সময়ে নাযিল হয়, 'আমাকে.... ছেড়ে দাও .... উনিশ জন।'

আরেক বর্ণনায় আছে কোরায়শরা বলতে আরম্ভ করেছিলো যে, ওলীদ যদি মোহাম্মাদের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায় তাহলে সমগ্র কোরায়শ এ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাবে। আবু জেহেল একথা শুনে বললো, আমি একা তোমাদের সকলের মোকাবেলায় যথেষ্ট। তারপর সে ওলীদের কাছে গেলে ওলীদ খানিকক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বললো, নিশ্চয়ই ওটা অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া জাদুমন্ত্র। দেখো না সে (মোহাম্মাদ) এ দ্বারা মানুষের সাথে স্ত্রীর, সন্তানের ও আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক ছিন্ন করে!

এ হচ্ছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে ঘটনাটার যে রূপ দাঁড়ায় তাই। কোরআন কিন্তু অত্যন্ত জীবন্ত ও দৃপ্তকণ্ঠে কঠোর হুমকির মধ্য দিয়ে পরবর্তী আয়াতগুলোতে এ ঘটনা বর্ণনা করে,

'আমাকে এবং আমি যাকে একাকী সৃষ্টি করেছি তাকে ছেড়ে দাও।'

এখানে সম্বোধন করা হয়েছে রসূল (স.)-কে। বলা হচ্ছে যে, এই ব্যক্তিটিকে-যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছিলাম, সৃষ্টির সময়ে তার এতো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি ছিলো না–তাকে ও আমাকে ছেড়ে দাও। তার চক্রান্তে তোমরা বিচলিত হয়ো না, তাকে শায়েস্তা কিভাবে করতে হয় সে ভার আমিই নিচ্ছি।

এখানে এসে অনুভূতিতে তীব্র শিহরণ জাগে। ভয়ে ও ত্রাসে শ্রোতার গোটা স্নায়ুমন্ডল কম্পমান হয়। কল্পনার চোখে সে দেখতে পায়, অসীম শক্তির অধিকারী এক মহাপরাক্রান্ত ও মহাপ্রতাপশালী সম্রাট যেন এই অতি ক্ষুদ্র, অতি নগন্য, অতীব দুর্বল ও অতীব অক্ষম সৃষ্টির ঘাড় মটকাতে ছুটে চলেছেন।

এহেন বিভীষিকাময় দৃশ্য কোরআন শুধু তার ভাষার মাধ্যমে পাঠক ও শ্রোতার মনে ভীতির সঞ্চার করে চলেছে ভাষার মাধ্যমে। আর যে হতভাগা মানুষ বাস্তবে এই মহাশক্তিধর সত্ত্বার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার কি অবস্থা হতে পারে, সেটা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

বৃথা ও অসার আস্ফালনে রত এই নগণ্য সৃষ্টির অবস্থা ও চরিত্রের বিবরণ কোরআন আরো দীর্ঘায়িত করে পেশ করেছে। তার ক্ষমাহীন গোয়ার্তুমির বর্ণনা দেয়ার আগে আল্লাহ তায়ালা তাকে কি কি নেয়ামত দান করেছেন, তার উল্লেখ করেছেন। তিনি যখন তাকে সৃষ্টি করেন, তখন তার

কাছে কিছুই ছিলো না, এমনকি তার পরনে কাপড়ও ছিলো না। তারপর তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন, সর্বক্ষণ তার চারপাশে উপস্থিত অনেক পুত্র সন্তানও তাকে দিয়েছেন। এরপর সে আরো পাওয়ার লোভে লালায়িত। যা পেয়েছে তাতে সে সন্তুষ্ট নয় এবং কৃতজ্ঞও নয়। হয়তো বা সে এরূপ আশাকরে যে, তার কাছে ওহী নাযিল হোক এবং কেতাব নাযিল হোক। যেমন সূরার শেষাংশ আছে,

'এবং তাদের প্রত্যেকে চায় তাকে পুস্তকসমূহ দেয়া হোক।'

**সকল যুগের সকল দুশমন এক ও অভিন্ন**

বস্তুত এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ওলীদ ইবনুল মুগীরা রসূল (স.)-কে নবুওতের জন্যে ঈর্ষা করতো।

তার এই অবাঞ্ছিত অন্যায় অভিলাষকে 'কাল্লা' (অর্থাৎ কখনো নয়) শব্দটি এবং তার পরবর্তী বাক্য দ্বারা কঠোর ভাষায় খন্ডন করা হয়েছে। কেননা তাকে ইতিপূর্বে যেসব নেয়ামত দান করা হয়েছে তার জন্যে সে মোটেই কৃতজ্ঞ হয়নি, আনুগত্য প্রদর্শন করেনি এবং কোনো ভালো কাজ করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কখনো নয়, নিশ্চয়ই সে আমার আয়াতের কট্টর দুষমন ছিলো।'

অর্থাৎ সত্য, ন্যায় ও ঈমান সংক্রান্ত যাবতীয় ওহীর নির্দেশনার বিরুদ্ধে সে চরম হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি প্রদর্শন করতো। ইসলামী দাওয়াতের পথ রুখে দাঁড়াতো। রসূল (স.)-এর প্রচারকার্যে সর্বাত্মক বাধার সৃষ্টি করতো, নিজেকে ও অন্যদেরকে তার কাছ থেকে দূরে রাখতো এবং দাওয়াতী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে নানা বিভ্রান্তি ছড়াতো।

তার অবাঞ্ছিত অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষ খন্ডন করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে এই মর্মে হুমকি দিচ্ছেন যে, তাকে দেয়া সকল সুযোগ সুবিধা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে কঠিন ও দুরূহ পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হবে। বলা হয়েছে,

'আমি অচিরেই তাকে একটা কঠিন চড়াইতে চড়াবো।'

এটা একটা রূপক অর্থবোধক বাকধারা। এ দ্বারা কঠিন ও দুরূহ পথে চলাফেরা বা কঠিন পরিশ্রমের কাজ বুঝানো হয়ে থাকে। উঁচু-নিচু রাস্তায় চলা এমনিতেই অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। তদুপরি যাত্রীকে যদি অনিচ্ছাসত্তেও নিচু থেকে উঁচুতে চড়তে হয় তাহলে সেটা হয় আরো প্রাণান্তকর ব্যাপার। এ উক্তিটি দ্বারা আরো একটি সত্য প্রকাশ করা হয়েছে। সেটি এই যে, যে ব্যক্তি ঈমানের সহজ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়, সে উঁচু-নিচু ও দুর্গম পথে চলতে বাধ্য হয় এবং চরম দুর্দশা ও কষ্টের ভেতর দিয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। না তার যাত্রা পথে কোনো পাথেয় ও রসদ থাকে, না তার যাত্রা শেষে কোনো শান্তি ও আশা ভরসার অবকাশ থাকে।

এরপর সেই হাস্যোদ্দীপক অবস্থাটার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যখন আল্লাহদ্রোহী লোকটি কোরআনের মধ্যে একটা কিছু নতুন দোষত্রুটি খুঁজে বের করার জন্যে গভীর চিন্তাভাবনা ও গবেষণা চালায়। এজন্যে সে অবিরাম মাথা ঘামায় ও নিজের মনমগযের ওপর সর্বাত্মক চাপ প্রয়োগ করে। সে চিন্তাভাবনা করেছে ও কিছু কথা রচনা করার চেষ্টা চালিয়েছে।

'এটা তো গতানুগতিকভাবে পাওয়া জাদুমন্ত্র ছাড়া কিছু নয় .....'

এ আয়াত কয়টিতে তার প্রতিটি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল গতিবিধি অংকিত করা হয়েছে, যেন শব্দ দিয়ে নয় বরং তুলি দিয়ে অথবা একটি চলচ্চিত্রের মধ্যমে গোটা দৃশ্যকে নিখুঁতভাবে অংকন করা হয়েছে। চিন্তাভাবনা করতে করতে সে যেন একটা কিছু খুঁজে পায়, সেই সাথে একটা

বদদোয়াও তার কপালে জোটে এবং সেটাই তার শেষ পাওনা। বলা হয়েছে, 'তার ওপর অভিশাপ হোক।' এটা একটা ধিক্কার এবং পুরোপুরি বিদ্রুপ। এরপর এই বদ দোয়া ও ধিক্কারের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

আবারও সে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে এবং করতে করতে সে একটা কিছু খুঁজে পায়। একটা কল্পিত ত্রুটি আবিস্কার করে কোরআনে। অতপর কৃত্রিম গাম্ভীর্য দেখিয়ে সে এদিক সেদিক তাকায়। তার তাকানো থেকেই বিদ্রুপের গন্ধ পাওয়া যায়। আবারও সে একটা কিছুর সন্ধান পায় আর তাতে তার কপাল কুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত হয়ে যায়। এভাবে তার চিন্তাধারা একটা হাস্যকর রূপ ধারণ করে। কিন্তু এতসব ভান করলেও আসলে সে কিছুরই সন্ধান পায়না। সে শুধু ঐশী আলোর বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটে এবং অহংকারের সাথে সত্যকে উপেক্ষা করে। তাই সে বলে–

'এটা তো যুগ যুগ ধরে চলে আসা জাদুমন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এটা তো মানুষেরই কথা।'

বস্তুত শিল্পীর তুলি কিংবা চলচ্চিত্রের সংলাপের চেয়ে কোরআনের এ জীবন্ত দৃশ্য অংকন অনেক বেশী শক্তিশালী ও সুন্দর, আর যার দৃশ্য কোরআন অংকন করেছে, তাকে চিরকালের জন্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উপহাসের পাত্র হিসাবেই গণ্য করা হবে। এই হাস্যোদ্দীপক জীবন্ত দৃশ্য অংকন শেষ হবার পর আল্লাহ তায়ালা উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি দিয়েছেন এভাবে,

'অচিরেই আমি তাকে দোযখে ঢুকাবো।' এই 'সাকার' বা দোযখকে অজ্ঞাত জিনিসের পর্যায়ে রেখে তাকে আরো ভয়ংকর করে তোলা হয়েছে। যথা,

'তুমি কি জানো সে দোযখ কি জিনিস?

তা হচ্ছে কল্পনাতীতভাবে ভয়ংকর। তারপর তার ভয়াবহ বৈশিষ্টটি বর্ণনা করা হয়েছে,

'তা কিছুই অবশিষ্ট রাখে না।' তারপর 'তা চামড়াকে ঝলসে দেয়।'

যেমন সূরা 'মায়ারেজ'-এ বলা হয়েছে, 'যে পশ্চাদপসরণ করে ও পালিয়ে যায় সে তাকে ডাকে।'

এ থেকে বুঝা যায় যে, নিজের ভয়াল রূপ দেখিয়ে দোযখ মানুষের মনে ত্রাস ও আতংক সৃষ্টি করে।

দোযখের প্রহরী থাকে 'উনিশ জন।' এই ফেরেশতারা ব্যক্তি না গোষ্ঠী, তা আমরা জানি না। পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ঈমানদাররা এই প্রহরী সংক্রান্ত কথাগুলোকে যথার্থ আদব শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পনের মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেছে এবং পুরোপুরিভাবে তা বিশ্বাস করেছে। কোনো বিষয় নিয়েই তারা তর্কে লিপ্ত হয়নি। কিন্তু মোশরেকরা এই সংখ্যাকে গ্রহণ করেছে ঈমান-শুন্য মন ও শ্রদ্ধাহীন মানসিকতা নিয়ে। আল্লাহর এই মহান দাওয়াতকে গ্রহণ না করার কট্টর মনোভাব নিয়ে তারা বিষয়টিকে দেখেছে। আল্লাহর এই মহান দাওয়াতকে গ্রহণ না করার মনোভাব নিয়েই তারা তা শ্রবণ করে। অধিকন্তু তার প্রতি বিদ্রুপ করে, উপহাস করে ও ধৃষ্টতা দেখায়।

তাদের কেউ কেউ বলে, কোরায়শ বংশের দশ দশজন মিলেও কি এই উনিশ জনের এক একজনকে পরাভূত করা যাবে না? আবার এক দাম্ভিক এসে বলে, ঠিক আছে কোরায়শদের সবাই মিলে দুইজনের মোকাবেলা করুক। বাকী সতেরো জনকে আমি একাই পরাস্ত করতে পারবো। এই পর্যায়ে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে আল্লাহর অদৃশ্য গুণের এই দিকটি প্রকাশ করা ও এই সংখ্যাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য কি, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অদৃশ্য গুণ যে শুধু আল্লাহর একক ও একচেটিয়া অধিকার তাও ঘোষণা করা হয়েছে।

**ফেরেশতার সংখ্যা নির্ণয়ের তাৎপর্য**

মোশরেকরা যে উনিশ জনকে নিয়ে বাকাবিতন্ডা শুরু করেছিলো তার রহস্য নিয়েই আয়াতটি শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমি দোযখের দায়িত্বশীল হিসেবে ফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে নিযুক্ত করিনি।'

বস্তুত ফেরেশতা হচ্ছে সেই অদৃশ্য সৃষ্টি যার স্বভাব ও শক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনি তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যা আদেশ করেন তা তারা অমান্য করে না এবং যা তাদেরকে করতে বলা হয় তারা তা করে।'

এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহর আদেশ তারা পালন করে এবং তা করার ক্ষমতাও তাদেরকে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে যে অর্পন করা হয় সাথে সাথে তা করার ক্ষমতাও তাদেরকে দেয়া হয়। কাজেই তাদেরকে যখন দোযখের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে তখন সেটিকে পরিচালনা করার ক্ষমতাও তাদেরকে দেয়া হয়েছে। কাজেই মানুষের মত দুর্বল সৃষ্টি তাদরকে পরাভূত করবে এটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তারা যে সব কথাবার্তা বলেছিলো, তা নিছক তাদের অজ্ঞতাপ্রসুত। আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বিশ্ব পরিচালনার রহস্য তাদের জানা ছিলোনা বলেই ওসব কথা তারা বলতে পেরেছিলো।

'তাদের সংখ্যাকে আমি কাফেরদের পরীক্ষার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছি।'

বস্তুত তারা এমনই স্বভাবের মানুষ যে, সংখ্যার উল্লেখ মাত্রই তাদের মনে তর্কের স্পৃহা জেগে ওঠে। কোথায় নির্বিবাদে কথা মেনে নিতে হয় এবং কোথায় তর্ক করতে হয় তাও তারা জানেনা। এটা একটা অদৃশ্য বিষয়। এ সংক্রান্ত কোনো জ্ঞানই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ রাখেনা এবং মানুষের কাছে এর কম বা বেশী কিছুই নেই। আল্লাহর এই অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত খবর কারোই জানা নেই। যখন আল্লাহ তায়ালা এই অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানান, সেই তথ্যটুকুরও একমাত্র উৎস তিনিই। মানুষের কাজ হলো নির্বিবাদে এই তথ্যটুকু মেনে নেয়া। তার এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা কর্তব্য যে, যে বিষয় সম্পর্কে যতটুকু তথ্য আল্লাহ তায়ালা জানালেন, শুধুমাত্র ততটুকু জানার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত। এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কারণ মানুষ শুধু তখনই বিতর্কে লিপ্ত হয়, যখন কোনো বিষয়ে তার আগে থেকে জ্ঞান থাকে এবং নতুন প্রাপ্ত তথ্য তার বিরুদ্ধে যায়।

ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ কেন হলো, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টি জগতের সমন্বয় ও শৃংখলা বিধান করেন এবং সকল জিনিসকে নির্দিষ্ট পরিমানে সৃষ্টি করেন। আলোচ্য সংখ্যাটি অন্য যে কোনো সংখ্যার মতোই। এ সংখ্যাটি নিয়ে যে ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হয়, তারপক্ষে অন্য যে কোনো সংখ্যা নিয়ে একইভাবে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সম্ভব। সে প্রশ্ন করতে পারে যে, আকাশ সাতটি কেন; মানুষ মাটি থেকে এবং জ্বিন আগুন থেকে সৃষ্টি কেন? মানুষ মায়ের পেটে নয় মাস থাকে কেন? কচ্ছপ হাজার হাজার বছর বাঁচে কেন? এটা কেন? ওটা কেন? সব প্রশ্নেরই জবাব এই যে, সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনি যা খুশী তাই ইচ্ছা করেন, এটাই এসব ব্যাপারে শেষ কথা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, এই সংখ্যা নির্ধারণের উদ্দেশ্য এই যে, কেতাবধারীরা যেন দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, আর মোমেনদের বিশ্বাস যেন আরো মযবুত হয় এবং কেতাবধারীরা ও মোমেনরা সন্দেহে লিপ্ত না হয়। দোযখের প্রহরীদের সংখ্যা জেনে কারো ঈমান মযবুত হবে এবং কারো ঈমান বাড়বে। আর কেতাবধারীদের তো এ সম্পর্কে কিছু জানা আছেই। উপরন্তু তারা যখন কোরআন

থেকে এ তথ্য জানবে, তখন নিশ্চিত হতে পারবে যে, কোরআন তাদের পূর্বে প্রাপ্ত আসমানী গ্রন্থের সমর্থক। আর মোমেনদের তো কথাই আলাদা। আল্লাহর প্রতিটি কথাই তাদের ঈমান বাড়ায়।

কেননা তাদের মন থাকে সর্বক্ষণ উন্মুক্ত ও আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত তত্ত্ব ও তথ্য তাদের মনে আপনা থেকেই ও স্বতস্ফুর্তভাবে গৃহীত হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কথাই তার কাছে আসে তা তাকে আল্লাহর অধিকতর ঘনিষ্ট ও প্রিয় করে। তাই এই ফেরেশতাদের সংখ্যার নিগুঢ় রহস্যও তারা উপলব্ধি করবে এবং তা তাদের ঈমান বাড়াবে। 'আর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা ও কাফেররা যেন বলতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা কি উদাহরণ দিতে চান?

এভাবে একই সত্য বিভিন্ন রকমের মানুষের অন্তরে বিভিন্ন রকমের প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে কেতাবধারীদের ঈমান মযবুত হয়। মোমেনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কাফের ও মোনাফেকরা হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করে যে, 'আল্লাহ তায়ালা এ দ্বারা কি উদাহরণ দিতে চান?'

তারা এই আশ্চর্য বিষয়ের নিগুঢ় তত্ত্ব জানতে পারে না। আর প্রত্যেক সৃষ্টিতেই যে আল্লাহর কোনো কোনো মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে, তা তারা স্বীকার করে না। আর এই অজানা তত্ত্বকে জনসমক্ষে নিয়ে আসায় যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং তা যে সম্পূর্ণ সত্য তাও তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে না।

'এভাবে আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন ও যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন।'

আল্লাহ তায়ালা শুধু মাত্র তথ্য অবহিত করেন। তাতে বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হয়। আল্লাহর ইচ্ছায় তা দ্বারা কেউ হেদায়াত লাভ করে, আবার কেউ বিভ্রান্ত হয়। সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি মানুষকে হেদায়াত ও গোমরাহীর উভয়ের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই যে গোমরাহ কিংবা সুপথপ্রাপ্ত হয়, তারা উভয়েই আল্লাহর ইচ্ছার সীমার ভেতরেই থাকে। তারপর কে কোনটি বাস্তবে গ্রহণ করবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উভয় পথই সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা ও গুপ্ত মহৎ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই তা করেছেন।

সৃষ্টি জগতে যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহর অবাধ ইচ্ছাক্রমেই ঘটে, এই বিশ্বাস মানুষের বিবেককে তথাকথিত অদৃষ্টের অধীনতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা-এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে সীমিত সংকীর্ণ বিতর্ক থেকে মুক্ত করে। এ বিতর্ক কোনো নির্ভুল ধারণায় উপনীত হতে দেয় না। কেননা তা বিষয়টিকে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে। অতপর তাকে সে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের রূপ দেয়, যা মানুষের যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও সীমিত ধ্যান ধারণা থেকেই উদ্ভুত হয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে হেদায়াতের পথ ও গোমরাহীর পথ উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্যে এমন একটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যার অনুসরণ করলে আমরা হেদায়াত পাই, শান্তি পাই ও সাফল্যমন্ডিত হতে পারি। পক্ষান্তরে তিনি আমাদেরকে এমন বহু সংখ্যক পথের কথাও বলে দিয়েছেন, যার অনুসরণ করলে আমরা গোমরাহ হবো, অসুখী হবো ও ক্ষতিগ্রস্থ হবো। এর বাইরে কিছু জানার জন্যে আমাদেরকে দায়িত্বও দেননি, ক্ষমতাও দেননি।

তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আমার ইচ্ছা অবাধ, স্বাধীন এবং কার্যকর। এখন আমাদের উচিত সাধ্যমত আল্লাহর স্বাধীন ও কার্যকর ইচ্ছার তত্ত্বকে প্রয়োগ করা যে, সঠিক পথ রয়েছে মাত্র

একটি, আর আমাদেরকে সেই পথই অনুসরণ করতে হবে। আর বিভ্রান্তির একাধিক পথগুলোকে বর্জন করতে হবে। যে অদৃশ্য তত্ত্ব আমাদের নাগালের বাইরে রাখা হয়েছে তা নিয়ে নিষ্ফল বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। এ কারণে প্রাচীন (কালাম) তর্ক শাস্ত্রবিদরা অদৃস্ট তত্ত্ব নিয়ে যেভাবে কথা বলেছেন, তা ব্যর্থ চেষ্টা বলেই আমার কাছে মনে হয়। আল্লাহর ইচ্ছা একটা গায়বী বা অদৃশ্য বিষয়। এটা আমরা ঠিক ঠিক জানি না। তবে আমরা জানি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে কি কি চান, কি কি করলে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করাকে তিনি নিজের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেন তাও আমরা জানি।

কাজেই আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনেই আমাদের শক্তি ব্যয় করা উচিত। আর আমাদের ব্যাপারে তার গোপন ইচ্ছা কি, তা তাঁর হাতেই ন্যস্ত করা আমাদের কর্তব্য। যা বাস্তবে সংঘটিত হবে সেটাই বুঝতে হবে তাঁর ইচ্ছা। সেটা আমরা সংঘটিত হওয়ার পরেই জানতে পারবো আগে নয়। আর কোনো জিনিসের পেছনে কোন্ উদ্দেশ্য ও কল্যাণ নিহিত, তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। এটাই হচ্ছে মোমেনের চিন্তার পদ্ধতি।

**আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্য বাহিনী**

'তোমার প্রভুর বাহিনীর সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

বস্তুত এটাও একটা গায়বী বা অদৃশ্য তত্ত্ব। আল্লাহর সৈন্যরা কেমন, কি তাদের কাজ, কেমন তাদের শক্তি ও ক্ষমতা, এ সবই গোপন তথা গায়বী তত্ত্ব। গায়বের যে তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করতে চান-করেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর কথাই চূড়ান্ত। কাজেই এরপর কারো এ নিয়ে মাথা ঘামানো বা বিতর্ক করা উচিত নয় এবং যা আল্লাহ তায়ালা জানাননি তা জানতে চেষ্টা করাও বৈধ নয়।

'এখানে মানব জাতির জন্যে উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়।'

এখানে আল্লাহর সৈন্য সামন্তকে, অথবা দোযখ ও তার কর্মকর্তাদের সম্পর্কিত বিষয়টাকে 'মানব জাতির জন্যে উপদেশ' আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর দোযখ ও তার কর্মকর্তারাও আল্লাহর সৈন্য সামন্তের অন্তর্ভূক্ত। এর উল্লেখ করা হয়েছে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্যে, কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করার জন্যে নয়। যারা মোমেন তারা একে উপদেশ হিসেবেই গ্রহণ করে এবং সতর্ক হয়। যারা গোমরাহ তারা এ দ্বারা বির্তক সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

এ পর্যন্ত যে অদৃশ্য বিষয়টি আলোচিত হলো এবং তাকে কেন্দ্র করে কারো বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারায় লিপ্ত হওয়া এবং কারো ভালো ও ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যে কথা বলা হলো, তার সূত্র ধরে পরবর্তী কয়টি আয়াতে আরো কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। এখানে আখেরাত, দোযখ ও আল্লাহর ফেরেশতা-বাহিনীর ন্যায় অদৃশ্যসৃষ্টিকে দৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। দৃশ্যমান জগতের এই জিনিসগুলোকে মানুষ সবসময়ই দেখে, কিন্তু উদাসীন ও চেতনাহীন ভাবে দেখে। অথচ এগুলো স্রষ্টার এক নিখুঁত পরিচালনা ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এগুলোর সৃষ্টি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পশ্চাতে এক মহান উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। এগুলোর শেষে রয়েছে হিসাব নিকাশ ও কর্মফল প্রদানের ব্যবস্থা। আয়াত কয়টি লক্ষণীয়,

'কখনো নয়, চাঁদের শপথ, পশ্চাদপসরণশীল রজনীর শপথ, বিকাশমান প্রভাতের শপথ। নিশ্চয়ই এগুলো আল্লাহর বড় বড় নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। মানবজাতির জন্যে সতর্ককারী।'

চাঁদ, অপস্রিয়মান রজনী ও আসন্ন প্রভাতকালের প্রত্যেকটির দৃশ্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও শিক্ষাপ্রদ। এগুলো মানুষের মনকে অনেক কথা বলে। অনেক গোপন তথ্য তাকে জানায়। অনেক গভীর আবেগ ও অনুভূতি তার ভেতরে সঞ্চারিত করে। কোরআন তার এই সংক্ষিপ্ত ইংগিতগুলো

দ্বারা উল্লেখিত গোপন তত্ত্ব ও সুপ্ত আবেগ অনুভূতিগুলোকে শ্রোতাদের হৃদয়ে সঞ্চালিত করে। কেননা মানুষের হৃদয়ের চড়াই উৎরাই ও প্রবেশদ্বার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাই বেশী।

চাঁদের উদয় অস্ত ও আকাশ পরিভ্রমণের দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে প্রাকৃতিক জগতের গোপন রহস্য সম্পর্কে কোনোরকম তথ্য লাভ করে না এমন মানুষ খুবই বিরল। এমনকি সচেতন মন ও জাগ্রত বিবেক নিয়ে এক মুহূর্তও চাঁদের আলোতে অবস্থান করলে তা মানুষের মনকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দিতে পারে এবং সেটা তার জন্যে আলোতে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে শেষ রাতের নিঝুম মুহূর্তে যদি কেউ জাগ্রত মন নিয়ে প্রকৃতির জাগরণ ও উত্থানের দৃশ্যটি পর্যবেক্ষণ করে, তাহলে তার মনে সেই দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না এবং তার হৃদয়ের গভীরতম প্রকোষ্ঠে স্বচ্ছ চিন্তার উন্মেষ না ঘটেও পারে না।

অনুরূপভাবে ঊষার আগমন কালের দৃশ্য যদি কেউ জাগ্রত বিবেক নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, তবে তার ভেতরেও আলোড়ন ও সচেতন ভাবান্তর উপস্থিত না হয়ে পারে না। প্রকৃতির আলো তার চোখে উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে তার হৃদয় ও বিবেকেও হেদায়াতের আলো গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষের মন ও বিবেককে সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি জানেন যে, এই সব প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বতস্ফুর্তভাবেই কখনো কখনো মানুষের মনে এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন আনে, যাকে অনেকটা পুনঃ সৃষ্টির নামান্তর বলা যেতে পারে।

চাঁদ, রাত ও ঊষাকালের আগমন নির্গমন, আলোর বিকীরণ ঘটানোর পেছনে একটা বিস্ময়কর সত্য রয়েছে, যা অনুধাবন করার জন্যে কোরআন মানুষের মন ও বিবেককে উদ্বুদ্ধ করে। এসবের পেছনে এক অকল্পনীয় সৃজনী শক্তি, এক বিচক্ষণ প্রজ্ঞা ও এক নিপুন পরিচালনা যা সত্যিকার অর্থে বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ব সমন্বয়ের এমন সুক্ষ্ণ ও অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে ক্ষনেকের জন্যে তা বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। উদাসীন ও অবহেলা প্রবণ মানুষের সম্বিত ফেরানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এসব প্রাকৃতিক নিদর্শনের শপথ করেছেন। কেননা এগুলো বিরাট মর্যাদাবান সৃষ্টি এবং এগুলোর ভেতরে অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে।

শপথ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, দোযখ ও দোযখের পরিচালনা ও প্রহরারত ফেরেশতার দল অথবা আখেরাত ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিস আল্লাহর অসাধারণ, বিরাট ও বিস্ময়কর সৃষ্টি যা মানুষকে তার দৃষ্টির আড়ালে লুকানো বিপদাশংকা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। তিনি বলেন,

'নিশ্চয় এগুলো বৃহত্তম নিদর্শনাবলীর অন্যতম, যা মানুষকে সতর্ক করে।'

এই শপথ, শপথের ভাষা ও যার জন্যে শপথ করা হয়েছে। সবই মানুষের মনে এক একটা হাতুড়ির মত আঘাত হানে। এর সাথে শিংগায় ফুঁক ও শিংগার ফুঁক জনিত চেতনার উত্থান এবং সূরার প্রারম্ভিক সম্ভাষণ 'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো'-এর পূর্ণ সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, সূরার গোটা প্রেক্ষাপট জুড়েই রয়েছে ফুঁক দেয়া, আঘাত করা ও সতর্ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

উল্লেখিত সতর্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টিকারী আলোচনার প্রেক্ষাপটে কোরআন পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভালোমন্দের জন্যে ব্যক্তিগতভাবেই দায়ী। প্রত্যেকে নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ নিজেই গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজের পাপ পূন্যের হাতে যিম্মী।

**কর্ম অনুযায়ীই তার ফলাফল**

'তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা নিজের উন্নতি সাধন করবে যার ইচ্ছা নিজের অবনতি ঘটাতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্মফলের কাছে যিম্মী।'

এর অর্থ হলো কেউই নিজের কর্মফল থেকে রেহাই পেতে পারে না, নিজের পাপ-পূণ্য দ্বারা যে কেউ নিজের মর্যাদা বাড়াতে বাড়াতে বা কমাতে পারে। সে তার ভালো-মন্দ কাজের হাতে বন্দী। আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভালো মন্দের পথ বলে দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় এর যে কোনো পথ গ্রহণ করতে পারে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এই একই ঘোষণা কার্যকর। দোযখের দৃশ্য বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই একই ঘোষণা কার্যকর। এ দ্বারা মানুষকে সুপথ ও কুপথ উভয়টাই বেছে নিতে বলা হয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মফলের কাছে যিম্মী, এই সাধারণ অবস্থা থেকে আল্লাহ তায়ালা দক্ষিণ বাহুর পক্ষের লোকদেরকে (অর্থাৎ সৎকর্মশীলদেরকে) অব্যাহতি দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি তাদেরকে অপরাধীদের শোচনীয় পরিণতির কারণ অণুসন্ধানেরও অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এতে দক্ষিণ বাহুওয়ালাদের কথা ভিন্ন। তারা বেহেশতে বসে অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের দোযখে নিলো কিসে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, দরিদ্র লোকদেরকে খাওয়াতামনা.... এভাবে শেষপর্যন্ত আমাদের মৃত্যু এসে গেলো।'

দক্ষিণ বাহুওয়ালাদের এই যিম্মীদশা থেকে অব্যাহতি লাভ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। কেননা তিনি মানুষের সৎ কাজের বিনিময়ে এর বহুগুণ বেশী প্রতিদান দিয়ে থাকেন। সৎ লোকদের এই শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা এখানে অপরাধীদের মনে কার্যকর প্রভাব বিস্তারে সহায়ক। তারা সেদিন অবমাননাকর অবস্থায় পতিত হয়ে নিজেদের অপরাধের দীর্ঘ স্বীকারোক্তি দেবে। আর সেই সময়ে মোমেনরা সম্মানজনক অবস্থানে থাকবে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মতই জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কি কারণে এখানে আসতে হলো? দুনিয়াতে তোমরা তো আমাদের পাত্তাই দিতে না।

এ বিবরণ মোমেনদের মনে এক ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পৃথিবীর জীবনে তারা ছিলো কাফেরদের যুলুম নিপীড়নের শিকার। আজ আখেরাতে তারা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আছে, আর তাদের অহংকারী দুশমনরা কি সাংঘাতিক অবমাননাকর অবস্থানেই না পড়ে আছে! উভয় পক্ষের মনে এই দৃশ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক। এক পক্ষ বর্তমানে যে অবস্থানে আছে, অপর পক্ষ সেই অবস্থানে থাকবে একটু পরে। এই দুনিয়া একদিন চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যাবে। এখানকার যাবতীয় সুখ-দুঃখও সেই সাথে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

**অপরাধের স্বীকারোক্তি**

অপরাধীদের দীর্ঘ স্বীকারোক্তিতে তাদের সেই সব অপরাধের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে, যা তাদের দোযখে ঠেলে দিয়েছে। মোমেনদের সামনে তারা পরম অসহায়ের মতো স্বীকারোক্তি দেবে, 'তারা বলবে, হাঁ আমরা নামায পড়তাম না।' আসলে এ কথা দ্বারা সমগ্র ঈমান ও ইসলামকেই বুঝানো হয়েছে। এই উক্তিটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইসলামে নামাযের গুরুত্ব এতো বেশী যে, তাকে ঈমানের প্রমাণ ও সংকেত হিসাবে ধরা হয়েছে। নামাযের অস্বীকৃতি কুফরির আলামত। এ আলামত যার ভেতরে বিদ্যমান থাকে তাকে মোমেনদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

তারা বলবে, 'আমরা দরিদ্রদেরকে খাওয়াতাম না।'

এটিও ঈমানহীনতার সাথে যুক্ত এবং তার একটি লক্ষণ। আল্লাহর নিজের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে যে এবাদাত সম্পাদিত হয়, তারপরেই আসে আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাঁর এবাদাত করা। কোরআনের একাধিক জায়গায় দরিদ্রদেরকে আহার করানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উল্লেখ দ্বারা কোরআন যে সামাজিক অবস্থার মুখে নাযিল হয়েছে, তার ভয়াবহতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও সে সময়ের সামাজিক যশ ও গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বদান্যতা প্রদর্শনের রেওয়ায ছিলো এবং খুব বড় গলায় তার ঢোলও পেটানো হতো, কিন্তু যেখানে বদান্যতার সত্যিকার প্রয়োজন হতো এবং একেবারে আন্তরিক সহানুভূতির দাবী হিসেবে তার প্রয়োজন দেখা দিতো, সে সব ক্ষেত্রে বদান্যতা মোটেই প্রদর্শন করা হতো না। সত্যিকার দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি সেই নিষ্ঠুর সমাজে সহানুভূতি ও অনুগ্রহ করার কেউ ছিলো না।

'আমরা অন্যান্য তামাশাকারীদের সাথে মিলে তামাশা করতাম।'

এটি ইসলামের সাথে নিদারুণ অবজ্ঞা, অবহেলা ও উপহাসের পরিবেশের ইংগিতবহ। অথচ মানব জীবনে এ আদর্শ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের অন্য যে কোনো জিনিসের চেয়ে এর মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশী। কারণ এই আদর্শের ভিত্তিতেই মানুষের জীবনের যাবতীয় আদর্শ, চিন্তা চেতনা, অনুভূতি ও মূল্যবোধের মান নির্ণীত হয়। এরই আলোকে মানুষ তার জীবন পথে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে। কাজেই এ আদর্শকে অবজ্ঞা করে এর সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট মতামত নির্ণয় না করে এ নিয়ে কেবল তামাশায় লিপ্ত থাকা কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব না।

'আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম।'

বস্তুত এটিই হচ্ছে সকল দোষের মূল। যে ব্যক্তি পরকালকে অবিশ্বাস করে, তার সকল মূল্যবোধ এবং সকল চিন্তা-চেতনা বিকৃত হয়ে যায়। তার জীবনের পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কেননা পার্থিব জীবনের মধ্যেই সে তার জীবনকে সীমিত করে ফেলে। এই সংকীর্ণ পার্থিব জীবনে যা কিছু ঘটে তার ভিত্তিতেই সে সব কিছুর পরিণতি মূল্যায়ন করে। ফলে পরকালে ও কেয়ামতে কোনো কাজের হিসাব দিতে হবে বা জবাবদিহী করতে হবে, একথা সে মনে করে না। এ জন্যে তার সকল কাজের মানদন্ড খারাপ হয়ে যায়। কোনো কাজের পরিচালনাই তার হাতে সুস্পষ্টভাবে সম্পন্ন হয় না। দুনিয়ার সাথে সাথে তার পরকালের পরিনামও খারাপ হয়ে যায়।

অপরাধীরা বলে, আমরা এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই জীবন কাটিয়ে আসছিলাম। নামায পড়তাম না, দরিদ্রকে খাওয়াতাম না, আখেরাতে বিশ্বাস করতাম না, তামাশাকারীদের সাথে তামাশায় ও ঠাট্টা বিদ্রুপে লিপ্ত হতাম।

'অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু এসে গেলো।'

মৃত্যু এসে সকল সন্দেহ সংশয় ঘুচিয়ে দিলো এবং আর কোনো তাওবা, অনুতাপ ও সৎকাজ করার সুযোগ রাখলো না। পরবর্তী আয়াতে সেই শোচনীয় অবমাননাকর অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, যা নির্ধারিত পরিণতিকে পাল্টানোর কোনো আশা ভরসার অবকাশ রাখে না,

'কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশে তাদের কাজ হবে না।'

কারণ আত্মস্বীকৃত অপরাধীরা তাদের অবধারিত পরিণতির মুখোমুখী হয়ে গেছে। সেখানে আদৌ কোনো সুপারিশকারীর অস্তিত্বই থাকবে না। যদি কেউ থাকেও তাদের সুপারিশে কোনো কাজ হবে না।

আখেরাতের এই চরম নৈরাশ্যজনক ও অবমাননাকর অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের পার্থিব সুযোগ সুবিধার কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যাতে আখেরাতের সেই শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার আগে তারা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সদ্ব্যবহার করতে পারে। অথচ তারা সেসব সুযোগ সুবিধাকে উপেক্ষা করে চলেছে এবং অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়ে চলেছে। পার্থিব জীবনে তাদেরকে হেদায়াত, কল্যাণ ও মুক্তির যা কিছু উপায় উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছিলো তা থেকে তারা পালাচ্ছে।

এই পর্যায়ে তাদের এক হাস্যকর ও বিদ্রুপাত্মক ভাবমূর্তি অংকন করা হয়েছে,

'তাদের কি হয়েছে যে তারা স্মরণিকাকে উপেক্ষা করছে? যেন তারা বাঘের ভয়ে পলায়নপর বন্য গাধা।'

ভীত সন্ত্রস্থ বন্য গাধা বাঘের ডাক শুনে চারদিকে ছুটোছুটি করে। আরবরা এ দৃশ্যের সাথে পরিচিত। এটা একটা মরাত্মক ও ভয়ংকর অবস্থা হলেও তার সাথে মানুষের সাদৃশ্য বর্ণনা করার পর এটা একটা দারুণ হাস্যকর অবস্থায় পরিণত হয়। এই মানুষগুলো যে এভাবে বন্য গাধায় পরিণত হয়, সেটা তাদের ভয়ের কারণে নয়। বরং শুধুমাত্র এ জন্যে যে, একজন মহান ব্যক্তি তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কথা ও কর্মফলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদেরকে ভয়াবহ, লজ্জাকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন।

এক নিপুন তুলি দিয়ে অপরাধীদের এই দৃশ্যটি অংকন করা হয়েছে এবং তাকে বিশ্ব প্রকৃতির স্মরণীয় দৃশ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে সকলেই এ দৃশ্যকে কলংকময় মনে করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে এই অপমানজনক দৃশ্যের অন্তর্ভূক্ত হতে না চায়।

'বাঘ থেকে পালানো বন্য গাধা।'

এটা ছিলো তাদের বাহ্যিক আকৃতি,

এরপর তাদের আভ্যন্তরীণ ও মানসিক অবস্থা এবং ভাবাবেগকেও কোরআন অংকন করতে ভোলেনি,

'বরঞ্চ তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই চায় যেন তাদেরকে প্রকাশ্য পুস্তক দেয়া হোক।'

আসলে আল্লাহ তায়ালা যে তাঁকে মনোনীত করেছেন ও তাঁর কাছে ওহী পাঠিয়েছেন, সে জন্যে তার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষবশত এই আকাংখা পোষণ করা হতো। প্রত্যেকের বাসনা ছিলো যে, রসূল (স.)-এর মত প্রত্যেকে যেন একই মর্যাদা লাভ করে এবং প্রত্যেকের কাছে ওহী ও কেতাব নাযিল হয়। আসলে এখানে বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথাই বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে বাদ দিয়ে আব্দুল্লাহর ছেলে মোহাম্মাদ নবী হওয়ায় তারা ভীষণ মনোক্ষুন্ন ছিলো। যেমন সূরা 'আয-যোখরুফ'-এ বলা হয়েছে, তারা বলে 'দুই শহরের কোনো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে এটা নাযিল হলো না কেন?'

অথচ রেসালাত ও নবুওত কাকে দিতে হবে সেটা আল্লাহ তায়ালা নিজেই ভালো জানেন। এ জন্যে তিনি সেই মহৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং এই জিনিসটাই তাদের বিদ্বেষের মূল কারণ আর এর কারণেই তারা সেই বন্য গাধার মত পালাতো।

এরপর তাদের মানসিক অবস্থার আরো বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতকে তাদের উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করার মূলে লোভ ও হিংসা ছাড়া অন্য যে কারণটি ছিলো, তা হলো আখেরাতের ভয় না করা। তবে এই কারণটি বর্ণনা করার আগে 'কাল্লা' (কখনো নয়) এই

অব্যয়টি ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের আল্লাহর ওহী ও অনুগ্রহ লাভের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা তার জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও সততার নামগন্ধও তাদের মধ্যে নেই। তাই বলা হয়েছে- 'কখনো নয়, আসলে তারা আখেরাতকে ভয় পায় না।'

বস্তুত আখেরাতের ভয় তাদের অন্তরে না থাকাই তাদেরকে কোরআন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এ কারণেই তারা এই দাওয়াতের প্রতি এতে বিদ্বিষ্ট ও এথেকে পলায়নপর। আখেরাত সম্পর্কে তাদের যদি কিছুমাত্র অনুভূতিও থাকতো, তা হলে তারা এমন কট্টর অস্বীকৃতির ভাব দেখাতো না।

অতপর পুনরায় তাদের ধিক্কার দেয়া হচ্ছে, তাদের কাছে শেষ বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে শেষবারের মত একটা পথ গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে,

'কখনো নয়, মনে রেখো এটা একটা স্মরণিকা, যার মনে চায় সে যেন একে স্মরণ করে।'

অর্থাৎ যদিও তারা এই কোরআনকে এড়িয়ে চলে, তা শুনতে চায়না, তা থেকে বুনো গাধার মতো পালায় এবং তাদের মনে মোহাম্মাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও আখেরাতকে উপেক্ষা করার মনোভাব বিদ্যমান, তবুও সকলের জন্য একথা জানা উচিত যে, এই কোরআন হলো সাবধানকারী স্মরণিকা। কাজেই যার ইচ্ছা হয় সে যেন স্মরণ করে। যে তা চাইবে না, তার পরিণতির জন্যে সে নিজেই দায়ী হবে। বেহেশতের সম্মানিত জীবন কিংবা দোযখের ঘৃণিত জীবন এই দুটোর যেটাই সে গ্রহণ করতে চায়–করতে পারে।

### আহলে তাকওয়া ও আহলে মাগফেরাত

ভালো ও মন্দ যে কোনো পথ গ্রহণে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে এ কথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা উপসংহারে মন্তব্য করছেন যে, সকল ইচ্ছার উর্ধে আল্লাহর সার্বভৌম ইচ্ছার অবস্থান। সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত ভাগ্য নিয়ন্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। সকল ঘটনা ও সকল বিষয়ের পেছনে যে আল্লাহর সার্বভৌম চূড়ান্ত ও নিরংকুশ ইচ্ছা সক্রিয় থাকে। এ ব্যাপারে ঈমান ও আকীদাকে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ রাখার জন্যে কোরআন এ বিষয়টির কথাগুলোকে কোনো রাখ ঢাক না রেখে দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করে থাকে। তাই আল্লাহ তায়ালা এই সূরার শেষে বলেন,

'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা স্মরণ করতে পারে না। তিনি তাকওয়া ও ক্ষমার অধিকারী।'

বস্তুত, বিশ্ব জগতে যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহর সর্বোচ্চ ও নিরংকুশ ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত। আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে এবং তার আওতার মধ্যেই তা সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনকি আল্লাহর কোনো সৃষ্ট প্রাণী এমন কোনো ইচ্ছাও করে না যা আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী। গোটা সৃষ্টি জগতের ক্ষমতার ওপরে তাঁর ইচ্ছা কার্যকর। আল্লাহর ইচ্ছায়ই গোটা সৃষ্টি জগতকে এবং তার নিয়মবিধানকে তৈরী করা হয়েছে। তাই গোটা সৃষ্টি জগত আল্লাহর সেই ইচ্ছার অধীনেই চলে। এই ইচ্ছা সকল বাধা বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা এবং গন্ডী থেকেও মুক্ত।

আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতকে স্মরণ করা এমন একটি কাজ, যার প্রেরণা ও ক্ষমতা আল্লাহই দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাকে এ কাজের যোগ্য বলে জানেন, তার জন্যে এ কাজ সহজ করে দেন। মানুষের মন আল্লাহর কুদরতী দুই আংগুলের মধ্যে থাকে, যখন যেমন ইচ্ছা করেন তা ঘুরিয়ে দেন। কোনো বান্দার সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার কথা জানলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর এবাদাত ও আনুগত্যের দিকে চালিত করেন।

কোনো বান্দা জানে না আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে কি ইচ্ছা পোষণ করেন। এটা তার অজানা বিষয় এবং তার কাছ থেকে লুকানো অদৃশ্য বিষয়। তবে আল্লাহ তায়ালা তার কি কি কাজ পছন্দ করেন তা সে জানে। কেননা এ বিষয়টি তিনি তাকে জানিয়েছেন। কাজেই আল্লাহর পছন্দনীয় ও অর্পিত কাজ যখন সে খালেছ নিয়তে করতে ইচ্ছা করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করেন এবং তাঁর স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতা বলে তাকে সেই কাজ করার দিকে চালিত করেন।

কোরআন যে বিষয়টি মুসলমানের অনুভূতিতে বদ্ধমূল করতে চায় তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম, সীমাহীন ও নিরংকুশ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। শুধু তাই নয়, সকল সৃষ্টির ইচ্ছাও তাঁর ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁর অধীন। এ বিষয়টি ব্যক্তির চেতনায় বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্য এই যে, বান্দা যেন পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল একাগ্রতা ও নিষ্ঠা নিয়ে আল্লাহর শরনাপন্ন হয় এবং তাঁর কাছে একেবারে শর্তহীন ও নিরংকুশভাবে আত্মসমর্পন করে। এই হলো ইসলামের প্রকৃত মানসিক রূপ। ইসলাম ঠিক এই রূপ পরিগ্রহ না করা পর্যন্ত কারো হৃদয়ে টিকে থাকতে পারে না। যখন তা কারো হৃদয়ে অবস্থান গ্রহণ করে, তখন তা ভেতর থেকে তাকে সর্বাত্মক পোষকতা দেয় এবং তার মধ্যে এমন একটি ধারণা ও মতামত গড়ে তোলে, যার ভিত্তিতে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যখনই বেহেশত ও দোযখের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে বা হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে কোনো কথা বলার পর আল্লাহর সার্বভৌম নিরংকুশ ও সর্বাত্মক ইচ্ছার সংক্রান্ত বক্তব্য আসে, তখন এটাই হয়ে থাকে তার উদ্দেশ্য।

এখন কেউ যদি এই নিরংকুশ ও সীমাহীন ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা বা অধীনতার বিতর্ক তোলার প্রয়াস পায়, তবে সেটা হবে একটা সার্বিক সত্য ও অখন্ড ধারণাকে খন্ডিত ও বিভক্ত করার প্রয়াস। এটা একটা চিরায়ত ও প্রশস্ত সত্যকে সংকীর্ণ ও সীমিত করার শামিল। এ দ্বারা স্বস্তিদায়ক ও সন্তোষজনক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে না। কেননা কোরআনে তাকে এরূপ সংকীর্ণ ও অবরুদ্ধ সত্য হিসাবে পেশ করা হয়নি।

'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা (আল্লাহ তায়ালাকে) স্মরণ করতে পারে না।'

কারণ মানুষ তার ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যকরী করতে সক্ষম নয়। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া মানুষ কোনো ব্যাপারে উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত এবং সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাই তাকে সক্রিয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম করে।

'তিনিই তাকওয়ার অধিকারী।'

অর্থাৎ একমাত্র তিনিই এই অধিকার রাখেন যে, তাকে ভয় করা হোক, আর এ জন্যে তিনিই চান যে, বান্দারা তাকে ভয় করুক।

'ক্ষমার অধিকারী।'

নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে যাকে খুশী অনুগ্রহ পূর্বক ক্ষমা বিতরণ করেন। খোদাভীতি ক্ষমার যোগ্যতা সৃষ্টি করে। আর আল্লাহ তায়ালা এই দুটোরই অধিকারী।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাঁকে স্মরণ করা ও ভয় করার প্রেরণা দিন এবং ক্ষমা দিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করুন। আমীন!

# সূরা আল ক্বেয়ামাহ

আয়াত ৪০ রুকু ২

**মক্কায় অবতীর্ণ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝١ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝٣ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝٤ بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝٥ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝٦ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ۝١٤ وَّلَوْ أَلْقٰى مَعَاذِيْرَهُ ۝١٥

## রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আমি শপথ করছি রোজ কেয়ামতের, ২. আরও আমি শপথ করছি সে নফসের, যে (ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যে) নিজেকে ধিক্কার দেয়; ৩. মানুষ কি ধরে নিয়েছে, (সে মরে গেলে) আমি তার অস্থিমজ্জাগুলো আর কখনো একত্রিত করতে পারবো না; ৪. অবশ্যই (আমি তা পারবো), আমি তো বরং তার আংগুলের গিরাগুলোকেও পুনর্বিন্যস্ত করে দিতে পারবো। ৫. এ সত্ত্বেও মানুষ তার সম্মুখের দিনগুলোতে পাপাচারে লিপ্ত হতে চায়, ৬. সে জিজ্ঞেস করে, (তোমার প্রতিশ্রুত) কেয়ামত কবে আসবে? ৭. (তুমি বলো,) যেদিন (সবার) দৃষ্টি ধাঁধাযুক্ত হয়ে যাবে, ৮. (যেদিন) চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, ৯. (যেদিন) চাঁদ ও সুরুজ একাকার হয়ে যাবে, ১০. (সেদিন) মানুষগুলো সব বলে উঠবে (সত্যিই তো! কেয়ামত এসে গেলো), কোথায় আজ পালানোর জায়গা (আমাদের)? ১১. (ঘোষণা আসবে) না, (আজ পালাবার জায়গা নেই,) কোনো আশ্রয়স্থল নেই; ১২. (আজ) আশ্রয়স্থল ও ঠাঁই আছে (একটাই এবং তা) শুধু) তোমার মালিকের কাছে, ১৩. সেদিন প্রতিটি মানুষকে (খুলে খুলে) জানিয়ে দেয়া হবে, কি (কাজ) নিয়ে সে আজ হাযির হয়েছে, আর কি (কি কাজ) সে পেছনে রেখে এসেছে; ১৪. মানুষরা (মূলত) নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে নিজেরাই সম্যক অবগত, ১৫. যদিও সে নিজের (সপক্ষে) বিভিন্ন অজুহাত পেশ করতে চাইবে;

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا

قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ

يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ

وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾

১৬. (ওহীর ব্যাপারে হে নবী) তুমি তাতে তাড়াহুড়ো করার উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ো না; ১৭. এর একত্র করা ও (ঠিকমতো তোমাকে) পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর, ১৮. অতএব আমি (জিবরাঈলের মাধ্যমে তোমার কাছে) যখন কোরআন পড়তে থাকি, তখন তুমি সে পড়ার (দিকে মনোযোগ দাও এবং এর) অনুসরণ করার চেষ্টা করো, ১৯. অতপর (তোমাকে) এর ব্যাখ্যা বলে দেয়ার দায়িত্বও আমার ওপর; ২০. কক্ষনো না, তোমরা পর্থিব জগতকেই বেশী ভালোবাসো ২১. এবং পরকালীন জীবনকে তোমরা উপেক্ষা করো! ২২. সেদিন কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে, ২৩. এ (ভাগ্যবান) ব্যক্তিরা তাদের মালিকের দিকে তাকিয়ে থাকবে, ২৪. আবার এদিন কিছু (মানুষের) চেহারা হয়ে যাবে (উদাস ও) বিবর্ণ, ২৫. তারা ভাবতে থাকবে, (এক্ষুণি বুঝি) তাদের সাথে কোমর বিচূর্ণকারী (আযাবের) আচরণ (শুরু) করা হবে; ২৬. কখনো নয়, মানুষের প্রাণ (যখন) তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে যাবে, ২৭. তাকে বলা হবে, এ (বিপদের) সময় (যাদুটোনা ও) ঝাড় ফুঁক দেয়ার মতো কেউ কি আছে? ২৮. সে (তখন ঠিকমতোই) বুঝে নেবে, (পৃথিবী থেকে এখন) তার বিদায় (নেয়ার পালা), ২৯. (আর এভাবেই) তার (এ জীবনের শেষ) পা' (পরের জীবনের প্রথম) পা'র সাথে জড়িয়ে যাবে, ৩০. আর সে দিনটিই হবে তোমার মালিকের দিকে (তার অনন্ত) যাত্রার (প্রথম) সময়!

## রুকু ২

৩১. (আসলে) এ (জাহান্নামী) ব্যক্তিটি সত্য স্বীকার করেনি এবং (সত্যের দাবী মোতাবেক) সে নামায প্রতিষ্ঠা করেনি, ৩২. বরং (তার বদলে) সে (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (সত্য থেকে) সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ৩৩. সে অত্যন্ত দম্ভ ও অহমিকাভরে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গেলো, ৩৪. (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হাঁ, (এ পরিণাম ঠিক) তোমাকেই মানায় এবং এটা তোমারই প্রাপ্য।

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

৩৫. অতপর এ আচরণ তোমারই সাজে, (এটা) তোমার জন্যেই মানায়; ৩৬. মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে তাকে এমনি (লাগামহীন অবস্থায়) ছেড়ে দিয়ে রাখা হবে; ৩৭. সে কি (এক সময়) এক ফোঁটা স্খলিত শুক্রবিন্দুর অংশ ছিলো না, ৩৮. তারপর (এক পর্যায়ে) তা হলো রক্তপিন্ড, অতপর আল্লাহ তায়ালা (তাকে দেহ সৃষ্টি করে) সুবিন্যস্ত করলেন, ৩৯. এরপর আল্লাহ তায়ালা সে থেকে নারী পুরুষের জোড়া পয়দা করেছেন। ৪০. এরপরও তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ তায়ালা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?

**সংক্ষিপ্ত আলোচনা**

এই ক্ষুদ্র সূরাটি মানুষের হৃদয়ে এত বিপুল পরিমাণ উচুঁ মানের তত্ত্ব ও তথ্য, ইশারা ও ইংগিত, দৃশ্য ও চিত্র এবং অনুভূতি ও উপলব্ধির সমাবেশ ঘটায়, যাকে সে প্রতিরোধও করতে পারে না আবার উপেক্ষাও করতে পারে না। অত্যন্ত ক্ষুরধার ভাষায় ও বিশেষ কোরআনিক বাচনভংগীর আশ্রয় নেয় যা তার ভাষাগত কাঠামোতে এবং শৈল্পিক সূরে ও ধ্বনিতে সমভাবে প্রতিফলিত হয়। ভাষাগত ও ধ্বনিগত উভয় প্রকারের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এতে এক শক্তিশালী প্রভাবের সৃষ্টি হয়, যার মোকাবেলাও করা যায় না, আবার তাকে উপেক্ষাও করা যায় না।

প্রথম দুটি আয়াতে কেয়ামত সংক্রান্ত বচন ও মন সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে। তারপর মন ও কেয়ামত সংক্রান্ত বক্তব্য অব্যাহত রয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুটি বিষয় পাশাপাশি চলেছে। এ হিসাবে প্রথম দুই আয়াতের বক্তব্যকে সূরার বিষয়বস্তুর বিবরণ অথবা এমন একটি জরুরী বক্তব্য বলে আখ্যায়িত করা যায়, যা সূরার বহুসংখ্যক বাক্যে ঘুরে ফিরে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি হয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ ভংগীতে।

মানুষের মনের সামনে এই সূরা যে বড় বড় তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে তার চারপাশে দুর্লংঘ্য প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে মৃত্যু সংক্রান্ত নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ সত্যটি। এটি এমন নির্মম বাস্তবতা, প্রত্যেক প্রাণীই যার সম্মুখীন হয়ে থাকে, অথচ সে নিজে অথবা তার আশপাশের কেউই তা প্রতিরোধ করতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে অগণিত প্রাণী মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি শিশু, কি বৃদ্ধ, কি সবল, কি দুর্বল, সকলেই এর শিকার হচ্ছে অথচ সকলে তার সামনে একই রকম অসহায়। কোনো কলাকৌশল বা ফন্দি-ফিকির, কোনো উপায়-উপকরণ, কোনো জোর-জবরদস্তি, কোনো সুপারিশ, কোনো প্রতিরোধ কিংবা কোনো বিলম্বিত করণের কৌশল প্রয়োগ করে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দিক থেকেই

তার সামনে আসে এবং মানুষ তা ঠেকানোর কোনো উপায়ই জানে না। মৃত্যুর কাছে এবং যে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তা পাঠায় তার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া মানুষের আর কিছুই করার থাকে না। সূরার ২৬-৩০ আয়াতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় এ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

সূরার উপস্থাপিত বিষয়সমূহের আর একটি অন্যতম বিষয় হলো মানুষের ইহকালীন জন্ম। এই জন্ম দ্বারা তার মৃত্যু পরবর্তী পুনর্জন্ম এবং মানব সৃষ্টির মূলে নিহিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এটি এমন একটি বাস্তবতা, যার সূক্ষ্মতা, নিপুণতা এবং অব্যাহত পুনরাবৃত্তি একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং তাতে সন্দেহ পোষণ করে তারাও কখনো একথা দাবী করে না যে, পৃথিবীর কোনো একটি জিনিসও তারা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার কাজ একজন স্রষ্টাই করে থাকেন। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা এই মর্মেও সাক্ষ্য দেয় যে, পরকালীন পুনরুজ্জীবন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সহজই শুধু নয়, বরং অপরিহার্য। কেননা প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার তত্ত্ব সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষকে নিরর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং তার জীবন ও কর্মকে পরিমাপ ও মূল্যায়ন না করে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না। এই বক্তব্য নিয়েই এই সূরা মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে। সূরার সূচনাতেই সে বলেছে, মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনো তার হাড়গুলোকে একত্রিত করবো না? আবার শেষের দিকে বলেছে, মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে?

সূরার উপস্থাপিত অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দৃশ্য হচ্ছে কেয়ামতের দৃশ্য, কেয়ামতে সংঘটিত প্রাকৃতিক জগতের ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার দৃশ্য। মনস্তাত্তিক বিপর্যয় এবং সমগ্র সৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়া সর্বাত্মক ভীতি ও ত্রাস। মানুষের প্রশ্নের জবাবে কেয়ামতের এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ দেয়া হবে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও দ্রুতগতিতে। যথা, 'আসলে মানুষের ইচ্ছা, আল্লাহর সামনেই পাপাচারে লিপ্ত হয়। সে জিজ্ঞাসা করে, কবে হবে কেয়ামত। সেটি হবে সেই দিন যেদিন দৃষ্টিশক্তি যাবে....'

সেদিনের দৃশ্যসমূহের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হবে মোমেনদের দৃশ্য। তারা সেদিন পরম আনন্দে ও শান্তিতে থাকবে। সেই ভয়াবহ দিনে তারা আল্লাহর সাক্ষাত লাভের আশায় আশান্বিত থাকবে। অপর দৃশ্যটি হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন, হতাশাগ্রস্ত, আপন পাপ ও কুফরীর শাস্তির আশংকায় তটস্থ অবাধ্য লোকদের দৃশ্য। এ দৃশ্যটি এত শক্তিশালী ও জীবন্তভাবে তুলে ধরা হয়, যেন তা কোরআন পাঠের সময় পাঠকের সামনেই উপস্থিত। এতে মানুষের ইহকাল প্রীতি ও আখেরাতকে অবহেলার সমালোচনা করা হয়েছে। 'কখনো নয়, তোমরা বরঞ্চ দুনিয়ার জীবনকেই ভালোবাস আর আখেরাতকে ছেড়ে দাও।'

এইসব দৃশ্য বর্ণনার মাঝখানে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে রসূল (স.)-এর ব্যাকুলতা সম্পর্কে দেয়া বিশেষ নির্দেশ সম্বলিত চারটি আয়াত। মনে হয় খোদ সূরার ভেতরেই এই শিক্ষার প্রসংগ বিদ্যমান রয়েছে। রসূল (স.) আশংকা করতেন যে, কোরআনের কোনো অংশ হয়তো তিনি ভুলে যাবেন। তাই ভুলে যাওয়ার ভয়ে তিনি ওহী নাযিল হওয়ার সময় এর এক একটি করে বাক্য বারবার মুখে আউড়িয়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। এই প্রসংগেই নাযিল হয়, 'তাড়াহুড়া করে মুখস্থ করার জন্যে কোরআনের আয়াত উচ্চারণ করে নিজের জিহবা

নাড়িও না। একে একত্রিত করা ও পড়িয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব। যখন আমি পড়বো, তখন তা অনুসরণ করে পড়ো। তারপর তার ব্যাখ্যা করাও আমার দায়িত্ব।' তাঁর কাছে এ নির্দেশিকা আসার কারণ এই যে, কোরআনের সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দায়িত্ব–এটা যেন তিনি বোঝেন ও নিশ্চিন্ত থাকেন।

তাঁর ভূমিকা শুধু কোরআন নিজে আহরণ করা ও অন্যদের কাছে পৌঁছানো। যথাসময়ে তিনি পুরো কোরআন তার অন্তরে রক্ষিত দেখতে পাবেন। আসলে হয়েছিলোও তাই। এই নির্দেশ কোরআন নাযিল হওয়ার সময়েই সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। যেহেতু এ নির্দেশটি স্বয়ং আল্লাহরই উক্তি, তাই আল্লাহর এই উক্তি অকাট্য ও অক্ষয় প্রমাণিত হয়েছিলো। খোদ্ কোরআনের মতোই এ কথাগুলোও অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত হয়েছে। এ থেকে একটি অক্ষরও হারায়নি বা খোয়া যায়নি। বস্তুত এ কথাগুলোও ছিলো অকাট্য সত্য।

এই সূরাটি পড়ার সময় প্রত্যেক পাঠকের মন উপলব্ধি করে যে, সে চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে আছে তার পালানোর অবকাশ নেই। তার কর্মফলের সাথেই তার ভাগ্য আবদ্ধ। এ থেকে তার নিস্তার নেই। এ থেকে তার কোথাও আশ্রয় নেই। কেউ তার রক্ষক নেই।

স্বয়ং আল্লাহর জ্ঞান ও পরিকল্পনা দ্বারা তার জন্ম ও তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত। দুনিয়াতে ও আখেরাতে একইভাবে নিয়ন্ত্রিত–চাই সে যতই খেলাধুলা, তামাশা ও অহংকার করে কাটাক না কেন। এ কথাই পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বিধৃত হয়েছে,

'কিন্তু সে–না সত্য মেনে নিলো, না সে নামায পড়লো। বরং সত্যকে মনে করলো ও ফিরে গেলো। পরে অহমিকা সহকারে নিজের পরিবার পরিজনের কাছে রওনা হয়ে গেলো।'

আর সেই বিপুলসংখ্যক তত্ত্ব, তথ্য ও আবেগ অনুভূতির সমাবেশ ঘটানোর পাশাপাশিই পরোক্ষ হুমকির বাণী শোনানো হয়েছে এভাবে,

'এরূপ আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায়। হাঁ, এই আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমাতেই শোভা পায়।'

এ ভাবেই সূরাটি মানুষের মনের একগুয়েমী, গোয়ার্তুমী, হঠকারিতা, অবহেলা, ও খেল তামাশা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করে এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করে। তা হচ্ছে কেয়ামত ও মন সংক্রান্ত সত্য নিয়ন্ত্রিত ও সূক্ষ্ম হিসাবের আওতাভুক্ত জীবনের বাস্তবতা এবং প্রতিটি অক্ষর সহ সংরক্ষিত এই অকাট্য কোরআনের বাস্তবতা। কেননা এ কোরআন মহান প্রভু আল্লাহর কালাম। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি তাঁর কালামে মুখরিত, প্রকৃতির নিরাপদ রেজিষ্টারে তা সুরক্ষিত এবং এই পবিত্র গ্রন্থেও তা সংরক্ষিত।

ইতিপূর্বে আমি নিছক বর্ণনার খাতিরে সূরার বক্তব্য বিষয় ও দৃশ্যসমূহ তুলে ধরেছি। কিন্তু মূল সূরায় সে বিষয়গুলোর স্বরূপ সম্পূর্ণ অন্যরকম। কেননা উক্ত বিষয়গুলো ক্রমাগতভাবে বর্ণনা করা, কোথাও একাধিক বিষয়ের একত্র সমাবেশ, আবার কোথাও সত্যের একটি বিশেষ দিক হৃদয়ে বদ্ধমূল করা এবং পুনরায় তার অপরাংশের বর্ণনায় প্রত্যাবর্তন–এ সবই মানব হৃদয়কে সম্বোধন করে ব্যবহৃত কোরআনের বিশেষ বাচনভংগী। অন্য কোনো বাচনভংগী এর ধারে কাছেও যেতে পারেনি।

### তাফসীর

এবার আমরা সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করবো। সূরার প্রথম থেকে ১৫ নং আয়াত পর্যন্ত পড়লে দেখা যাবে, এখানে যে পরোক্ষ শপথ করা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ শপথের চেয়েও অন্তরে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব বিস্তার করাই এর আসল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য এই বিশেষ বাচনভংগীই অধিকতর সফল হয়। এই বাচনভংগীর প্রয়োগ কোরআনের একাধিক জায়গায় দেখা যায়। অতপর কেয়ামত ও তিরস্কারকারী মনের তত্ত্বকথা উন্মোচন করা হয়।

### নাফসে লাওয়ামা বা তিরস্কারকারীর মন

কেয়ামতের ব্যাপারটি তো সূরায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই তার তেমন বেশী ব্যাখ্যার দরকার নেই। কিন্তু 'নাফসে লাওয়ামা' বা তিরস্কারকারী মন সম্পর্কে বহু মত রয়েছে।

হাসান বসরী বলেন, আল্লাহর কসম, কোনো মোমেনকে তুমি যখনই দেখবে, দেখবে সে নিজেকে তিরস্কার তথা আত্মসমালোচনা করছে। সে নিরন্তর নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, আমার কথার উদ্দেশ্য কি? আমার খাওয়ার উদ্দেশ্য কি? আমার নিজের সাথে কথা বলার উদ্দেশ্য কি? আর পাপী লোককে দেখবে, চলছে তো চলছেই। সে একটুও আত্মসমালোচনা করছে না।

হাসান বলেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজেকে ধিক্কার দেবে ও আত্মসমালোচনা করবে। ইকরামার মতে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার কাজ করেই নিজের সমালোচনা ও পর্যালোচনা এভাবে করা যে, আমি যদি এভাবে কাজ করতাম!

হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ার এবং হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এ হচ্ছে আত্মসমালোচক মন। তিনি এর অর্থ, সমালোচিত মনও বলেছেন।

মোজাহেদ বলেন, যে সৎ কাজ হাত ছাড়া হয়ে গেছে তার জন্যে আফসোস ও অনুশোচনা করা এবং নিজেকে ভর্ৎসনা করা।

কাতাদা (র.)-এর মতে, লাওয়ামা অর্থ পাপী। ইবনে জরীর বলেন, এই সব কয়টি উক্তি প্রায় কাছাকাছি অর্থবোধক। কোরআনের উক্তিতে এর অর্থ বাহ্যত, ভালো ও মন্দ কাজের ওপর সমালোচনাকারী ও ছুটে যাওয়া সৎ কাজের জন্যে অনুশোচনাকারী মোমেন।

আমার কাছে 'নাফসে লাওয়ামা'-এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরীর উপরোক্ত উক্তিই সঠিক বলে মনে হয়। এহনে আত্মসমালোচক, সদাসতর্ক, আল্লাহভীরু মনই আল্লাহর কাছে অতীব সম্মানিত মন, কেননা সর্বক্ষণ তার পরিবেশের প্রতি নযর থাকে। স্বীয় কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে হুশিয়ার থাকে।

এ কারণেই এই মনের কথা হিসাবের দিন কেয়ামতের সাথেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া এটি পাপাসক্ত মনের ঠিক বিপরীত। পাপাসক্ত মন হচ্ছে সর্বদা অপরাধ প্রবণ, সে দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও ফিরে যায় এবং আপন পরিবারের কাছে গর্বের সাথে যায়, কোনো আত্মসমালোচনার প্রয়োজন অনুভব করে না।

### মানুষের পুনরুত্থান অবধারিত সত্য

কেয়ামত ও নাফসে লাওয়ামার শপথ করে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের অবধারিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে সেটা কিছুটা ভিন্ন আংগিকে। যথা,

'মানুষ কি ভেবেছে যে আমি তার হাড়গুলোকে একত্রিত করবো না? আমি তো তার আংগুলের গিরাগুলোও যথাযথভাবে বানিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখি।'

মোশরেকদের মনস্তাত্বিক সমস্যা ছিলো এই যে, তারা মনে করতো, মৃত মানুষের হাড়গোড় মাটির গভীরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে হারিয়ে যাওয়ার পর তা পুনরায় একত্রিত করে মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা কি করে সম্ভব, তা তারা ভাবতেই পারতো না। বর্তমান যুগেও বোধকরি এটা অনেকে অসম্ভব মনে করে। হাড়গোড় একত্রিত করার এ ব্যাপারটিকে অসম্ভব মনে করাকে কোরআন দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এ কাজটি সংঘটিত হবেই বলে ঘোষণা করেছে। আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে,

'অবশ্যই আমি তার আংগুলের গিরাগুলোকেও যথাযথভাবে বানিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখি।'

'বানান' শব্দটির অর্থ হচ্ছে আংগুলের প্রান্তভাগ বা গিরা। কোরআন বলতে চাচ্ছে যে, শুধুমাত্র হাড়গোড় একত্রিত করা আর এমন কি? আল্লাহ তায়ালা তো তার চেয়েও উন্নততর ও সুক্ষ্মতর কাজ যথা আংগুলগুলোর গিরাগুলো পর্যন্ত যথাযথভাবে বানিয়ে দিতে সক্ষম। অর্থাৎ মানবদেহকে এত সুক্ষ্মভাবে ও পূর্ণাংগভাবে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম, যাতে তার একটা আংগুলও খোয়া না যায়, স্থানচ্যুত না হয়, কোনো অংগহানি বা অংগের বিকৃতি না ঘটে–চাই তা যতই ছোট ও সূক্ষ্ম হোক না কেন। একেবারে যেমনটি পূর্বে ছিলো, ঠিক তেমনটি বানিয়ে দিতে তিনি সক্ষম।

এখানে আল্লাহ তায়ালা শুধু এতটুকু যুক্তি প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। সূরার শেষভাগে আল্লাহ তায়ালা আরো একটা যুক্তি পেশ করেছেন প্রথম সৃষ্টির বাস্তবতার আলোকে। এখানে মানুষের এরূপ ধারণার পেছনে এবং আল্লাহ তায়ালা হাড়গোড় একত্রিত করতে পারবেন না–বলে মনে করার পেছনে একটি মনস্তাত্বিক কারণ দেখিয়েছেন। সেটি এই যে, মানুষ পাপ করতে চায়, কিন্তু সে এও চায় এক্ষেত্রে কেউ যেন তাকে বাধা দিতে না পারে এবং কোনো হিসাব নিকাশ ও জবাবদিহীর সম্মুখীন তাকে যেন হতে না হয়। এরূপ একটি মনস্তাত্বিক ঝোঁকের বশে সে মনে করে যে, পুনরুজ্জীবিত হওয়া ও কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

'বরঞ্চ মানুষ তার সামনে পাপ করতে চায়, তাই জিজ্ঞাসা করে যে, কেয়ামত আবার কবে হবে?'

আসলে এ প্রশ্নটির মূল সূর হচ্ছে, কেয়ামত হবে না, হতেও পারে না। আসলে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া এবং অপ্রতিহতগতিতে পাপ কাজ চালিয়ে যাওয়ার অদম্য বাসনা থেকেই এই ধারণার উৎপত্তি। সে চায় আখেরাতের জবাবদিহী ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কল্পরূপ যেন তার পাপে মত্ত জীবনকে বাধাগ্রস্থ করতে না পারে।

কেননা আখেরাত বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তা পাপাসক্ত প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরে এবং পাপ প্রবণ মনের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। এ জন্যে সে কেয়ামতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে এই লাগামটি দূরে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে, যাতে তার উদ্দাম ও সীমাহীন দুষ্কর্ম অব্যাহত থাকে।

এ কারণে কেয়ামতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা ও অসম্ভব মনে করার ঔদ্ধত্যের জবাবে অতি দ্রুত ও আকস্মিকভাবে কেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। কেয়ামতের এ দৃশ্যটিতে মানুষের অনুভুতি, ভাবাবেগ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর একত্র সমাবেশ ঘটেছে,

'যখন বিদ্যুতের ঝলকানিতে চোখ ঝলসে যাবে, চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে, চাঁদ ও সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হবে, তখন মানুষ বলবে, এখন কোথায় পালাই?'

দৃষ্টিশক্তি যখন বিদ্যুতের মতো দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হবে ও ঝলসে যাবে, চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে এবং সুর্য বিচ্ছিন্ন থাকার পর চাঁদের সাথে মিলে যাবে এবং সৌর মন্ডলের প্রচলিত

নিয়ম-শৃংখলা ভেংগে গিয়ে গোটা প্রাকৃতিক জগত বিপর্যস্থ হয়ে পড়বে, তখন সেই সর্বময় আলোড়ন ও আতংকের পরিবেশে ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ বলবে, 'এখন কোথায় পালাই!'

তার এ প্রশ্নে ভয়ে দিশাহারা হয়ে যাওয়ার মনোভাব পরিস্ফুট। মনে হয় একবার সে চারদিক তাকিয়ে দেখবে, তারপর সব পথ রুদ্ধ দেখে এ কথা বলবে। আসলে সেদিন আল্লাহর আক্রোশ ও পাকড়াও থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো পথ থাকবে না, তার কাছে ছাড়া আশ্রয় নেয়ার কোনো জায়গা থাকবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কখনো নয়, কোনোই আশ্রয় স্থল থাকবে না। সেদিন একমাত্র তোমার প্রভুর কাছেই থাকবে অবস্থানের স্থান।' ইতিপূর্বে মানুষ অবাধে পাপ করে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে ছাড়া পাবে বলে যে আশা ছিলো, সেদিন আর তা থাকবে না। সেদিন যা কিছু সে করেছে কড়ায় গন্ডায় তার হিসাব বুঝে পাবে। যদি ভুলে যায় তবে তা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। অতপর তার সকল কৃতকর্মকে সে স্মরণ করতে পারবে এবং তার সামনেই উপস্থিত পাবে, 'সেদিন মানুষ যা আগে করেছে ও পরে করেছে তা তাকে জানানো হবে।'

অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে যে সব কাজ সে নিজে এবং মৃত্যুর পরে তার সম্পাদিত ভালো বা মন্দ কাজের জের হিসাবে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তাও তাকে অবহিত করা হবে। বস্তুত, হিসাব নিকাশের শেষে প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামায় সেইসব কাজ যুক্ত হবে, যা তার মৃত্যুর পরে তার কাজের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংঘটিত হবে।

মানুষ তার কৃতকর্মের পক্ষে যত ওযর বাহানা ও সাফাই পেশ করুক না কেন, তা গৃহীত হবে না। কেননা তার প্রবৃত্তির দায়দায়িত্ব তার নিজেরই ঘাড়ে থাকবে। নিজের প্রবৃত্তিকে সৎপথে পরিচালিত করা তারই দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু তা যখন সে করেনি এবং অপকর্ম করেছে, তখন তার জন্যে তাকেই দায়ী হতে হবে, 'বরঞ্চ মানুষ নিজে নিজেকে খুব ভালোভাবেই জানে, চাই যতই সাফাই সে পেশ করুক না কেন।'

লক্ষণীয় যে, প্রতিটি বাক্য ছোট ছোট ও দ্রুত গতিশীল। প্রত্যেকটির মাঝে সামান্য বিরতি। প্রত্যেকটিতে অপূর্ব সুরেলা ছন্দ ও চোখ ধাঁধানো দৃশ্যের সমাবেশ। হিসাব নিকাশের অনুষ্ঠানটিও তদ্রূপ অল্প কথায় সমাপ্ত। 'মানুষকে তার আগের ও পরের কৃতকর্ম অবগত করা হবে।' এভাবে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বচনে বিবরণ দেয়া হয়েছে। কারণ এ দ্বারা দীর্ঘ আশা ও হিসাবের দিনের প্রতি অবজ্ঞার জবাব দেয়া হয়েছে।

### কোরআনের পাঠ ও সংরক্ষণ

এরপরই আসছে সেই বিশেষ চারটি আয়াত, যাতে রসূল (স.)-কে ওহী ও কোরআন মুখস্থ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

'এই ওহীর বাণী দ্রুত উচ্চরণ করার জন্যে জিহবা নাড়িও না, একে সংরক্ষণ করা ও পড়ার ব্যবস্থা করা আমারই দায়িত্ব। আমি যখন পড়বো তখন তুমিও পড়ো। তারপর তার ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমার।'

সূরার ভূমিকায় আমরা এ আয়াতগুলো সম্পর্কে যা বলেছি, তার সাথে আরেকটি কথা এখানে যোগ করতে চাই এবং তা এই যে, এই আয়াতগুলো থেকে মনে যে ধারণাগুলো বদ্ধমূল হয় তা হলো,

১. এই কোরআন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। ওহী প্রেরণ থেকে শুরু করে নির্ভুলভাবে তা সংরক্ষণ, সংকলন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যন্ত সব কিছুই তার প্রত্যক্ষ দায়িত্বের আওতাধীন।

২. এই কোরআন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর রচিত এবং তা তিনি তার কাছ থেকেই পেয়েছেন।

৩. রসূল (স.)-এর ওপর কোরআনের ব্যাপারে অর্পিত দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, তিনি তা বহন করবেন ও প্রচার করবেন।

৪. রসূল (স.) কর্তৃক কোরআনকে সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ করার প্রবল আবেগ ও আগ্রহ পোষণ করতেন এবং এ কাজকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন শুধু এই ভয়ে যে, এর একটি শব্দও যেন তার কাছ থেকে খোয়া না যায়। আর এ কারণেই জিবরাঈল যখন কোরআন পড়ে তাঁকে শোনাতেন তখন তিনিও তার অনুকরণে প্রতিটি আয়াত ও শব্দ উচ্চারণ করতেন। যাতে তার একটি শব্দও তার কাছ থেকে হারিয়ে না যায়। এবং সম্পূর্ণ সংরক্ষিত হয়েছে এই মর্মে পরবর্তীকালে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

কোরআনে এই ঘটনার উল্লেখ এবং স্থায়ীভাবে এর সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ দ্বারা সূরার ভূমিকায় যা বলেছি এবং উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর সত্যতাই সমর্থিত হয়।

**কেয়ামতের দিনের একটি চিত্র**

এরপর সূরায় কেয়ামতের দৃশ্যাবলী ও সেখানে আত্মসমালোচক মনের যে অবস্থা হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এত মানুষের মনের স্বভাব ও ব্যাধিগুলো, যথা দুনিয়ার আসক্তি ও তাতে সর্বাত্মকভাবে নিমজ্জিত হওয়া এবং আখেরাতকে অবহেলা করা প্রভৃতির চিকিৎসার ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে। অতপর আখেরাতের ব্যাপারে তাদের উদাসীন ভূমিকা ও তার ফলে কেয়ামতে তাদের যে দুর্গতি হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। একটি জীবন্ত দৃশ্যের উপস্থাপনার মাধ্যমে এ দুরবস্থা চিত্রিত করা হয়েছে। এ দৃশ্য অত্যন্ত প্রভাবশালী ও উদ্দীপনাময়,

'কখনো নয়! বরঞ্চ তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসছো এবং আখেরাতকে ত্যাগ করছো। প্রকৃতপক্ষে সেদিন কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে এবং নিজের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উদাস ও ম্লান হবে। মনে করতে থাকবে যে, তাদের সাথে বুঝি এখনি নৃশংস আচরণ করা হবে।'

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা এই যে, এখানে দুনিয়াকে 'আ'জেলা' অর্থাৎ দ্রুতগামী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও এ শব্দের প্রধান প্রতিপাদ্য হলো, দ্রুত অতিক্রমকারী ও ক্ষণস্থায়ী এবং এখানেও সেই অর্থেই এটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই শব্দের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতে 'তাড়াতাড়ি ওহীকে আয়ত্ত করার জন্যে জিহবা নাড়িও না' এই নির্দেশটির একটি তত্ত্বগত ও অর্থগত মিল রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই 'ত্বরিত প্রাপ্তির আকাংখ্যা' পার্থিব জীবনে মানবীয় চরিত্রের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

কোরআনের ভাষায় এটা মানবীয় চেতনার একটা সুক্ষ্ম ও গভীর সমন্বয়।

এরপর কেয়ামতের যে অবস্থাটি কোরআন অতি সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছে তা হলো,

'সেদিন বহুসংখ্যক মুখাবয়ব থাকবে উজ্জ্বল ও তরতাজা, আপন বিভূর দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

এই বক্তব্যটুকু অতি সংক্ষেপে এমন একটি অবস্থার দিকে ইংগিত করেছে, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না এবং কল্পনা শক্তি দ্বারাও তাকে পুরোপুরিভাবে কল্পনা করা যায় না। ভাগ্যবান

লোকদের সম্পর্কে এখানে এমন একটি সুখকর অবস্থার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যার সাথে কোনো কিছুর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি পাশেই অবস্থিত বেহেস্ত তার সকল নানা নেয়ামত নিয়েও তার সামনে নগণ্য।

এই সকল তরতাজা উজ্বল চেহারা কেন এত উজ্জ্বল। কারণ, তারা আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হয়েছে। এটি যে কত উচুঁ স্তরের সৌভাগ্য এবং কত উচ্চ মার্গের সুখ, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

মানুষের আত্মা বিশ্ব প্রকৃতিতে অথবা মানবীয় সত্তায় আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি নৈপূণ্যের কিছু কিছু নমুনা দেখে সে সময় অভিভূত ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

কখনো জোৎস্না-স্নাত রাতে, ফুটফুটে অন্ধকার ঘেরা রজনীতে। নবীন প্রভাতে দীর্ঘ সুশীতল ছায়া ঘেরা অরণ্যে, তরঙ্গস্ফীত সমুদ্রে, জনহীন মরুভূমিতে, সুশোভিত বাগানে, সুদৃশ্য চেহারায়, মহত্বপূর্ণ হৃদয়ে অটল অচল ঈমানে, অথবা মনোমুগ্ধকর ধৈর্যে এবং ও আনন্দোদ্দীপক দৃশ্য দেখে সে ক্ষণিকের জন্যে সকল দুঃখ কষ্টের তিক্ত স্মৃতি ও অনুভূতি ভুলে যায়। আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দেখে যদি এরূপ তৃপ্তি লাভ হতে পারে, তাহলে স্বয়ং আল্লাহর সৌন্দর্য দেখে কি অবস্থা হতে পারে?

এ অবস্থাকে ভাষায় বর্ণনা করা তো দূরের কথা, মানুষ যাতে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে এই অকল্পনীয় সুখ, আনন্দ তৃপ্তিকে উপভোগ করতে পারে, সে জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাকে দীর্ঘ আয়ু ও দৃঢ়তা প্রদান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং আল্লাহর সৌন্দর্য উপভোগ করার ভেতরে তার মুখাবয়বে ঔজ্জল্য আসবে না কেন?

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিভিন্ন দৃশ্য দেখলেই তো মানুষের তৃপ্তির আলামত মাঝে মাঝে তার হৃদয়ের চৌহদ্দী অতিক্রম করে মুখমন্ডলেও প্রতিফলিত হয়। এসময় তার মুখমন্ডল উজ্জ্বল ও তরতাজা মনে হয়। কাজেই এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্রষ্টা যিনি, যিনি সব দিক থেকেই পূর্ণাংগ ও সর্ব্বোচ্চস্তরে উন্নীত, তাঁর সীমাহীন সৌন্দর্য দেখে তার মুখমন্ডলে উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠবে না কেন? একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বেহেস্তে যখন মানুষ আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করবে তখন পার্থিব জীবনে সেই অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকনের যত অক্ষমতা ও অযোগ্যতা মানুষের মধ্যে ছিলো, তা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে এবং যে স্তরে উন্নীত হলে তার ভেতরে এই যোগ্যতা সৃষ্টি হবে সে স্তরেই সে উন্নীত হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তারা আল্লাহকে কিভাবে দেখবে, কোন অংগ দিয়ে দেখবে, কোন যন্ত্র দিয়ে দেখবে? এর জবাব এই যে, যার হৃদয়ে কোরআন আনন্দের ফোয়ারা বইয়ে দেয়, তার হৃদয়ে এ প্রশ্ন ওঠে না। যার আত্মায় সৌভাগ্যের পরশ বুলানো থাকে এবং যার আত্মা এই দর্শনের আশায় মতোয়ারা থাকে, এ প্রশ্ন তার মনে জাগে না। যেসব মানুষ নিজের আত্মাকে এই পরম সুখ, সৌভাগ্য ও আলোর বন্যা থেকে বঞ্চিত করছে এবং যে জিনিসকে মানবীয় বিবেক বুদ্ধির নির্ধারিত নিয়ম নীতি দ্বারা বুঝা যায় না, তা নিয়ে নিরর্থক তর্ক ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে তাদের অবস্থাটা অবশ্যই ভেবে দেখার মতো।

পরকালীন জীবনে মানুষের নৈতিক সত্তা তার বস্তুগত সত্তার সীমিত গন্ডী থেকে মুক্তি লাভ করবে। এই মুক্তির ফলেই মহাসত্যের সাথে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে তার মিলন ও সাক্ষাৎ সম্ভব হবে। এই মুক্তির আগে তার পক্ষে উক্ত সাক্ষাতের সম্ভাবনা কল্পনা করাও দুসাধ্য।

সুতরাং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে কেন্দ্র করে 'মোতাযেলা' সম্প্রদায় ও তাদের বিরোধীদের দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ক একটা নিরর্থক ও বৃথা বিতর্ক ছাড়া আর কিছু নয়।

আসল ব্যাপার এই যে, তারা পার্থিব ও ইহকালীন মানদন্ড দিয়েই সব কিছু পরিমাপ করতে চাইতো। তারা কথা বলতো পার্থিব বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত মানুষ সম্পর্কে এবং চিন্তা করতো সীমিত চিন্তা শক্তি ও বোধশক্তির সাহায্যে।(১)

ভাষা দ্বারা মনের যে ভাব প্রকাশ করা হয়, তা আমাদের সীমাবদ্ধ বিবেক বুদ্ধি ও ধ্যান-ধারণার ওপর নির্ভরশীল। আমরা যদি কখনো এই ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে যাই, তাহলে আমাদের ভাষার প্রকৃতিই বদলে যাবে। কেননা ভাষা হলো মানুষের মনমগযে বিদ্যমান ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে নানাবিধ জিনিসের নির্দেশক কতিপয় সংকেত চিহ্ন মাত্র। তাই মানুষের শক্তির তারতম্য ঘটলে তার ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন ঘটবে এবং সেই সাথে ভাষা দ্বারা প্রকাশিত মনোভাবের প্রকৃতিও পাল্টে যাবে।

আমরা দুনিয়াতে আমাদের অবস্থা অনুসারে ভাষার সেই সংকেতগুলো দ্বারাই কাজ নিয়ে থাকি, যার দ্বারা কাজ করতে আমরা অভ্যস্ত। পৃথিবীতে আমরা যে ভাষা দ্বারা যে অর্থ বুঝি, তা যেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে সেই জগত সম্পর্কে আমরা কিভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারি? কাজেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের মনমগয ও অন্তরাত্মাকে যেন সাধ্যমত সেই অপার্থিব জগতের পবিত্র ও নিষ্কলুষ প্রেরণা লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত করা। কেননা তা আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত। বস্তুত এই চেষ্টা এমন এক দুর্লভ নেয়ামত, যার ওপরে আল্লাহ তায়ালাব সাক্ষাত লাভ ছাড়া আর কোনো নেয়ামত নেই।

**অপরাধীদের উদাস চেহারা**

'কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব সেদিন উদাস ও ম্লান থাকবে.......... ।'

এই মুখাবয়বগুলোর ম্লান ও উদাস হওয়ার কারণ এই যে পাপের কালিমায় অতিমাত্রায় লিপ্ত থাকার কারণে তা আল্লাহর সাক্ষাত ও দর্শন লাভের যেমন যোগ্য থাকবে না, তেমনি কখন সে কোমর ভেংগে দেয়ার মতো আযাবে নিপতিত হবে এই ভেবে নিদারুণভাবে বিমর্ষ থাকবে। ভয়ে ও আশায় তাদের মুখমন্ডলে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠবে।

এই হচ্ছে সেই আখেরাত যাকে তারা অবহেলা করে পার্থিব জীবনকে অধিকতর ভালোবাসে। আর তাদের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে কেয়ামতের সেই ভয়াবহ দিন, যখন বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের কর্মফল ভোগ করবে। ফলাফলের এই বিভিন্নতাই উপরোক্ত আয়াত কয়টিতে ফুটে উঠেছে।

আয়াতসমূহ কেয়ামতের দিনের সার্বিক বিপর্যয়, মানুষের পালানোর জায়গা খোঁজার ব্যাকুলতা এবং নানান ধরনের মানুষের নানান ধরনের কর্মফল সম্বলিত দৃশ্য বর্ণনা করে। আর সে

---

(১) 'মোতাযেলা' একটি বাতিল ফের্কার নাম। আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে ইসলামের কতিপয় মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস যেমন, বেহেশতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ, কোরআনের সৃষ্টি, কবিরা গুনা করলে কাফের সাব্যস্ত হওয়া ও এর শাস্তি মৃত্যুদন্ড, মানুষের ব্যক্তিগত কাজের আসল সিদ্ধান্তকর ক্ষমতা-ইত্যাদি ব্যাপারে তারা কিছু বিভ্রান্তিমূলক চিন্তাধারা ছড়িয়েছিলো, যেগুলো মুসলিম মিল্লাতের স্বীকৃত আলেমদের বিরোধীতার মুখে বলতে গেলে তখন রহিতই হয়ে গিয়েছিলো। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই বাতিল ফের্কাটি 'বাতিল' হয়ে গেলেও এখন তাদেরই উচ্ছিষ্ট চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে এখন বহু নতুন মতবাদ গজিয়ে উঠছে। নামের একটু হেরফের হলেও চিন্তা ও দর্শনে এরা সবাই এক।—সম্পাদক

দৃশ্যসমূহ যখন মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং কোরআনের ক্ষুরধার বর্ণনাভংগী সেই শক্তি ও প্রভাবকে সুনির্দিষ্টভাবে জীবন্ত করে তুলে ধরে, তখন শ্রোতাদের চেতনায় তা আরো একটা দৃশ্যকে অংকিত করে। এই দৃশ্যটি প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন বারবার প্রত্যক্ষ করে এবং প্রতি মুহূর্তে তার সামনে তা পূর্ণ শক্তি ও তীব্রতা নিয়ে হাযির হয়।

এই দৃশটি হলো মৃত্যুর দৃশ্য। প্রত্যেক প্রাণীর এটি হচ্ছে শেষ পরিণতি। কোনো প্রাণী এই পরিণতি থেকে নিজেকে কিংবা অন্য কাউকে রক্ষা করতে পারে না। মৃত্যু প্রিয়জনকে প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে করতে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে। কারো দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না, কোনো শোকার্ত মানুষের বিলাপে, ব্যথিত প্রিয়জনের আক্ষেপে, কোনো আগ্রহী মানুষের আগ্রহে কিংবা ভীরু মানুষের ভয়ে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায় না। এই মৃত্যু একজন ক্ষুদ্র নগন্য ও দুর্বলকে যেমন সহজে সাবাড় করে, ঠিক তেমনি অনায়াসে খতম করে বড় বড় পরাক্রমশালী স্বৈরাচারী প্রতাপশালী শাসককেও। যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষের বিন্দুমাত্রও কোনো ফন্দিফিকির চলে না, তার অপ্রতিরোধ্য শক্তি সম্পর্কে মানুষ কিছুই চিন্তাভাবনা করে না। ২৬ থেকে ৩০ নম্বর আয়াত কয়টির মর্মার্থ এটাই।

এ আয়াত কয়টি পড়ে মনে হয়, কোরআন যেন একটি মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে উপনীত। মৃত্যু সেখানে সামনে দাঁড়ানো।

'কখনো নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

বস্তুত প্রাণ যখন কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন প্রাণ বায়ু নির্গত হবার সময় সমাগত হবে। তখন চেতনা হরণকারী এক অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং যন্ত্রণার চোটে চোখ বিস্ফারিত হবে, আর মুমুর্ষ ব্যক্তির পাশে হাযির লোকেরা বেদনা বিধুর আত্মাটিকে উদ্ধারের কৌশল ও উপায় উদ্ভাবনের জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাবে।

'বলা হবে ঝাড়-ফুঁক দেয়ার কেউ আছে কি?'

হয়তো বা এই ঝাড় ফুঁক বা তাবিয তুমারে কোনো উপকার হতে পারে। হয়তো বা মুমূর্ষ ব্যক্তিটি ভালোও হয়ে যেতে পারে।........।

'আর পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে।'

সকল কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে, সকল ফন্দিফিকির নিস্ফল হবে এবং সেই একমাত্র পথটিই সামনে এসে যাবে, যা প্রত্যেক প্রাণীর শেষ পথ,

'সেদিনটি হবে তোমার প্রভুর দিকে যাত্রা করার দিন।'

দৃশ্যটি যেন একটি সচল ও সবাক চিত্র। প্রত্যেক আয়াত একটি গতিশীল অবস্থা তুলে ধরছে। প্রতিটি বাক্য যেন একটি মুহূর্তকে তুলে ধরছে। মুমূর্ষাবস্থা চিহ্নিত হচ্ছে আর সেই সাথে চিহ্নিত হচ্ছে বিলাপ, হতাশা, দিশাহারা অবস্থা ও নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়ার প্রস্তুতি। সে নিষ্ঠুর সত্যকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই, ঠেকাবার কোনো উপায় নেই, তারপর সামনে এসে যাচ্ছে সেই চরম মুহূর্ত, যা থেকে পালাবার কোনো পথ নেই। 'সেদিন তোমার প্রভুর দিকেই যাত্রা করার দিন।'

এ পর্যন্ত এসে বেদনাময় দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটছে। কিন্তু চোখে মুখে ও স্নায়ুতে তা তার প্রতিবিম্ব ও প্রতিক্রিয়া রেখে যাচ্ছে, রেখে যাচ্ছে গোটা পরিবেশে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা।

উল্লেখিত শোক সন্তপ্ত, বেদনাবিধুর ও নির্মম বাস্তব পরিস্থিতির বিপরীতে পেশ করা হচ্ছে তামাশারত অবিশ্বাসীরা, যারা কোনো সৎকর্ম বা এবাদাত দ্বারা মৃত্যুকে আলিংগন করার প্রস্তুতি নেয়নি, বরং কেবল পাপ কাজ করেই চলেছে এবং অবজ্ঞা, অবহেলা ও অহংকারে লিপ্ত থেকেছে,

'সে সত্য মেনে নিলো না, নামাযও পড়লো না, বরং সত্যকে মিথ্যা মনে করলো এবং ফিরে গেলো। তারপর অহমিকতা সহকারে আপন পরিবার-পরিজনের দিকে রওনা হয়ে গেলো।'

**অহংকারী ও দাম্ভিক আবু জাহেল**

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো দ্বারা আবু জাহেল আমর বিন হিশামকে বুঝানো হয়েছে। সে মাঝে মাঝে রসূল (স.)-এর কাছে আসতো ও কোরআন শুনতো। তারপর সেখান থেকে চলে যেত। তার ভেতরে কোনো পরিবর্তন আসতো না, সে ঈমানও আনতো না, আনুগত্যও করতো না কিংবা কোনো ভয়ভীতি বা আদব তমীযও শিখতো না। বরঞ্চ রসূল (স.)-কে কটুবাক্য দ্বারা কষ্ট দিতো এবং মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আসতে বাধা দিতো। তারপর আবার নিজের অপকর্মের জন্যে গর্ববোধ করতো। যেন সে একটা উল্লেখযোগ্য ভালো কাজ করে ফেলেছে। কোরআনের ভংগীটি তার প্রতি বিদ্রূপাত্মক। এতে তার অহংকার সহকারে আপন পরিজনের কাছে যাওয়ার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে এ রকমের আবু জাহেল আরো অনেক ছিলো, আছে এবং থাকবে। দাওয়াত শুনবে, প্রত্যাখ্যান করবে, আল্লাহর পথে যেতে মানুষকে এরা বাধা দেবে, আহবানকারীদের ওপর নির্যাতন চালাবে, চক্রান্ত চালাবে এবং তারপরও নিজেদের অপকর্ম, অনাচার, নৈরাজ্য, ষড়যন্ত্র ও দাংগা ফাসাদের জন্যে গর্ব বোধ করবে।

কোরআন এই সব অহংকারী দুরাচারকে কঠোর হুমকি দিয়ে বলেছে, 'হাঁ, এই আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমার পক্ষেই মানানসই।'

এটা হচ্ছে হুমকিসম্বলিত একটা পরিভাষা।

একবার রসূল (স.) আবু জাহেলের গলা টিপে ধরে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, 'এ আচরণ তোমার জন্যেই উপযুক্ত এবং তোমার জন্যেই এটা মানানসই।'

তখন আবু জাহেল বলেছিলো, 'হে মোহম্মাদ! আমাকে কি তুমি ভয় দেখাচ্ছ? তুমি তো দূরের কথা, তোমার খোদাও আমার কিছু করতে পারবে না। দুই পাহাড়ের মাঝখানে যত মানুষ চলাফেরা করে, তাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাবান।'

বদরের যুদ্ধে সে মোমেনদের হাতে ধরা পড়ে। সেদিন সে মোহাম্মাদ (স.) ও তাঁর মহাপরাক্রমশালী প্রভুর শক্তি দেখে নিয়েছিলো।

ইতিপূর্বে ফেরাউনও বলেছিলো, 'আমি তো তোমাদের জন্যে আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ আছে বলে জানি না।'

সে আরো বলেছিলো, 'মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? এইসব নদীনালা তো আমার অধীনেই চলছে।' অতপর আল্লাহ তায়ালা একইভাবে তাকেও পাকড়াও করেছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু আবু জাহলের সন্ধান পাওয়া যায়। যারা নিজের আত্মীয় স্বজন, শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির বলে বলিয়ান হয়ে মনে করতো, আমি বিরাট একটা কিছু হয়ে গেছি। আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যেতো। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের একটা ব্যাঙ বা মাছির চেয়েও নিকৃষ্টভাবে পাকড়াও করলেন। তবে এ জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার এক মুহূর্ত আগেও পাকড়াও করা হয় না, এক মুহূর্ত পরেও না।

**একটি জীবননির্ভর সত্য ঘটনা**

পরিশেষে এখানে অন্য একটি বাস্তব ও জীবননির্ভর সত্য দিয়ে শ্রোতাদের মনমানসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সত্যটির যেমন মানুষের পার্থিব জীবনের পরিচালনা ও পরিকল্পনায় ভূমিকা রয়েছে, তেমনি আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও রয়েছে এর অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ।

'মানুষ কি মনে করেছে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে.... আল্লাহ তায়ালা কি মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নয়?'

আরবের পৌত্তলিকদের চোখে জীবনের কোনো উৎস ছিলো না এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো না। তারা ভাবতো, মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং কবরের পেটে শেষ আশ্রয় নেয়া এই হলো মানুষের নিয়তি। এর মাঝে যে সময়টুকু, তা আনন্দ ফুর্তির জন্যে, পক্ষান্তরে জীবনের জন্যে কোনো আইন বা নৈতিক বিধান থাকার প্রশ্ন, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় পৃথিবীতে আগমনকে একটি পরীক্ষা হিসাবে চিহ্নিত করা এবং তার শেষে প্রতিদান ও প্রতিফলের আশা করা এবং এই বিশ্ব জগতের জন্যে এক অদৃশ্য, অসীম শক্তিধর ও মহাজ্ঞানী স্রষ্টা ও পরিচালকের অপরিহার্যতার ইত্যাদি প্রশ্ন ছিলো তাদের কাছে একেবারেই অবাস্তব, অসম্ভব ও অকল্পনীয়।

যে জিনিস মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা হলো, সময় ঘটনাবলী ও লক্ষ্যের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা, মানব জীবন এবং তার পারিপার্শিক যাবতীয় জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা, উপরোক্ত উপলব্ধির বিকাশ ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে তার মনুষ্যত্বের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন। জীবনের জন্যে নৈতিক বিধান থাকার পক্ষে ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা করা এবং উক্ত বিধানের সাথে ঘটনাবলী ও বস্তুনিচয়ের সংযোগ সাধন করা।

মানুষ নানা মুহূর্তে ও নানা ঘটনার মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন ধারণ করতে পারে না। বরং স্থান, কাল, পরস্পরের সাথে সাথে সম্পৃক্ত থাকে। তারপর এই জিনিসটাই গোটা মহাবিশ্বের সাথে ও তার নিয়ম বিধির সাথে গিয়ে সম্পৃক্ত হয়। এরপর এই গোটাবিশ্ব সম্পৃক্ত হয় তার স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও পরিচালকের সর্বোচ্চ ইচ্ছার সাথে যিনি মানুষকে অকারণ সৃষ্টি করেন না এবং তাকে লক্ষ্যহীনভাবেও ছেড়ে দেন না।

এটাই হচ্ছে আবহমান কাল থেকে চলে আসা সেই চিন্তাধারা, যার একান্ত কাছাকাছি কোরআন মানুষকে নিয়ে গেছে। সে সমাজে বিরাজমান অন্যান্য বাতিল চিন্তাধারার কাছে তাকে নিয়ে যায়নি। এ চিন্তাধারা সেকালেও ছিলো অভিনব এবং এ যুগেও অভিনব। প্রাচীন দর্শনের সাথে পরিচিত জীবন ও জগত সংক্রান্ত যাবতীয় মানব রচিত চিন্তাধারার কাছেও এটা অভিনব।

কোরআনের জিজ্ঞাসা : এমনিই কি ছেড়ে দেয়া হবে?

'মানুষ কি মনে করে যে তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?'

এটি মানুষের মনের কাছে উত্থাপিত কোরআনের একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রশ্ন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সে যেন একটু চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুঝতে চেষ্টা করে যে, পারিপার্শিক সৃষ্টি জগত ও স্রষ্টার সাথে তার কোনো সম্পর্ক সংযোগ আছে কিনা।

এরপর অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, মানুষকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না। এক্ষেত্রে যুক্তিগুলো হচ্ছে তার পার্থিব ও প্রথম জন্ম সংক্রান্ত,

'সেটি কি এক ফোঁটা টপকানো বীর্য ছিলো না? অতপর তা একটি জমাট রক্তপিন্ড হলো এবং তারপর আল্লাহ তায়ালা তার দেহ সৃষ্টি করলেন ও অংগ প্রত্যঙ্গকে সুষ্ঠু ও সংগতিপূর্ণ বানালেন। তারপর তা থেকে পুরুষ ও নারী দু ধরনের মানুষ বানালেন।'

কে এই মানুষ? কিসের থেকে তাকে সৃষ্টি করা হলো? সে কেমন ছিলো? কেমন হলো? কিভাবে সে এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই গ্রহে পৌঁছলো? সে কি ক্ষুদ্র এক ফোঁটা পানি তথা টপকানো বীর্য ছিলো না? সে কি একটি সেল গ্রহণ করেনি? বেঁচে থাকা ও খাদ্য লাভের জন্যে সে কি মাতৃগর্ভে অবস্থান গ্রহণ করেনি? মাতৃগর্ভের সাথে সে কি সর্বদা ঝুলে থাকতো না। কে তাকে নড়াচড়ার শক্তি ও গতি দান করলো, তারপর কে তাকে ভারসাম্য এই পূর্ণ মানবদেহের রূপ দিলো?

কোটি কোটি জীবন্ত 'সেল' থেকে তার যে দেহ তৈরী হলো তা আসলে একটি মাত্র সেল ও ডিম্বানু থেকেই তৈরী। একটি সেল থেকে সুগঠিত মানবদেহে রূপান্তরিত হতে তার যে স্তরগুলো পার হতে হয়েছে, তা জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের স্তরগুলোর চেয়ে অনেক দীর্ঘ। অনুরূপভাবে মাতৃগর্ভে তার মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে, তাও তার ভূমিষ্ট হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতগুলো স্তরের সম্মুখীন হতে হয় তার চেয়ে বেশী ও ব্যাপক। কে তাকে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পথ দেখালো? অথচ সে ছিলো তখন অতীব দুর্বল একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি। তার কোনো বুঝও ছিলো না, অভিজ্ঞতাও ছিলো না।

সবশেষে প্রশ্ন জাগে, যে একটি মাত্র সেল থেকে কে পুরুষ ও স্ত্রী বানালো, সে সেলটিকে পুরুষে অথবা স্ত্রীতে পরিণত করতে কার ইচ্ছা কার্যকর হয়েছিলো? অথবা কে সে-যে, মাতৃগর্ভের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সেলটিকে স্বেচ্ছায় পুরুষ বা স্ত্রী হওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছে?

এ কথা না মেনে কোনো গত্যন্তর নেই যে, এক অতীব বিচক্ষণ ও নিপুণ কুশলী হাত এই টপকেপড়া শুক্রের ফোঁটাকে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই রূপান্তরের শেষ ধাপে পৌঁছে দিয়েছে।

মানুষের চেতনার ওপর অংকিত এই অকাট্য সত্যের প্রেক্ষাপটে এই সূরায় আলোচিত সকল তত্ত্বের সার নির্যাস হিসাবে একটি মৌলিক বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে,

'এই মহান সত্তা কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?'

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম, আর মানুষের পক্ষে এই সত্যকে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই অকাট্য প্রত্যয়দীপ্ত উপসংহার দ্বারা মানুষের চেতনাকে পরিতৃপ্ত করা এবং মানুষের জন্ম রহস্য ও তার ব্যাপারে মহান আল্লাহর অতুলনীয় দক্ষ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার তথ্য উদঘাটনের মধ্য দিয়ে সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

# সূরা আদ্ দাহর

আয়াত ৩১ রুকু ২

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴿١﴾ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ﴿٢﴾ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ﴿٣﴾ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ﴿٤﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٦﴾ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ﴿٧﴾

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. কালের (পরিক্রমায়) কোনো একটি সময় মানুষের ওপর দিয়ে এমন অতিবাহিত হয়েছে কি– যখন সে (এবং তার অস্তিত্ব) উল্লেখ করার মতো কোনো বিষয়ই ছিলো না! ২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত শুক্র থেকে, যেন আমি তাকে (তার ভালো মন্দের ব্যাপারে) পরীক্ষা করতে পারি, অতপর (এর উপযোগী করে তোলার জন্যে) তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে পয়দা করেছি। ৩. আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় কাফের হয়ে যাবে। ৪. কাফেরদের (পাকড়াও করার) জন্যে আমি শেকল, বেড়ি ও (শাস্তির জন্যে) আগুনের লেলিহান শিখার ব্যবস্থা করে রেখেছি। ৫. নিসন্দেহে যারা সৎকর্মশীল তারা (জান্নাতে) এমন সুরা পান করবে যার সাথে (সুগন্ধযুক্ত) কর্পূর মেশানো থাকবে, ৬. এ (কর্পূর মেশানো) পানি হবে প্রবাহমান (এক) ঝর্ণা, যার (প্রবাহ) থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা সদা পানীয় গ্রহণ করবে, তারা (যেদিকে যখন ইচ্ছা) এ (ঝর্ণাধারা)-টা প্রবাহিত করে নেবে। ৭. (এরা হচ্ছে সেসব লোক) যারা 'মানত' পূরণ করে এবং এমন এক দিনকে ভয় করে, যে দিনের ধ্বংসলীলা হবে (ব্যাপক ও) সুদূরপ্রসারী।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا

৮. এরা শুধু আল্লাহর ভালোবাসায় (উদ্বুদ্ধ হয়েই ফকীর), মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদের খাবার দেয়। ৯. (খাবার দেয়ার সময় এরা বলে,) আমরা শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি, (বিনিময়ে) আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিদান চাই না– না (চাই) কোনো রকম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ১০. আমরা তো সে দিনটির ব্যাপারে আমাদের প্রতিপালককে ভয় করি, যেদিনটি হবে অতীব ভয়ংকর। ১১. (এরা যেহেতু এ দিনটিকে বিশ্বাস করেছে তাই-) আল্লাহ তায়ালা আজ তাদের সে দিনের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন, তিনি তাদের সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন, ১২. এরা যে কঠোর ধৈর্য (ও সহিষ্ণুতা) প্রদর্শন করেছে (তার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তায়ালা) তাদের জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র দান করবেন, ১৩. (সেই মনোরম জান্নাতে) তারা (সুসজ্জিত) আসনে হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে সূর্যের (তাপ) যেমন তারা দেখবে না, তেমনি দেখবে না কোনোরকম শীত (-এর প্রকোপ), ১৪. তাদের ওপর (জান্নাতে) তার গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে, তার ফলপাকড়াকে তাদের আয়ত্তাধীন করে দেয়া হবে। ১৫. তাদের (সামনে খাবার) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য নির্মিত পাত্রে আর কাচের পেয়ালায় এবং তা হবে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, ১৬. রূপালী স্ফটিক পাত্র, (যার সবটুকুই) পরিবেশনকারীরা যথাযথভাবে পূর্ণ করে রাখবে। ১৭. সেখানে তাদের এমন এক (অপূর্ব) সুরা পান করানো হবে, যার সাথে মেশানো হবে 'যানজাবীল' (নামের এক মূল্যবান সুগন্ধ), ১৮. তাতে রয়েছে (জান্নাতের) এক (অমিয়) ঝর্ণা, যার নাম রাখা হয়েছে 'সালসাবীল'। ১৯. তাদের চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে একদল কিশোর বালক, যারা (বয়সের ভারে বৃদ্ধ হয়ে যাবে না,) চিরকাল কিশোর থাকবে, যখনি তুমি তাদের দিকে তাকাবে মনে হবে এরা বুঝি

مَّنْثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

কতিপয় ছড়ানো ছিটানো মুক্তা। ২০. সেখানে যখন যেদিকে তুমি তাকাবে, দেখবে শুধু নেয়ামতেরই সমারোহ, আরও দেখবে (নেয়ামতে উপচে পড়া) এক বিশাল সাম্রাজ্য। ২১. বেহেশতবাসীদের পরনের কাপড় হবে অতি সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও মোটা মখমল, তাদের পরানো হবে রূপার কংকণ, (তদুপরি) তাদের মালিক সেদিন তাদের 'শরাবান তহুরা' (মহাপবিত্র উৎকৃষ্ট পানীয়) পান করাবেন। ২২. (তাদের মালিক বলবেন, হে আমার বান্দারা,) এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে (আমার) পুরস্কার এবং তোমাদের (যাবতীয়) চেষ্টা সাধনার স্বীকৃতি!

## রুকু ২

২৩. (হে নবী,) আমি (এ মহাগ্রন্থ) কোরআন ধীরে ধীরে তোমার ওপর নাযিল করেছি, ২৪. সুতরাং (এদের ব্যাপারেও ধীরে ধীরে) তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার মালিকের নির্দেশের অপেক্ষা করো, আর এদের মধ্যে যারা পাপী ও সত্যের পথ প্রত্যাখ্যানকারী, কখনো তাদের আনুগত্য করবে না, ২৫. তুমি সকাল সন্ধ্যা শুধু তোমার মালিকের নাম স্মরণ করতে থাকো, ২৬. রাতের একাংশ তাঁর সামনে সাজদাবনত থাকো এবং রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো। ২৭. এরা বৈষয়িক স্বার্থের এ (সহজলভ্য) পার্থিব জগতকেই বেশী ভালোবাসে এবং পরে যে তাদের ওপর একটা কঠিন দিন আসছে তা (এরা) উপেক্ষা করে! ২৮. (অথচ) আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের জোড়াগুলো ও তার বাঁধন আমিই মযবুত করেছি, আবার আমি যখন ইচ্ছা করবো তখন এদের (এ শক্ত বাঁধন শিথিল করে তাদের) আকৃতিই বদলে দেবো।

إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُونَ

إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى

رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ﴿٣١﴾

২৯. এটা হচ্ছে অবশ্যই একটি উপদেশ বিশেষ, অতএব যার ইচ্ছা সে (একে আঁকড়ে ধরে) নিজের মালিকের কাছে যাওয়ার (একটা) পথ করে নিতে পারে। ৩০. আর আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছেন সেটা ছাড়া তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময়। ৩১. তিনি যাকে চান তাকে তাঁর অফুরন্ত রহমতের মাঝে প্রবেশ করান; যালেমদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন।

## সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কোনো কোনো বর্ণনায় যদিও এই সূরাটিকে মাদানী বলে অভিহিত করা হয়েছে কিন্তু আসলে এটি হচ্ছে একটি মক্কী সূরা। বিষয়বস্তু, বক্তব্য ও যাবতীয় লক্ষণের দিক দিয়ে এর মক্কী হওয়াটাই স্পষ্ট। এ জন্যে আমরা এর মক্কী হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাকেই অগ্রগণ্য মনে করেছি। এর বক্তব্য বিবেচনা করলে মনে হয়, এ সূরা কোরআনের মক্কায় নাযিল হওয়া অংশের প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। এতে আখেরাতের জীবনে দৈহিক উপভোগ্য নেয়ামতসমূহের পাশাপাশি কঠিন ও ভয়ংকর আযাবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে রসূল (স.)-কে স্বীয় প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা এবং পাপিষ্ঠ ও অবাধ্য মোশরেকদের কারো আনুগত্য না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ সময়ে ইসলামী আন্দোলন ও তার কর্মীদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে চলছিলো। একদিকে মোশরেকদেরকে আরো একটু সময় দেয়া এবং অপরদিকে রসূল (স.)-কে তাঁর কাছে নাযিল করা ওহীর ওপর অবিচল থাকা, বাতিলপন্থীদের চাপ ও প্রলোভনের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আল ক্বালাম, সূরা আল মোযযামমেল ও সূরা আল মোদদাসসের-এর বক্তব্যও অনেকটা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই আমাদের দৃষ্টিতে এই সূরার মাদানী হওয়ার সম্ভাবনা এতো কম যে, তা বিবেচনা না করলেও চলে।

সামগ্রিকভাবে সূরার বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহর অনুগত হওয়া, তাঁর কাছে একাগ্রমনে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তার সন্তোষ কামনা করা, তাঁর নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করা, তাঁর অনুগ্রহকে অনুভব করা, তাঁর আযাব থেকে সতর্ক হওয়া, তাছাড়া তাঁর পরীক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তাঁর সৃষ্টি, নেয়ামত বিতরণ পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টে নিক্ষেপ করার পেছনে যে মহত্তর সুক্ষ্ম, গভীর জ্ঞান ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করার উদাত্ত, বিনম্র ও মৃদু আহবানও এতে রয়েছে।

সূরার শুরুতেই এই মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করে মানুষের হৃদয়ে একটি হালকা অনুভূতির পরশ বুলাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষ তার জন্মের পূর্বে কোথায় ছিলো? কে তাকে অস্তিত্বে

আনলো? এক সময়ে যার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না, যার কোনো উল্লেখও ছিলো না, সেই মানুষ একদিন এই সৃষ্টিজগতে কিভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়ে পরিণত হলো। বলা হয়েছে, 'মানুষের ওপর কি মহাকালের এমন একটা সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিসই ছিলো না!'

এরপর তার জন্মের উৎস ও রহস্য উদ্ঘাটন করে তার সৃষ্টির পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে, অতপর তার যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে আরেকটি হালকা পরশ বুলানো হয়েছে। 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত বীর্য থেকে, যাতে করে আমি তার পরীক্ষা নিতে পারি, অতপর আমি তাকে শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন বানিয়েছি।'

এরপর তৃতীয় আরেকটি পরশ বুলানো হয়েছে এই মর্মে যে, আল্লাহ তায়ালাই তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন, সত্য ও সঠিক পথে চলতে তাকে সাহায্য করেছেন, অতপর নিজের গন্তব্যস্থল নিজেই বেছে নেয়ার জন্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন,

'আমি তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, এখন চাই সে কৃতজ্ঞ হোক কিংবা অকৃতজ্ঞ হোক।'

ওহীর মাধ্যমে এই তিনটি পরশ বুলানো এবং এগুলোর ফলে মানুষের মনে সৃষ্ট গভীর চিন্তা-ভাবনা করা, আগে পিছে ভাবতে বলা হয়েছে, অতপর নির্দিষ্ট পথটি মনোনীত করার প্রাক্কালে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সূরাটি মানুষকে জাহান্নামের পথ প্রত্যাখ্যান করারও আহ্বান জানিয়েছে এবং তার দ্বিধাদ্বন্দের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছে। এ জন্যে উৎসাহ দানের যতো পথ ও পন্থা থাকতে পারে তাও দেখানো হয়েছে। আরাম আয়েশ, সুখ শান্তি ও উচ্চ মর্যাদার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে যতো আকর্ষণীয় ভাষা থাকতে পারে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা,

'আমি কাফেরদের জন্যে হাতকড়া, জিঞ্জির ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। সৎ লোকেরা এমন পেয়ালায় পান করবে, যার সাথে কর্পুরের সুগন্ধি মিশ্রিত থাকবে। তা হবে এমন একটি প্রবহমান ঝর্ণা, যার কিনারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর বান্দারা পান করবে এবং যেখানে যেমন খুশী তারা তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে।'

আখেরাতের সেই অঢেল সুখ সমৃদ্ধির উপকরণগুলো বর্ণনা করার আগে এই সৎ লোকদের গুণ বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনার জন্যে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে আগাগোড়াই সহানুভুতি, ঔদার্য, সৌন্দর্য ও আন্তরিকতার অভিব্যক্তি রয়েছে, আর এই সবই হচ্ছে সৎ লোকদের জন্যে নির্ধারিত সেই আনন্দদায়ক তৃপ্তিকর ও মনোমুগ্ধকর নেয়ামতসমূহের সাথে পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যথা,

'তারা মান্নত পূরণ করে এবং সেই দিনটিকে ভয় করে যার বিপদ সবত্র বিস্তৃত হবে, খাবারের প্রতি নিজেদের থাকা সত্তেও তারা মেসকীন, এতীম ও কয়েদীদেরকে খাবার খাওয়ায়.... ।'

তারপর এই সব সৎ বান্দাদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনমনীয় ও সংকল্পবদ্ধ ছিলো, যারা আখেরাতের কঠিন দিনকে ভয় করতো, যারা নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দরিদ্রদেরকে খাওয়াতো এবং এ জন্যে কারো কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করতো না, শুধুমাত্র কেয়ামতের কঠিন দিনের ভয়েই তারা খাবার খাওয়াতো।

এভাবে যারা নিছক আখেরাতের ভয়ে দরিদ্রদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাওয়াতো, তাদের কি প্রতিদান দেয়া হবে পরবর্তী আয়াতে এবার তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে,

'তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেই দিনের মুসিবত ও আযাব থেকে রক্ষা করবেন এবং দান করবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ। তাদের ধৈর্যের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রতিদান হিসাবে বেহেশত ও রেশমী বস্ত্র দেবেন...।'

এভাবে প্রথম রুকুর শেষপর্যন্ত এই প্রতিদানের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এই তৃপ্তিকর নেয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরার পর স্বয়ং রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাঁকে সকল অবজ্ঞা অবহেলা ও অস্বীকৃতির মুখে দাওয়াতের কাজে অবিচল থাকা ও ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ও পথ যতোই দীর্ঘ হোক তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশও তাকে দেয়া হয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম চারটি আয়াত হচ্ছে এই আদেশ সম্বলিত। অতপর সূরার শেষ আয়াতগুলোতে কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা এই দিনটির যথাযথ গুরুত্ব না দিলেও নেককার লোকেরা তাকে ভয় করে, সাবধানতা অবলম্বন করে। সেই সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই অবিশ্বাসীদেরকে খতম করে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুন মানব গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে খুবই সহজ কাজ। কেননা তিনিই তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দেহ ও মনে বিদ্যমান যাবতীয় শক্তি ও যোগ্যতার যোগান দিয়েছেন। এখানে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি এবং তাঁর পরীক্ষার কি পরিণতি হয়ে থাকে তাও তিনি এ সূরায় ব্যক্ত করেছেন।

মানুষের জন্মের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাকে যে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন, তা জানানোর মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা হয়েছে, আর সূরাটির সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে সে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে। কেননা শুরু থেকেই এ ধরনের পরিকল্পনা আল্লাহর ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

সূরাটির উল্লেখিত সূচনা ও উপসংহার জীবনের বাইরের সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। এটাকে বুঝবার চেষ্টা না করে এড়িয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা তাকে পরীক্ষার জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর উপরোক্ত সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করাটাও এই পরীক্ষার আওতাভুক্ত। বুঝবার ক্ষমতাটুকু তাকে এ জন্যে দেয়া হয়েছে যেন সে পরীক্ষায় কামিয়াব করতে পারে।

সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে আখেরাতের নেয়ামতসমূহের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা কোরআনের দীর্ঘতম বিবরণ। অথবা বলা যেতে পারে যে, সূরা 'আল ওয়াকেয়া'-য় যে বিবরণ এসেছে তার তুলনায় এটা দীর্ঘ। সামগ্রিকভাবে এ নেয়ামত দৈহিকভাবে অনুভবযোগ্য ও উপভোগ্য। সেই সাথে রয়েছে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানের বাড়তি পুরস্কার।

এই উভয় ধরনের পুরস্কার বা প্রতিদানের বিবরণ স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা মক্কাবাসীরাই ছিলো জাহেলিয়াতের সাথে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ট। দৈহিকভাবে উপভোগ্য সামগ্রীর প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিলো তীব্র। এ ধরনের ভোগ্য সামগ্রী সমাজের বহু শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মনকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। প্রতিদান হিসাবেও এ ধরনের দ্রব্যসামগ্রী অনেকের কাছে সর্বোত্তম বিবেচিত হয়।

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কাদের কি অভিরুচি, কাদের কাছে কি বেশী প্রিয়, কার মন-মানসিকতার সাথে কোন দ্রব্য সামগ্রী বেশী উপযোগী ও মানানসই, তা তিনিই ভালো জানেন। তাঁর বান্দাদের মধ্যে আবার অনেকে এমনও আছে, যাদের কাছে স্থূল ভোগ্য সামগ্রীর চেয়ে উন্নতমানের প্রতিদান বেশী আকর্ষণীয়। যেমন সূরা 'আল কেয়ামা'য় আছে, 'কিছু মুখমন্ডল সেদিন প্রফুল্ল থাকবে এবং তারা আপন প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

### তাফসীর

এবার আমি সূরাটির তাফসীরে মনোনিবেশ করবো।

সূরার শুরুতেই রয়েছে একটি প্রশ্নবোধক বাক্য, 'মানুষের ওপর কি মহাকালের এমন একটি সময়ও অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিসই ছিলো না?'

এর উত্তরটি হাঁ বোধক। অর্থাৎ হাঁ এমন সময় অতিবাহিত হয়েছে। তবে এখানে প্রশ্নটি উত্থাপনের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন করুক যে, এমন একটি সময় তার ওপর অতিবাহিত হয়েছে–তা কি সে জানে যে, সে তখন আদৌ কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ই ছিলো না!

তারপরও এই ঐতিহাসিক সত্য নিয়ে কি সে কিছু চিন্তা-ভাবনা করে না? আর যদি চিন্তা-ভাবনা করে থাকে তবে তার চিন্তা-ভাবনা কি তার মনে সেই অদৃশ্য হাত সম্পর্কে কিছুমাত্র অনুভূতি সঞ্চার করে না, যা তাকে এই অস্তিত্বের জগতে ঠেলে পাঠিয়েছে, না চাইতে তাকে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছে এবং এক সময় অনুল্লেখযোগ্য থাকার পর তাকে উল্লেখযোগ্য জিনিসে পরিণত করেছে? এভাবে এই প্রশ্নবোধক বাক্যটি দ্বারা অনেক গভীর ও সূক্ষ্ম ভাবনার জন্ম দেয়া হয়েছে,

### অস্তিত্ববিহীনতা থেকে মানুষের অস্তিত্ব

প্রথম ভাবনাটি হলো মানুষের সৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থা এবং তার আদি অস্তিত্ব সংক্রান্ত। তার সেই আদি সত্তা মানবশূন্য প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থান করছিলো। তখন সে কেমন ছিলো? যুগ যুগ কালধরে সে অন্য কোথাও অবস্থান করছিলো, আজ তা সে ভুলে গেছে। আসলে 'মানুষ' নামের এই প্রাণীটির জন্যে বিশ্ব প্রকৃতির কোনো প্রত্যাশা বা প্রতীক্ষাই ছিলো না। শুধু আল্লাহর ইচ্ছাতেই এখানে তার জন্ম হয়েছে।

অপর ভাবনাটি মানুষের উৎপত্তির লগ্ন সংক্রান্ত। যদিও এই মুহূর্তটির কথা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না, তথাপি ভাবনাটি এই সময়টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিজগতে এই সৃষ্টির যে সংযোজন সম্পন্ন করেন, তার পরিকল্পনা তিনি করেন তারও অনেক আগে।

অপর ভাবনাটি হলো স্রষ্টার সেই মহাশক্তিধর ক্ষমতা সংক্রান্ত, যা মানুষ নামের এই সৃষ্টিকে প্রকৃতির এই নাট্যমঞ্চে জোরপূর্বক পাঠিয়ে দেয়, তাকে তার ভূমিকা পালনের যোগ্য বানায়, তার জন্যে যথাযথ ময়দান তৈরী করে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের সাথে তার জীবনের যোগসূত্র গড়ে তোলে, তার স্থীতি ও ভূমিকা পালন সম্ভব ও সহজ হয় এমন এক পরিবেশ তার জন্যে গড়ে তোলে, তারপর প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর সেই ভূমিকা অব্যাহত রাখার ক্ষমতা যোগায় এবং সেই সাথে সমগ্র মহাবিশ্বের সাথে তার যোগসূত্রকে অটুট রাখে।

এছাড়াও এই প্রাথমিক আয়াতটি মানুষের বিবেকে আরো অনেক চিন্তা-ভাবনা ও আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। মানুষের জন্মের উৎস, পার্থিব জীবন ও তার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে

তাকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। এরপর আসে জন্মের পর মানুষের স্থীতি ও প্রজাতিক বিস্তৃতির প্রসংগ। এর পেছনে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক কাহিনী। সূরার দ্বিতীয় আয়াতে এই কাহিনী শুনুন,

'আমি মানুষকে মিশ্রিত বীর্য থেকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি, অতপর তাকে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন করেছি।'

'আমশাজ' শব্দটির অর্থ মিশ্রিত। সম্ভবত এ দ্বারা এই মর্মে ইংগিত করা হয়েছে যে, যে বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয় তা জরায়ুতে প্রবিষ্ট বীর্যের পুরুষ কোষ ও নারী ডিম্বানুর মিশ্রণের পরেই তৈরী হয়। এ দ্বারা বীর্যের ভেতরে নিহিত পরবর্তী প্রজন্ম ও উত্তরাধিকারের বিষয়টিও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এরই নাম হচ্ছে 'জিন'।

প্রথমত প্রজাতিক ধারায় হস্তান্তরিত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহকে এবং সর্বশেষে গর্ভস্থ সন্তানের পারিবারিক বৈশিষ্টসমূহকে 'জিন' বলা হয়ে থাকে। মানুষের বীর্য তার ধারাবাহিক পথ পরিক্রমা অতিক্রম করে অন্য কোনো প্রাণীর নয় বরং মানুষের সন্তান তৈরীর লক্ষেই এগিয়ে যায় এবং মানব সন্তানের মধ্যে তার পারিবারিক গুণাবলীরই বিকাশ ঘটায়, 'মিশ্রিত বীর্য' বা 'জিন' কথাটা সম্ভবত সেই সত্যটিই প্রকাশ করে। অবশ্য এই 'মিশ্রিত বীর্য' নিজেও বিভিন্ন উত্তরাধিকারের এক মিলন কেন্দ্র।

**মানুষকে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তিদানের কারণ**

অসীম শক্তিধর স্রষ্টা এভাবে মিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। নিছক তামাসাচ্ছলে বা উদ্দেশ্যহীনভাবে নয়, বরং তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যদিও আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানেন, মানুষ কেমন সৃষ্টি এবং তাকে পরীক্ষা করার ফলাফলই বা কী হবে। কিন্তু তিনি চান, সেই ফলাফলটা প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে এসে প্রকাশ পাক, সৃষ্টির সমগ্র অবকাঠামোতে তার সেই পরীক্ষার পরিকল্পিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হোক এবং তার পরবর্তী পরিকল্পিত প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পাক। অতপর তিনি তার পরীক্ষার এই সমস্ত পর্যায়ক্রমিক ফলাফল অনুসারে তাকে প্রতিদান দিতে চান।

এ কারণেই তিনি মানুষকে দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন করেছেন। অর্থাৎ তাকে বুঝবার ও উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয় সকল উপায় উপকরণ ও হাতিয়ার দান করেছেন, যাতে সে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য আহরণ করতে পারে, বিভিন্ন জিনিসের মূল্যমান বুঝতে পারে, সেসব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সর্বোপরি একটি নির্দিষ্ট জিনিস বা পথ বেছে নিতে পারে এবং সে বাছাই অনুসারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

সুতরাং মানুষের সৃষ্টি, তার অব্যাহত প্রজাতিক বিস্তার, তাকে তার প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ তথা অংগ প্রত্যংগ ও শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদিতে আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর রয়েছে। মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করার পেছনেও আল্লাহর যে ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত সক্রিয় রয়েছে, তার পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য, সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিহিত রয়েছে। এ কাজ নেহাৎ কোনো তামাসা নয়। এ সৃষ্টিতে আগে থেকেই তাকে পরীক্ষা করার পরিকল্পনা ছিলো। সে জন্যেই তাকে তথ্য আহরণ, জ্ঞান অর্জন ও ভালোমন্দ বাছাই করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। প্রথমে মানুষকে সৃষ্টি করা, অতপর তাকে নানা রকমের জ্ঞানার্জন ও উপলব্ধি দান করা, উপায় উপকরণে সজ্জিত করা ও বাস্তব জীবনে পরীক্ষার সম্মুখীন করা এই সব কয়টি কাজের প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিতভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

জ্ঞান দানের পর তাকে জীবন যাপনের পথ নির্ধারনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং কোন পথটি সঠিক ও অভ্রান্ত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে তাও বলে দেয়া হয়েছে। তারপর তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, এখন চাই সে সেই নির্ভুল পথ গ্রহণ করুক অথবা ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করে বিপথগামী হয়ে যাক, এটা তার ব্যাপার

আল্লাহ তায়ালা সেই কথাই বলছেন পরবর্তী আয়াতে, 'আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাই সে কৃতজ্ঞ হোক বা অকৃতজ্ঞ 'শাকুরা' শব্দটি দ্বারা একটি সার্বিক ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ যে ব্যক্তি সঠিক পথের সন্ধান চায় এবং একথাও জানে যে, একদিন সে এই পৃথিবীতে আদৌ কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিসই ছিলো না, পরে তার প্রভু তাকে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাকে দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন, তারপর তাকে জানার ও বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, অতপর তাকে যে কোনো একটি পথ গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, সে ব্যক্তির হৃদয় এসব কথা জানার পর স্বতস্ফূর্তভাবেই আপন প্রভুর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠবে এবং তাঁর দেখানো নির্ভুল পথটিতে বেছে নেয়ার পক্ষেই তার মন সাড়া দেবে। এই কৃতজ্ঞতার কথা যদি সে গ্রহণ না করে তা হলে বুঝতে হবে যে, সে চরম অকৃতজ্ঞ।

বিবেকের ওপর পরপর উক্ত তিনটি মৃদু পরশ বুলানোর উদ্দেশ্য হলো যাতে মানুষ কোরআনের দাওয়াতের গুরুত্ব ও তীক্ষ্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। সে বুঝতে পারে যে, সে কোনো উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়; বরং তার সৃষ্টির পেছনে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। সে এও বুঝতে পারে যে, সে কোনো বন্ধনমুক্ত সৃষ্টি নয় বরং মহাবিশ্বের এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রের সাথে তার যোগসূত্র রয়েছে, আর তাকে সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা হয়েছে, সেই জ্ঞানের আলোকে তাকে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। পৃথিবীতে তাকে পরীক্ষা দিতে ও পরীক্ষায় উত্তির্ণ হতেই পাঠানো হয়েছে।

সুতরাং পৃথিবীকে সে একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবেই দেখতে পায়। তাই এ তিনটি আয়াত থেকে সে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু চিন্তার খো রাক লাভ করে। দুনিয়ার জীবনকে সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জবাবদিহিতায় পরিপূর্ণ দেখতে পায়। পার্থিব জীবনকে পরীক্ষায় পরিপূর্ণ জীবন হিসাবে উপলব্ধি করার পর সে এখানকার পরীক্ষাসমূহের কি ফলাফল পরবর্তী জীবনে পাবে, সে সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক হয়। এ তিনটি ক্ষুদ্র আয়াত তার দৃষ্টিকে তার সৃষ্টির লক্ষ্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে, এর মূল্যবোধ সম্পর্কে তার মনে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলে।

এ জন্যে পরীক্ষা তথা কৃতজ্ঞতা অথবা অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করার পর মানুষের জন্যে কি পরিণতি অপেক্ষা করছে, তার বিবরণ পরবর্তী আয়াত থেকে দেয়া শুরু হয়েছে। অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞের জন্যে যে, অশুভ পরিণতি অপেক্ষা করছে তার বিবরণ খুবই সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে। কেননা দৃশ্য রূপায়ন ও প্রভাব সৃষ্টি উভয়দিক দিয়েই এ সূরার সাধারণ পরিবেশ কোমলতা এবং আনন্দদায়ক নেয়ামতসমূহের বিবরণ সমৃদ্ধ। আযাবের বিবরণ যেটুকু এসেছে তা সংক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিতের চেয়ে বেশী কিছু নয়। যেমন,

'আমি কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি জিঞ্জির হাতকড়া ও জ্বলন্ত আগুন।'

অর্থাৎ পায়ে দেয়ার জন্যে শেকল, হাতে পরানোর জন্যে হাতকড়া থাকবে এবং হাত পা বাঁধা এই অপরাধীদেরকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

**বেহেশতের কিছু বর্ণনা**

এতটুকু বলেই দ্রুত গতিতে পুনরায় বেহেশতের সুখের বর্ণনা দেয়া শুরু হয়েছে,

'পুন্যবান লোকেরা কর্পুর সুরভিত পেয়ালা থেকে শরাব পান করবে। সেটি হবে এমন এক প্রবহমান ঝর্না, যার কিনারে আল্লাহর বান্দারা শরাব পান করবে এবং যেখানে যেমন খুশী, ঝর্নার শাখা-প্রশাখা তারা বের করে নেবে।'

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বেহেশতবাসী পুন্যবানদের পানীয় কর্পুর মিশ্রিত থাকবে, আর যে পেয়ালায় তারা পান করবে, তা ঝর্না থেকে ভরে দেয়া হবে। সেই ঝর্নার শাখা প্রশাখা সর্বত্র বিস্তৃত হবে, যাতে পানীয়ের প্রাচুর্য ও সরবরাহ অব্যাহত থাকে। স্বাদ বাড়ানোর জন্যে আরবরা তাদের মদের সাথে কখনো কর্পুর এবং কখনো আদা মেশাতো।

এ আয়াত থেকে তারা জানতে পারলো যে, বেহেশতে কর্পুর মিশ্রিত পানীয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। এই পানীয়ের মান যে দুনিয়ার মদের চেয়ে অনেক উন্নত তাও বুঝা গেছে। এই পানীয়ের স্বাদ ক্রমেই বাড়তে থাকবে। অবশ্য পৃথিবীতে বসে আমরা সেখানকার খাদ্য ও পানীয়ের স্বাদ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারি না যে, তা কি ধরনের ও কি মানের। এখানে শুধু তার কাছাকাছি একটা ধারণা সৃষ্টি করে কিছু বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র! কেননা আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, এই অদৃশ্য ও অজানা বস্তুর ধারণা লাভের জন্যে মানুষের কাছে এই শব্দগুলো ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

প্রথম আয়াতে বেহেশতবাসীদেরকে 'আবরার' (পুন্যবান) ও দ্বিতীয় আয়াতে 'ইবাদুল্লাহ' (আল্লাহর বান্দা) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোথাও আপন করে নেয়া, সম্মান প্রদর্শন করা ও অনুগ্রহ বর্ষণের কথা ঘোষণা করা, আবার কোথাও আল্লাহর নৈকট্যের ও ঘনিষ্টতার কথা ব্যক্ত করা। যেখানে সম্মান প্রদর্শন ও নেয়ামতের প্রাচূর্যের উল্লেখ থাকে সেখানে শেষোক্ত উদ্দেশ্যই ব্যক্ত হয়ে থাকে।

**পুণ্যবানদের পরিচয়**

পরবর্তী আয়াতে এসব পুন্যবান বান্দাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে,

'তারা মান্নত পুরন করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যার বিপদ সর্বত্র বিস্তৃত হবে এবং খাদ্যের প্রতি নিজেদের দুর্বলতা সত্ত্বেও এতীম ও বন্দীকে আহার করায়, (আর বলে যে) আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেও তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি। এ জন্যে তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না। আমরা শুধু আমাদের প্রভুর প্রতি সেই দিনের আযাবের ভয়ে ভীত, যেদিন কঠিন বিপদের দিন অতিশয় দীর্ঘ হবে।'

নির্ভেজাল ইসলামী আকীদা ও ঈমানে উদ্বুদ্ধ আল্লাহর যে বান্দারা আল্লাহর প্রতি অবিচল আনুগত্যের প্রমাণ দিতে গিয়ে আল্লাহর দুর্বল বান্দাদের প্রতি করুণা ও বদান্যতা প্রদর্শন করে, নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়, তারা সফল। যারা যথার্থ আল্লাহভীতির প্রমাণ দেয়, তার সন্তোষ কামনা করে, আর আল্লাহর আযাবের ভয়ে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে, কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্যকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করে, সেই বান্দাদের মন কত উজ্জ্বল, স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে থাকে, তা এই আয়াতগুলো থেকে প্রতিভাত হয়।

'তারা মান্নত পূরণ করে।'

অর্থাৎ যে সৎ কাজের সংকল্প গ্রহণ করে সেগুলোকে তারা তারা যথাযথ গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করে, কোনো রকম ফাঁকি দেয় না বা গড়িমসি করে না এবং সেই দায়িত্বের দাবীকে অস্বীকার করে

না। এটাই মান্নত পুরণের তাৎপর্য। 'মান্নত' শব্দটির প্রচলিত অর্থের তুলনায় এই অর্থটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক।

'এবং সেই দিনকে ভয় করে যার ভয় সর্বত্র বিস্তৃত হবে।'

অর্থাৎ তারা এই দিনের স্বরূপ উপলব্ধি করে। এ দিনের বিপদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং গুনাহগারদেরকে তা আক্রান্ত করবে। তাই তারা আশংকা করে যে, এর বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার কিছু অংশ তাদের ওপরও আপতিত হতে পারে। এটা হচ্ছে মোত্তাকী বা আল্লাহভীরু লোকদের আলামত। তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এত সচেতন ও স্পর্শকাতর হয়ে থাকে যে, শত এবাদাত ও পুন্যের কাজ করা সত্ত্বেও তাদের গুরুদায়িত্বে কোনো ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে গেলো কিনা, তা নিয়ে তারা সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে।

'নিজেরা খাদ্যকে ভালোবাসা সত্ত্বেও তারা এতীম, মিসকীন ও বন্দীকে আহার করায়।'

নিজের খাদ্যের অভাব ও প্রয়োজন থাকার কারণে খাদ্যের প্রতি মনের স্বাভাবিক ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও অন্যকে খাবার খাওয়ানোর মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতি এবং সেবা ও কল্যাণের মনোবৃত্তির যে প্রকাশ পাওয়া যায়, তা এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে সাধারণভাবে এ কথা বলা হয় যে, বিভিন্ন পর্যায়ের অভাবী লোকদেরকে তারা যে খাবার খাওয়ায়, তার প্রতি তাদের নিজেদেরও মনের টান আছে। এ খাদ্যের তারাও মুখাপেক্ষী হয়। কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনের ওপরে তারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, আয়াতে একথাই বুঝানো হয়েছে।

মক্কায় মোশরেকদের সমাজে এক অবর্ণনীয় হৃদয়হীন পরিবেশ বিরাজ করতো। সেখানে দুর্বল ও দরিদ্র মানুষের জন্যে কোনো কল্যাণের ব্যবস্থাই ছিলো না। সেই সমাজের মোড়লরা অবশ্য লোক দেখানো এবং সুনামের খাতিরে অনেক বদান্যতা দেখাতো। কিন্তু আল্লাহর সৎ মোমেন বান্দারা ছিলো এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তারা ছিলো সকল দুঃখী ও আর্তমানুষের জন্যে হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ মরু ভূমিতে ছায়াশীতল মরুদ্যান স্বরূপ।। তারা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও দরদভরা মন নিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে গরীব দুঃখীদের আহার করাতো। এই সুরার আয়াতে তাদের মনের কথার যথার্থ প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে-

'আমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরেই তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা পাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তো শুধু সেই দিনের ভয়ে ভীত, যে কঠিন বিপদের দিন হবে অতিশয় দীর্ঘ।'

বস্তুত এ হচ্ছে এমন এক দুর্লভ দয়ালু মানসিকতা, যা অত্যন্ত কোমল ও বন্ধুসূলভ হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে। এ দয়া শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে। তাছাড়া আর কারো কৃতজ্ঞতা বা আর কোনো প্রতিদান চায় না। দরিদ্র লোকদের ওপর আধিপত্য বিস্তারেরও স্বপ্ন দেখে না, কিংবা অহংকারী হবারও দুরাশা পোষণ করে না। শুধুমাত্র আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া আর কিছুই তারা আশা করে না। রসূল (স.) একটি হাদীস দ্বারা এ ব্যাপারে তাঁর সাথীদের উৎসাহিত করেছেন। হাদীসটি হলো,

'একটি খোরমার অংশ বিশেষ দিয়ে হলেও তোমরা আগুন থেকে বাচোঁ।'

এরূপ প্রত্যক্ষভাবে খাবার খাওয়ানো মনের এই দয়া ও কোমলতা প্রকাশের একটি মাধ্যম ছিলো। এটি ছিলো দুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সৌহার্দ প্রকাশ ও তাদের প্রয়োজন পুরনের একটা বিশেষ পন্থা। তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে এই অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যম ও

পন্থার পরিবর্তন হতে পারে। তবে যে জিনিসটা সব সমাজের জন্যে অপরিবর্তিত থাকা প্রয়োজন তা হলো মনের এই কোমলতা, দয়ার্দ্রতা স্পর্শকাতরতা, সহানুভূতিশীলতা, আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে মানবতার প্রতি সেবার মনোভাব এবং পার্থিব লাভ বা অন্য কোনো স্বার্থ মুক্ত হয়ে জনসেবার আকাংখা।

আজকাল দেশে দেশে দুর্গত মানুষের সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার নামে বিভিন্ন রকমের কর আদায় করা হয়ে থাকে এবং এভাবে জনগণের ওপর অনেক দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়। কিন্তু এসব ব্যবস্থা দ্বারা আলোচ্য আয়াতসমূহে যে ইসলামী বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি অংশ পূরণ হয় মাত্র। ইসলামের এই বিধানটি যাকাত বিধানের অংগীভূত। এই অংশটি হলো দুর্গত মানুষের সেবা বা অভাব পূরণ। এ হলো এর একটি দিক বা অংশ, অপর অংশটি হলো দাতাদের আত্মার বিশুদ্ধি করণ এবং তার সঠিক উন্নয়ন।

এটি এমন একটি বিষয় যাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করার কোনো অবকাশ নেই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজ এই দ্বিতীয় অংশটিকে শুধু অবজ্ঞা ও অবহেলাই করাই হচ্ছে না, বরং তা বিকৃত করে বলা হচ্ছে যে, এটা না করলে নাকি গ্রহীতাদের অবমাননা ও দাতাদের দানের উৎসাহ নষ্ট হবে।

মনে রাখা দরকার যে, ইসলাম একদিকে যেমন আমাদের বিবেক ও মনের জন্যে কিছু আকীদা বিশ্বাস মনোনীত করে, অপরদিকে এই মনকে পরিশীলিত করার জন্যে একটা ব্যবস্থাও পেশ করে। স্বার্থমুক্ত, নির্মল ও মহানুভবতাপূর্ণ দয়া ও সহানুভূতি যেমন দাতাকে কলুষমুক্ত ও পরিশীলিত করে, তেমনি যে ভাইকে সে দান করে তারও এতে প্রভুত উপকার সাধন করে। এটি ইসলামের কাংখিত দানশীলতার উভয় দিক এবং উভয় অংশই পূরণ করে। এই নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ দানের চিত্রই উপরোক্ত আয়াতে অংকন করা হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেই দিনের বিপদ থেকে রেহাই দিলেন এবং তাদেরকে আনন্দ ও প্রফুল্লতা দান করলেন।'

কোরআন এখানে আখেরাতের অন্যান্য দিকের উল্লেখের আগে অতি দ্রুত কেয়ামতের বিপদ থেকে উদ্ধারের সুসংবাদ দিয়ে এই পুণ্যবান বান্দাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কেননা তারা যখন এই কোরআন শুনতো ও বিশ্বাস করতো, তখন তাদের মনে কেয়ামতের ব্যাপারে আতংক সৃষ্টি হতো, তাই এখানে তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হচ্ছে যে, তোমাদের সেই দুর্বিসহ দীর্ঘ কেয়ামতের ভয়ে অস্থির হতে হবে না, তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আনন্দ ও প্রফুল্লতা দান করবেন। এটা তোমাদের আখেরাত ভীতির যথার্থ পুরস্কার এবং হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ার্দ্রতার প্রতিদান।

**বেহেশতের অপরিসীম নেয়ামত**

এরপর তাদের জন্যে বেহেশতের নেয়ামতসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে,

'তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বেহেশত ও রেশমী বস্ত্র প্রদান করবেন।'

বসবাসের জন্যে হচ্ছে বেহেশত এবং পরিধানের জন্যে হচ্ছে রেশমী বস্ত্র।

'সেখানে তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, তারা না দেখবে সেখানে রৌদ্র, আর না দেখবে কোনো মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডা।'

এ থেকে বুঝা গেলো যে, বেহেশতে অতিশয় শান্ত, সুখময়, নিরুদ্বেগ, কোমল, সৌহার্দময় ও নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। অন্যকথায় বলা যায়, সেটি হবে একটি আলাদা জগত

তাতে আমাদের আজকের এই সূর্য কিংবা অন্য কোনো এক বা একাধিক সূর্যের অস্তিত্ব থাকবে না। সেই জগত সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট।

'বেহেশতের ছায়া তাদের ওপর অবনত হয়ে থাকবে এবং তার ফলসমূহ সব সময় তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে।'

ছায়া অবনত হয়ে থাকা এবং ফলসমূহ নিজের আয়ত্তাধীন থাকা এমন এক সুখময় পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে, যার চেয়ে সুখময় পরিবেশ এখানে বসে কল্পনা করা যায় না।

এই হচ্ছে আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্যে পুরস্কার হিসাবে বরাদ্দকৃত বেহেশতের একটি সাধারণ রূপরেখা। দুনিয়ার প্রচলিত ভাষায় এর চমকপ্রদ একটি বিবরণ ওপরের আয়াতগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আসছে সেখানকার নিত্য উপভোগ্য নেয়ামত ও সেবার বিবরণ,

'তাদের সম্মুখে রূপার তৈরী পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা ঘোরানো হবে। সেই কাঁচ হবে রূপা জাতীয় এবং সেগুলোকে (বেহেশতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমানমতো ভরে রাখবে।'

তাদেরকে সেখানে এমন সূরা পান করানো হবে; যাতে আদা মিশ্রিত থাকবে। সেটি হবে জান্নাতের একটি র্ঝনা, যাকে 'সালসাবীল' বলা হয়।

এভাবে তারা সুখভোগে মত্ত থাকবে। নিবীড় ছায়ার মধ্যে ফলমূল এবং বিলাস সামগ্রীর সমাহার। এই পরিবেশে তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তদুপরি রূপার তৈরী পাত্র ও পেয়ালা ভর্তি শরাব তাদের সামনে দিয়ে ঘোরানো হবে। এই পেয়ালাগুলো রূপার হলেও কাঁচের মত স্বচ্ছ হবে, যা পৃথিবীতে অকল্পনীয়। আর এগুলোর আকৃতি ও পরিমিত সৌন্দর্যে তা হবে মনোরম এবং ভোগেও হবে তা অপূর্ব।

আবার সেই পানীয় হবে আদা মিশ্রিত, মাঝে মাঝে এটা কর্পুর মিশ্রিতও হবে বলা হয়েছে। 'সালসাবীল' নামক একটি সদা প্রবহমান ঝর্না থেকে তা পূর্ণ করা হবে। পানকারীদের জন্যে তৃপ্তিদায়ক হওয়ার কারণেই তা 'সালসাবীল' নামে আখ্যায়িত হবে।

এই পানীয় সরবরাহটা আরো বেশী উপভোগ্য হবে এ জন্যে যে, যারা এসব পাত্র ও পেয়ালা নিয়ে ঘুরবে, তারা হবে উজ্জ্বল চেহারাধারী কিশোর, যাদের চেহারায় কখনোই বয়সের ছাপ পড়বে না। তাই তারা হবে চির কিশোর ও চির উজ্জ্বল। তাদেরকে এখানে সেখানে ছড়ানো ছিটানো কতিপয় মুক্তার দানার মতো মনে হবে,

'তাদের সেবাকার্যে ছোটাছুটি করতে থাকবে এমন সব বালক যারা চিরকাল বালকই থাকবে। তুমি তাদেরকে দেখলে মনে করবে, তারা যেন কিছু ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।'

এরপর সেখানকার বিরাজমান পরিবেশের ওপর হৃদয় ও চোখের প্রভাবকে বদ্ধমূল করার জন্যে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হচ্ছে,

'সেখানে যেদিকেই তুমি তাকাবে শুধু নেয়ামত আর নেয়ামতই দেখবে এবং (নেয়ামতের) একটি বিরাট সম্রাজ্য দেখতে পাবে।'

এই নেয়ামতে ভরপুর সম্রাজ্যটিই হচ্ছে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল বান্দাদের সাধারণ আবাস ভূমি। অতপর সেই নেয়ামত ও বিশালসম্রাজ্যের অগণিত বৈশিষ্টের মধ্য থেকে আরেকটি বৈশিষ্টের উল্লেখ করা হচ্ছে। এটাকে উপরোক্ত নেয়ামতপূর্ণ সম্রাজ্যের ব্যাখ্যা ও তার বিশ্লেষণ রূপে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

'তারা আবৃত থাকবে সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাকে এবং মখমল কাপড়ে। তাদেরকে রূপার কংকন পরানো হবে এবং তাদের প্রভু তাদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন।'

'সুনদুস' হচ্ছে পাতলা রেশমের কাপড়, আর 'ইসতাবরাক' হচ্ছে ভারী ও মোটা রেশমের কাপড়, যাকে মখমল বলা হয়। এই অপরূপ বেশভূষা ও বিলাস বহুল সাজসজ্জায় তারা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই সজ্জিত হবে। মহান দাতার মহাদান বটে! এটা বেহেশতের অন্যান্য নেয়ামতের শোভা ও মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এর ওপর আরো যুক্ত হবে মহাপ্রভুর আদর, স্নেহ ও সম্মান।

'নিশ্চয়ই এসব তোমাদের যথোচিত প্রতিদান এবং তোমাদের চেষ্টা মর্যাদার সাথে গৃহীত হয়েছে।'

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা বেহেশতের সকল নেয়ামতের সমান মর্যাদা রাখে এবং সেগুলোর মানকে আরো সমুন্নত করে। এভাবে পরকালীন জীবনের সেই বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত আল্লাহর সেই উদাত্ত আহ্বান সমাপ্ত হচ্ছে। এই উদাত্ত আহ্বান ছিলো বেহেশতের অনুপম নেয়ামতের প্রতি। দোযখের দাউদাউ করা আগুণ, শেকল ও বেড়ি থেকে আত্মরক্ষার প্রতি আহবান। মূলত এই হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটো পথ। একটি পথ নিয়ে যায় জান্নাতের দিকে, অপরটি নিয়ে যায় দোযখের দিকে।

**ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের শিক্ষণীয় বিষয়**

বেহেশত ও তার নেয়ামতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানোর এই পর্ব সমাপ্ত হবার পর কোরআন এবার হটকারী, জেদী ও একগুঁয়ে মোশরেকদের প্রসংগ তুলছে, যারা আল্লাহর আহ্বানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে ও তার বিরুদ্ধাচরণ করতে বদ্ধ পরিকর। ইসলামের এই দাওয়াতের মর্ম উপলব্ধি না করে তারা তা নিয়ে রসূল (স.)-এর সাথে দরকষাকষি করতে উদ্যোগী হয়, যাতে করে তিনি এই দাওয়াতের কাজ হয় পুরোপুরি বাদ দেন, নচেত ইসলামের যে সব বিধান পালন করা মোশরেকদের জন্যে কষ্টকর সেগুলোকে শিথিল করে দেন।

তারা একদিকে রসূল (স.)-এর সাথে এই দরকষাকষি, অন্যদিকে সাধারণ মোমেনদের নির্যাতন ও নিপীড়নের মাধ্যমে ইসলাম থেকে ফেরানোর চেষ্টা করতে থাকে, অন্যদেরকে এই দাওয়াত গ্রহণে বাধা দান করা এবং বেহেশত ও তার নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকার এই পরিবেশ নিয়ে সূরার শেষাংশ নাযিল হয়। এতে কোরআন তার নিজস্ব ভংগীতে মোশারেকদের উক্ত পরস্পর বিরোধী ভূমিকার পর্যালোচনা করেছে,

'মূলত আমি তোমার প্রতি এই কোরআন অল্প অল্প করে নাযিল করেছি। অতএব (এদের ব্যাপারেও) তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার প্রভুর নিদের্শের অপেক্ষা করো। আর এদের মধ্যেকার পাপি ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কথা কখনো কখনো শুনবে না। সকাল সন্ধ্যা তুমি তোমার মালিকের নাম স্মরণ করতে থাকো।'

উল্লেখিত চারটি আয়াতে ইসলামী দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিহিত রয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী প্রত্যেক কর্মীর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং এর প্রধান প্রধান সামাজিক, মনস্তাত্বিক ও বিশ্বাসগত প্রতিক্রিয়াসমূহকে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করা উচিত।

রসূল (স.) যদিও একমাত্র আল্লাহর এবাদাতের আহ্বান নিয়েই মোশরেকদের মুখোমুখী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এর সাথে তাদের মন-মগযের একটা প্রতিকুল বিশ্বাসের মোকাবেলাও করেছেন। এই ব্যাপারটা ছিলো আরো ব্যাপক। প্রথম অর্থে তার কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। কেননা পৌত্তলিকতার মত জটীল, পেচাঁলো, হেয়ালীপূর্ণ, দুর্বোধ্য ও ভংগুর ধরনের বিশ্বাস

কখনো এতোটা শক্তিশালী ও মযবুত হতে পারে না যে, তা ইসলামের মতো সহজ, স্বচ্ছ সরল মযবুত ও দৃঢ় আদর্শের মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারে। বরং পৌত্তলিকতার বিশ্বাসকে ঘিরে এমন কিছু আনুসংগিক কায়েমী স্বার্থ নিহিত ছিলো, যার তাগিদে পৌত্তলিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে চরম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো।

পবিত্র কোরআনের একাধিক জায়গায় যেসব রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তার একমাত্র উৎস ছিলো এই আনুসংগিক কায়েমী স্বার্থ। পৌত্তলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংশ্লিষ্ট বস্তুগত স্বার্থের ভিত্তিতে পৌত্তলিক সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়েছিলো, তাই-ই ছিলো এই কায়েমী স্বার্থ। এই কায়েমী স্বার্থই ছিলো শক্তিশালী ইসলামী আদর্শের মোকাবেলায় মিথ্যা ও অসার পৌত্তলিক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রাখার একটি প্রধান ও মূল কারণ।

এর ধারকদেরকে আরো অনমনীয় ও একগুঁয়ে করে তুলেছিলো জাহেলিয়াতের বিভিন্ন রসম রেওয়ায। এইসব ভোগবাদী জীবনাচার ও প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থকারী নানা রকমের দুষ্কর্মের লাগামহীন স্বাধীনতা এই পৌত্তলিক আকীদা-বিশ্বাসকে আরো দৃঢ়তা ও শক্তি যুগিয়েছিলো। এসব উপকরণ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, সংঘর্ষ ও অস্বীকৃতির মনোভাবকে অনেকাংশেই জোরদার করে রেখেছিলো। কারণ ইসলামের উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে অবাধ যৌনাচার ও নীতি গর্হিত কাজের অনুমতি দেয় না।

সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি, অর্থ সম্পদ ও অর্থনৈতিক স্বার্থ, এর সাথে সম্পৃক্ত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন আদত অভ্যাস, রসম রেওয়ায ঐতিহ্যগত রীতিপ্রথাও ছিলো এক একটা বিরাট কারণ। এর সাথে সংশ্লিষ্ট নৈতিক মূল্যবোধ ও শৃংখলাহীনতা শুধু যে মোহাম্মদ (স.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তাই নয়, বরং প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক প্রজন্মে তা ইসলামী দাওয়াতের সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিপরীত আকীদা ও বিশ্বাসের সংঘাতের সব কয়টি উপকরণ ও কার্যকারণ ইসলাম ও জাহেলিয়াতের এই সংঘাতে সর্বদাই উপস্থিত থাকে এবং এর কারণে এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী ও চরম হঠকারী সংঘাতে পরিণত হয়। এই দুঃসহ প্রাণান্তকর সংঘাত ইসলামী আকীদা ও আদর্শের ওপর অবিচল থাকা ও তার বিধিবিধান মেনে চলাকে কঠিন কাজে পরিণত করে দেয়।

### দায়ী-য়ে দ্বীনের কর্তব্য

এ জন্যে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, উক্ত চারটি আয়াতে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় চিন্তা-ভাবনা করা। যে প্রসংগে এ আয়াতগুলো রসূল (স.)-এর ওপর নাযিল হয়েছিলো তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা। কারণ তিনি যে দেশের ও যে যুগের মানুষই হোক না কেন তাকে ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা অব্যাহত রাখার জন্যে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেননা এগুলোই সংঘাতের উৎস এবং যুদ্ধের মূল কারণ। ইসলামী দাওয়াতের প্রত্যেক সৈনিককে প্রত্যেক ভুখন্ডে ও প্রত্যেক যুগে এর সম্মুখীন হতে হয়।

'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সাবধান করো' এই সম্বোধনের মাধ্যমে রসূল (স.) স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানব জাতিকে সতর্ক করার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব লাভ করেন। যখনই তিনি এই দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ নিলেন, অমনি নতুন দাওয়াতকে প্রতিরোধকারী এই উপকরণগুলো তার সামনে এসে দাঁড়ালো। এই উপকরণগুলো আরববাসীকে নতুন দাওয়াত গ্রহণে বাধা দিতে লাগলো এবং তাদের প্রচলিত আকীদা বিশ্বাসকে দূর্বল, বাসি ও অকেজো জানা সত্তেও তাকে তারা আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ করলো।

শুধু তাই নয় তাদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে চরম হঠকারী ভূমিকা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা, সামাজিক অবস্থা, মর্যাদা ও কায়েমী স্বার্থকে যে কোনো মূল্যে টিকিয়ে রাখতে

প্ররোচিত করলো। তাদের প্রচলিত ও চিরাচরিত রীতিনীতি আমোদ-প্রমোদ ও যৌন সম্ভোগের লাগামহীন স্বাধীনতা দান করলো, এক কথায় ইসলামের বিধান প্রচলিত যেসব রীতিনীতি ও চালচলনের ওপর আঘাত হানে তারা সেগুলোর দিকেই আহ্বান জানালো।

এই প্রবল সংরক্ষণ প্রচেষ্টা বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। প্রথমেই তা এলো নবাগত এই দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ঈমান আনয়নকারী মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোমেনদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়নের আকারে। হুমকি ধমকি ও অত্যাচারের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের আকীদা ও আদর্শ থেকে ফেরানোর প্রচেষ্টা বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ ও বিভিন্ন উপায়ে এই আদর্শের ভাবমূর্তি ম্লান করা ও তাঁর নবী (স.)-এর সুনাম ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করা, যাতে করে নতুন আর কোনো লোক তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। কেননা যারা নয়া আদর্শকে গ্রহণ করেছে ও তার মর্ম উপলব্ধি করেছে, তাদেরকে তা থেকে ফেরানোর চাইতে নতুন লোকদেরকে তা গ্রহণ থেকে ঠেকিয়ে রাখা ছিলো সহজতর।

এর সাথে তারা দাওয়াতের মূল নেতার কাছে গিয়েও হুমকি ও নির্যাতনের পাশাপাশি প্রলোভনের কৌশলও প্রয়োগ করতে থাকে, যাতে তাকে একটা আপোষ রফায় উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাকে তাদের আকীদা, প্রচলিত অবস্থা ও ঐতিহ্যগত রীতিনীতির সমালোচনা থেকে বিরত রাখা যায়, সর্বোপরি উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোনো শর্তে তার সাথে একটা সন্ধি স্থাপন করা যায়। কেননা প্রচলিত সমাজ রীতিতেও এরূপ রেওয়ায ছিলো যে, সংশ্লিষ্ট স্বার্থে কিংবা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর স্বার্থ নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে উভয় পক্ষের ছাড় দেয়ার মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য মধ্যম পথ অবলম্বন করা হতো। এ ধরনের বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হওয়া যে কোনো যুগের ও যে কোনো দেশের ইসলামের আহবায়কের পক্ষেই সম্ভব।

হযরত মোহাম্মদ (স.) একজন রসূল হওয়া সত্তেও এবং সকল গোমরাহী ও মানবসৃষ্ট বিপদ থেকে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি থাকা সত্তেও যেহেতু তিনি একজন মানুষ ছিলেন, তাই মুষ্টিমেয় সংখ্যক দুর্বল মোমেনদেরকে সাথে নিয়ে এই কঠিন বাস্তবতার তিনি সম্মুখীন ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই বাস্তব অবস্থা জানার কারণে তাকে অসহায় অবস্থায় রেখে দেননি এবং পথের বাঁধা বন্ধন সম্পর্কে দিক নির্দেশনাহীন অবস্থায়ও ছেড়ে দেননি। বরং তাকে এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার পন্থা অবহিত করেছেন। এই দিক নির্দেশনা ও সহায়তাই পরবর্তী আয়াতগুলোর আলোচ্য বিষয়। 'আমি তোমার ওপর অল্প অল্প করে কোরআন নাযিল করেছি।'

এই দাওয়াতের দায়িত্ব কোথা থেকে এলো এবং এর মূলমন্ত্রের উৎস কি, তা হচ্ছে এই বারটি আয়াতের প্রথম পর্বের বক্তব্য। এর মূলকথা এই যে, এ দাওয়াত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। তিনিই এর একমাত্র উৎস। তিনিই এই দাওয়াতের বাণীসহ কোরআন নাযিল করেছেন। তিনি ছাড়া এর আর কোনো উৎস নেই। এই উৎস থেকে উৎসারিত নয় এমন কোনো জিনিস এর সাথে মিশতেও পারে না। এই উৎস ছাড়া আর কোনো উৎস থেকে নেয়া কোনো জিনিস দিয়ে এর সাথে জোড়াতালি দেয়াও সম্ভব নয়।

আর আল্লাহ তায়ালা যখন এই কোরআন নাযিল করেছেন এবং ইসলামের দাওয়াত প্রচারের দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তখন তিনি একে সাফল্য মন্ডিত না করে ছাড়বেন না। তিনি এর আহবায়ককেও অসহায় ছেড়ে দেবেন না। কারণ তিনিই তাকে এই দায়িত্ব অর্পন করেছেন এবং তিনিই তার ওপর কোরআন নাযিল করেছেন।

কিন্তু তা সত্তেও বাতিল শক্তির বড়াই এবং অপশক্তির হুংকার ও আস্ফালন অব্যাহত থাকলো। মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চলতে থাকলো। তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা চলতে লাগলো। তাছাড়া আকীদা বিশ্বাস, সমাজ ব্যবস্থা, প্রচলিত রীতিপ্রথা, সর্বাত্মক অরাজকতা ও অনাচারে তারা লিপ্ত ছিলো, তার ওপর জিদ ও একগুয়েমী ছিলোই, তদুপরি তারা আপোষ রফার মাধ্যমে মক্কা শহরকে দুই ভাগ করা এবং উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা মধ্যম পন্থা অবলম্বনের জন্যে রসূল (স.) কে চাপ দিতে লাগলো। সেই কঠিন ও প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে এ ধরনের আপোষ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা ছিলো আসলেই খুব কঠিন কাজ।

## ইসলামের বক্তব্য আপোষহীন

এই প্রেক্ষাপটেই দ্বিতীয় পর্বের বক্তব্য হাযির করা হয়েছে,

'অতএব তুমি তোমার প্রভুর সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করো এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো দুষ্কৃতিকারী বা অকৃতজ্ঞের কথা মেনে নিও না।'

অর্থাৎ সবকিছুই আল্লাহর পরিকল্পনার অধীন। তিনি বাতিল শক্তিকে এবং দুষ্কর্মপরায়নদেরকে সময় দেন। মোমেনদের পরীক্ষা, বিপদ মুসিবত ও যাচাই বাছাইর কাজটিকে একটু দীর্ঘস্থায়ী করেন। এর পেছনে এমন নিগূঢ় রহস্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা শুধু তিনিই জানেন। সেই বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরেই তিনি নিজের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন।

সুতরাং তাঁর পরিকল্পিত ও নির্ধারিত সময়টি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। বিপদ মুসিবত এলেও ধৈর্যধারণ করো। বাতিল জয়ী হয়ে যায় যাক, অপশক্তি হুংকার দিতে থাকে দিক-ধৈর্যধারণ করো। যে মহাসত্য নিয়ে তোমার ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে তার ওপর আরো বেশী করে দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আকীদা-বিশ্বাসের প্রশ্নে যে আপোষের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাতে রাযী না হয়ে ধৈর্যধারণ করো।

'তাদের মধ্য থেকে কোনো দুষ্কৃতিপরায়ন ও অকৃতজ্ঞ লোকের কথা মেনে নিও না।'

অর্থাৎ তারা সকলেই পাপী, কাফের ও অকৃতজ্ঞ। তারা কোনো সৎ কাজে বা কল্যাণের কাজে ডাকতে পারে না। তারা যখন আপোষের আহ্বান জানাবে তখন পাপ ও কুফরীর দিকেই আহ্বান জানাবে। তারা তোমার কাছে এমন প্রস্তাব দেবে, যা তোমার ভালো লাগবে বলেই তাদের ধারণা।

ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থাবলী সাক্ষী যে, রসূল (স.)-কে তারা ক্ষমতা, ধন সম্পদ ও রূপ যৌবনের লালসা দেখিয়ে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলো। তাকে উচ্চতর নেতা বানানোর প্রস্তাব দিয়েছিলো। আবার বিকল্প হিসাবে তাকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দেবে বলেও প্রলোভন দেখিয়েছিলো।

দেশের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারীকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার টোপও তারা ফেলেছিলো। ওতবা ইবনে রাবীয়া তো এও বলেছিলো যে, 'এই ইসলামের দাওয়াতের কাজটা তুমি বাদ দাও, তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো। আর কোরায়শ বংশে আমার মেয়েদের মতো সুন্দরী আর কারো নেই।' সাধারনত বাতিল শক্তি সর্বকালে ও সর্বদেশে ইসলামের দাওয়াত দাতাদেরকে খরিদ করার জন্যে এই কয়টি প্রলোভনের টোপই দিয়ে থাকে।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে রসূল (স.)-কে পরীক্ষার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের সাথে তোমার কোনো আপোষ হতে পারে না। কেননা তাদের জীবনপদ্ধতি ও তোমার জীবনপদ্ধতির মাঝে বিস্তর ব্যাবধান রয়েছে। জীবন ও জগত সম্পর্কে তোমার চিন্তাধারা ও তাদের চিন্তাধরা, তোমার সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে এবং তাদের বাতিল মতবাদে এবং তোমার ঈমানে ও তাদের কুফরীতে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। তাছাড়া তোমার আলোতে ও তাদের অন্ধকারে এবং তোমার সত্য জ্ঞানে ও তাদের জাহেলিয়াতে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে, তা ঘুচাতে কোনো পুল তৈরী করার অবকাশও নেই। তাই সময় ও পথ যতো দীর্ঘই হোক এবং নির্যাতনের অগ্নী পরীক্ষা ও প্রলোভনের শক্তি যতো কঠিন ও দুঃসহই হোক, তোমাকে ধৈর্যধারণ করেই যেতে হবে। কিন্তু ধৈর্যধারণ করা এত কঠিন কাজ যে, সাহায্য ও রসদ ছাড়া তা অসাধ্য, তাই সেই শক্তি ও রসদ সংগ্রহের উপায় নির্দেশ করা হচ্ছে–

'সকাল সন্ধ্যায় তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো। রাতেও তার জন্যে সেজদা করো এবং দীর্ঘ রাতব্যাপী তাঁর তাসবীহ করো।'

সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করা এবং রাতে সেজদা ও তাসবীহ হচ্ছে এর রসদ। এর মাধ্যমেই সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে কোরআন নাযিলকারী ও দাওয়াতের দায়িত্ব অর্পনকারী উৎসের সাথে। তিনিই সকল শক্তি, সাহায্য ও রসদের উৎস। রাতব্যাপী যেকের, এবাদাত, দোয়া ও

তাসবীর মাধ্যমেই এই সংযোগ মযবুত হবে। রাস্তা অনেক দীর্ঘ। বোঝাও ভারী। তাই অনেক সাহায্য ও রসদের প্রয়োজন। আল্লাহর সাথে বান্দার গোপন সাক্ষাতেই এই রসদ ও সাহায্য পাওয়ার পথ খুলে যাবে।

এরূপ নিভৃত সাক্ষাতে যে ঘনিষ্টতা ও ভালোবাসা জন্মে তা সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে দেয়। এই সাক্ষাতকারের মাধ্যমেই দাওয়াতী দায়িত্ব ও আমানতের বিশালত্ব উপলব্ধি করা যায়। ফলে পথের যাবতীয় বাধা ও বিপদ তার সামনে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হয়।

আল্লাহ তায়ালা দয়ালু। তাই তাঁর বান্দা ও নবীকে যখন দাওয়াতের এই বিশাল কাজের দায়িত্ব দিলেন, তাঁর ওপর কোরআনও নাযিল করলেন। এই পথের বাধা বিঘ্নও তাঁর অজানা নয়, এ অবস্থায় তাঁকে তিনি বিনা সাহায্যে কিভাবে ছেড়ে দিতে পারেন? এ জন্যে এই সাহায্যকেই তিনি তাঁর কন্টকাকীর্ণ পথের সবচেয়ে কার্যকর সাহায্য বলে বিবেচনা করেছেন।

সর্বকালের ও সকল দেশের ইসলামী দাওয়াতের কর্মীদের জন্যে এটাই যথার্থ সাহায্য এবং কার্যকর রসদ। কেননা সর্বত্র ও সর্বকালে এটি হচ্ছে একই দাওয়াত এবং একই আন্দোলন। এর সমস্যা ও বাধা বিপত্তি সব সময় একই রকম এবং এর ব্যাপারে বাতিল শক্তির ভূমিকাও সব সময় ছিলো একই রকম। এ ভূমিকার ধারাও এক। বাতিল শক্তি যে উপায় উপকরণ নিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে রুখে দাঁড়ায় তাও সর্বত্র এক। সুতরাং সত্যের সৈনিকদের জন্যে যে জিনিস আবহমান কাল ধরে কার্যকর শক্তি, হাতিয়ার ও রসদ হিসাবে আল্লাহর কাছে বিবেচিত–এখনও ঠিক সেগুলোই কার্যকর রয়েছে।

ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহীদেরকে যে বিষয়টি ভালো করে বুঝতে হবে তা অবিকল সেই জিনিস–যা আল্লাহ তায়ালা এই দাওয়াতের প্রথম নিশানবাহী রসূল (স.)-কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে বিষয়টি এই যে, এই দাওয়াতের দায়িত্ব ও নির্দেশ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এ দাওয়াতের মালিক তিনিই। যে সত্য সহকারে এই দাওয়াতের আবির্ভাব ঘটেছে, তার সাথে কোনো বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটা সম্ভব নয়। তাই হক ও বাতিলের মধ্যে সহযোগিতার কোনো পথ নেই।

### হক ও বাতিলের মধ্যে কোনো আপোষ নেই

হকপন্থীদের সাথে বাতিলপন্থীদের কোনো আপোষ কখনোই সম্ভব নয়। উভয়ের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও গিয়ে তা পরস্পরের সাথে মিলিত হয় না। মোমেনদের দুর্বলতা ও সংখ্যাস্বল্পতার সুযোগে এবং নিজের শক্তি ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যখন বাতিলশক্তি মোমেনদের ওপর জয়ী হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিবেচনা অনুসারে কোনো বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে তদ্রূপ অবস্থার উদ্ভব ঘটতে দেন, তখন আল্লাহর পরবর্তী ফয়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করাই মোমেনদের একমাত্র কর্তব্য। দোয়া ও তাসবীহর মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেই এই কঠিন সময়টি কাটিয়ে দিতে হবে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত সকলের এ বিষয়টি হৃদয়ংগম করা খুবই জরুরী।

পরবর্তী আয়াতেও এই আলোচনা অব্যাহত রয়েছে যে, রসূল (স.) আনীত জীবন পদ্ধতি ও জাহেলিয়াতের জীবন পদ্ধতির মাঝে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। জাহেলিয়াতের জীবনপদ্ধতি সে পন্থীদের সত্য ও ন্যায়ের পথ এড়িয়ে চলাকে পূর্ণ সমর্থন দেয় এবং তাদের চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের সমালোচনা করে,

‘তারা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর ভালোবাসে এবং এরপর তাদের ওপর যে বিপদসংকুল দিনটি আসছে তাকে তারা অবহেলা করে।’

অর্থাৎ যাদের গন্তব্য অত্যন্ত কাছাকাছি এবং যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য, তারা এই দুনিয়াকে নিয়েই ডুবে থাকে এবং পরকালের ভয়াবহ সেই দিনকে উপেক্ষা করে, কোনো ব্যাপারেই তাদের অনুকরণ ও অনুসরণের অবকাশ নেই! মোমেনদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোনোই মিল নেই।

এই দুনিয়ার জীবনের যে ধন সম্পদ ও ক্ষমতা প্রতাপের লোভে তারা লালায়িত, তার প্রতি মোমেনদের আকৃষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ সম্পদ। আর বাতিলপন্থীরা বড়ই অসহায়। বাতিলপন্থীরা যে আপন কল্যাণের ব্যাপারেও উদাসীন সে কথাও এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ক্ষণস্থায়ী জীবনকে গ্রহণ করেছে এবং যেদিন কঠিন হিসাব কেতাবের পর তাদেরকে শেকল, বেড়ী ও আগুন দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হবে-সেই দিনকে তারা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেছে।

আয়াতটিতে রসূল (স.) ও তাঁর সাথী মোমেনদের মনোবল দৃঢ় করারও চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা ক্ষনস্থায়ী পার্থিব জীবনের সকল কাংখিত বস্তুর প্রাচূর্যে যাদের জীবন ধন্য, তাদের মোকাবেলা করতে সুদৃঢ় মনোবলের প্রয়োজন। তবে এতে পরকালের বিপদসংকুল দিকের উল্লেখ করার মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ সম্ভোগে ও ভোগবিলাসে মাতোয়ারা লোকদের প্রতি পরোক্ষ হুমকি এবং হুশিয়ারীও দেয়া হয়েছে।

**বাতিলপন্থীদের জন্যে সতর্কবাণী**

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে- যে শক্তি সামর্থ্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দিয়েছেন, তা আল্লাহর চোখে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা তিনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তাদের জায়গায় অন্য জাতির উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম। তবে তিনি তা করেন না। কল্যাণ ও সূক্ষ্মতর প্রজ্ঞার আলোকে তার প্রাচীন প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা চলে আসছে, তার তাগিদেই তিনি এ জিনিসটিকে বিলম্বিত করছেন,

'আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছি। আর যখন আমি চাইবো, তখন তাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে সৃষ্টি করবো।'

আলোচনার এই পর্বটি এক শ্রেণীর লোকদের জন্যে হুশিয়ারী স্বরূপ। আপন শক্তির মধ্যে মত্ত এসব লোককে তাদের জন্ম ও শক্তির উৎসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অতপর দুর্বল ও স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদেরকে এই বলে প্রবোধ দেয়া হয়েছে যে, সকল শক্তির দাতা তিনিই, যাঁর সাথে তারা সম্পৃক্ত এবং যার দাওয়াত প্রচারে তারা নিয়োজিত। সেই সাথে আল্লাহর ভাগ্য নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা এবং এর পেছনে যে সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা সক্রিয় রয়েছে, সে বিষয়টিও তাদের মনে বদ্ধমূল করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহর এই প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্মদর্শিতা অনুসারেই বিশ্বজগতের সকল ছোট বড় ঘটনা সংঘটিত হয় এবং তাঁর ফয়সালার ওপরই সব কিছু নির্ভরশীল। তিনিই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

'আর যখন চাইবো তাদের পরিবর্তে তাদের মতো অন্যদেরকে সৃষ্টি করবো।'

অর্থাৎ তারা তাদের শক্তি দ্বারা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। কেননা তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং শক্তি সামর্থ্য দিয়েছেন। তাদের জায়গায় তাদের মতো অন্যদেরকে সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম। তথাপি তিনি যখন তাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্যদেরকে সৃষ্টি করেননি, তখন বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহর পরম করুনা ও অনুগ্রহ। এটাই তাঁর সিদ্ধান্ত এবং এটাই কল্যাণকর।

আয়াতের এই শেষাংশে রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদের মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা এবং তাদের ভূমিকা ও অন্যদের ভূমিকার বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। সেই সাথে এতে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাসে মত্ত লোকদের বিবেকে একটি মৃদু কষাঘাত করা হয়েছে, যেন তারা তাদের শক্তির নেশায় দিশাহারা না হয়, আল্লাহর নেয়ামতকে যেন স্মরণ করে। সে নেয়ামত নিয়ে বড়াই করে অথচ শোকর করে না। এই নেয়ামতের পেছনে যে পরীক্ষার উদ্দেশ্যটি লুকিয়ে আছে তা যেন সে বুঝতে চেষ্টা করে। সূরার শুরুতেও এ পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে।

অতপর তাদেরকে প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্যে সজাগ করে তোলা হচ্ছে। তাদের সামনে কোরআন পেশ করে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে।

'নিশ্চয়ই এই কোরআন একটি উপদেশ বিশেষ, যার ইচ্ছা হয় সে যেন এর মাধ্যমে আপন প্রভুর কাছে যাওয়ার নিজের পথ করে নেয়।'

পরবর্তী আয়াতে এই মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা অবাধ ও সার্বভৌম ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং সবকিছুই তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন চূড়ান্তভাবে তারই দিকে মনোনিবেশ করে এবং তারই কাছে চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, আর মানুষ যেন নিজের শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম,

'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কোনো কিছুর ইচ্ছা করতে পারো না। আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, বিচক্ষন প্রজ্ঞাময়।'

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ জানুক যে, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সর্বময় কর্তা ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক। তিনি দোর্দন্ড প্রতাপশালী ও সার্বভৌম। এ কথা জানার পর সে সহজেই তাঁর দিকে মনোনিবেশ ও আত্মসমর্পণের পন্থা কি তা জানতে পারবে। কোরআনের যেখানে যেখানে এ ধরনের কথা উচ্চারিত হয়েছে, সেখানে তার মোটামুটি মর্ম এটাই। এখানে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছা অনুসারে মানুষকে সত্য ও মিথ্যা হক ও বাতিল এবং ন্যায় ও অন্যায় বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে ভালো বা মন্দ পথে চালিত হওয়ার ক্ষমতাও তিনি তাকে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক মানুষের মনের স্বভাবপ্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত।

তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যেমন পথের সন্ধান দিয়েছেন, তাদের কাছে রসূল পাঠিয়েছেন এবং কোরআন নাযিল করেছেন, তেমনি তাকে জ্ঞান ও বোধশক্তিও দান করেছেন। তবে এসব কিন্তু একান্তভাবে আল্লাহর ফয়সালার ওপর নির্ভরশীল। তাই তাঁর কাছেই সকলের ক্ষমা চাওয়া উচিত। আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর আনুগত্য করার শক্তিও তিনি স্বয়ং নিজেই তাদের দিয়ে থাকেন। আল্লাহর সর্বব্যাপী ক্ষমতার বিষয়টি যদি কারো অজানা বা অবহেলিত থাকে এবং সে জন্যে সে তাঁর কাছে তাঁর আনুগত্য সহজ করে দেয়া ও তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তাহলে তার হেদায়াত লাভ ও তার কথা স্মরণ করার সম্ভাবনা সুদূর পরাহতই থেকে যাবে এবং সে কল্যাণের দিকে চলার কোনো প্রেরণাই পায় না।

এ জন্যেই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাকে তিনি ইচ্ছা করেন নিজের অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, আর যালেমদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।'

বস্তুত তিনি যা ইচ্ছা তাই করার অবাধ ক্ষমতা রাখেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো ব্যক্তিকে আপন অনুগ্রহের আওতাভুক্ত করাও তাঁর ক্ষমতার অধীন। এই ক্ষমতা ও ইচ্ছা তিনি তাদের ওপরই প্রয়োগ করেন, যারা তাঁর কাছে ধর্না দেয় এবং তাঁর কাছে হেদায়াত ও আনুগত্যের তাওফীক কামনা করে।

'আর যালেমদের জন্যে তিনি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।'

তাদেরকে তিনি সময় দিয়ে রেখেছেন, যাতে তারা এই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি লাভের যোগ্য হয়।

এই উপসংহার সূরার সূচনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। শুরুতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে চোখ ও কান দিয়েছেন এবং তাকে দোযখ অথবা বেহেশতের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, আর এখানে সূরার উপসংহারে তাদের উক্ত পরীক্ষার শেষ অবস্থাটি চিত্রিত করা হয়েছে।

# সূরা আল মোরসালাত

আয়াত ৫০ রুকু ২

**মক্কায় অবতীর্ণ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ ﴿١﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ ﴿٢﴾ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ ﴿٣﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ ﴿٥﴾ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ ﴿٦﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ؕ ﴿٧﴾ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ ﴿٨﴾ وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۙ ﴿٩﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ ﴿١٠﴾ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ؕ ﴿١١﴾ لِاَىِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ؕ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۚ ﴿١٣﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ؕ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٥﴾ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ؕ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾

## রুকু ১

**রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—**

১. মৃদুমন্দ ও ক্রমাগতভাবে পাঠানো (কল্যাণবাহী) বাতাসের শপথ, ২. প্রলয়ংকরী ঝঞ্ঝা বাতাসের শপথ, ৩. মেঘমালা বিস্তৃতকারী বাতাসের শপথ, ৪. (আবার এ মেঘমালাকে) যে (বাতাস) টুকরো টুকরো করে আলাদা করে দেয় তার শপথ, ৫. (মানুষের অন্তরে) ওহী নিয়ে আসে যে (ফেরেশতা) তার শপথ, ৬. (বিশ্বাসীরা এরপর) যেন কোনো ওযর আপত্তি (পেশ) করতে না পারে কিংবা (অবিশ্বাসীরা) যেন এতে সতর্ক হতে পারে, ৭. নিসন্দেহে তোমাদের (পরকাল দিবসের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সংঘটিত হবেই; ৮. যখন আকাশের তারাগুলোকে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে, ৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, ১০. যখন পাহাড়গুলোকে (ধুলার মতো) উড়িয়ে দেয়া হবে, ১১. যখন নবী রসূলদের সকলকে নির্ধারিত সময়ে (এক জায়গায়) জড়ো করা হবে; ১২. কোন্ (বিশেষ) দিনটির জন্যে (এ কাজটি) স্থগিত করে রাখা হয়েছে? ১৩. (হাঁ) চূড়ান্ত ফয়সালার দিনটির জন্যে, ১৪. তুমি কি জানো সে ফয়সালার দিনটি কেমন হবে? ১৫. যারা (একে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে সেদিন তাদের ধ্বংস (অবধারিত)। ১৬. আমি কি আগের (অবিশ্বাসী যালেম) লোকদের ধ্বংস করিনি? ১৭. অতপর আমি পরবর্তী লোকদেরও (ধ্বংসের পথে) পূর্ববর্তীদের সঙ্গী করে দেবো। ১৮. (সকল যুগে) অপরাধী ব্যক্তিদের সাথে আমি এ (একই) ধরনের ব্যবহারই করে থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنٰهُ

فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا ق فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ اَحْيَآءً

وَّاَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾

১৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে! ২০. আমি কি তোমাদের (এক ফোঁটা) তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? ২১. অতপর সেই (তুচ্ছ পানির) ফোঁটাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে আমি (সযত্নে) রেখে দিয়েছি? ২২. (রেখে দিয়েছি) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত, ২৩. তারপর তাকে পরিমাণমতো সব (কিছু দিয়ে আমি পূর্ণাংগ একটি মানুষ তৈরী) করতে সক্ষম হয়েছি, কতো সক্ষম (ও নিপুণ) স্রষ্টা আমি! ২৪. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের জন্যে যারা (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে! ২৫. আমি কি ভূমিকে (প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের) ধারণকারী করে বানিয়ে রাখিনি? ২৬. জীবিত ব্যক্তিদের যেমনি (সে ধারণ করে আছে) তেমনি মৃত ব্যক্তিদেরও (সে নিজের ভেতরে ধরে রেখেছে), ২৭. আমি তাতে উঁচু উঁচু পর্বতমালা সৃষ্টি করে রেখেছি এবং তোমাদের আমি সুপেয় পানি পান করিয়েছি। ২৮. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ২৯. (বিচারের পর বলা হবে,) এবার চলো সেই জিনিসের দিকে যাকে তোমরা দুনিয়ায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে, ৩০. চলো সেই ধূম্রপুঞ্জের ছায়ার দিকে, যার রয়েছে তিনটি (ভয়ংকর) শাখা প্রশাখা, ৩১. এ ছায়া কিন্তু সুনিবিড় কিছু নয়, এটা (তাকে) আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচাতেও পারবে না; ৩২. (বরং) তা বৃহৎ প্রাসাদতুল্য আগুনের স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করতে থাকবে, ৩৩. (মনে হবে) তা যেন হলুদ বর্ণের (কতিপয়) উটের পাল; ৩৪. দুর্ভোগ তাদের (জন্যে), যারা (একে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ৩৫. এ হচ্ছে সেই (মহাবিচারের) দিন, যেদিন কেউ কোনো কথা বলবে না, ৩৬. কাউকে সেদিন (গুনাহের পক্ষে) ওযর আপত্তি (কিংবা সাফাই) পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْأَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ

فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ

لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

৩৭. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ৩৮. (সেদিন পাপীদের বলা হবে,) আজকের দিন হচ্ছে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, তোমাদের সাথে তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষকে আজ আমি (এখানে) একত্রিত করেছি। ৩৯. আজ যদি (আমার বিরুদ্ধে) তোমাদের কোনো অপকৌশল প্রয়োগ করার থাকে তাহলে তা প্রয়োগ করো। ৪০. দুর্ভোগ তাদের (জন্যে), যারা (একে) মিথ্যা করেছে।

## রুকু ২

৪১. (আল্লাহকে) যারা ভয় করেছে আজ তারা থাকবে (সুনিবিড়) ছায়াতলে এবং (প্রবাহমান) ঝর্ণাধারার মাঝে, ৪২. তাদের জন্যে ফলফলারির ব্যবস্থা থাকবে, যা চাইবে তারা তাই পাবে; ৪৩. (তাদের বলা হবে, দুনিয়ায়) তোমরা যা করে এসেছো তার পুরস্কার হিসেবে (আজ) তোমরা তৃপ্তির সাথে (আমার নেয়ামত) খাও ও পান করো। ৪৪. অবশ্যই আমি সৎকর্মশীল মানুষদের এমনিভাবে পুরস্কার দিয়ে থাকি। ৪৫. সেদিন (যাবতীয়) দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে! ৪৬. (হে অবিশ্বাসীরা,) কিছুদিনের জন্যে তোমরা এখানে খেয়ে নাও এবং কিছু ভোগ আস্বাদনও করে নাও, নিসন্দেহে তোমরা হচ্ছো অপরাধী! ৪৭. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে) যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ৪৮. এ যালেমদের অবস্থা হচ্ছে, এদের যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর দরবারে নত হও, তখন তারা নত হয় না। ৪৯. (যাবতীয়) দুর্ভোগ সেদিন তাদের (জন্যে), যারা (এসব সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে! ৫০. (তুমিই বলো,) এরপর আর এমন কোন্ কথা আছে যার ওপর এরা ঈমান আনবে!

**সংক্ষিপ্ত আলোচনা**

প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনেকগুলো দৃশ্য ও সুতীব্র প্রভাব বিস্তারকারী বহু বক্তব্যে এ সূরাটি পরিপূর্ণ। মনে হয় এর প্রত্যেকটি বাক্য এক একটি জলন্ত আগুনের কাঠি। এগুলো যেন শ্রোতার বিবেকের ওপর অত্যন্ত ভয়ংকর আঘাত করে। তার বিবেকের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও হুমকির কিছু বান যেন ছুড়ে মারে।

সূরাটি দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন দৃশ্য, মানব সত্ত্বা সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব এবং কেয়ামত ও আযাবের বহু চিত্র তুলে ধরে। আর প্রত্যেকটি দৃশ্য তুলে ধরার পর অপরাধীর মনের ওপর যেন এই বলে একটা একটা ধারালো আগুনের শূল নিক্ষেপ করে।

'সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য।'

পুরো সূরাটিতে দশবার এই ছন্দায়িত মন্তব্যটি পেশ করা হয়েছে। এটি এই সূরার একটি বিশিষ্ট বাকধারায় পরিণত হয়েছে। আলোচনার ক্ষুরধার ইংগিত, আলোড়ন সৃষ্টিকারী দৃশ্যসমূহ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী উপস্থাপনা ভংগির সাথে এই মন্তব্যগুলো একান্ত সংগতিপূর্ণ।

সূরা 'আর রহমান'-এ আল্লাহর এক একটি নেয়ামতের বিবরণ দেয়ার পর বারবার উচ্চারিত হয়েছে, 'অতপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতটি অস্বীকার করবে?'

অনুরূপভাবে সূরা 'আল কামার'-এ প্রতিটি আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর বারবার এ কথাটি উচ্চারিত হয়েছে যে, 'অতপর দেখলে তো আমার আযাব ও হুঁশিয়ারী কেমন ছিলো?'

আলোচ্য সূরায় এই বারবার উচ্চারিত তাৎপর্যবহ বাক্যটি আগের সূরা দুটোর সে বাক্য দুটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে এটির বারবার উচ্চারণ সূরাটিকে একটি বিশেষ চরিত্রে ও মহিমায় মন্ডিত করেছে এবং তাকে বহুলাংশে ধারালো ও তেজস্বী করে তুলেছে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরার আয়াতগুলো ছোট ছোট, গতিশীল ও প্রচন্ড প্রভাবময়ী। অধিকাংশই বিচিত্র মিত্রাক্ষর শব্দে সমাপ্ত আয়াতের সমষ্টি। আয়াতের শেষে কখনো কখনো একই মিত্রাক্ষর শব্দ পুনরুচ্চারিত হয়েছে। এসব মিত্রাক্ষর শব্দগুলো ছোট ও গতিশীল। এর বাক্যগুলো শ্রোতার স্নায়ুতে তীব্র এক দাহ ও প্রবল প্রেরণার সৃষ্টি করে। এসব অনুভূতি তাদের মনে একের পর এক অবিরত ধারায় সৃষ্টি হতে থাকে। একটির রেশ না মিলাতেই আর একটির উদ্ভব হয়।

সূরার শুরু থেকেই এই ধারা শুরু হয়েছে। তীব্র ঘুর্ণিবায়ু অথবা ফেরেশতার উল্লেখ দ্বারা সূরার পরিবেশকে ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ করা হয়েছে। এপর্যায়ে প্রথম ৭টি আয়াত লক্ষণীয়। এই উদ্বোধনী বক্তব্যগুলো সূরার সার্বিক পরিমন্ডল ও তার প্রভাব বলয়ের সাথে পুরোপুরিভাবেই সংগতিশীল।

এসব ক্ষেত্রে কোরআন একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করে থাকে। কোথাও সূরা 'আদ দোহা'র ন্যায় স্নেহপ্রীতি ও দরদ মাখা দৃশ্য অংকন করে। আবার কোথাও অনুসরণ করে সূরা 'আ'দিয়াত' এর ন্যায় ঊষাকালীন দ্রুতগামী অশ্বের ধুলা উড়ানো এবং কবর খুলে কবরবাসীর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দৃশ্য। এভাবে বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরা হয়ে থাকে।

এই উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সূরার যে দশটি প্যারা সম্বলিত ছোট ছোট বাক্যগুচ্ছ রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই বলতে গেলে শ্রোতাকে এক একটি স্বতন্ত্র জগতে টেনে নিয়ে যায়। প্রত্যেক জগতে পরিভ্রমণের সময় সূরাটি নিজেই যেন চিন্তা গবেষণা, আবেগ, উদ্দীপনা মানসিক প্রতিক্রিয়া ও সাড়ার এক একটি বিশাল অংগনে রূপান্তরিত হয়। ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দের তুলনায় সেই বাস্তব অংগনগুলো অনেক প্রশস্ত ও সুপরিসর। শব্দগুলো যেন এক একটি সাংকেতিক তীর, যা বিভিন্ন জগতের দিকে ইংগিত করে যায়।

এর মধ্যে প্রথম বাক্যগুচ্ছটি (৮-১৫তম আয়াত) কেয়ামতের দিনের দৃশ্য বর্ণনা সম্বলিত। এতে আকাশ ও পৃথিবীতে যে ভয়াবহ পরিবর্তন সূচিত হবে তার একটা সুন্দর চিত্র আঁকা হয়েছে। এই চিত্র সে সময়কার, যখন রসূলরা সবাই মানব জাতির সাথে এক হয়ে হিসাব চুকিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় প্যারাটি হচ্ছে অতীত যমানার আল্লাহদ্রোহীদের ধ্বংসের কাহিনী সম্বলিত। আল্লাহর বিধান ও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কি নীতি অবলম্বন করে থাকেন এখানে তার প্রতি ইশারা ইংগিত রয়েছে। এ প্যারাটি ১৬ থেকে ১৯ তম আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত।

তৃতীয় প্যারাটি মানুষের ইহকালীন জীবনের সূচনা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং এটি ২০-২৪ আয়াত জুড়ে বিস্তৃত।

চতুর্থ প্যারাটি ২৫-২৮ আয়াত জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এতে পৃথিবী, তার জীবিত ও মৃত অধিবাসীদের বাসস্থানের বর্ণনা, তার স্থীতি ও তাতে জীবন দানকারী পানির প্রাচুর্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম প্যারাটি রয়েছে ২১-৩৪ আয়াতসমূহে। ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের কেয়ামতের দিন যে আযাবে ভুগতে হবে এতে তার বিবরণ রয়েছে।

ষষ্ঠ (৩৫-৩৭) ও সপ্তম প্যারায় (৩৮-৪০) দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ভয়াবহ পরিণতির আরো কিছু বিবরণ এসেছে।

পার্থিব জীবনের সব কিছুই এই আখেরাত বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত মূল্যবোধের বিশুদ্ধিও এর ওপর নির্ভরশীল। তাই এই আকীদাকে মনে বদ্ধমূল করার জন্যে এক দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টা সাধনার প্রয়োজন ছিলো।

**তাফসীর**

সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং শপথ করে বলছেন যে, আখেরাত সংক্রান্ত এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবেই। আর শুরুতে শপথ সূচক ক্রিয়াপদটি এই মর্মে ইংগিত দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা যে জিনিসের শপথ করছেন, তা অদৃশ্য জগতের অজানা একশক্তি, যা মানবজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাচীন তাফসীরকারদের মধ্যে উল্লেখিত শব্দ কয়টি 'মোরসালাত' (প্রেরিত) 'আ'সেফাত' (প্রবাহিত) 'ফা'রেকাত' (বিচ্ছিন্নকারী) ও মুলকিয়াত (জাগরুককারী) দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এ দ্বারা সকল রকমের বাতাসকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন, সকল শ্রেণীর ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কারো মতে, এর কোনো কোনো শব্দ দ্বারা বাতাস এবং কোনো কোনোটি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এই শব্দ কয়টি সত্যিই রহস্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অস্পষ্টতা ও রহস্যময়তা আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারে লুকানো অদৃশ্য জিনিসের নামে শপথ করার সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ। শপথ দ্বারা এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, এই সব অজানা ও অদৃশ্য জিনিস যেমন বাস্তব ও মানব জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী, ঠিক তেমনি এই শপথও বাস্তব এবং অবধারিতভাবে তা কার্যকর হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.), মাসরূক, আবুদ দোহা, মোজাহেদ, সুদ্দী, রবী ইবনে আনাস ও আবু সালেহ থেকে বর্ণিত আছে যে, মোরসালাত বা 'প্রেরিত' শব্দ দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। সে মতে কথাটার মর্ম দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তায়ালা ক্রমাগত ও অবিরত ধারায় প্রেরিত ফেরেশতাদের নামে শপথ করছেন। 'উরফ' শব্দটি ঘোড়ার বিরামহীন দৌড়ের বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবু সালেহ একই রকম ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন। 'আসেফাত', 'নাশেরাত', 'ফারেকাত' ও 'মুলকিয়াত' দ্বারাও ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে।

ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে 'মোরসালাত' দ্বারা ঘোড়ার মতো জোরে ছুটে চলা বাতাসকে বুঝানো হয়েছে। 'আসেফাত' ও 'নাসেরাত' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যাও তিনি এভাবে করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বাতাস। কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে ইবনে আব্বাস (রা.), মোজাহেদ, কাতাদা ও আবু সালেহ-এর মতও তদ্রুপ। 'মোরসালাত' দ্বারা যে বাতাসকে বুঝানো হয়েছে ইবনে জরীর সে ব্যাপারে নিশ্চিত। অনুরূপভাবে 'নাশেরাত' অর্থও হবে আকাশে মেঘ বিস্তারকারী বাতাস।

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'ফারেকাত ও মুলকিয়াত' দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.), মাসরূক, মোজাহেদ, কাতাদা, রবী ইবনে আনাস, সুদ্দী ও সাওরী প্রমূখও একমত। কেননা তারা আল্লাহর নির্দেশে রসূলদের কাছে আসেন, হক ও বাতেলকে পৃথক করেন এবং রসূলদের কাছে ওহী নাযিল করেন, যা সৃষ্টির ওপরও ভীতি প্রদর্শন সম্বলিত।

আমার অভিমত হচ্ছে যে, এখানে যে কয়টি জিনিসের নামে শপথ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যেমন 'যারিয়াত' ও 'নাযিয়াত' শব্দ দুটো রয়েছে। এর মর্ম নির্ণয়ে যে মতভেদ ঘটেছে তা থেকেও এর অস্পষ্টতা প্রমাণিত হয়। এগুলোর সুনিশ্চিত অর্থ অজ্ঞাত রাখার উদ্দেশ্য সম্ভবত, ভীতি ও আতংক সৃষ্টি। এই অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতাই এখানকার মূল উপাদান। অস্পষ্টতাই এখানে সব স্পষ্ট ব্যাপার। এই অস্পষ্টতাই শ্রোতার চেতনায় এক ধরনের শিহরণ আনে। এই শিহরণ ও কম্পনই সূরার বক্তব্য বিষয়ের সাথে অধিকতর মানানসই।

বস্তুত সূরার প্রত্যেকটি প্যারাই হচ্ছে এক একটি শিহরণ। ঠিক যেন কোনো ব্যক্তিকে ঘাড়ি ধরে এক একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার অপরাধ সম্পর্কে বা সত্য অস্বীকার করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, অতপর 'সেদিন সত্য অস্বীকারকারীদের ধ্বংস অনিবার্য' বলে চরম একটা হুমকি দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে।

**কেয়ামতের মহাপ্রলয়**

এরপর কেয়ামতের দিনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য তুলে ধরে তাকে আরেকটি প্রচন্ড ঝাকুনি দেয়া হচ্ছে। রসূলরা সমগ্র মানব জাতির কাছ থেকে তাদের রেসালাতের দায়িত্ব পালনের কি সাড়া পেলেন তার হিসাব মেলানোর জন্যে কেয়ামতের এই দিনটি নির্দিষ্ট রয়েছে।

'যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হয়ে যাবে, আকাশ বিদীর্ণ করা হবে, পাহাড় ধুনে ফেলা হবে .... সেই দিন অমান্যকারীদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় সংঘটিত হবে।'

কোরআনের বহু সূরায় এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে। বিকট গর্জন, প্রকান্ড ফাটল ও ভয়াবহ বিস্ফোরণের মাধ্যমে দৃশ্যমান এই মহাবিশ্বের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবনে মানুষ ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরীর অগ্নুৎপাত, ঝড় বন্যা প্রভৃতি হাজারো ত্রাসসঞ্চারী বিপর্যয় দেখে থাকলেও কেয়ামতের সেই মহা বিপর্যয়ের সাথে এগুলোর কোনো তুলনাই হবে না। কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলীর সাথে এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনা করার ব্যাপারটি হচ্ছে শিশুদের বাজি ফুটানোর সাথে আনবিক বোমা ও হাইড্রোজেন জাতীয় কোনো বিস্ফোরকের মতো। আসলে এটা একটা কাছাকাছি উদাহরণ পেশ করা মাত্র। নচেত এই প্রকৃতির বিপর্যয় ও বিস্ফোরণের ফলে যে আতংকের সৃষ্টি হবে, তা মানুষের কল্পনার যে কোনো বিপর্যয়ের চেয়েও ভয়াবহ ও মারাত্মক হবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও এই সূরায় আরেকটি বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা এখনো পর্যন্ত স্থগিত রয়েছে। সেটি এই যে, সেদিন রসূলরা পৃথিবীতে তাদের আবহমানকালব্যাপী আল্লাহর দিনের দাওয়াত পেশ করার ফলাফল প্রকাশ করবেন। এই দিনটিই তাদের এই কাজের জন্যে নির্ধারিত ছিলো। সেদিন তারা এ কাজের সর্বশেষ হিসাব পেশ করবেন, যাতে আল্লাহর ফয়সালা ও বিধান অনুসারে পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিরোধের মীমাংসা করা যায় এবং যুগ যুগ পরে আল্লাহর সর্বশেষ বার্তা ও ঘোষণা করা যায়। এ আয়াত কয়টির ভাষায় এই দাওয়াতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তার বিশালত্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'যখন রসূলদের উপস্থিতির সময় এসে পড়বে....।' বর্ণনাভংগী থেকে স্পষ্ট হয় যে, এখানে একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা হতে যাচ্ছে! এই বিষয়টি যখন শ্রোতার অনুভূতিতে পূর্ণ ভয়াবহতা নিয়ে জাগরুক হয় এবং ম্লান হয়ে যাওয়া নক্ষত্র, ফেটে যাওয়া আকাশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত পাহাড় পর্বতের চেয়েও তার ভয়াবহতা বেশী হয়, তখনই এই ভীতিজনক হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়,

'সেদিন ধ্বংস ও বিপর্যয় হবে অমান্যকারীদের জন্যে।'

এই হুমকি ও হুঁশিয়ারী স্বয়ং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ সময়ে হুমকির প্রভাব যে অত্যন্ত ভীতিজনক হবে তা সহজেই বোধগম্য। কেয়ামতের ভয়াল দৃশ্যের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা অতীতের ধ্বংস হয়ে যাওয়া কাফেরদের বর্ণনা দিচ্ছেন,

'আমি কি আগের লোকদের ধ্বংস করিনি? তারপর তাদের পরবর্তীদেরকেও একই পরিনতির শিকার করিনি? আমি অপরাধীদের সাথে এ রকমই আচরণ করে থাকি। সেদিন ধ্বংস ও বিপর্যয় হবে অস্বীকারকারীদের জন্যে!'

**অপরাধীদের সাথে আচরণ**

এভাবে দেখা গেলো একটি আঘাতেই যেন আগের লোকদের মৃতদেহের স্তুপ পড়ে রইলো। আরেক আঘাতে পরবর্তীদের মৃতদেহের স্তুপও পড়ে রইলো। যতো দূর দৃষ্টি যায়, যেন হতাহতদের বিরান সারি আর সারি। আর তাদের উপস্থিতিতেই যেন আল্লাহর শাশ্বত ঘোষণা জারী করা হচ্ছে– 'হাঁ আমি অপরাধীদের সাথে এ রকমই আচরণ করে থাকি।'

এটা আল্লাহর এক চিরস্থায়ী ও নিরপেক্ষ নীতি, আর যেহেতু সকল যুগের অপরাধীরাই অতীতের অপরাধীদের মতো ধ্বংসের যোগ্য, তাই তাদের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের হুমকি দেয়া হচ্ছে,

'সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয় (অবধারিত)!'

ধ্বংস ও বিপর্যয়ের বর্ণনা থেকে পরবর্তী প্যারায় সৃষ্টি ও উজ্জীবনের বিবরণে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। এই সৃষ্টি ও উজ্জীবন পরিকল্পিত ও সুশৃংখল। ছোট ও বড় সকলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

'আমি কি তোমাদেরকে অত্যন্ত তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? আমি সব ধরনের কাজ করতে সমর্থ। আমি অতীব ক্ষমতাবান। সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে মহা বিপর্যয় ও ধ্বংস!'

এটা ছিলো মাতৃগর্ভে সন্তানের দীর্ঘ ও বিচিত্র বিবর্তনের কাহিনী, এখানে অতি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এক ফোঁটা তুচ্ছ পানিকে সুরক্ষিত জরায়ুতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে জন্যে সংরক্ষণ করা। সেই মেয়াদটির বিভিন্ন স্তরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে যে সৃজনী কাজ চলে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মন্তব্য আসছে, 'আমি এরূপ করতে সমর্থ, আমি অতীব ক্ষমতাবান।'

বস্তুত আল্লাহর এই প্রজ্ঞাই পরিকল্পিতভাবে সকল জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালা এই অপ্রতিরোধ্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষিতে পুনরায় হুমকি উচ্চারিত হয়েছে– 'অমান্যকারীদের জন্যে সেদিন মহা বিপর্যয় ও ধ্বংস।'

এরপর এই পৃথিবীর প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের জীবনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা দিয়েছেন। মানব জীবনকে সহজ ও সুগম করতে পারে, এমন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট ও উপকরণ দান করেছেন– 'আমি কি পৃথিবীকে একটি আবাসভূমি করে বানাইনি ....।' অর্থাৎ আমি জীবিত ও মৃত সকলের জন্যেই পৃথিবীকে আবাস ভূমি বানিয়েছি। এখানে উচু ও সুদৃঢ় পর্বতমালা বানিয়েছি, যার শীর্ষস্থানে মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয় এবং তা থেকে সুপেয় পানি গড়িয়ে পড়ে। এ সব ব্যবস্থা কি স্রষ্টার অপার ক্ষমতা ও পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব? বিচক্ষণ প্রজ্ঞা, নিপুন কুশলতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া কি এসব আসলেই সম্ভব? এর পরও কি অমান্যকারীরা তা অমান্য করবে?

**কাফেরদের জন্যে মহাবিপর্যয়**

'সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে মহাবিপর্যয় ও ধ্বংস অনিবার্য।'

এ সব দৃশ্য তুলে ধরা এবং এর প্রভাবে শ্রোতার স্নায়ুমন্ডলকে আবেগে উদ্বেলিত করার পর আকস্মিকভাবে কেয়ামতের জবাবদিহী, হিসাব নিকাশ ও কর্মফল সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করা

হয়েছে। এখানে আমরা শুনতে পাচ্ছি ইসলামী দাওয়াতকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে॥প্রত্যাখ্যানকারী সেই অপরাধীদের আযাবের দিকে ধাবিত হবার জন্যে ভয়াবহ এক আদেশ জারী করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্ট আরো বাড়ে,

'চলো তোমরা যা মিথ্যা মনে করতে তার দিকে...সেদিন মহাবিপর্যয় হবে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের!' কেয়ামতের ময়দানের দীর্ঘ, অবরুদ্ধ ও আটক জীবন শেষে তারা মুক্ত হয়ে রওয়ানা হবে। কিন্তু কোথায় যাবে? মনে হয় সেই মুক্তিলাভ ও রওয়ানা হওয়ার চেয়ে অবরুদ্ধ ও আটক থাকাই ভালো ছিলো!

'চলো তোমরা সেদিকে যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে।' কেননা সেটা তো এখন তোমাদের সম্পূর্ণ সামনে উপস্থিত। 'তোমরা চলো তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে।'

এ ছায়া হলো জাহান্নামের ধোঁয়ার ছায়া। এর ছায়া তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে লম্বা হয়ে যাবে। সেই ছায়ার চেয়ে জ্বলন্ত আগুন অনেক ভালো! 'তা ঠান্ডা নয় এবং আগুনের লেলিহান হল্কা থেকেও তা রক্ষা করে না।' অর্থাৎ গরম ও শ্বাসরুদ্ধকর ছায়া। তাকে ছায়া নাম দেয়া আসলে কাফেরদের সাথে আল্লাহর এক নিষ্ঠুর উপহাস। তাদেরকে এই মর্মে আশান্বিত করা হচ্ছে যে, জাহান্নামের উত্তাপ থেকে এই ছায়ায় আশ্রয় সন্ধান করলেও করতে পারো! রওয়ানা হয়ে যাও। কোথায় রওয়ানা হতে হবে তা তো জানো! কাজেই তার নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

'সেই আগুন প্রাসাদতুল্য অগ্নি শিখা ছুড়ে মারবে, যেন হলুদ বর্ণের উট।'

('কাস্‌র' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রাসাদ। আরবরা অবশ্য যে কোনো পাথর নির্মিত ঘরকেই কাস্‌র বলতো। তাই প্রচলিত অর্থে এটি প্রাসাদের মতো বিশাল ও প্রকান্ড হওয়া জরুরী নয়।) যখন এই শিখা ক্রমাগত ছুটতে থাকবে, তখন মনে হবে তা ইতস্তত বিচরণকারী হলুদ উট। আগুনের শিখার অবস্থা যখন এরূপ, তখন সে আগুন থেকে যে শিখা বের হয়, তা কি রকম হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়।

এই বিবরণ সম্পর্কিত ভীতি যখন সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ঠিক সেই মুহূর্তে মন্তব্য করা হচ্ছে– 'সেদিন বিপর্যয় ও ধ্বংস অমান্যকারীদের জন্যে!'

এই দৃশ্যমান আযাবের দৃশ্য যথাযথভাবে তুলে ধরার পর এক কঠিন মানসিক আযাবের বিবরণের মাধ্যমে এ আলোচনা এখানে শেষ হচ্ছে, পরবর্তী আয়াত দুটোতে বলা হয়েছে–

'এটা হবে সেই দিন যখন তারা নির্বাক হয়ে যাবে, কোনো ওযর আপত্তি তোলার কোনো অনুমতি পাবে না।' বস্তুত তখন এক ভীতিকর নীরবতা ও থমথমে নিস্তব্ধতার আকারে আতংকময় পরিস্থিতি বিরাজ করবে। সেই নীরবতা ভেংগে কেউ কোনো কথা বলবে না, না কেউ কোনো ওযর আপত্তি তুলতে পারবে। কেননা তর্কবিতর্ক করা বা ওযর বাহানা করার সময় অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

'সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে শুধু বিপর্যয় ও ধ্বংসের দিন!' কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের আক্ষেপ, অনুশোচনা, দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হলে তাদের ভালো হওয়ার শপথ এবং নানা রকমের ওযর আপত্তির বিবরণ দেখা যায়। যেহেতু কেয়ামতের দিনটি পরিমাণে অনেক বড় হবে। তাই সেখানে কিছু সময় ওযর আপত্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কাটবে, আবার কিছু সময় নির্বাক ও নিস্তব্ধ অবস্থায়ও কেটে যাবে, এটা হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা। আলোচ্য সূরায় পূর্বাপর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই নির্বাক অবস্থাটাই বেশী মানানসই বলে সেটাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াত দুটোতে বলা হচ্ছে– 'এটা হচ্ছে মীমাংসার দিন। আমি আজ তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে সমবেত করেছি। এখন আমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করতে চাইলে তোমরা করতে পারো। সেই দিন অমান্যকারীদের জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয়!'

অর্থাৎ আজ মীমাংসা ও কর্মফলের দিন, ওযর বাহানা করার দিন শেষ হয়ে গেছে। আজ আমি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি। সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে কোনো ফন্দি বা চক্রান্ত আঁটতে চাও তো আঁটো। কিছু করার ক্ষমতা থাকে তো করো। কোনো

চক্রান্তই আঁটতে পারবে না। কোনো ক্ষমতাও তোমাদের নেই। আজ শুধু তোমাদের মুখ ভোতা করে থাকার দিন। কঠিন মানসিক আযাব মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া তোমাদের কোনোই গত্যান্তর নেই। 'আজ তোমাদের বিপর্যয় ও ধ্বংসের দিন।'

**মোমেনদের বিশেষ পুরস্কার**

অপরাধীদের দৈহিক ও মানসিক আযাবের বিবরণ শেষে এখন পরহেযগার ও সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কারের বিবরণ দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে সম্মানের সাথে এখানে সম্বোধন করা হচ্ছে,

'পরহেযগার ও সৎকর্মশীলরা ছায়া ঝর্ণার মধ্যে থাকবে— এবং থাকবে ....... সেদিন বিপর্যয় হবে শুধু অমান্যকারীদের!' পরহেযগার লোকদের এই ছায়া হবে আসল ছায়া। সেই তিন শাখা বিশিষ্ট গরম ও শ্বাসরুদ্ধকর ছায়া নয়। তারা থাকবে সুপেয় পানির ঝর্ণার কাছে। শ্বাসরুদ্ধকর ধোঁয়ার ছায়ায় নয়; যা শুধু পিপাসাই বাড়ায়। 'আর মজাদার ফলমূল।' দৈহিক ভাবে উপভোগ্য ও সম্মানজনক এ সব নেয়ামত লাভের পর তারা সমগ্র মানবজাতির সামনে আরেকটি সম্মানও লাভ করবেন এবং তা হচ্ছে— 'তোমাদের সৎ কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা আজ এসব কিছু সসম্মানে খাও ও পান করো। আমি সৎ কর্মশীলদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।'

এই সম্মানের পাশাপাশি কাফেরদের জন্যে অবমাননাকর আযাবের ঘোষণা দিয়ে সৎকর্মের পুরস্কারকে আরো উপভোগ্য করা হবে। সেই অবমাননার ঘোষণা হলো,

'সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে বিপর্যয় অনিবার্য।'

পরবর্তী আয়াতে দুনিয়ার জীবনের বন্ধ হয়ে যাওয়া পাতাটি যেন ক্ষনেকের জন্যে আবার খোলা হচ্ছে। সহসা যেন আমরা দুনিয়ায় ফিরে এসেছি, এখানে অপরাধীদের কঠোর ভাষায় বলা হচ্ছে— 'অল্প কিছুদিন তোমরা খাওয়া দাওয়া করো ও ভোগবিলাসে মত্ত হও, তোমরাই অপরাধী। সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে বিপর্যয় অনিবার্য!'

এভাবে পরপর দুটি প্যারায় দুনিয়া ও আখেরাতকে একত্রিত করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধী এই দুটি দৃশ্য যেন একই সময়ে উপস্থিত হয়েছে। অথচ উভয়ের মাঝে রয়েছে অনন্ত কালের ব্যবধান। একটু আগেই যেখানে আখেরাতে পরহেযগারদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, সেখানে পরক্ষণেই দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত কাফেরদের উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে যেন বলা হচ্ছে, দুই ধরনের বিশ্বাসের পরিণামের পার্থক্যটা তোমরা ভালো করে দেখে নাও। এই দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী আয়েশ কিছুটা ভোগ করে নাও। তাহলেই পরিণামটা টের পাবে। সেখানে সকল আরাম আয়েশ থেকে বঞ্চিত হবে এবং সুদীর্ঘকালের আযাব ভোগ করবে।

'সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে বিপর্যয় ও ধ্বংস!' অতপর এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে যে, মোশরেকদের হেদায়াতের দিকে ডাকা হচ্ছে অথচ তারা তা গ্রহণ করছে না,

'যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা রুকু করো তখন তারা রুকু করে না। সেদিন অমান্যকারীদের জন্যে বিপর্যয় ও ধ্বংস অনিবার্য!' খারাপ পরিণামের বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করা এবং এর সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর বলা হয়েছে— 'আর কোন বাণীতে তারা অতপর বিশ্বাস স্থাপন করবে!'

আল্লাহর যে বাণী পাহাড়কে টলিয়ে দেয়, তার প্রতি যে ব্যক্তি ঈমান আনে না, সে অতপর আর কোনো বাণীতেই বিশ্বাস আনবে না। সুতরাং এই অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে শুধু দুঃখ কষ্ট, বঞ্চনা, হীনতা, চরম অশুভ পরিণাম ও ভয়াবহ বিপর্যয়।

সূরাটির ভাষা এত গঠনমূলক, তার সূরেলা উপস্থাপনা এত শানিত, তার উপস্থাপিত দৃশ্যাবলী এত জোরদার এবং বিবেকের ওপর তার আঘাত এতো তীব্র যে, তার সামনে কারো বিবেক ও মন স্থির থাকতে পারে না এবং কোনো মানব সত্ত্বা তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

কোরআনে এই অপ্রতিরোধ্য শক্তি যিনি নিহিত রেখেছেন এবং এই কোরআনকে যিনি নাযিল করেছেন, সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাই, মুক্ত কণ্ঠে আমরা ঘোষণা করি সোবহানাল্লাহ!

# এক নযরে
# তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

**১ম খন্ড**
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

**২য় খন্ড**
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

**৩য় খন্ড**
সূরা আলে ইমরান

**৪র্থ খন্ড**
সূরা আন নেসা

**৫ম খন্ড**
সূরা আল মায়েদা

**৬ষ্ঠ খন্ড**
সূরা আল আনয়াম

**৭ম খন্ড**
সূরা আল আ'রাফ

**৮ম খন্ড**
সূরা আল আনফাল

**৯ম খন্ড**
সূরা আত তাওবা

**১০ম খন্ড**
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

**১১তম খন্ড**
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

**১২তম খন্ড**
সূরা আল হেজ্র
সূরা আন নাহ্ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্ফ

**১৩তম খন্ড**
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

**১৪তম খন্ড**
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

**১৫তম খন্ড**
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

**১৬তম খন্ড**
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

**১৭তম খন্ড**
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

**১৮তম খন্ড**
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

**১৯তম খন্ড**
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ